CHATURDIK
A Bengali Novel by Prafulla Roy
Published by Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 73 Rs. 80/-

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

দাম : আশি টাকা

ISBN : 81-7079-934-1

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
মুদ্রক : ধীরেন্দ্রনাথ বাগ। নিউ নিরালা প্রেস
৪ কৈলাস মুখার্জি লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৬

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমপূজনীয়েষু

লেখকের অন্যান্য বই

রামচরিত্র
মোহানার দিকে
পূর্বপার্বতী
আমাকে দেখুন ১।২।৩।৪
নিজের সঙ্গে দেখা
আমার নাম বকুল
শঙ্খিনী
রৌদ্রঝলক
সুখের পাখি অনেক দূরে
শীর্ষবিন্দু
একাকী অরণ্যে
নয়না
আলোয় ফেরা
মহাযুদ্ধের ঘোড়া ১।২
আকাশের নীচে মানুষ
স্বর্গের ছবি
সিন্ধুপারের পাখি
নোনা জল মিঠে মাটি
শ্রেষ্ঠ গল্প
ধর্মান্তর
মাটি আর নেই
সত্যমিথ্যা
বাঘবন্দী
দায়বন্ধ
অন্ধকারে ফুলের গন্ধ
মানুষের জন্য
তিন মূর্তির কীর্তি
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
দুই দিগন্ত
অদিতির উপাখ্যান
স্বনির্বাচিত গল্প
যুদ্ধযাত্রা
চরিত্র
ইত্যাদি

আমার একুশ বছর আগের উপন্যাস 'সীমারেখার বাইরে'। এতকাল পর সেটি পড়তে গিয়ে মনে হল, অনেক জায়গায় কাঁচা হাতের ছাপ রয়েছে, আগাগোড়া এর ঘষামাজা দরকার। নতুন করে লেখার ফলে উপন্যাসটির আলাদা একটি চেহারা দাঁড়িয়ে যায়। লেখাটাই যখন সম্পূর্ণ বদলে গেল তখন এর নতুন একটি নামও দেওয়া যেতে পারে। 'সীমা রেখার বাইরে' তাই 'চতুর্দিক' হয়ে আত্ম-প্রকাশ করল।

গ্রন্থকার

প্রথম তরঙ্গ

উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালের আগস্ট মাস। কলকাতা-গামী লোকাল ট্রেনটায় একেবারেই ভিড় ছিল না। আমি যে কামরায় ছিলাম তাতে মাত্র পাঁচজন যাত্রী। আমি ছাড়া বাকি চারজন কোন কারখানার শ্রমিক-ট্রমিক হবে। তাদের পোশাক এবং চেহারা স্পষ্ট উচ্চারণে সেই কথাই বুঝিয়ে দিচ্ছিল। আমরা পাঁচজন বিক্ষিপ্তভাবে পাঁচ জায়গায় বসে ছিলাম।

ইদানীং ক' বছর ধরে কলকাতার দিকে যে ট্রেনগুলো যায় সেগুলো প্রায় যাত্রীশূন্য, নির্জন। উনিশ শ বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশে, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্য পর্বে হাওড়া-দমদম শিয়ালদা—কলকাতার যত সদর আর খিড়কি দিয়ে মানুষের ঢল বেরিয়ে গিয়েছিল। তারা এখনও ফিরতে শুরু করে নি। ট্রেন-গুলোতে এখনও জোয়ারের বেগ লাগে নি। কলকাতায় এখনও ভাটার টান। নেহাতই ঐ শহরটার সঙ্গে যাদের জীবিকা আর প্রাণ ধারণের দায় জড়িত তারাই শুধু ভয়ে ভয়ে, বুকে শ্বাস চেপে যাওয়া-আসা করে।

হুগলী স্টেশন থেকে খুব সকালে ট্রেন ধরেছিলাম। আমি কলকাতায় যাচ্ছি। আমাদের গ্রাম মাজনা, আমাদের সংসার, আত্মীয়-স্বজন—সমস্ত কিছু ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যাচ্ছি। কলকাতায় না গিয়ে আমার উপায় নেই।

জীবন ধারণের সবগুলি রাস্তাই আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে আসছিল। ভিতরে-বাইরে একটু একটু করে মরতে বসেছিলাম।

আমি কলকাতায় যাচ্ছি এই আশায় যে ঐ শহরটা চাকরি দিয়ে, জীবিকা দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে এবং বাঁচবার মত একটা পথ খুলে দিয়ে আমাকে রক্ষা করবে।

যেমনই হোক একটা চাকরি আমার চাই। নতুবা আমি বাঁচব না, মৃত্যু আমার অনিবার্য।

হুগলী ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছি। এখন বেশ বেলা হয়েছে।

আমাদের ট্রেন সব স্টেশনে থেমে, ধোঁয়া আর কয়লার গুঁড়ো উড়িয়ে, ঢিমে তালে মন্থর গতিতে ছুটছে। বিচিত্র এক আলস্য তার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে রয়েছে যেন। গন্তব্যে পৌঁছবার জন্য কোনরকম ব্যস্ততা নেই। ভাবখানা এই, যখন খুশি গেলেই হ'ল।

জানালার কাছে বসে ছিলাম। আমার মুখটা বাইরের দিকে ফেরানো। যতদূর চোখ যায়, দিগন্তবিসারী সমতল মাঠ। সবুজ ধানের অগাধ খুশিতে ডগমগ হয়ে আছে।

সময়টা আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। বাংলা মাসের হিসেবে শ্রাবণ অর্থাৎ

বর্ষাকাল। কাগজে-কলমে যে হিসেবই থাক, বর্ষার আমেজ কোথাও নেই। বরং আকাশে-বাতাসে শরৎকালের মেজাজটুকু পুরোপুরি ধরা পড়েছে।

আকাশটা আশ্চর্য নীল। তার অথৈ বুকে সাদা সাদা মেঘের টুকরোগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝির ঝির করে একটু বৃষ্টি হয়। তারপরেই গলানো সোনার মত রোদে সব দিক ভেসে যায়।

আমি তাকিয়ে আছি। কিন্তু ঐ তাকিয়ে থাকা পর্যন্তই। আকাশ-মেঘ-মাঠ-ধান, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিংবা দেখতে পেলেও আমার চেতনায় তারা রেখাপাত করতে পারছে না। অনেক, অনেক দূরে এই মাঠ আর আকাশের দিগন্ত পেরিয়ে কোন এক অদৃশ্য মঞ্চে আমার চব্বিশ বছরের জীবন একটা সুগ্রথিত নাটকের মত দৃশ্যে দৃশ্যে ফুটে উঠছে। আমি যেন কলকাতা-গামী এই ট্রেনটায় নেই, সেই নাটকটার মুখোমুখি রুদ্ধশ্বাসে বসে আছি।

আমার জীবনটাই শুধু না, আমাদের সংসার আর এই যুগটাও সেই মঞ্চে ফুটে উঠছে। এই যুগ আর আমাদের সংসার আমার জীবনের চালচিত্র যেন।

প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি যুগটাকে, আমাদের এই নিদারুণ কালকে। এই কালটার শুরু উনিশ শ উনচল্লিশে, পশ্চিম গোলার্ধে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন। দেখতে দেখতে পশ্চিমের যুদ্ধ শিকারী বাজের মত ডানা মেলে পূর্ব দিগন্তে হানা দিল। পৃথিবীর মাটি মানুষের রক্তে পিছল হ'ল। মুষ্টিমেয় ক'জন সাম্রাজ্যবাদীর মধ্য থেকে আদিম কালের শ্বাপদেরা আত্ম-প্রকাশ করেছে। দুই গোলার্ধের অগণিত অসহায় মানুষের প্রাণ নিয়ে তাদের সে কি মত্ততা!

সারা পৃথিবীর কথা থাক। আমাদের এই বাংলাদেশের দিকেই তাকানো যাক।

উনিশ শ উনচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ—এই ছ বছরে সমস্ত বাংলা দেশ জুড়ে তরঙ্গ উঠেছে। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ বন্যা মহামারী—একের পর এক ঢেউ উন্মত্তের মত আঘাত দিয়ে যাচ্ছে। সেই আঘাতে কোন মানুষই আর স্থির নেই। সবাই অশান্ত, বিক্ষিপ্ত। সোজা হয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। সবার পায়ের নিচেই মাটি টলমল, তরঙ্গিত।

সৃষ্টির আদিম যুগে গ্রহ-উপগ্রহরা নাকি দুর্জয় বেগে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে বেড়াত। তাদের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ছিল না, কক্ষপথও তখন নির্ধারিত হয় নি। এ-কালের মানুষও অনেকটা সেইরকম। ঠিক সেইরকম না, সামান্য পার্থক্য আছে। এই মানুষগুলির পথ ছিল, মত ছিল, জীবনের এক-একটা লক্ষ্যও ছিল। কিন্তু ছ-বছরের অতর্কিত ধাক্কায় তাদের সব গেছে। মত-পথ-লক্ষ্য, ন্যায়-নীতি-নিয়ম—সমস্ত কিছু থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আদিম কালের গ্রহদের মত উদ্দেশ্যহীন অন্ধ গতিতে তারা ছুটছেই।

এই ছ-বছরে কোন মানুষই সুস্থ অক্ষত নেই। সবার গায়েই কিছু-না কিছু আঁচ লেগেছে।

সবার গায়েই লেগেছে, একমাত্র আমি ছাড়া। দূর থেকেই এই নিদারুণ সময়কে দেখেছি। মাঝে মধ্যে খবরের কাগজ পড়ে এবং লোকমুখে গুজব শুনে যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর ভয়াবহতা সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। জেনে শিউরে উঠেছি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। নিজের জীবনে এই কাল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।

আমি ছিলাম সুরক্ষিত একটা দুর্গের মধ্যে। দুই হাত বাড়িয়ে বাবা আমাকে আগলে রেখেছিলেন। সময় হাজার চেষ্টা করেও আমার নাগাল পায় নি।

হুগলী স্টেশন থেকে মাইল চারেক গেলে আমাদের গ্রাম, যার নাম মাজনা। আমি মাজনাতে থাকতাম না। থাকতাম শ্রীরামপুর হোস্টেলে। সেখানে কলেজে পড়তাম। মাসের পয়লা তারিখে বাবা টাকা পাঠিয়ে দিতেন। এ নিয়মের কোনদিন ব্যতিক্রম হয় নি। মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় বাড়ি যেতাম। সেও মাত্র দিন কয়েকের জন্য। তারপরেই আবার হোস্টেলে ফিরে আসতাম। এই ছিল আমার জীবনের মোটামুটি ছক। এই ছকের বাইরে কোনদিন পা বাড়াই নি।

একমাত্র আমি বললে ভুল হবে। আমাদের সংসারটাই নতুন কাল সম্পর্কে সচেতন ছিল না। ছিল না আমার বাবার জন্য। আমার মতই বাবা সারা সংসারটাকে বেষ্টন করে ছিলেন। সময়ের এতটুকু দাহ তার গায়ে লাগতে দেন নি।

মাজনাতে আমাদের বিশাল সংসার। বাবারা ছিলেন পাঁচ ভাই। বাবা বড়, অন্য চার ভাই ছোট। আমার মা নেই। আমার জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা গেছেন। মা ছিলেন না কিন্তু চার কাকীমা আছে। তাদের অগুনতি ছেলেপুলে আছে। ফলে বাড়িটা সবসময় জমজমাট।

আপন মায়ের পেটের ভাই অথচ চার কাকার স্বভাবে বিন্দুমাত্র মিল নেই। এমন কি চেহারার দিক থেকেও কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা সবাই একে অন্যের বিপরীত।

কাকাদের চরিত্রে কিছু কিছু জান্তব উপাদান ছিল। উপমা দিয়ে বলা যায়, বড় কাকা হরেন বুনো শুয়োর। বুনো শুয়োরের কুচির মতই তার চুল খাড়া, মুখটা ছুঁচলো, চোখদুটো রক্তাভ। বিরাট স্থূল দেহ, কণ্ঠস্বর কর্কশ। গলা প্রায় নেই বললেই চলে। মাথাটা সরাসরি ঘাড়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যেন। প্রকৃতিও তার সেইরকম। তেমনি উদ্ধত হঠকারী আর দুর্বিনীত। রাগও ভয়ঙ্কর।

জগতে যত রকমের নেশা আছে, গাঁজা-ভাঙ-আফিম-তাড়ি, কোনটাতেই তার বিতৃষ্ণা নেই। যতরকমের তমোগুণ আছে তার সবগুলোই বড়কাকার শরীরে রয়েছে। খেত সে প্রচুর, ঘুমোত ততোধিক। আর কাজের মধ্যে ছিল দাঙ্গাবাজি। দু-চার টাকা দিলে তাকে ভাড়া পাওয়া যেত এবং তাকে দিয়ে লোকের মাথা ফাটানো, ঘরে আগুন দেওয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় অকাজ

করিয়ে নেওয়া যেত।

মেজকাকা লোকেন শিয়ালের মত। শরীরটা তার ভারি রুগ্ন, অত্যন্ত দুর্বল এবং অপুষ্ট। কিছুই সে খেতে পারত না। জোর করে খেলেও সহ্য হ'ত না। পাকস্থলীতে ঘা ছিল। অনেক চিকিৎসা করিয়েও ঘা-টা সারানো যায় নি। ফলে খাওয়া-দাওয়া-ঘুম-স্বাস্থ্য-আনন্দ—পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে চিরদিনের জন্য সে বঞ্চিত।

শরীর যা-ই হোক, মেজ কাকার বুদ্ধি কিন্তু সাঙ্ঘাতিক ক্ষুরধার। শিয়ালের মতই সে ধূর্ত এবং চতুর। ছয়ঋতু বারোমাস সে বাড়িতেই থাকত। কোনদিন তাকে ঘরের বার হতে দেখা যায় নি। দিবারাত্রি গুজ গুজ করে স্ত্রীর সঙ্গে কি পরামর্শ যে করত সে-ই জানে।

সেজকাকা যোগেনের উপমা হচ্ছে গর্দভ। চোখদুটো তার গাধার মতই ভাবলেশহীন এবং নির্বোধ। নাক থ্যাবড়া, কানদুটো অস্বাভাবিক লম্বা। চুল খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা। চোখেমুখে এবং চেহারায় কোথাও বিন্দুমাত্র বুদ্ধির ঝলক নেই। শুধু বুদ্ধি কেন, কোনরকম ব্যক্তিত্বই ছিল না লোকটার। যে যেমনভাবে পারত তাকে খাটিয়ে নিত। আর নির্বিচারে মুখ বুজে খেটে যেত সে।

ছোটকাকা বীরেনের উপমা পশুর রাজ্যে নেই। তার জন্য আসতে হবে পাখিদের মধ্যে। সে যেন একটি ময়ূর। ভারি শৌখিন মানুষ বীরেনকাকা। প্রজাপতি-মার্কা সূক্ষ্ম গোঁফ ছাড়া সমস্ত মুখ নিখুঁতভাবে কামানো। মাথার চুল ঢেউ খেলিয়ে পরিপাটি করে আঁচড়ানো থাকত। সেই পারিপাট্যের এতটুকু হেরফের হবার উপায় ছিল না।

দামী সাবান মাখত সে। জামায় এসেন্স লাগাত। সবসময় তার গা থেকে ভুর ভুর করে গন্ধ বেরুত।

মেজকাকা সারাদিন যেমন বাড়ি থেকে বেরুত না, ছোটকাকা তেমনি বাড়িতেই থাকত না। বেশির ভাগ দিনই বাইরে কেটে যেত তার। যাত্রাদলে 'নিমাই' কি 'লক্ষ্মণের' পালা গাইত। তার স্বপ্ন ছিল কলকাতার 'গণেশ অপেরা' কি 'নাট্য কোম্পানি'র ঢঙে একটা দল খুলবে। সেই স্বপ্নেই সে বিভোর হয়ে থাকত।

চার কাকা তাদের রুচি এবং চরিত্র অনুযায়ী সঙ্গিনী পেয়েছিল। নিজের নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তাদের কোনদিন কোন বিষয়ে বিরোধ বাধতে দেখি নি। যথার্থই তারা সহধর্মিণী।

ভাবনায় চিন্তায় চেহারায় এবং প্রকৃতিতে কাকারা যেন পৃথিবীর চার প্রান্তের চারটি মানুষ। কোনদিক থেকেই তাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, একটা জায়গায় চার ভাইয়ের অদ্ভুত মিল আছে। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যাঃ'—এই শাস্ত্রবাক্যটি চার কাকাই তাদের জীবনে সার্থক করে তুলেছিল। বড়কাকার ছেলেমেয়ের সংখ্যা পাঁচ, মেজকাকার সাত, সেজকাকার চার এবং ছোটকাকার তিন।

সেই নিদারুণ যুগে যখন চালের মণ তিরিশ পঁয়তিরিশ টাকা, একজোড়া মাঝারি কাপড় পঁচিশ টাকা, তেল-ঘি-নুন-মশলার দর চাল আর কাপড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়তে চড়তে আকাশ ছুঁয়েছে তখন শ্রীরামপুরের হোস্টেলে থেকে নির্ভাবনায় আমি বি. এ. পড়ছি। আমার কাকারা কেউ ঘুমিয়ে আর দাঙ্গাবাজি করে, কেউ বউর সঙ্গে গুজুর গুজুর করে, কেউবা যাত্রাদলে 'নিমাই' কি 'লক্ষ্মণে'র পালা গেয়ে পরম নিশ্চিন্তে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। আর এই ভয়াবহ কালের যত ঝড় যত ঝাপটা, সব বয়ে যাচ্ছে আমার প্রৌঢ় বিপত্নীক বাবার উপর দিয়ে।

বাবা ছিলেন সেই স্বর্ণযুগের মানুষদের একজন যাঁরা সমস্ত ভাইকে এক সংসারে এক অন্নে রাখার জন্য নিঃস্বার্থভাবে মুখে রক্ত তুলে খেটে যেতেন। তাঁদের আদর্শ ছিল একান্নবর্তী পরিবার।

রাত থাকতে থাকতে ঘুম থেকে উঠে পড়তেন বাবা। একটা ধূসর রঙের গলাবন্ধ কোট ছিল তাঁর। শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস সেই কোটটি গায়ে দিয়ে ভোর হবার আগেই চার মাইল হেঁটে হুগলী স্টেশনে যেতেন। সেখান থেকে ফার্স্ট ট্রেন ধরে কলকাতা। এ একেবারে নিয়মিত এবং দৈনন্দিন।

বাবা ছিলেন সওদাগরি অফিসের বড় বাবু। দশটা থেকে তাঁর অফিস শুরু। কিন্তু ছ'টার মধ্যেই রোজ কলকাতায় পেঁছিতেন। ছ'টা থেকে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ছোটখাট কি একটা ব্যবসা যেন করতেন। তারপর পাইস হোটেলে গিয়ে নাকেমুখে চাট্টি গুঁজে অফিসে ছুটতেন। ছুটি হ'ত বিকেল পাঁচটায়।

তখন পুরোদমে যুদ্ধ চলছে। দেশী বিদেশী নানা কোম্পানি মরসুমী আগাছার মত গজিয়ে উঠেছে। ছুটির পর ক্যানিং স্ট্রীটের এক মাড়োয়ারী ফার্মে গিয়ে খাতা লিখতেন রাত্রি সাড়ে ন'টা দশটা পর্যন্ত। তারপর দৌড়তে দৌড়তে হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে লাস্ট ট্রেনে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বারোটা সাড়ে বারোটা বেজে যেত।

অটুট স্বাস্থ্য ছিল বাবার। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমন অমানুষিক পরিশ্রম করেও শরীর ভেঙে পড়ে নি। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অপরিসীম গর্ব ছিল তাঁর। প্রায়ই বলতেন, 'বুঝলে হে, আমার এটা শরীর না, মেশিন। দশ হর্স পাওয়ারের মেশিন। সারা জীবন খাটালেও এর লয় ক্ষয় নেই।'

বাবা কিন্তু ভুল করেছিলেন। মেশিনও যে একদিন বিকল হতে পারে এই মোটা কথাটা তিনি বুঝতে চাইতেন না। ফল যা হবার তাই হ'ল। প্রাকৃতিক নিয়মেই দশ হর্স পাওয়ারের মজবুত শরীর একদিন হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়ল। একদিন কলকাতা থেকে ফিরে বাবা সেই যে শুয়ে পড়লেন আর উঠতে পারলেন না।

সেটা উনিশ শ পঁয়তাল্লিশের ফেব্রুয়ারি মাস। যথারীতি শ্রীরামপুরের হোস্টেলেই আমি রয়েছি। থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে উঠব। মার্চ মাসে তার পরীক্ষা। সারা বছর ফাঁকি দিয়েছি। পড়াশোনা প্রায় কিছুই হয় নি।

পরীক্ষার মুখে এসে তটস্থ হয়ে আছি। ঠিক সেই সময় সেজকাকা গিয়ে খবর দিল বাবার অবস্থা খুব খারাপ। তিনি আমাকে দেখতে চান।

বইপত্তর বাক্সে পুরে তালা আটকে সেজ কাকার সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেলাম। বাড়ি এসে যে দৃশ্য দেখলাম তা যেমন অভাবিত তেমনি করুণ।

বাবা শুয়ে ছিলেন। মাস দেড়েক আগে তাঁকে দেখে গেছি। তারপর এই দেখলাম। দেড় মাস আগে তিনি ছিলেন নীরোগ, সুস্থ। আর এখন? চোখদুটো গর্তে ঢুকে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। গাল বসে হনু বেরিয়ে পড়েছে। পাঁজরার হাড়গুলো চামড়া ফুঁড়ে দেখা দিয়েছে। মুখটা ফ্যাকাসে, নীরক্ত। খুব আস্তে আস্তে শ্বাস টানছেন বাবা। মনে হয়, বাইরের বাতাসের সঙ্গে ফুসফুসের যোগাযোগ রাখতে তাঁর ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

দেড়মাস আগে যে কর্মঠ উৎসাহী মানুষটিকে দেখে গিয়েছিলাম ইনি যেন তিনি নন। দশ হর্স পাওয়ারের গর্ব নিয়ে আমার বাবা বিছানার সঙ্গে মিশে গেছেন। দেখতে দেখতে অজ্ঞাত এক আশঙ্কায় আমার বুকের ভিতর কাঁপন লাগল।

বাবা চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। আমি ডাকি নি। একসময় তাকিয়ে আমাকে দেখে ডাকলেন, 'এসেছিস বকু? আয়, কাছে এসে ব'স।' গলার স্বর তাঁর অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষীণ এবং খাদে-বসা।

নিঃশব্দে তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম।

আমার পিঠে একখানা হাত রেখে বাবা বললেন, 'দেহের ওপর অনেক অবিচার করেছি। সুদে-আসলে চক্রবৃদ্ধিহারে দেহ এখন তার শোধ তুলে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি সময় আমার শেষ হয়ে এসেছে। তাই—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ তিনি থামলেন।

শুনতে শুনতে আমার হৃৎপিণ্ড ফেটে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, বুকের গভীর থেকে একটা অসহায় মূঢ় কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে এসে গলার কাছে আটকে গেছে। বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছে না। অবরুদ্ধ গলায় বললাম, 'বড় ডাক্তার এনে আপনাকে দেখাব। এত তাড়াতাড়ি—' এটুকুই মাত্র বলতে পারলাম। তারপরেই আমার ঠোঁট-দুটো থর থর করে উঠল।

বড় ডাক্তার এনে কিছুই ফল হ'ল না। একদিন রক্তবমি শুরু হ'ল বাবার। সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট এবং স্বরভঙ্গ। শরীরটা আরো দুর্বল আরো নির্জীব হয়ে পড়ল।

একদিন চার ভাইকে ডাকিয়ে পাশে বসালেন বাবা। আমি কাছেই ছিলাম। ভাঙা-ভাঙা, জড়িত স্বরে বললেন, 'আমি তো চললাম রে—'

চার কাকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বাবা বলতে লাগলেন, 'তোদের ভয়ানক ক্ষতি করে দিয়ে গেলাম। সারা জীবন আগলে আগলে রেখেছি। এতদিন তবু একরকম কেটে গেছে। কিন্তু ইদানীং ক'টা বছর কি সময় যে পড়েছে! পঞ্চাশ বছর বয়স হ'ল। এমন

দুঃসময় আর কখনও দেখি নি। এই কালটার স্বরূপ যে কী, তোরা বুঝতে পারিস নি। বুঝতে পারিস নি আমার জন্যে। আমিই তোদের বুঝতে দিই নি। বড় অন্যায় হয়ে গেছে। বড় ভুল হয়ে গেছে।' বলতে বলতে শ্বাস উঠল। ক্ষীণ রুগ্ন বুকটা অস্বাভাবিক দ্রুত তালে ওঠানামা করতে লাগল। একটু সামলে উঠে আবার শুরু করলেন, 'যদি জানতাম এত তাড়াতাড়ি আমাকে চলে যেতে হবে তোদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতাম। কিন্তু দেহটা যে সময় দিল না। আমি যখন থাকব না তোরা অথৈ সমুদ্রে পড়ে যাবি। তখন কি যে করবি তোরা! বড্ড ক্ষতি করে দিয়ে গেলাম তোদের।'

কাকারা বলল, 'চুপ করুন দাদা, চুপ করুন। আপনার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

'না রে, চুপ করতে বলিস না। চুপ করার সময় এটা নয়। যতক্ষণ আছি ততক্ষণ বলতে দে। অনেক কথা আছে তোদের সঙ্গে।' থেমে থেমে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ক্লান্ত স্বরে বাবা বলে চললেন, 'তোরা চার ভাই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকিস। সবাই কাজকর্ম করিস। এ বড় সাঙ্ঘাতিক সময়। কাজ না করলে না খেয়ে মরতে হবে।'

কাকারা কিছু বলল না।

বাবা থামেন নি, 'প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে আমার হাজার তিনেক টাকা আছে। লোকেনের নামে অথরিটি দিয়ে যাচ্ছি। ও বেশ চালাক-চতুর। আমি যদি মারা যাই ও গিয়ে কলকাতার অফিস থেকে টাকাটা তুলে আনবে। ওর সঙ্গে বীরেন কি যোগেন যাবে। ঐ তিন হাজার থেকে এক হাজার বকুর পড়ার জন্যে থাকবে। একটা বছর মাত্র বাকি। এই বছরটা চালাতে পারলেই ও গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে আসবে। ওর পড়া শেষ হ'লে আর ভাবনা নেই। ও তখন তোদের পেছনে এসে দাঁড়াবে।'

বাবা থামলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। কি যেন চিন্তা করে আবার আরম্ভ করলেন, 'এক হাজার খরচ হবে বকুর পড়ার জন্যে। বাকি দু-হাজার দিয়ে তোরা একটা ব্যবসা-পত্তর করিস। এখন যুদ্ধের বাজার। যে ব্যবসা করবি তাতেই লাভ।' বলতে বলতে বাবা কাকাদের মুখের দিকে তাকালেন, 'তোরা কাছে আয়।'

চার কাকা আরো এগিয়ে এল।

আমার একটা হাত কাকাদের হাতে তুলে দিয়ে বাবা বললেন, 'হরেন বীরেন লোকেন যোগেন—তোদের হাতে বকুকে দিয়ে গেলাম। ওকে তোরা দেখিস। বড় আশা ছিল বকু গ্র্যাজুয়েট হবে, বড় চাকরি করবে, নিজের চোখে তা দেখে যাব। কিন্তু পারলাম না। আর একটা বছর যদি আয়ু পেতাম।' গলাটা রুদ্ধ হয়ে এল তাঁর।

এর পর বাবা আর মাত্র দুটি দিন বেঁচে ছিলেন।

বাবার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকতে চুকতে ফেব্রুয়ারি মাস কাবার হয়ে গেল। মার্চ মাসের দু-তারিখে শ্রীরামপুরে ফিরে গেলাম।

পড়াশোনায় আজকাল আর মন বসে না। বাবার মৃত্যুটা এমনই অভাবনীয়

আর আকস্মিক যে তার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারছি না। অগাধ এক শূন্যতা চারপাশ থেকে আমাকে বেষ্টন করে রয়েছে।

দেখতে দেখতে দিন পনের কেটে গেল। নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে হোস্টেলের চার্জ আর কলেজের মাইনে মিটিয়ে দিতে হয়। বাবা বেঁচে থাকতে পয়লা তারিখের মধ্যেই টাকা এসে যেত। কিন্তু এবার মাসের অর্ধেক পার হতে চলল, এখনও টাকা এল না। এদিকে হোস্টেল থেকে চার্জ মিটিয়ে দেবার জন্য তাগাদা দিচ্ছে। রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

আরো কয়েকটা দিন দেখে মাজনাতে এলাম।

বাড়িতে পা দিয়েই স্তম্ভিত হতে হ'ল।

বেশ বড় বাড়ি আমাদের। মাঝখানে প্রকাণ্ড উঠোন। চার পাশে ঘিরে সারি সারি ঘর। টিনের চাল, ইটের দেওয়াল, লাল সিমেণ্টের পাকা মেঝে।

দেখলাম, উঠোনের মাঝ বরাবর বাঁশের বেড়া পড়েছে। বেড়াটা বাড়িটাকে সমান দু-অংশে ভাগ করেছে।

বেড়ার একদিকে বড়কাকা সেজকাকা, তাদের স্ত্রী এবং ছেলেপুলেরা। অন্যদিকে মেজকাকা ছোটকাকা, তাদের স্ত্রী এবং ছেলেপুলেরা। দু'টি দল পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

ঠিক দাঁড়িয়ে বললে ভুল হবে। প্রতিপক্ষ দল দু'টির মধ্যে একটা খণ্ডযুদ্ধের তোড়জোড় চলছে। তারই প্রথম পর্ব হিসেবে উভয় তরফে কিছু কিছু ইতর ভাষার আদান-প্রদান চলছে।

এতগুলি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দর্শনীয় হচ্ছে বড়কাকা। তার চোখ সর্বক্ষণই লালচে থাকে। এখন এত লাল দেখাচ্ছে, মনে হয়, শরীরের সমস্ত রক্ত সেখানে গিয়ে জমা হয়েছে। যে কোনসময় সে দুটো ফেটে যাবে যেন। স্থূল মাংসল দেহটা অসহ্য রাগে ফুলে ফুলে উঠছে। গলার ভিতর থেকে একটা জান্তব হিংস্র শব্দ থেকে থেকে বেরিয়ে আসছে, 'হুঁ-অ-অ-অ—হুঁ-অ-অ-অ—।' বুনো শুয়োরটা ক্ষেপে উঠেছে।

মাঝে মাঝেই বাঁশের বেড়া পর্যন্ত তেড়ে যাচ্ছে সে। পারিবারিক সম্পর্কটা ভুলে গিয়ে গর্জে উঠছে, 'বার কর শালারা, আভি—এখনই রুপেয়া বার কর।'

মেজকাকা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'টাকাটার কী হয়েছে সবই তোমাকে বলেছি। তবু বার বার টাকা টাকা করে এমন হ্যাঙ্গাম করছ কেন?'

দেখলাম, বরাহধর্মী বড়কাকা আরো ক্ষিপ্ত আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'ভেবেছিস আমাকে ভাঁওতা মেরে টাকাটা গাব করবি। তা হবে না। কভী নেহী। ও টাকা আমি তোদের হজম করতে দেব না। পেটের ভেতর থেকে টেনে বার করব।'

প্রথমটা বিস্মিত হয়েছিলাম ঠিকই। পরে ভেবে দেখলাম, বিস্ময়ের কিছু নেই। এটাই স্বাভাবিক, এটাই একান্ত সঙ্গত। চারটি বিপরীত স্বভাবের প্রাণী একই সংসারে একই অন্নে এতকাল যে আবদ্ধ ছিল সেটাই বিচিত্র ব্যাপার। অনেক আগেই হাতাহাতি লাঠালাঠি করে তাদের আলাদা হয়ে

যাওয়া উচিত ছিল। হয় নি সে শুধু আমার বাবার জন্য।

বাবার মৃত্যুর একমাসের মধ্যেই চার কাকা কুশ্রী কলহে মেতেছে। বুঝতে পারছি, তার মূলে রয়েছে টাকা। কিন্তু টাকাটা কিসের এবং কার বুঝে উঠতে পারছি না।

আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, 'এ সব তোমরা লাগিয়েছ কী!'

আমার গলার স্বরে এমন কিছু রূঢ়তা ছিল যাতে সবাই চকিত হয়ে উঠল। এতক্ষণ ঝগড়ায় তারা এতই মত্ত ছিল যে আমাকে লক্ষ্য করে নি। এবার আমার দিকে তাকাল।

মেজকাকা বাঁশের বেড়ার কাছে এগিয়ে এসে মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'এই যে বকু তুই এসে গেছিস। ভালই হয়েছে। মেজদা শুধু শুধু আমাদের নামে বদনাম দিচ্ছে। তোকে সব কথা খুলে বলছি। শুনে তুই বিচার কর।'

বললাম, 'বল, কী বলবে—'

মেজকাকা চেরা-চেরা ক্ষীণ গলায় থেমে থেমে শ্বাস টেনে যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম।

মৃত্যুর আগেই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের তিন হাজার টাকার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন বাবা। মেজকাকার নামে অথরিটি দিয়েছিলেন।

বাবা মারা গেলেন; শ্রাদ্ধশান্তি চুকল; আমি শ্রীরামপুর চলে গেলাম। তারও বেশ কিছুদিন পর ছোটকাকাকে সঙ্গে নিয়ে মেজকাকা কলকাতায় টাকা আনতে গেল। বাবার অফিস থেকে টাকা তুলে কোমরে বেঁধে বাড়ির দিকে ফিরছিল দু-জনে। বড়বাজারে হ্যারিসন রোডের মুখে এসে হঠাৎ মেজকাকার মনে হ'ল, কোমরটা কেমন যেন হাল্কা হাল্কা লাগছে। হাত দিয়েই তার মাথা ঘুরে গেল। কোমরের কাপড় কাটা এবং টাকার বাণ্ডিল উধাও হয়েছে।

মেজকাকা বলল, 'বাড়ি এসে মেজদাকে কোমরের কাটা জায়গাটা দেখিয়েছি। তা ছাড়া বীরেন বরাবর আমার সঙ্গেই ছিল। এক মিনিটের জন্যে কাছছাড়া হয় নি। টাকা আমি যদি মেরে দিতাম ও কি আমাকে ছাড়ত?'

বড়কাকা খেঁকিয়ে উঠল, 'সব মিথ্যে, সব ধাপ্পা। দুই শালা যুক্তি করে কোমরের কাপড় কেটে বাড়ি ফিরেছে। লেকেন আমিও বুনো শোর, অত সহজে ছাড়ছি না।'

বড়কাকা শাসাচ্ছে। মেজ আর ছোটকাকা তার প্রতিবাদ করছে। এতগুলি মানুষের মধ্যে একমাত্র নীরব ভূমিকা সেজকাকার। গোল গোল দুটো নির্বোধ চোখ মেলে সে শুধু এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

আমি যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। কিংবা শুনতে পেলেও বুঝতে পারছি না, দেখতে পাচ্ছি না। একেবারে অন্ধ আর বোবা হয়ে গেছি।

আমাকে ঘিরে বাবা স্বপ্ন দেখতেন। আমাদের বংশে কেউ যা করে নি আমি তাই করব। বি. এ. পাশ করে গ্র্যাজুয়েট হব। নিজের চোখে তা দেখে যেতে পারলেন না। যেতে পারেন নি কিন্তু সব বন্দোবস্তই করে গিয়েছিলেন। আমার পড়ার জন্য একহাজার টাকা রেখে গিয়েছিলেন বাবা। ঐ টাকার সঙ্গে

আমার ভবিষ্যৎ এবং তাঁর ইচ্ছা জড়িত ছিল। কিন্তু টাকাটা খোয়া গেছে। গাঁটকাটা পকেটমারই নিক কি মেজকাকা ছোটকাকাই প্রতারণা করুক, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, সেটা আর পাওয়া যাবে না।

এখন আমি কী করব? কিছুই ভাবতে পারছি না, কিছুই স্থির করতে পারছি না। আমার চারপাশ ঘিরে সমস্ত সৌরলোক দুলতে শুরু করেছে। একটা অনুভূতিশূন্য নিরাকার জগতে আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছি।

কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল নেই। একসময় খানিকটা অনুভূতি যেন ফিরে পেলাম। প্রবল উৎসাহে চার কাকা তখনও ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশটা অসহ্য লাগছে। মনে হচ্ছে ধারাল ছুঁচ দিয়ে কেউ যেন আমার স্নায়ুগুলো বিন্ধ করছে। আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে সেগুলো ছিঁড়ে রক্তাক্ত হয়ে যাবে। কাজেই এখনই এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।

অর্ধচেতন একটা ঘোরের মধ্যে চার মাইল হেঁটে হুগলী স্টেশনে ফিরে গেলাম। সেখান থেকে ট্রেনে আবার শ্রীরামপুর।

ক'টা দিন অদ্ভুত এক অস্থিরতার মধ্যে কেটে গেল। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ছক কেটে রেখেছিলাম। সেই ছকটা নিয়ে এতকাল নিশ্চিন্ত ছিলাম। প্রথমে বি. এ. পাশ করব। তারপর ভদ্র রকমের একটা চাকরি জুটিয়ে নেব।

পূর্ব-নির্ধারিত সমস্ত পরিকল্পনাই মাঝপথে তছনছ হয়ে গেল।

কিছুই যখন ঠিক করতে পারছি না, অগাধ জলরাশিতে সাঁতার-না-জানা ডুবন্ত মানুষের মত ছটফট করছি সেই সময় কথাটা মনে পড়ল। ম্যাট্রিক পাশ করার পর বাবা আমাকে একটা দামী রিস্ট ওয়াচ কিনে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া পোকরাজ-বসানো একটা সোনার আংটিও ছিল আমার হাতে। সে দুটো বিক্রি করে শ-দুই টাকার মত পেলাম।

আমার হোস্টেলের চার্জ প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা, কলেজের মাইনে দশ টাকা। এসব ছাড়া তেল-সাবান-চুলকাটা-কাপড় কাচা—এমনি নানা ধরনের টুকিটাকি খরচ আছে।

টেনেটুনে চালালে চল্লিশ টাকায় মাস চলে যাবে। আমার কাছে শ দুই টাকার মত আছে। অতএব মাস পাঁচেকের জন্য আমি নিশ্চিন্ত।

পাঁচটা মাস অর্থাৎ মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই। তার পরের ব্যাপার নিয়ে আপাতত দুর্ভাবনা নেই।

মার্চ মাসের শেষাশেষি পরীক্ষা হ'ল। ছাত্র হিসেবে আমি বরাবরই মাঝারি মাপের। মানুষকে ধাঁধিয়ে দেবার মত কোনরকম অসাধারণত্বই আমার নেই। খুব সাধারণ হ'লেও মোটামুটি ভালভাবেই পাশ করে গেছি। কোনদিন কোন বিষয়ে ফেল করি নি।

এবার কিন্তু পরীক্ষার ফল শোচনীয় হ'ল। দুটো বিষয়ে ফেল করে বসলাম। প্রিন্সিপ্যালের কাছে দরবার করে অত্যন্ত লজ্জার মধ্যে থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে প্রোমোশন পেলাম।

পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার পরও মাসখানেকের মত ক্লাস চলল। কিন্তু তখন ভাঙা আসর। ছাত্র বা অধ্যাপক কোন পক্ষেরই তেমন উৎসাহ নেই।

একটা মাস কোনরকমে তা-না-না-না করে কাটিয়ে দিতেই গ্রীষ্মের ছুটি পড়ল।

অন্য সব বছর ছুটির দিনগুলো বাড়িতে কাটিয়ে আসি। এবার বাড়ি যাবার মত বিন্দুমাত্র আগ্রহ নিজের মধ্যে খুঁজে পেলাম না। ক'দিন আগে মাজনাতে যে জঘন্য আবহাওয়া দেখে এসেছি মনটা তাতে বিরূপ হয়ে আছে।

ছুটিতে হোস্টেল ফাঁকা হয়ে গেল। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়িটায় আমি ছাড়া দ্বিতীয় বোর্ডার নেই। একমাত্র নীচের তলায় ঠাকুর-চাকরেরা আছে।

আমি একা, একেবারে একা। গত বছরও গ্রীষ্মের ছুটিটা বাড়িতে কাটিয়ে এসেছি। চার কাকা চার কাকিমা আর তাদের অসংখ্য ছেলেমেয়েতে আমাদের বাড়ি সব সময় সরগরম। সেখানে চড়া সুরের হৈ-চৈর মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছি। ছুটির দিনগুলো ঝড়ের মত কখন উড়ে গেছে টেরও পাই নি। আর এবার? এবার আমি তাদের কাছে যেতে পারছি না।

'এবার আমার চারপাশ ঘিরে শুধু শূন্যতা আর স্তব্ধতার বেষ্টনী। মাস দুই আগে বাবা মারা গেছেন। এর মধ্যেই আমি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি। আমার কেউ সঙ্গী নেই, বন্ধু নেই, সহচর নেই। নিজের কথা ভাবতে গিয়ে অগাধ সমুদ্রে সঙ্গহীন দ্বীপের উপমা মনে পড়ে যায়।

কিংবা এটাই হয়ত সত্যি। আমাদের চারপাশে মানুষের ভিড়ের যে চালচিত্র তা একটা ছলনামাত্র। যে কোন মুহূর্তে সেটা অদৃশ্য হতে পারে। আসলে আমরা একা, বড় একা।

একা একা সময় আর কাটতে চায় না। দিনগুলো হঠাৎ বড় বেশি দীর্ঘ আর মন্থর হয়ে গেছে।

কিভাবে ছুটির মাস দুটো যে পার করলাম, সে শুধু আমিই জানি।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি কলেজ খুলল। সঙ্গে সঙ্গে যে দুর্ভাবনাটাকে এতদিন দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম লম্বা লম্বা পা ফেলে সেটা আমাকে ধরে ফেলল। আমার কাছে যে ক'টি টাকা আছে তাতে মাত্র এই মাসটাই চলবে। তারপর কী করব? কার কাছে গিয়ে হাত পাতব?

ছুটির পর পুরোদমে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। আমার কিন্তু বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। প্রফেসরদের লেকচারগুলো কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হয়। কিছুই বুঝতে পারি না, কিছুই ধরতে পারি না। পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হয়ে গেছে। দুর্বহ চিন্তায় সব সময় আচ্ছন্ন হয়ে আছি।

'জীবনযুদ্ধ' বলে একটা শব্দ এতকাল শুনে এসেছি। শব্দটা আমার খুব পছন্দ। ওটার মধ্যে ধ্বনি আছে, ঝঙ্কার আছে এবং অদৃশ্য একটা তরঙ্গও আছে। 'এসে' লেখার সময় প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে শব্দটাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করেছি।

'জীবনযুদ্ধ' এতদিন একটা ধ্বনিময় সুন্দর শব্দ ছাড়া আমার চোখে আর

কিছু ছিল না। এই প্রথম নিজের গায়ে তার আঁচ অনুভব করলাম। তার স্বরূপটা যে কী, কিছুটা অন্তত বুঝলাম।

জুলাই মাস শেষ হয়ে গেল। এদিকে হাতের টাকাও ফুরিয়ে এসেছে। একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম।

আগস্ট মাসের প্রথম দিকে আবার মাজনা গেলাম এই আশায় কাকারা যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারে।

মার্চ মাসে মাজনা এসেছিলাম। তারপর এই এলাম। মার্চের মত এবারও বাড়ি এসে স্তম্ভিত হতে হ'ল। অভাবিত অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ল। অনেক কিছু শুনলামও।

সেবার দেখেছিলাম উঠোনের মাঝখানে বাঁশের বেড়া তুলে বাড়িটা দু-ভাগ করা হয়েছে। এবার দেখলাম পাঁচ ভাগ। চার কাকার চার ভাগ; বাকিটা আমার।

বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা নিয়ে কাকারা আগেই দু-ভাগ হয়েছিল। মেজ আর ছোটকাকা, যারা টাকা আনতে কলকাতায় বাবার অফিসে গিয়েছিল তারা একদিকে। অন্য দিকে বড় আর সেজ কাকা।

মেজ আর ছোটকাকার মধ্যে ভাবটা কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। একদিন খুব মারামারি করে তারা আলাদা হয়ে গেছে।

মার্চ মাসে কলকাতা থেকে দু'জনে যুক্তি করে এসে বলেছিল, বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাটা কোমরের কাপড় কেটে গাঁটকাটারা নিয়ে গেছে। আসলে টাকাটা নাকি খোয়া যায় নি। তাদের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল, সেটা ভাগাভাগি করে নেবে। কিন্তু চতুর মেজকাকা শেষ পর্যন্ত ছোটকাকাকে ঠকিয়েছে, একটা কানাকড়িও দেয় নি। তারই ফলাফল মারামারি এবং বিচ্ছেদ।

এদিকে সেজ আর বড়কাকার সম্পর্কও মধুর থাকে নি। বাবার মৃত্যুর পর সেজকাকা একটা কাজ জুটিয়েছিল। অলস প্রকৃতির বড়কাকার উদ্দেশ্য ছিল বউ-ছেলেপুলে নিয়ে তার উপর ভর করে থাকবে। কিন্তু সেজকাকা তাতে একেবারেই রাজী নয়। কাজেই মাঝারি রকমের একটা ঝগড়া করে তারাও একদিন আলাদা হয়ে গেছে।

কাকাদের স্বভাবগুলো ছিল পরস্পর-বিরুদ্ধ। এক সঙ্গে যে তারা থাকত না, তা অনিবার্য। যখনই হোক আলাদা তারা হ'তই। কিন্তু বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাটা বড় দ্রুত তাদের মধ্যে চিড় ধরিয়েছিল। তারপর দেখা দিল জীবন ধারণের প্রশ্ন। কেউ কাউকে দেখে না। কারো প্রতি কারোর সহানুভূতি নেই। বাবার মৃত্যুর ছ-মাসের মধ্যে আমাদের সংসারটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

বাবা বেঁচে থাকতে কাকারা কেউ কিছু করত না। যে যার খুশিমত চলত। আজকাল সবাই কিছু-না-কিছু কাজকর্ম করছে। অলস আর বদরাগী বড়কাকা চটকলে কাজ নিয়েছে। দুর্বল চেহারার মেজকাকা হাওড়ায় ছাতার

কারখানায় কি যেন করে। সেজকাকা চুঁচুড়ায় বাস-কণ্ডাক্টর। যাত্রা দল খোলার স্বপ্ন দেখত যে ছোটকাকা সে হুগলীর বাজারে আনাজের দোকান দিয়েছে। হায় রে জীবন ধারণ!

একে একে বড়কাকা মেজকাকা ছোটকাকা—তিনজনের কাছে গেলাম। বললাম, 'ঘড়ি আর আংটি বিক্রি করে পাঁচটা মাস চালিয়েছি। আমার হাতে আর একটা পয়সা নেই। ফাইন্যাল পরীক্ষার মাত্র সাত-আট মাস বাকি। তোমরা যেমন করে পার এই মাস ক'টার খরচ চালিয়ে দাও। আমার জন্য শুধু এইটুকু কর। তোমাদের উপকার জীবনে ভুলব না।'

তিন কাকাই আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে। বলেছে, 'সবই তো বুঝি কিন্তু আমাদের অবস্থা দ্যাখ্, নিজেদের সংসারই চালাতে পারছি না। তার ওপর তোর খরচ—'

এরপর বলার মত কিছু খুঁজে পাই নি।

একেবারে শেষে গেলাম সেজকাকার কাছে। এতকাল তাকে নির্বোধ বলেই জানতাম। সংসারে সবার কাছেই তার উপমা ছিল গাধা। কিন্তু দেখলাম, চার কাকার মধ্যে একমাত্র তার আচরণ এবং কথাবার্তাই মানুষের মত।

সব শুনে সেজকাকা বলল, 'নিশ্চয়, তোর পড়ার খরচ চালানো আমাদের কর্তব্য। বড়দা আমাদের জন্যে অনেক করেছে, ঢের নুন খেয়েছি তার। তোর জন্যে যদি কিছু না করি সে ভারি অ-ধর্ম হবে।' একটু থেমে গাঢ় গভীর স্বরে আবার শুরু করল, 'তুই বি. এ. পাশ করবি, বংশে কেউ যা হয় নি তাই হ'বি। গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠবে। সেই তো চাই। বড়দার বড় ইচ্ছে ছিল তোকে বি. এ. পাশ করাবে। নিজের চোখে তা তো দেখে যেতে পারল না। যাই হোক, আর কেউ তোর জন্যে কিছু করুক আর না-ই করুক আমি করব। ভগবানের দিব্যি, করব।' বলতে বলতে উঠে পড়ল সে। ঘরের মধ্যে ঢুকে কাকিমার সঙ্গে অনুচ্চ ফিস ফিস গলায় কি যেন পরামর্শ করল। তারপর বেরিয়ে এসে আমার হাতে একজোড়া সোনার ঝুমকো গুঁজে দিতে দিতে কাঁচুমাচু মুখে করুণ গলায় বলতে লাগল, 'এর বেশি আর কিছু নেই বকু। এ দুটো বিক্রি করে দে—'

ঝুমকো দুটো সেজকাকিমার। কান থেকে খুলে দিয়েছে। আমি প্রায় চমকে উঠলাম। ঝুমকো দুটো থেকে আমার হাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল যেন। বললাম, 'না-না, এ আমি নিতে পারব না।'

'কেন?'

'গয়না বিক্রি করে পড়াশোনা চালিয়ে কী লাভ! তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'ঝুমকোদুটো বিক্রি করে কত আর পাব; বড় জোর কুড়ি পঁচিশ টাকা। তা দিয়ে আমার একটা মাসও চলবে না।'

অনেকক্ষণ স্থির নিবদ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সেজকাকা। একসময় চাপা বিষণ্ণ গলায় বলল, 'ভগবান আমাকে মেরে রেখেছে বকু।

লেখাপড়া শিখি নি। তাই ভাল চাকরি জুটল না। বাস-কণ্ডাক্টরি করে মাসে বাহাত্তর টাকা পাই। নিজের এতগুলোন ছেলেপুলে, তার ওপর আমি, তোর কাকিমা—এত বড় সংসার চালাতে জের বার হয়ে যাচ্ছে। তবু বলছি, যেমন করে পারি তোর খরচ আমি চালাব। চুরি করতে হয় ডাকাতি করতে হয়, করব। বড়দার সাধটা মেটাতেই হবে। ক'টা দিন তুই অপেক্ষা কর। দেখি কি করতে পারি।'

সেজকাকার কথাগুলোতে ভান নেই, কপটতা নেই। বরং প্রাণের উত্তাপ মেশানো রয়েছে।

আমি কিছু বললাম না। ঝুমকোদুটো আস্তে আস্তে তার হাতে ফিরিয়ে দিলাম।

দেখতে দেখতে কয়েকটা দিন কেটে গেল।

বাড়ির যে অংশটা আমার ভাগে পড়েছে সেখানেই থাকি আর চার কাকার ঘরে পালা করে খাই। মুখ ফুটে কাকারা কেউ অবশ্য কিছু বলে না। তবু বুঝতে পারছি, তাদের অভাবের সংসারে আমি দুর্বহ বোঝা হয়ে আছি।

এ আমার ভালো লাগছে না। নিজেকে ভারি ছোট আর সঙ্কুচিত মনে হচ্ছে। আমি যেন সেই ক্ষুধার্ত ভিখিরি একমুঠো খাদ্যের জন্য দুয়ারে দুয়ারে মাথা কুটে মরছি।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছিলাম; চার কাকার মধ্যে কথা বন্ধ। কেউ কারো অংশে যায় না। পরস্পর দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কাকাদের বিরোধ কাকিমা এবং ছেলেপুলেদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। তাদের মুখও কুলুপ-আঁটা। বাঁশের বেড়া তুলে উঠোনে যে গণ্ডি কাটা হয়েছে পারতপক্ষে সেগুলো কেউ ডিঙোয় না। যে যার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। কোথায় যেন একটা অদৃশ্য অলিখিত চুক্তি রয়েছে, একে অন্যের দিকে পা বাড়াবে না।

কিন্তু কথায় বলে ছেলেপুলের জাত। তাদের মতিগতি বা গতিবিধির হদিশ পাওয়া দুষ্কর। কোন কারণে একজনের ছেলে যদি অন্যের সীমানায় ঢুকে পড়ে তা হ'লে আর কোন উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে কাড়া-নাকাড়া বেজে ওঠে। একেবারে তুলকালাম শুরু হয়ে যায়। শুধু কি ছেলেপুলেদের জন্যই, কারো বাড়িতে হয়ত একটু ভালো রান্না হ'ল তাতেও নিস্তার নেই। নিতান্ত তুচ্ছ কারণে, এমন কি অকারণেও অনেক সময় লেগে যায়। তখন চিৎকারে-খিস্তিতে এবং অশ্রাব্য গালাগালিতে মাজনা গ্রামের যত কাকচিল উধাও হয়ে যায়।

চার কাকার চার অংশ যেন চারটে সংযোগ-বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। যোগ্যতর উপমা দিয়ে বলা যায় চারটে শত্রুশিবির কিংবা বারুদের স্তূপ। আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ এসে পড়ার শুধু অপেক্ষা।

কাকারা অতি নীচ, অতি হীন এবং অসহিষ্ণু। কারো প্রতি কারোর উদারতা সহানুভূতি বা সহনশীলতা নেই।

এই পরিবেশে আমি অত্যন্ত পীড়িত বোধ করছিলাম। যদিও কাকারা

আমার আপনজন, তাদের সঙ্গে এতকাল বিশেষ যোগাযোগ ছিল না, আমি পড়াশোনা করতাম, থাকতাম শ্রীরামপুরের হোস্টেলে, আমার শিক্ষাদীক্ষা রুচির সঙ্গে তাদের কিছুই মিল ছিল না। তাদের সুরে সুর মেলাতে পারছিলাম না। বার বার তাল কেটে যাচ্ছিল। প্রত্যহের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসে মনে হচ্ছিল, আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

তবু দম বন্ধ অবস্থায় এখানে পড়ে ছিলাম। সেজকাকা ক্ষীণ একটু আশা দিয়েছিল।

একদিন আশাভঙ্গ হ'ল। সেজকাকা বিমর্ষ ঝাপসা গলায় বলল, 'অনেক চেষ্টা করলাম বকু কিন্তু তোর জন্যে কিছুই করতে পারব বলে ভরসা হচ্ছে না।' বলতে বলতে তার স্বর অতল খাদে ডুবে গেল। তারপর অপরাধীর মত মুখ নীচু করে বসে রইল সেজকাকা।

আমি সেজকাকাকে দেখছিলাম না। আমি তাকিয়ে ছিলাম সামনের দিকে। সম্ভবত ভবিষ্যতের একটা চেহারা দেখার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ছিল না। যতদূর দৃষ্টি যায় সব অস্পষ্ট, আচ্ছন্ন, অন্ধকার। নিরেট একটা প্রাচীর আকাশ পর্যন্ত খাড়া হয়ে সমস্ত কিছুকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। কোথাও একটু আলো নেই, কোথাও একটা পথের ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি না।

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে সেই দিনটা কোথা দিয়ে, কেমন করে কেটে গেল টেরই পেলাম না। আমার সমস্ত অনুভূতি আর ইন্দ্রিয় একসঙ্গে বিকল হয়েছে যেন। সেগুলোর ক্রিয়া হঠাৎ থেমে গেছে। ফলে কিছুই বুঝতে পারছি না, অনুভব করতে পারছি না। খেতে হয়, তাই সেদিন খেয়েছি। শুতে হয়, তাই শুয়েছি। ঘুমোতে হয়, ঘুমিয়েছি। যা যা করেছি কোনটাই সজ্ঞানে সচেতনভাবে নয়, করেছি চব্বিশ বছরের দীর্ঘ অভ্যাসের নিয়মে।

পরের দিন খানিকটা স্বাভাবিক হলাম। মনে মনে স্থির করলাম, এখানে মাজনার এই বিষাক্ত অসুস্থ পরিবেশে আর থাকব না। অনেক চেষ্টা করলাম, তবু পড়াশোনাই যখন হবে না তখন কাকাদের সংসারে বোঝা বাড়িয়ে লাভ কী? কাকারা এখনও অবশ্য কিছু বলছে না কিন্তু বলতে কতক্ষণ। ফস্ করে অসম্মানজনক একটা কিছু যদি বলে ফেলে আমার পক্ষে তা মর্মান্তিক হবে। কাজেই মর্যাদা থাকতে থাকতে চলে যাওয়াই ভাল। ভাল তো, কিন্তু যাব কোথায়?

ভেবে ভেবে যখন অস্থির, সেই সময় সীতেশদার কথা মনে পড়ল। সীতেশদা এই মাজনারই ছেলে। বাবা তাকে চাকরি করে দিয়েছিলেন। একটি মাত্র ছেলে আর স্বামী-স্ত্রী—মোট তিনজন নিয়ে তার সংসার। কলকাতায় শ্যামবাজারে বাসা ভাড়া করে থাকে। বাবার সঙ্গে বারকয়েক তার বাসায় গেছি। আদরে-আপ্যায়নে সীতেশদা আর বৌদি আমাদের মুগ্ধ করে দিয়েছে। বাবা চাকরি করে দিয়েছেন, সে জন্য তারা অসীম কৃতজ্ঞ।

মানুষ হিসেবে সীতেশদা অত্যন্ত সহৃদয়, সজ্জন। তার কথা মনে হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে আর দেরি করি নি। হুগলী স্টেশনে এসে ট্রেন ধরেছি। একটা চিঠি দেবারও ফুরসত পাই নি। আমার বিশ্বাস, সীতেশদা আমাকে বিমুখ করবে না। চাকরি-বাকরিই হোক আর যে কোন কাজকর্মই হোক, একটা কিছুর ব্যবস্থা করে দেবেই।

তীব্র একটা ঝাঁকানি খেয়ে চমকে উঠলাম। দেখলাম আমাদের ট্রেনের বিরাট সর্পিল দেহ কখন যেন হাওড়া স্টেশনে ঢুকে পড়েছে। আমার সামনে সেই মঞ্চটা নেই। সেই নাটকটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

ট্রেন থেকে সামান্য ক'টি যাত্রী নামল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও নামলাম।

আশ্চর্য, ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ আর সবচেয়ে মুখর স্টেশন এই হাওড়ায় এতটুকু ব্যস্ততা নেই, চাঞ্চল্য নেই। বিশাল শরীর এলিয়ে স্তব্ধ হয়ে সে পড়ে আছে।

ইতস্তত দু-চারজন চেকার, টিকেট-কালেক্টার এবং ভেণ্ডার চোখে পড়ল। কিন্তু পৃথিবীর কোন বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র তাড়া আছে বলে মনে হয় না।

হাওড়া স্টেশনের স্তব্ধতা আমাদের গ্রাস করল যেন। আমরা ক'টি যাত্রী রুদ্ধশ্বাসে চুপিসাড়ে এগিয়ে চললাম। এখানকার নিশ্চল আবহাওয়ায় একটা ঢেউও উঠল না।

গেটে টিকিট জমা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এসেই স্তম্ভিত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম।

উনিশ শ আটত্রিশে অর্থাৎ যুদ্ধের কিছুদিন আগে শেষবারের মত কলকাতায় এসেছিলাম। তারপরে এই এলাম।

সে সময় হুগলী নদী পারাপারের জন্য একটা ভাসমান সেতু ছিল। ইংরেজিতে যাকে 'পণ্টুন-ব্রিজ' বলে, তা-ই। এবার দেখলাম খানিকটা উত্তরে প্রকাণ্ড ক্যান্টিলিভর ব্রিজ আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে।

আসলে এটা একটা পুল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল ইস্পাত, কংক্রীট আর মানুষের প্রযুক্তিবিদ্যার মিশ্রণে অপরূপ এক মহাকাব্য। অবাক চোখে কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম, খেয়াল নেই।

হঠাৎ একটানা চিৎকারে চকিত হয়ে উঠলাম। দেখলাম, খবর কাগজের হকারেরা চেঁচাচ্ছে, 'জোর খবর, লড়াই খতম হো গ্যয়া। তাজা খবর, জাপানকো বিলকুল হার হো গ্যয়া—'

একটা হকারকে ডেকে একখানা কাগজ কিনে নিলাম! তারপর শ্যামবাজারের ট্রামে উঠলাম।

ট্রেনের মত ট্রামগুলোও ফাঁকা-ফাঁকা। ক্বচিৎ দু-একটি যাত্রী ওঠে কি ওঠে না।

জানালার পাশে একটা সীটে বসে কাগজখানা মেলে ধরলাম। প্রথমেই নজর পড়ল তারিখটার দিকে। "কলিকাতা : বৃহস্পতিবার ৩১ শে শ্রাবণ, ১৩৫২ সাল। Thursday August 16, 1945."

তারিখের নীচ থেকেই বড় বড় হরফে খবর শুরু হয়েছে। আমি পড়তে লাগলাম :

"বিশ্ব যুদ্ধের অবসান ঃ মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের আত্ম-সমর্পণ ঃ জাপ সম্রাটের ঘোষণা।

পটাসডাম ঘোষণার সমস্ত শর্ত স্বীকার। মিকাডো কর্তৃক আণবিক বোমার ধ্বংসলীলার উল্লেখ।

প্রেঃ ট্রুম্যান ও মিঃ এটলীর বিবৃতি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় মিত্রপক্ষ বাহিনীর প্রতি যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ।

নিউইয়র্ক, ১৫ই আগস্ট—সম্রাট হিরোহিতো অদ্য বেতারে সরাসরি জাপ জাতির উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় বলেন যে, পটাসডাম চরমপত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। জাতির উদ্দেশ্যে সম্রাটের সরাসরি বক্তৃতা জাপানের ইতিহাসে এই প্রথম।"

আরেকটা খবর দেখলাম ঃ

"পরাজিত জাপানের প্রতি মিত্রপক্ষের প্রথম আদেশ জারি। জেনারেল ম্যাক আর্থারের প্রতি দূত প্রেরণের নির্দেশ। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি মিত্রবাহিনী কর্তৃক দখলের আয়োজন।"

আরো একটা খবর চোখে পড়ল ঃ

"জাপানী সমর সচিবের আত্মহত্যা। যুদ্ধে পরাজয়ের জের।

লণ্ডন, ১৫ই আগস্ট—জাপানী নিউজ এজেন্সীর খবরে প্রকাশ যে, জাপানের সমর সচিব কোরেচিকা আনামি গত রাত্রে তাঁহার সরকারী বাস-ভবনে আত্মহত্যা করিয়াছেন।…"

কাগজটা বন্ধ করে ফেললাম। জাপানের আত্মসমর্পণ, পটাসডাম ঘোষণা, আণবিক বোমার ধ্বংসলীলা, জাপ সমরসচিবের আত্মহত্যা—আমার নরম ধাতের স্নায়ু একসঙ্গে এত সব বিচিত্র খবর সহ্য করতে পারছে না।

মানুষ হিসেবে আমি কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক। কলকাতা থেকে মাত্র তিরিশ পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে থাকতাম। যুদ্ধ বেধেছে, এটুকুই শুধু জানতাম। কিন্তু কবে আণবিক বোমা পড়েছে, কবে পটাসডাম ঘোষণা হ'ল—সে-সব খোঁজ রাখতাম না। রাখার প্রয়োজনও বোধ করতাম না। কলকাতায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, একটা জটিল আবর্তের মধ্যে এসে পড়েছি।

ট্রামটা গড়িমসি চালে দুলে দুলে চলেছে। আমি জানালার বাইরে তাকিয়ে আছি। রাস্তাগুলো জনবিরল। মাঝে মধ্যে দু-চারটে মানুষ চোখে পড়ে।

অথচ যুদ্ধের আগে এই কলকাতায় কতবার এসেছি। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে আসতাম। বড় হয়ে আসতাম বন্ধুদের সঙ্গে। মরসুমী ফুলের মত এই শহরে আমি বহুবার ফুটেছি।

ফুটবল-ক্রিকেট-কার্নিভ্যাল-সিনেমা-সার্কাস-একজিবিশন—কলকাতায় তখন প্রতি মুহূর্তে বিস্ময়, প্রতিদিন উৎসব। কিন্তু আজকের, এই উনিশ শ পঁয়তাল্লিশের কলকাতা নির্জন, নিরুৎসব, নিরানন্দ। একটা যুদ্ধ তার সব স্রোত সব তরঙ্গ চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দিয়েছে।

গড়িয়ে গড়িয়ে ট্রামটা একসময় শ্যামবাজার পৌঁছল।

সীতেশদা যে গলিতে থাকত, সেটা আমার মনে আছে। শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর উল্টোদিকে সেই গলিটা। ট্রাম থেকে নেমে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট পেরিয়ে সেখানে গিয়ে ঢুকলাম।

গলিটা আঁকাবাঁকা, সর্পিল। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম।

যুদ্ধ লাগবার আগে সাঁইত্রিশ আটত্রিশ সালে বাবার সঙ্গে বার কয়েক আমি এখানে এসেছি। মাঝখানে একেবারেই যাতায়াত ছিল না। প্রায় সাত-আট বছর পর আবার এলাম!

সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ সালে যেমন দেখেছিলাম বাড়িটা আজও তেমনি জীর্ণ, জরাগ্রস্ত। আস্তর খসে অনেক জায়গায় ইট বেরিয়ে পড়েছে। তৈরি হবার পর থেকে সম্ভবত আর কলি ফেরানো হয় নি। একটা ভ্যাপসা ভারী আদিম গন্ধ তার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে রয়েছে।

বাড়ির সামনে একফালি রোয়াক। সেখানে মধ্যবয়সী একটি লোক খবরের কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে।

খুব আস্তে, ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে ডাকলাম, 'শুনছেন—'

লোকটা মুখ তুলল। নিকেলের চশমা টপকে তার গোল চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি আমার ওপর এসে পড়ল।

লোকটাকে চিনতে পারলাম। সীতেশদার বাড়িওলা। আশ্চর্য, এই বাড়িটার মত তারও কোন পরিবর্তন হয় নি। সাত-আট বছর আগে যেমন দেখে গেছি তার শরীরটা আজও তেমনি মজবুত, বেতের মত পাকানো। রস বা শাঁস কিছুই নেই। সবই তার ছিবড়ে। মাথাটা সাদাও না, কালোও না। সাদা আর কালোর মধ্যবর্তী ধূসর রঙের।

বাড়ি এবং বাড়ির মালিক সময়ের সঙ্গে একটা সন্ধি করে ফেলেছে যেন। চুক্তি হয়েছে সময় তাদের এড়িয়ে চলবে। একটা বিশেষ জায়গায় পৌঁছে তাদের চেহারার স্থিতি হয়ে গেছে।

বাড়িওলা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। একসময় বলল, 'কাকে চাই?'

'আজ্ঞে সীতেশদা মানে সীতেশ মল্লিকের কাছে এসেছি—'

'সীতেশ মল্লিককে চাই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সে তো এখানে থাকে না।'

আমি চমকে উঠলাম। পায়ের তলায় মাটি যেন দুলে উঠল। কোনরকমে বলতে পারলাম, 'থাকে না!'

'না।'

'কিন্তু সাত-আট বছর আগে আমি এখানে এসেছি। তখন তো সীতেশদা এ-বাড়িতে থাকত।'

'হ্যাঁ থাকত।' বাড়িওলা বলতে লাগল, 'কিন্তু এখন আর নেই। গেল

বছর তারা উঠে গেছে।'

ফিস ফিস করে বললাম, 'উঠে গেছে!'

বাড়িওলা খেঁকিয়ে উঠল, 'উঠে যাবে না তো শ্যামবাজারের এই এঁদো গলিতে পড়ে পড়ে পচবে না কি! সীতেশ মল্লিক এখন মস্ত লোক। সাউথ ক্যালকাটার কোথায় যেন পেল্লায় বাড়ি হাঁকিয়েছে।'

বাড়িওলার ঘোলাটে চোখের দিকে তাকিয়ে সব কিছু দুর্বোধ্য মনে হতে লাগল। বাবা সীতেশদাকে ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে একটা চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। কেরানীগিরির চাকরি। একজন কেরানীর পক্ষে সাউথ ক্যালকাটায় প্রকাণ্ড বাড়ি করা যতদূর জানি সম্ভব নয়। ব্যাপারটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য আর চমকপ্রদ মনে হল।

বললাম, 'সীতেশদা বাড়ি করেছে!'

আমার গলার স্বরে বিস্ময় ছিল। খুব সম্ভব সেটা লক্ষ্য করে বাড়িওলা বলল, 'বাড়ি করেছে তাতে চমকাবার কি আছে! এই যুদ্ধের বাজারে কত আরশোলাই তো পাখি হয়ে গেল। কত টিকটিকি ফুলে কুমীর হ'ল। তবে হ্যাঁ, আমি বদলাই নি। ফার্স্ট গ্রেট ওয়ারেও যেমন, সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ারেও ঠিক তেমনিই আছি, এতটুকু চেঞ্জ নেই।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

বাড়িওলা থামে নি। সমানে বলে যাচ্ছে, 'উঠে গেছে না বেঁচেছি। হাড়ে বাতাস লেগেছে। রোজ রাত্তিরে নেশা করে এসে হল্লা করবে। তা ছাড়া—' বলতে বলতে হঠাৎ যেন সচেতন হ'ল সে। একটু থেমে কি যেন চিন্তা করে আরম্ভ করল, 'তা মশায় আপনাকে জানি না শুনি না অথচ এত কথা তো বলে ফেললাম। আপনি কে? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

বললাম, 'আমি সীতেশদার গ্রামের লোক। নাম শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়।'

'অ—' প্রায় অব্যক্ত একটা শব্দ করে আবার খবরের কাগজে ঝুঁকে পড়ল বাড়িওলা।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সীতেশদার সাউথ ক্যালকাটার ঠিকানা বলতে পারেন?'

বাড়িওলা কাগজ থেকে মুখ না তুলে দুই হাত আর মাথা প্রবলবেগে নেড়ে বলতে লাগল, 'না-না মশায়, ওসব মাতাল-দাঁতালের খবর আমি রাখি না। শুনেছিলাম সাউথ ক্যালকাটায় বাড়ি করেছে; তাই বললাম। আপনি এখন আসতে পারেন।'

আমি আর দাঁড়ালাম না। শ্যামবাজার ট্রামডিপোর দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। পায়ের নীচে সর্পিল সরু গলিটা যেন অস্থির সমুদ্র হয়ে গেছে আর অসংখ্য ঢেউয়ের উপর দিয়ে আমি টলতে টলতে দুলতে দুলতে চলেছি।

কলকাতায় সীতেশদাই ছিল আমার একমাত্র ভরসা। এখন আমি কি করব? এই বিশাল শহরে একটি ঠিকানাহীন মানুষকে খুঁজে বার করা দুরূহ ব্যাপার। আদৌ সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে।

গলিটা সরলরেখায় কিছুদূর এগিয়ে একটা বাঁক নিয়েছে। বাঁকের কাছে আসতেই ডাকটা শুনতে পেলাম, 'ও মশায় শুনুন—শুনুন—'

ফিরে তাকালাম। দেখলাম বাড়িওলা হাত নেড়ে কাছে যাবার জন্য ইশারা করছে। আস্তে আস্তে আবার তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বাড়িওলা বলল, 'সীতেশ মল্লিককে খুব দরকার, না?'

একটু যেন আশার আভাস পেলাম। রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব দরকার। তাকে না পেলে—'

'আপনি একটু দাঁড়ান। ঐ বদমাস মেয়েছেলেটাকে জিগ্যেস করে আসি। ও নিশ্চয় সীতেশের ঠিকানা জানে।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নিজের অজান্তে অনুচ্চ চাপা গলায় বলে ফেললাম, 'বদমাস মেয়েছেলে!'

আমার কথাটা শুনতে পেয়েছিল বাড়িওলা। বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ বুলকি, আমার আরেক ভাড়াটের মেয়ে। ছুকরি একেবারে বয়ে গেছে। সীতেশ মল্লিকের সঙ্গে ওর খুব ঢলাঢলি, মাখামাখি। লোকে ওদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলে। তারা নাকি নানা অবস্থায় ওদের দেখেছে। আমার চোখেও দু-চারদিন যে না পড়েছে তা নয়।' বলতে বলতেই থেমে গেল সে। ঘোলাটে চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তাই তো, আপনার অত কথায় কাজ কি? ঠিকানা নিতে এসেছেন, তাই নিয়ে চলে যান। আমিও হয়েছি যেমন, খালি বকবক করছি।'

বাড়িওলা উঠে পড়ল। তারপর সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। সাত-আট বছর আগে যে সীতেশদাকে জানতাম তার সঙ্গে বাড়িওলা-কথিত সীতেশদার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই। দু-জনে যেন দুটি বিপরীত মেরুর মানুষ।

আমার জানা সীতেশদা বিড়ি-সিগারেট দূরের কথা, চা পর্যন্ত খেত না। পানীয় বা ধূম—সমস্ত রকম নেশা থেকে হাজার মাইল তফাৎ দিয়ে হাঁটত। নেহাতই গৃহপালিত স্ত্রী-লালিত ভীরু প্রাণী সে। তার চরিত্রের কোথাও এতটুকু খাদ বা দুঃসাহস ছিল না। কিন্তু বাড়িওলা যার কথা বলছে সে একেবারে ভিন্ন মানুষ। সে মদ্যপ, স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে তার সম্বন্ধে লোকের মুখে মুখে কুৎসা।

বিমূঢ় ভাবটা কাটল পায়ের আওয়াজে। চকিত হয়ে তাকালাম। বাড়িওলা আবার রোয়াকে ফিরে এসেছে। সে বলল, 'যা ভেবেছিলাম তাই। বুলকির কাছে সীতেশের ঠিকানা পাওয়া গেছে।—নম্বর সাদার্ন অ্যাভেনিউ। ঢাকুরে লেকের কাছে বাড়িটা।'

আমি বললাম, 'বড্ড উপকার হল আমার। আপনাকে খুব জ্বালাতন করে গেলাম। কিছু মনে করবেন না।'

'না-না, মনে করার কি আছে।'

'এখন তা হলে চলি।'

'আচ্ছা।' বাড়িওলা আবার খবরের কাগজে মুখ গুঁজে দিল।

ঢাকুরিয়া লেকের কাছে সাদার্ন অ্যাভেনিউতে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, দুপুর পেরিয়ে গেছে।

আজ একত্রিশে শ্রাবণ। নামেই শ্রাবণ মাস। নইলে শরৎ কালের মেজাজ-লাগা দিনটা রোদের সোনালী রসে ভাসো-ভাসো। বাতাসে একটি মন্থর দোলা রয়েছে। সাদার্ন অ্যাভেনিউর গাছে গাছে ছোট ছোট চড়াই পাখিরা নাচানাচি করে বেড়াচ্ছে। দু-ধারের রাস্তার মাঝখানে আইল্যাণ্ডের ঘাস ঘন সবুজ হয়ে উঠেছে।

ঠিকানা জেনে এসেছি। বাড়িটা খুঁজে বার করতে অসুবিধা হ'ল না।

অসুবিধা হ'ল না কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হ'ল। সামনেই হালকা সবুজ রঙের ঝকঝকে নতুন বাড়িটা। গ্রীল-দেওয়া জানালায় রঙীন পর্দা টাঙানো। বারান্দার থামগুলো বেয়ে মাধবী লতা জড়িয়ে রয়েছে।

বাড়িটার সামনে এক টুকরো ঘাসের জমি। তার চারপাশ ঘিরে মরসুমী ফুলের কেয়ারি। গেটের কাছে পেতলের প্লেটে বাঁকানো হরফে ইংরেজিতে লেখা—এস. মল্লিক।

স্তব্ধ নির্নিমেষ চোখে কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ মোটা গলায় শুনতে পেলাম, 'কিসকো মাংতা ?'

চমকে উঠলাম। দেখলাম, নেপালী দারোয়ান ভুরুবর্জিত চোখে ভাবলেশ-হীন মোঙ্গলীয় মুখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

নেম প্লেটে স্পষ্টাক্ষরে নাম লেখা রয়েছে। তবু আমার সংশয় কাটতে চাইছে না। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না এটা সীতেশদার বাড়ি। জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি সীতেশ মল্লিকের বাড়ি ?'

দারোয়ানটা জবাব দিল, 'জী হাঁ।'

'আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আভী মোলাকাত নাহি হোগা। সাহাব নিকাল গিয়া।'

'তা হ'লে তো বড় মুশকিলের কথা। অনেক দূর থেকে অনেক হ্যাঙ্গামা করে আসছি। তার সঙ্গে দেখা হওয়া খুব দরকার—'

'ও তো ঠিক বাত। লেকেন মুলাকাত ক্যায়সে হোগা ?' দারোয়ান বলল। তার স্বরে তরঙ্গ নেই, ওঠানামা নেই, কেমন যেন এক টানা সুরহীন গলা।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম না। আচমকা বউদির কথা মনে পড়ল। বললাম, 'তোমার সাহেবের স্ত্রী বাড়ি আছে ?'

'কৌন, মেমসাহাব ?'

সাত আট বছর আগে সীতেশদার বউকে দেখেছিলাম। সেই ছবিটাই চোখের ওপর ভেসে উঠল। মাজ মাজা গায়ের রং, ছিপছিপে রোগা চেহারা। মুখেচোখে বুদ্ধির এতটুকু দীপ্তি নেই। সরল গ্রাম্য মেয়ে যেমন হয় অবিকল তাই। হাতে আর কাপড়ে হলুদের ছোপ, কপালে কয়লার কালি অথবা ঘাম।

রান্নাবান্না, সংসার, স্বামী আর তিন বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে সবসময় সে ঝালাপালা, সুখী এবং ডগমগ।

সেই বউটি মেমসাহেব হয়েছে, ভাবতেই কেমন যেন লাগল। বললাম, 'হ্যাঁ মেমসাহেব। তার সঙ্গে আমি দেখা করব।'

নেপালী দারোয়ান আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিল। জরিপ করল যেন। তারপর বলল, 'আইয়ে—'

দারোয়ানের পেছনে পেছনে একটা ঘরের সামনে এসে পড়লাম। জানালার মতই দরজায় পর্দা দুলছে। পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।

ঘরের মোজেইক-করা মেঝে কার্পেটে মোড়া। তার ওপর অনেকগুলো সোফা, টিপয়। এককোণে একটা রেডিওগ্রাম। সেটার ওপর নৌকোর আকারে সুদৃশ্য একটি ঘড়ি। আরেক কোণে ফুলদানিতে রক্তগোলাপ। চার দেওয়ালে অসংখ্য ছবি। পেন্সিলের স্কেচ, অয়েল পেন্টিং এবং কিছু কিছু জলরঙের কাজ। আসবাব আর ছবির ভিড়ে চারদিক ঠাসা। পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ নেই কোথাও। সীতেশদা যে হঠাৎ অনেক টাকা করেছে, সে কথা সরবে তারস্বরে এই ঘরটা ঘোষণা করছে। এই ঘরটা তার বড়মানুষির বিজ্ঞাপন।

দেখতে দেখতে অবাক হচ্ছিলাম। বিচিত্র এক চমক আমার ভেতরটা তোলপাড় করে ফেলছিল। মনে হচ্ছিল, একটা অবিশ্বাস্য অবাস্তব স্বপ্নের ভেতর কেউ আমাকে ছুঁড়ে দিয়েছে।

শ্যামবাজারের সর্পিল গলিতে ভাঙা পুরনো একটা বাড়ির দু-খানা দম চাপা অন্ধকার ঘরের সঙ্গে এই নতুন বাড়িটার একটা তুলনা মনে আনার চেষ্টা করলাম।

দারোয়ান অনেকক্ষণ আগে আমাকে বসিয়ে রেখে ভেতরে গিয়েছিল। একসময় খট খট শব্দে চকিত হলাম। সামনের দিকে তাকিয়ে আমাকে আবার অবাক হতে হ'ল।

প্রথমটা চিনতে পারি নি। না চেনারই কথা। মাত্র সাত আট বছরে শ্যামবাজারের রোগা ছিপছিপে বউটির যে এত পরিবর্তন হতে পারে কে ভেবেছিল।

সীতেশদার বউ কি আশ্চর্য মোটাই না হয়েছে! গালদুটো এত ফুলেছে যে চোখ প্রায় ঢাকা পড়েছে। কোমরটা প্রায় চল্লিশ ইঞ্চি। কোমর আর পেটের মাঝখানে কোন সীমারেখা নেই, সব একাকার হয়ে গেছে। গলার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। সরাসরি মাথাটাকে কাঁধের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যেন। তাল তাল অনাবশ্যক মাংস তাকে বিপুল আর কদর্য করে ফেলেছে। একটা মানুষ সাত আট বছরে এত ফুলতে পারে, এ ছিল আমার পক্ষে অকল্পনীয়।

শুধু কি দৈহিক, রুচি এবং সাজসজ্জার দিক থেকেও তার অভাবিত পরিবর্তন হয়েছে। শ্যামবাজারের যে বউটি হলুদের ছোপলাগা ময়লা কাপড় পরে ঘুরে ঘুরে ঘর সংসার সামলাত, দামী স্বচ্ছ সিল্ক এখন তার কটিদেশ বেষ্টন করে রয়েছে। হাতকাটা পেটকাটা এমন একটি ব্লাউজ সে পরেছে যার

দিকে তাকালে মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। চোখের কোলে সুর্মার টান দিয়ে কটাক্ষ ফোটাতে চেয়েছে।

রুজ পাউডার লিপস্টিক নখরঞ্জনী—প্রসাধনের যত উপকরণ, যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে। ফলে সীতেশদার বউ কতখানি মনোহারিণী হতে পেরেছে সেটা যে দেখবে তার রুচির ব্যাপার। তবে সব মিলিয়ে আমার কাছে সে বিচিত্র এবং অভাবনীয়।

স্থির পলকহীন তাকিয়ে ছিলাম।

সীতেশদার বউ জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চান?'

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আমাকে চিনতে পারছেন না বৌদি?'

বৌদি কিছু বলল না। একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝলাম চিনতে পারে নি। বললাম, 'আমি বকু—'

এবার চিনতে পারল বৌদি। প্রায় হুড়মুড় করে ছুটে আমার কাছে এসে পড়ল। গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে চোখ গোলাকার করে বলল, 'ওমা, তুমি বকু ঠাকুরপো! কত ছোট দেখেছিলাম; কত বড় হয়ে গেছ!'

সিল্কে-সাটিনে-রুজ-পাউডারে ওপরটা মুড়লে কি হবে, ভেতরে ভেতরে বৌদি শ্যামবাজারের সেই বউটিই রয়েছে। সেখানে সে বদলায় নি। এটুকু জেনেই আপাতত আশ্বস্ত হলাম। বললাম, 'চিরকাল ছোট থাকব নাকি, বড় হব না?'

'তা তো ঠিকই, কতদিন পর তোমাকে দেখলাম! ভাল আছ তো?'

'ভাল আছি কিনা বলতে পারব না, তবে বেঁচে আছি ঠিকই।'

'বাবা, খুব কথা শিখেছ দেখছি।'

আমি কিছু বললাম না। একটু হাসলাম শুধু। আর ভাবলাম কথা শিখতে হয় না। ওটা আপনিই আসে—স্রোতের মত, ঢলের মত। মানুষের জীবন, অবস্থা আর পরিবেশ তার মুখে প্রয়োজনমত কথা যুগিয়ে দেয়।

বৌদি বলল, 'এতকাল আস নি কেন? আমাদের কথা মনে পড়ে নি বুঝি?'

'মনে ঠিকই ছিল। তবে যুদ্ধটুদ্ধ চলছিল—' বলতে বলতে থেমে গেলাম।

'যুদ্ধের ভয়ে আস নি!' বৌদির চোখমুখ এবং গলার স্বর কৌতুকে ঝকমক করতে লাগল। অল্প হেসে সে বলল, 'আমাদের কিন্তু অত ভয় নেই বাপু। যুদ্ধ বাধল, সব লোক পালাল, কলকাতা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। আমরা কিন্তু নড়ি নি। নড়ি নি বলে কি মরে গেছি?'

চুপ করে রইলাম।

কি যেন চিন্তা করে বৌদি জিজ্ঞেস করল, 'ভাল কথা, এ বাড়ির ঠিকানা পেলে কোথায়? এখানে তো তুমি কোনদিন আস নি।'

কীভাবে ঠিকানা জোগাড় করেছি বললাম।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার সম্বন্ধে সচেতন হল বৌদি। বলল, 'ওই

দেখ, আমি বকবক করে যাচ্ছি। তোমার নিশ্চয়ই চান-খাওয়া হয় নি। চুলগুলো রুক্ষ, মুখখানা শুকনো দেখাচ্ছে।'

উত্তর দিলাম না।

বৌদি তাড়া লাগাল, 'নাও উঠে পড়।'

নির্দেশমত উঠলাম। তারপর তার পিছু পিছু বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।

তিন চারখানা ঘর পেরিয়ে ডানদিকের একটা দরজার সামনে এসে বৌদি বলল, 'এটা বাথরুম, যাও চান করে এস। তেল সাবান সব ওখানে পাবে। আমি তোমার খাবার ব্যবস্থা করছি।'

পাল্লা ঠেলে ভিতরে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

স্নান সেরে একসময় বেরিয়ে এলাম।

খাওয়ার ব্যবস্থা টেবিল চেয়ারে, সাহেবী চালে। বর্মা টিকের প্রকাণ্ড একখানা টেবিল ঘিরে গদি-আঁটা সারি সারি ফ্যাশনেবল চেয়ার। টেবিলটার উপর ফুল পাতা আঁকা জয়পুরী ক্লথ।

বৌদি টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখেছিল। খাবারটা অবশ্য বাঙালী রুচি অনুযায়ী সুদৃশ্য প্লেটে ভাত, ডাল, ভাজা, মাছ, মাংস, চাটনি এবং দই। একপাশে সল্ট পট, কাচের গ্লাস, জলের সোরাই, ঝকঝকে চামচ।

খেতে খেতে শ্যামবাজারের প্রায়ান্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘর দু-খানার স্মৃতি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেখানে মেঝেতে পিঁড়ি পেতে কাঁসার থালায় অনেকবার খেয়েছি। আর এখন?

এখানকার এই খাওয়াটা যেন সত্যি নয়। অতি চমৎকার আর অতি মিথ্যে একটা স্বপ্নমাত্র।

বৌদি কাছেই বসে ছিল। বলল, 'তারপর তোমাদের বাড়ির খবর কী? তোমার বাবা ভাল আছেন তো?'

ভাত মাখতে মাখতে থমকে গেলাম। আস্তে আস্তে ভারী আচ্ছন্ন গলায় বললাম, 'বাবা নেই। ফেব্রুয়ারি মাসে মারা গেছেন।'

'সে কি! কই আমরা তো খবর পাই নি!' বৌদি চমকে উঠল। তার মুখে বিষণ্ণ একটা ছায়া পড়ল। চাপা অস্থির গলায় বলতে লাগল, 'তোমার বাবার মত মানুষ হয় না। কত স্নেহ করতেন আমাকে, মারা গেলেন অথচ জানতেও পারি নি।'

বললাম, 'বাবা মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংসারটা ভেঙে চুরমার হ'ল। কাকারা আলাদা হয়ে গেছে। আমার পড়া বন্ধ হয়েছে। এখন একটা চাকরি না পেলে না খেয়ে মরতে হবে। অনেক আশা নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি বৌদি, সীতেশদাকে বলে আমাকে একটা কাজ জোগাড় করে দিতেই হবে।' বলতে বলতে আমার গলা বুজে এল।

'বেশ তো, তোমার দাদা ফিরে এলে তাকে সব বল।'

'সীতেশদা কখন ফিরবে ?'

'কিছু ঠিক নেই। রাত দশটার আগে তো নয়ই। কোন কোন দিন বারটা-একটা হয়ে যায়। আবার এক একদিন ফেরেই না।'

যত শুনছি ততই অবাক হচ্ছি। বললাম, 'ফেরে না !'

'না গো, না। কত টাকা তোমার সীতেশদার। যাদের অনেক টাকা, মাঝে মাঝে তাদের বাইরে রাত কাটাতে হয়।' আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করল বৌদি।

'বাইরে রাত কাটাতে হয় !'

'হ্যাঁ গো, তুমি কিছুই জান না।' বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল বৌদি। হাসিটা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল। মুখ-চোখ তার উদভ্রান্তের মত দেখাচ্ছে।

বৌদি যা বলেছিল তা কিন্তু মিলল না। দশটার অনেক আগেই সীতেশদা ফিরে এল।

বৌদি আর আমি বাইরের ঘরে বসে ছিলাম। শীতের এখনও অনেক দেরি। এরই মধ্যে একতাল উল কিনেছে বৌদি। নিজের জন্য একটা ব্লাউজ বুনছে আর আমার সঙ্গে গল্প করছে।

সীতেশদার একটি মাত্র ছেলে। সে বাপ-মায়ের কাছে থাকে না। কার্শিয়াংএ কনভেন্টে থেকে পড়ে। একটা রান্নার লোক, গেটে একটা দারোয়ান আর দুটো চাকর অবশ্য আছে। তাদের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। কাজেই বাড়িটা নিস্তব্ধ।

আমাদের গল্পের মাঝখানেই সীতেশদা এসে পড়ল। সে একা আসে নি। তরুণী একটি মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছে। মেয়েটির রূপ কতখানি তার নিজস্ব আর কতখানি-বিলিতি প্রসাধন কোম্পানিগুলোর কারচুপি সে সম্বন্ধে সংশয় থাকতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দ্বিমত হবার সুযোগ নেই। আদিবাসী যুবতীদের মত উদ্দাম স্বাস্থ্য। সবচেয়ে আশ্চর্য তার চোখ। করুণ, বিষণ্ণ, ম্লান। এমন ব্যথাতুর চোখ কদাচিৎ দেখেছি। মনে হয়, অসহ্য এক যন্ত্রণা নিজের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছে সে।

মেয়েটির ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সীতেশদার দিকে তাকালাম। সীতেশদার কিন্তু বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। আগের মতই আছে সে। তেমনই লম্বা আর মেদহীন ছিপছিপে। গায়ের রংটা অবশ্য অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। চুল নিখুঁতভাবে ব্যাক ব্রাশ করা। শ্যামবাজারে থাকতে ধুতি পরত, এখন পরে প্যান্ট-কোট আর টাই। পোশাকের জাত বদলে দিয়েছে সীতেশদা। একটা ব্যাপার নজরে পড়ল, সীতেশদার চোখ কেমন যেন লালচে, ঢুলু ঢুলু, ঠিক স্বাভাবিক নয়।

সেই মেয়েটিকে নিয়ে একটা সোফায় প্রায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল সীতেশদা। নিজেদের মাঝখানে ভদ্ররকমের একটু দূরত্বও রাখল না। রাখার প্রয়োজনই বোধ করল না।

সীতেশদা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র অথচ মিষ্টি একটা গন্ধ পেয়েছিলাম। আমার স্নায়ুগুলো অস্পষ্টভাবে বলতে লাগল সে মদ খেয়েছে। এটা মদের গন্ধ। সীতেশদাকে খুব ভাল করেই জানি। বিড়ি সিগারেট, এমন কি চা পর্যন্ত খেত না। অথচ এখন মদ ধরেছে। আমার বুকের ভেতরটা গভীর এক দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

একটা ব্যাপার আগাগোড়াই লক্ষ্য করেছি। বৌদি কিন্তু সীতেশদা বা মেয়েটির দিকে একবারও তাকায় নি। তারা ঘরে ঢুকতেই উলের অসমাপ্ত ব্লাউজটার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। হাতের কাঁটা দুটো জলদ বাজনার মত দ্রুততালে প্রায় অন্ধগতিতে ঘর বুনে যাচ্ছে। তার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, তবু মনে হচ্ছে ঠোঁট দুটো শক্তবন্ধ, চোয়াল কঠিন, দাঁতে-দাঁত চাপা। একটা রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা তাকে ঘিরে আছে।

অনেকদিন পর আমাকে দেখে বৌদি চিনতে পারে নি। সীতেশদা কিন্তু পারল। বলল, 'বকু না ?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কখন এসেছিস ?'

'দুপুর বেলা।'

'এতদিন পর কি মনে করে ?'

মেয়েটি বসে রয়েছে। কী উদ্দেশ্যে এসেছি তার সামনে বলতে দ্বিধা হ'ল। একটু ইতস্তত করে বললাম, 'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। পরে বলব।'

আমার মনোভাব যেন বুঝতে পারল সীতেশদা। বলল, 'আচ্ছা পরেই বলিস।'

সীতেশদার পাশ থেকে মেয়েটি বলে উঠল, 'এবার আমি যাই, অনেক রাত হ'ল।'

সীতেশদা ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'না-না, এখন যাবে কি! কী এমন রাত হয়েছে!' কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে বলল, 'সবে তো সাড়ে সাতটা।'

মেয়েটি বলল, 'মায়ের পাগলামিটা সকাল থেকে খুব বেড়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার। সন্ধ্যা একা সামলাতে পারবে না।'

'যাবে যাবে, একেবারে ডিনার খেয়ে বাড়ি ফিরবে।' মেয়েটির দিক থেকে চোখ সরিয়ে বৌদির দিকে তাকাল সীতেশদা। বলল, 'বুলাকি এখানে খেয়ে যাবে।'

এই সেই বুলাকি! এর কাছ থেকেই শ্যামবাজারের বাড়িওলা এ-বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে দিয়েছিল। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। সোজা হয়ে বসলাম।

সেই মেয়েটি অর্থাৎ বুলাকি কিন্তু সীতেশদার কথা রাখল না। উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এখন খাওয়ার ঝামেলা করলে রাত বেড়ে যাবে। বাড়ি ফেরার বাস পাব না।'

হতাশ একটা ভঙ্গি করে সীতেশদা বলল, 'খাবে না যখন, তখন কি আর

করব। চল, তোমাকে রসা রোডে গিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসি।'

'কি দরকার, আমি নিজেই যেতে পারব।'

'না-না, এই সাদার্ন অ্যাভেনিউ রাস্তাটা খুব খারাপ। একে ব্ল্যাকআউটের রাত্তির, তার ওপর মিলিটারি টমিগুলো মাতাল হয়ে ডালকুত্তার মত ঘুরছে। একা-একা বেরিয়ে কি কেলেঙ্কারি করতে চাও?'

বুলাকি আর কিছু বলল না। তাকে সঙ্গে নিয়ে সীতেশদা বেরিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে এখন বৌদি আর আমি। উল বুনতে বুনতে হঠাৎ মুখ তুলল বৌদি। বলল, 'দেখলে ওকে?'

বুঝতে না পেরে বললাম, 'কাকে?'

'কাকে আবার, বুলাকিকে, তোমার দাদা যাকে বাসে তুলে দিতে গেল।'

আধফোটা স্বরে বললাম, 'হ্যাঁ, কিন্তু—'

আমার কথা বুঝিবা শুনতেই পেল না বৌদি। সামনের দিকে অনেকখানি এগিয়ে এসে ফিস ফিস করল, 'ঐ বুলাকি কে জান?'

স্বপ্নোত্থিতের মত বললাম, 'কে?'

'আমার সতীন গো, সতীন।' বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল বৌদি। হাসতে হাসতেই বলল, 'এ-রকম সতীন আমার অনেক আছে।'

চকিত হয়ে উঠলাম। স্থির নির্নিমেষ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বৌদি আবার বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি!' বলেই আবার হাসল। তীব্র তীক্ষ্ম বিচিত্র হাসি। হাসির দমকে তার সমস্ত দেহ দুলতে লাগল।

হাসির একটা স্বরূপই জানা ছিল। চিরদিন দেখেছি মানুষ সুখেই হাসে। কিন্তু তারও যে রকমফের থাকতে পারে, কে জানত। কে জানত, হাসি দিয়ে আনন্দ ছাড়া আরো অনেক কিছু বোঝানো যায়। বৌদির হাসিতে আর যাই থাক, সুখ বা আনন্দের চিহ্নমাত্র নেই।

সাত-আট বছর পর আজ প্রথম কলকাতায় এসেছি। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত তিনটি মানুষকে দেখলাম। সীতেশদা, বৌদি বা বুলাকি—কাউকেই সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে না। একটা যুদ্ধ আর ক'টা বছর মানুষকে এত অস্বাভাবিক করে দিয়েছে!

কিছুক্ষণ পর সীতেশদা ফিরে এল। ঘরে ঢুকেই বৌদিকে বলল, 'বড্ড খিদে পেয়েছে। বিলাসিয়াকে খাবার দিতে বল।' আমার দিকে ঘুরে বলল, 'খেতে খেতে তোর কথা শুনব!'

খাবার টেবিলে বসে সব বললাম। বাবা মারা যাওয়া থেকে শুরু করে কী-ভাবে আমাদের সংসারটা ভেঙে গেল, কেন আমার পড়া বন্ধ হ'ল, কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি, কিছুই বাদ দিলাম না।

সমস্ত শুনে গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে সীতেশদা বলল, 'তাই তো, আর ক'টা দিন আগেও যদি আসতিস্! জাপান সারেন্ডার করেছে—ওয়ার থেমে গেল।

চাকরির বাজার এখন খুব খারাপ। যুদ্ধের হিড়িকে কত কোম্পানি গজিয়েছিল, তারা এখন উঠে যাবে। যারা উঠবে না তাদেরও অনেক ছাঁটাই হবে। নতুন করে এ-সময় কেউ লোক নেবে না। অথচ আট দশ মাস আগেও কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে কোম্পানিগুলো হয়রান হয়ে গেছে। একটা লোক পায় নি।'

আমার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। কাঁপা গলায় বললাম, 'আমার কথা তো শুনলে। একটা চাকরি না পেলে মরে যাব।'

কপালে অসংখ্য রেখা ফুটিয়ে কি যেন চিন্তা করল সীতেশদা। বলল, 'আচ্ছা দেখি, তোর জন্যে কি করতে পারি।'

এর পর কেউ কিছু বললাম না। সীতেশদা, বৌদি এবং আমি নিঃশব্দে নতমুখে খেতে লাগলাম।

খেতে খেতে কথাটা মনে পড়ল। মুখ তুলে অনেকক্ষণ ইতস্তত করলাম। তারপর ভয়ে ভয়ে ডাকলাম, 'সীতেশদা—'

'বল—' সীতেশদা সাড়া দিল।

'একটা কথা—'

'কী?'

'এখন আমি কি করব; বাড়ির যা অবস্থা তাতে সেখানে ফিরতে ইচ্ছে করে না। আমার কাছে মোটে চারটে টাকা আছে। এই টাকায়—' বলতে বলতে থেমে গেলাম।

আমার মনের কথা পড়তে পারল সীতেশদা। ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'কি আশ্চর্য! বাড়ি তোকে ফিরতে বলেছে কে! যদ্দিন না চাকরি-বাকরি হয় আমার এখানেই থাকবি। তোর বাবা মানে জিতেন কাকা আমার জন্যে কত করেছে! হাত ধরে সে-ই একদিন আমাকে কলকাতায় এনেছিল, চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিল। সে উপকার আমার মনে আছে।'

উত্তর দিলাম না। ভাবলাম মানুষ যতই বদলাক তার সার বস্তু কিছু না কিছু অটুট থাকেই। বাবা তাকে চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। সে কথা সীতেশদা ভুলে যায় নি। সেই উপকারের কথা মনে রেখেই সে আমাকে আশ্রয় দিল।

বৌদিকে দেখে বুলাকিকে দেখে এবং মুখে মদের গন্ধের আভাস পেয়ে তার সম্বন্ধে আমার মন অশ্রদ্ধায় বিরূপ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তার কৃতজ্ঞতা বোধ দেখে মনে হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সীতেশদাকে পুরোপুরি বদলে ফেলতে পারে নি।

দুই

কয়েকটা দিন কেটে গেল। এর মধ্যে অনেক কিছুই জানতে পারলাম।

সীতেশদা অনেক দূরের মানুষ। তাকে ধরা ছোঁয়া যায় না। সকালে সে বেরিয়ে যায়, ফিরতে ফিরতে রাত। টলতে টলতে বাড়ি ফেরে। কোন কোন

দিন আবার ফেরেই না।

এত বড় ফ্ল্যাটটায় বৌদি একেবারে একা। সঙ্গী নেই, চাকর বাকর ছাড়া কথা বলার লোক নেই। অলস মন্থর কর্মহীন জীবনে দিনগুলো তার কাটতেই চায় না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ খবরের কাগজ পড়ে বৌদি। তারপরেই উলের স্তূপ নিয়ে বসে। খবরের কাগজ আর উলের পেছনে দিনের অতি সামান্য অংশই কাটে। বাকি সময়টা সাজসজ্জা নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে। কখনও গলায় পাউডার লাগাচ্ছে, কখনও মুখে ক্রীম ঘষছে। কখনও নখে এবং ঠোঁটে রঙ মাখছে। এই হয়ত মুর্শিদাবাদ সিল্ক দেখা গেল তার গায়ে, পরমুহূর্তেই সেটা বদলে বালুচরী পরল। বালুচরীও বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। তার জায়গায় সিফন এল। খোঁপাটা কখনই মনোমত হয় না। দিনরাত সেটা ভাঙছে আর নতুন করে গড়ছে। খোঁপাটা কখনও পানের আকার নিচ্ছে, কখনও কল্কার, কখনও বা পাটির।

এতদিন সে ছিল সঙ্গীহীন। মুখ বুজে নিঃশব্দে তার দিন কাটত। আমি আসতে কথা বলার একটা লোক পেয়ে বেঁচেছে।

দিনের মধ্যে অসংখ্য বার নানা সাজে সেজে বৌদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'কেমন লাগছে ঠাকুরপো?'

যার মধ্যদেশ চল্লিশ ইঞ্চি, দেহ মেদের ঢিবি, উৎকট ভাবে সাজলে তাকে কেমন দেখায় সে কথা ইচ্ছা থাকলেও বলা যায় না। অন্তত যেখানে আশ্রয় পেয়েছি সেখানে তো নয়ই। মুখ ফুটে যা বলি তা এইরকম, 'সুন্দর দেখাচ্ছে।'

বৌদি হাসে। সে হাসি করুণ, বিষণ্ণ। বলে, 'তুমিই শুধু সুন্দর বল। এত সাজি, তোমার দাদা কিন্তু ফিরেও তাকায় না।'

কি উত্তর দেব, ভেবে থই পাই না। চুপচাপ বসে থাকি।

বৌদি আবার বলে, 'তুমি সুন্দর বললে কি হবে ভাই, সত্যিই তো আমি সুন্দর না। মোটা হয়ে গেছি। বয়স হয়েছে। ভাল দেখতে নই। ভাল হলে কি তোমার দাদা বুলাকি উর্লাকিদের পেছনে ঘুরে বেড়ায়?' একটু থেমে আবার শুরু করে, 'তাই আমি সাজি, সবসময় পটের বিবি হয়ে থাকি। কেন জানো? বুলাকি-উর্লাকিদের দেখলে প্রাণটা খাক হয়ে যায়। ভাবি রূপ দিয়ে তো পারব না, সাজগোজ দিয়ে তোমার দাদাকে যদি ফেরাতে পারি।'

নিজের রূপ এবং যৌবন সম্বন্ধে বৌদি খুবই সচেতন। কিন্তু সাজলে তাকে যে অসহনীয় দেখায়, সে-কথা সে বোঝে না। সাজসজ্জাই তার হাতে একমাত্র অস্ত্র যা দিয়ে স্বামীর যুবতী বান্ধবীদের সঙ্গে সে লড়তে চায়। দিবারাত্রি তাই সে সাজে। কি নিদারুণ দুঃসহ জীবন!

আমি বলি, 'বাইরের মেয়েদের সঙ্গে সীতেশদা ঘোরে, তাদের বাড়িতে এনে তোলে। আপনি কিছু বলেন না কেন?'

'বলে কি হবে! পুরুষ মানুষ সে, যুদ্ধের বাজারে অঢেল টাকা হাতে এসেছে। টাকা তাকে খারাপ করে দিয়েছে। এমনিতেই বেশির ভাগ দিন

বাইরে রাত কাটায়। কিছু বললে হয়ত বাড়িতেই আসবে না।' বৌদি বলতে থাকে, 'অথচ লোকটা কত ভাল ছিল। কেন যে যুদ্ধ বাধল, কেন যে আমাদের টাকা হ'ল!'

আমি উত্তর দিই না।

এই ক'দিনে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। বৌদি এবং সীতেশদার মধ্যে কথাবার্তা খুবই কম হয়। কচিৎ দু-একটা। দু-জনে যেন দুটি ভিন্ন গ্রহের মানুষ।

শ্যামবাজারের সেই স্যাঁতসেঁতে ঘরে অর্থ ছিল না, বিত্ত ছিল না কিন্তু হৃদয় ছিল। সাদার্ন অ্যাভেনিউর এই ফ্ল্যাট সোফা-সেটি-কার্পেটে ঝলমলে, অর্থের জৌলুসে ঝকমকে কিন্তু হৃদয়-বর্জিত।

তিন

এখানে অনেক সুখ, অনেক আরাম, অনেক বিলাস। সব কিছুই প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তবু আমার ভাল লাগছে না।

সীতেশদা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। যতদিন চাকরি বাকরি না নয় ততদিন থাকতে বলেছে। তবু নিজেকে কেমন যেন অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছে।

প্রায় রোজই সীতেশদাকে তাগিদ দিই, 'আমার চাকরির কী করলে?'

সীতেশদা বলে, 'চেষ্টা তো করছি। কিন্তু ভালমত পাচ্ছি না। বাজারটাই খুব খারাপ পড়েছে।'

'ভাল মন্দের বাছ বিচার নেই। যেমন হোক একটা জুটিয়ে দাও। এভাবে বসে থাকতে ইচ্ছা করছে না।'

'দেখি—'

'দেখি না, যত তাড়াতাড়ি হয় ব্যবস্থা কর।'

পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত ফল হ'ল। একদিন সীতেশদা বলল, 'একটা চাকরির খোঁজ পেয়েছি। কিন্তু—'

'কী?' আমি উন্মুখ হলাম।

'কাজটা কোন অফিস-টফিসে নয়।'

'তবে?'

'আমার জানাশোনা একটা বাড়িতে, এক ভদ্রমহিলার কাছে।' কুণ্ঠিত ভাবে সীতেশদা বলল।

স্তব্ধ হয়ে রইলাম। কত উচ্চাশাই না আমার ছিল! স্বপ্ন দেখতাম, ভাল চাকরি করব। মাসের শেষে প্রচুর মাইনে পাব। অন্তত তিনশ টাকার কম মাইনে হলে চলবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি-না বাড়ির চাকরি! খুব সম্ভব চাকর-বাকর অথবা বাজার-সরকার জাতীয় কোন কাজ করতে হবে। আমার স্বপ্ন, আমার জন্মগত উচ্চাশা—সব কিছু নিষ্ঠুর আঘাতে রঙীন কাঁচের বাসনের মত চুরমার হয়ে গেল।

সীতেশদা আমার মুখের দিকে তাকাল একবার। একটু ইতস্তত করে বলল, 'শুনতে যতটা খারাপ আসলে ততটা নয়। বাড়ির চাকরি হলেও অসম্মানের কিছু নেই। অবশ্য কাজটা নেওয়া না নেওয়া তোর ইচ্ছের ওপর।'

আমার বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস অনেকগুলো স্তর ঠেলে উঠে এল যেন। আস্তে আস্তে বললাম, 'চাকরিটা নিলে আমাকে কী করতে হবে ?'

'বিশেষ কিছুই নয়। ভদ্রমহিলার কাছে কাছে সব সময় থাকবি। উনি যখন যা বলেন তা-ই করবি। অনেকটা পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টাণ্টের মত কাজ।' সীতেশদা বলতে লাগল, 'মাইনে ভালই দেবে। আপাতত পঁচাত্তর টাকা। তার সঙ্গে খাওয়া এবং পোশাক। ভাল করে ভেবে দ্যাখ কাজটা নিবি কি না ?'

নিরুচ্ছ্বাস শুকনো গলায় বললাম, 'ভেবে দেখবার কিছু নেই। কাজটা আমি নেব।'

'কালই তা হ'লে আমার সঙ্গে চল। কথাবার্তা ঠিক করে আসি।'

'আচ্ছা।'

পরের দিন সকালে সীতেশদার সঙ্গে তার গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম। হাজরা রোডে এসে পুব দিকে যেতে যেতে সীতেশদা বলল, 'ভদ্রমহিলা মস্ত বড়লোক। ওয়ার কনট্রাক্ট ধরে লাখ লাখ টাকা করেছেন। যে সে কনট্রাক্ট নয়, বিল্ডিং কনট্রাক্ট। রাস্তাঘাট, এরোড্রোম, মিলিটারি ব্যারাক, এমনি সব ব্যাপার। ওঁকে ধরেই আমি হাঁস মুরগি সাপ্লাইয়ের কাজটা জোগাড় করেছিলাম।'

হাঁ হয়ে গেলাম। আমার অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে যে স্ত্রীলোকেরা রয়েছে তাদের জীবনে একটি মাত্র রং। সে রং দাসত্বের। প্রথম জীবনে বাপের সংসারে, মধ্যজীবনে স্বামীর সংসারে, শেষ জীবনে ছেলের সংসারে নির্বিচারে মুখ বুজে খেটে যায় তারা। এ-দেশে মেয়ে মাত্রেই জন্মশর্তে ক্রীতদাসী।

জীবনের চব্বিশটা বছর কেটেছে আমার মফঃস্বলে। মাঝে মাঝে অবশ্য শুনতাম কলকাতার অনেক মেয়ে স্বাধীন হয়েছে। চাকরি বাকরি করে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাই বলে ওয়ার কনট্রাক্ট নিয়ে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে, এতটা ভাবতে পারি নি। এ ছিল আমার পক্ষে অকল্পনীয়। বললাম, 'মহিলা হয়ে কনট্রাক্টরি করেন !'

'উনি ঠিক করেন না, করে ছেলে। তবে ব্রেনটা ওঁরই। কী করলে কনট্রাক্ট ধরা যাবে, কী-ভাবে কনস্ট্রাকশন করলে লাভ বেশি থাকবে—সবই ওঁর পরামর্শমত হয়। অদ্ভুত শার্প ব্রেন ভদ্রমহিলার।' সীতেশদা বলতে লাগল। তার মুখ-চোখ এবং গলার স্বর ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠেছে।

চুপ করে রইলাম।

সীতেশদা থামে নি; 'চাকরিটা যদি তোর হয়ে যায়, রক্তচোষা জোঁকের মত, লাইক ব্লাড-সাকিং লীচ ওঁকে ধরে থাকবি। আমার বিশ্বাস, আলটিমেটলি তোর লাভ হবে।'

যুদ্ধের দৌলতে সীতেশদার আর্থিক এবং চরিত্রগত পরিবর্তনই শুধু হয় নি, মুখের ভাষাটাও বদলে গেছে। ছ-সাত বছর আগে সোজা সহজ বাংলায় কথা বলতে সে। ভাষাটা এখন আর বিশুদ্ধ নেই। ইংরেজির খাদ মিশে বর্ণসংকর হয়ে গেছে। ইংরেজি-খচিত সেই ভাষা যেমন বিচিত্র তেমনি চমকপ্রদ।

যাই হোক এবারও কিছু বললাম না। নিঃশব্দে তার পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম।

সীতেশদা সমানে বলে যাচ্ছে, অজস্র সোর্স আছে ভদ্রমহিলার। বড় বড় গভর্নমেণ্ট অফিসার, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, নানা কোম্পানির ডিরেক্টর—সব ওঁদের বাড়ি এসে আড্ডা দেয়। ড্যাশিং হতে হবে তোকে। সাহস করে তাদের সঙ্গে আলাপ করবি, তাদের তোষামোদ করবি। যাতে ইমপ্রেসড্ হয় তেমন ভাবে চলবি। দেখবি, ভাল চান্স পেয়ে গেছিস।' বলতে বলতে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল সে। আমার কাঁধে একখানা হাত রেখে বলল, 'লাইফের আসল কথাটা কী জানিস?'

'কী?' চকিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'চান্স। চান্স ছাড়া কেউ বড় হতে পারে না। আজ যে চান্সটা পাচ্ছিস কাল তার চেয়ে ভাল পেতে হবে। পরশু তার চেয়েও ভাল। সব সময় মনে রাখবি, চান্স এমনি আসে না। তাকে তৈরি করে নিতে হয়।'

সীতেশদার জীবন-দর্শন শুনতে শুনতে নীরবে নিরুত্তরে হাঁটতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ চলার পর সীতেশদা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'এই যে এসে গেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে আমিও দাঁড়ালাম। সামনের দিকে তাকাতেই দোতলা বাড়িটা চোখে পড়ল।

বাড়িটার স্থাপত্যরীতিতে যুদ্ধকালীন আধুনিক যুগের ছাপ রয়েছে। দূরে থেকে একটা সমুদ্রগামী বিশাল-দেহ জাহাজের মত মনে হয়। সারি সারি ঘরগুলি যেন কেবিনের উপমা। একতলা এবং দোতলার সামনের দিকের বারান্দাগুলো দেখতে দেখতে অনায়াসে ডেকের কথা মনে পড়ে যায়।

ছাদের ওপর একটা চোঙা আর কিছু লাইফবোট থাকলেই জাহাজের তুলনাটা নিখুঁত হত।

সামনের দিকে অনেকখানি অংশ জুড়ে সবুজ ঘাসের 'লন'। আয়তনে এক বিঘের মত। লনের একধারে টেনিস এবং ব্যাডমিণ্টনের কোর্ট। আরেকদিকে দুটো উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার মাঝখানে একটি মর্মর নগ্নিকা। তাদের পেছনে বসবার জন্য সিমেণ্টের লাল-নীল ছাতা। ছাতাগুলোর তলায় বেতের চেয়ার এবং টি-পয় সাজানো।

লনটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে আছে লাল সুরকির রাস্তা। রাস্তার দুপাশে সমান দূরত্ব বজায় রেখে সারি সারি পাম গাছ।

গাড়ি থামিয়ে নামতে নামতে সীতেশদা বলল, 'আয় আমার সঙ্গে—'

আমিও নেমে পড়লাম। তারপর নিঃশব্দে মন্ত্রচালিতের মত চলতে লাগলাম। স্তম্ভিত বিস্ময়ে ভাবলাম, এই বাড়িটা যাদের, তাদের ঐশ্বর্যের পরিমাণ কত !

গেট পেরিয়ে সুরকির রাস্তা মাড়িয়ে চলেছি। আগে আগে সীতেশদা, আমি তার পেছনে।

বাড়িটায় পৌঁছবার আগেই মৃদু অথচ মিষ্টি এবং সুরেলা একটা গলা বাতাসের ওপর দিয়ে ভেসে এল যেন, 'সীতেশ না ?'

সীতেশদা থমকে দাঁড়াল। কাজে কাজেই আমাকেও দাঁড়াতে হ'ল।

'এখানে এস।' গলাটা আবার শোনা গেল।

এবার দেখতে পেলাম। সবুজ ঘাসের লনে যেখানে লাল-নীল ছাতাগুলো ছড়ানো সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। প্রথমে মনে হয়েছিল ছবি। কিংবা আধুনিক যুগের বাড়িটার পটে অবাস্তব কোন স্বপ্ন। আমার স্নায়ুগুলোর মধ্য দিয়ে দ্রুত লয়ে অর্কেস্ট্রার মত কিছু বেজে গেল।

পরনে লাল সিল্কের শাড়ি এবং হলুদ ব্লাউজ। শাড়ি এবং ব্লাউজের মাঝখানে অনেকখানি অংশ উন্মুক্ত। বাঁ হাতের মণিবন্ধে ঘড়ি। ডান হাতে একটিমাত্র চুড়ি। গলায় মুক্তোর হার, কানে হীরে-বসানো দুল। আঙুলে মীনে-করা আংটি। পায়ে বর্মী চটি !

দেহটি মসৃণ, কোমল। কোথাও একটা রেখা বা ভাঁজ নেই। গায়ের রং টকটকে ফর্সা। নাক তীক্ষ্ম, চোখ দীর্ঘ, ঠোঁট পাতলা এবং রক্তাভ। ভুরুদুটো কিন্তু আসল নয়, পেন্সিলে আঁকা। সিঁথিতে সিঁদুরের ক্ষীণ রেখা। এখন আর কত বেলা ! বেশি হলে আটটা। এরই মধ্যে রীতিমত প্রসাধন করেছেন। পটে আঁকা ছবির মত সেজেছেন ঠিকই কিন্তু সীতেশদার বৌর মত উৎকট ভাবে নয়। তিনি আধুনিকা তবু অভিজাত, উজ্জ্বল এবং অসাধারণ। তাঁর সমস্ত দেহ ঘিরে পোশাকে এবং সাজে, ব্যক্তিত্বে আর রুচিতে আশ্চর্য একটা ছন্দ রয়েছে।

তাঁর বয়স আমার কাছে রহস্যই থেকে যেত, যদি না দেখতে পেতাম কপালের কাছে কয়েকটি চুল সাদা হয়ে গেছে। সামান্য ক'টি চুলের রঙ বদলে দেওয়া ছাড়া সময় তাঁর দেহে আর কোন ছাপই রেখে যেতে পারে নি।

তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাতে নীল রঙের বল, পাশে একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর। লাল খরখরে জিভ বার করে কুকুরটা হাঁপাচ্ছে।

মুগ্ধ নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছি।

সীতেশদা চাপা ফিস ফিস গলায় বলল, 'এঁর কাছে আমরা এসেছি। চল, উনি ডাকছেন—'

দু-জনে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার বুকের ভেতরটা অজ্ঞাত এবং অহেতুক এক ভয়ে কাঁপছে। রক্তের মধ্যে অদ্ভুত এক উত্তেজনা ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। বুঝতে পারছি আমার কপালে কণা কণা ঘাম জমেছে।

সীতেশদা বলল, 'এই অসময়ে আপনি লনে এসেছেন মিসেস মিত্র !' তার

গলার স্বরে বিস্ময়ের আভাস।

মিসেস মিত্র হাসলেন। বললেন, 'কুকুরটার এ-সময় ছোটাছুটি করার অভ্যাস। বুধন সিং বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওকে দৌড় করায়। কিন্তু কাল থেকে তার জ্বর হয়েছে। তাই ওকে নিয়ে আমিই এসেছি। অভ্যাসটা ঠিক রাখা তো দরকার, নইলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে।' বলেই হাতের বলটা দূরে ছুঁড়ে দিলেন। কুকুরটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

এবার মিসেস মিত্র বললেন, 'তারপর সীতেশ, এই সকালবেলা কি মনে করে?'

'সেদিন আপনি একটি লোকের কথা বলেছিলেন। আমি একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। দেখুন যদি পছন্দ হয়—'

মিসেস মিত্র আমার দিকে তাকালেন। খুব আস্তে বললেন, 'এই বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তুমি তো বেশ কাজের ছেলে দেখছি। পরশুদিন কথাটা বলেছি, এর মধ্যেই লোক জোগাড় করে ফেলেছ!' মিসেস মিত্রের গলার স্বরে তারিফ ফুটে বেরুল।

সীতেশদা কিছু বলল না। অল্প একটু হেসে প্রশংসাটুকু উপভোগ করল।

মিসেস মিত্র বললেন, 'চল, ওখানে গিয়ে বসা যাক।'

একটা ছাতার নীচে গিয়ে বেতের চেয়ারে আমরা বসলাম। ইতিমধ্যে কুকুরটা বল মুখে করে ফিরে এসেছে। বলটা মিসেস মিত্রের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ম সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল সে। তারপর কাছে এসে আমার জামা-কাপড় হাত-পা শুঁকতে লাগল।

কোথায় লুকবো ঠিক করতে পারছিলাম না। চেয়ারে হাত-পা গুটিয়ে সন্ত্রস্ত চোখে কুকুরটার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম। আর কুকুরটাও আমার ভীত বিব্রত ভঙ্গি যেন উপভোগ করছিল। যতই প্রাণীটার কাছ থেকে নিজেকে সরাতে চাইছিলাম ততই সেটা জিভ মেলে লম্বা মুখটা আমার কাছে নিয়ে আসছিল।

মিসেস মিত্র সস্নেহে ধমক দিলেন, 'ইউ রোজি, ডোণ্ট ডিসটার্ব হিম। কাম হিয়ার।'

বাঘের মত ঐ কুকুরটার নাম 'রোজি'। জগতে কত আশ্চর্য ব্যাপারই না আছে!

রোজি কিন্তু মিসেস মিত্রের হুকুম তামিল করল না। আমার পেছনে লেগেই রইল। বেশ মজা পেয়ে গেছে সে।

মিসেস মিত্র আবার ধমকে উঠলেন, 'নটি চ্যাপ, আই সে ইউ কাম হিয়ার। কাম—কুইক—'

মাথা নীচু করে কুকুরটা চলে গেল। গিয়ে মিসেস মিত্রের পায়ের কাছে শান্ত শিষ্ট এবং ভব্য হয়ে বসল।

মিসেস মিত্র ঈষৎ ঝুঁকে পিঠে আস্তে আস্তে তিন চারটে চাপড় দিলেন। বললেন, 'ভারি দুষ্টু হয়েছ তুমি। লোককে অকারণে উত্ত্যক্ত কর।'

কুকুরটা মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। কথাগুলো যেন শুনতেই পায় নি।

কুকুরকে শাসন করে আমাদের প্রতি মনোযোগী হলেন মিসেস মিত্র। সীতেশদাকে বললেন, 'আমার এখানে কী করতে হবে ছেলেটিকে (আমাকে) বলেছ?'

'মোটামুটি আভাস দিয়েছি। সব তো আমি জানি না। যা-যা করতে হবে আপনিই বলে দিন।' সীতেশদা বলল।

মিসেস মিত্র আমার দিকে ফিরলেন। কি ভেবে বললেন, 'প্রথমেই বলে রাখছি তোমাকে কিন্তু 'আপনি' করে বলতে পারব না।'

আড়ষ্ট অস্পষ্ট গলায় উত্তর দিলাম, 'আপনি আমাকে 'তুমি' করেই বলবেন।'

'গুড, ভেরি গুড। কত বয়স তোমার?'

'চব্বিশ।'

'আমার ছেলের চেয়েও দু-বছরের ছোট।' বলতে বলতে হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ল। ব্যস্তভাবে মিসেস মিত্র বলে উঠলেন, 'ভাল কথা, তোমার নামটাই তো জানা হয় নি।'

'আমার নাম শুভেন্দু—শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়।'

'শুভেন্দু? বাঃ সুন্দর নাম। কে রেখেছিল?'

'আমার বাবা।' মুখ নামিয়ে বললাম।

'ভদ্রলোকের টেস্ট আছে।' মিসেস মিত্র বলতে লাগলেন, 'কিছু মনে করো না, তোমাকে ক'টা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব।'

বড়লোকদের সম্বন্ধে এতদিন কিংবদন্তী শুনেছি। আমাদের মত গরীবদের ধরাছোঁয়ার বাইরে প্রাচীরঘেরা এক নিষিদ্ধ জগতের বাসিন্দা তারা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মুখের কথা বলার রুচি বা অবকাশ তাদের নেই। মিসেস মিত্র কিন্তু সেই কিংবদন্তীগুলির প্রতিবাদ। কথায় বার্তায় ভদ্রমহিলা বেশ সহজ, স্বচ্ছন্দ। তাঁর আন্তরিকতা আমাকে স্পর্শ করল। ধীরে ধীরে কখন যে আমার আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিল টের পাই নি। বললাম, 'না-না, মনে করব কেন। আপনার যা-যা জানবার জেনে নিন।'

'তুমি কোথায় থাক?'

'আপাতত সীতেশদার কাছে।'

'বাবা-মা, ভাই-বোন—এরা সব?'

'কেউ নেই আমার।'

'কেউ না!'

'না।' এরপর সংক্ষেপে আমাদের পারিবারিক ইতিহাস খুলে বললাম। শুনে মিসেস মিত্র খুশিই হলেন। অন্তত মুখ দেখে তাই মনে হল।

বললেন, 'নাইস, এরকমই একজনকে খুঁজছিলাম। যার পিছুটান আছে তাকে দিয়ে আমার চলবে না।'

আমি চুপ করে রইলাম।

মিসেস মিত্র আবার প্রশ্ন করলেন, 'কতদূর পড়াশোনা করেছ?'

বললাম, 'বি. এ. পর্যন্ত। ফোর্থ ইয়ারে উঠে পড়া ছেড়ে দিতে হল। বাবা মারা গেলেন, কাকারা কেউ খরচ চালাল না।'

'বি. এ. পাশ হ'লে ভাল হত। যাক, এতেই চলবে।' বলতে বলতে একটু থামলেন মিসেস মিত্র। কি যেন চিন্তা করে ফের আরম্ভ করলেন, 'আমার কাছে কাজ করতে হলে ক'টা শর্ত তোমাকে মানতে হবে।'

'কী কী শর্ত?'

'প্রথমত আমার বাড়িতে এসে তোমাকে থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত আমার পারমিশান ছাড়া কোথাও বেরুতে পারবে না। তৃতীয়ত দিনে রাত্রে—যখনই তোমাকে ডাকব যে অবস্থায় থাক না, ছুটে আসতে হবে। এই শর্তে তুমি রাজি?'

সামান্য কয়েকটি টাকার জন্য আমার জীবনটা ক্রীতদাস হয়ে যাবে! স্তব্ধ হয়ে একবার ভাবলাম, কাজটা নেব কি-না। পরমুহূর্তে মনে পড়ল, যুদ্ধ থেমে গেছে। চাকরির বাজার এখন খুবই খারাপ। এ-কাজটা না নিলে কতদিন অনিশ্চিতভাবে সীতেশদার বাড়িতে বসে থাকতে হবে ঠিক নেই। রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'রাজি।'

'গুড, ভেরি গুড। মাইনের কথা সীতেশ তোমাকে নিশ্চয়ই বলেছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কালই তা হ'লে তোমার জিনিসপত্তর নিয়ে চলে এস।'

'আচ্ছা।'

সীতেশদা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। এবার সে মুখ খুলল, 'চাকরির কথা তো সেটেলড্ হয়ে গেল। এবার তা হলে আমরা চলি।'

মিসেস মিত্র বললেন, 'এস।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল সকালেই এস কিন্তু।'

'আসব।' আমরা বিদায় নিলাম।

লাল সুরকির পথ ধরে পাম গাছের ছায়ায় ছায়ায় আবার চলেছি। পেছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখলাম, মিসেস মিত্র কুকুরের স্বাস্থ্য এবং অ্যাস রক্ষার জন্য নীল বলটা আবার ছুঁড়ে দিয়েছেন।

চার

কথামত পরের দিন সকালেই চলে এলাম। সঙ্গে চামড়ার স্যুটকেশ আর ছোট একটি বিছানা।

কাল সীতেশদা সঙ্গে ছিল, সুতরাং নিশ্চিন্ত ছিলাম। আজ গেটের সামনে

দাঁড়িয়ে একা একা নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হ'ল। অনুভব করলাম, বুকের ভেতরটা ভয়ানক কাঁপছে। ভয়ের কোন কারণই ছিল না। মিসেস মিত্রই আমাকে আসতে বলেছেন। তবু বুকের অস্বাভাবিক ধুকপুকুনি কিছুতেই থামাতে পারছি না। এর নামই কি স্নায়বিক দুর্বলতা?

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর গেটের ওপারে উঁকি দিলাম। পামগাছের ছায়ায় লাল সুরকির রাস্তাটা এখনও ঘুমিয়ে আছে। কেউ নেই সেখানে। ওপাশের সবুজ লনটায় কাল মিসেস মিত্র কুকুর নিয়ে খেলা করছিলেন। তাঁকেও দেখতে পেলাম না।

কালকের চাইতে আজ অবশ্য আগেই এসে পড়েছি। সাতটাও বাজে নি এখন। খুব সম্ভব এ বাড়ির কেউ ঘুম থেকে ওঠে নি। ভাবলাম এখন আর ভেতরে ঢুকে ডাকাডাকি করব না। একটু ঘুরে ন'টা সাড়ে ন'টা নাগাদ আসব।

কিন্তু ঘুরতে যেতে হ'ল না। হঠাৎ যেন লোকটা মাটি ফুঁড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

বেশ বয়স হয়েছে তার। শরীর কিন্তু এখনও যথেষ্ট মজবুত। হাত-পায়ের হাড়গুলো মোটা মোটা এবং শক্ত। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। ফতুয়ার ওপর দিয়েও তার বলিষ্ঠ বুকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। চওড়া কাঁধ, ঘাড়টা রীতিমত মাংসল।

অবশ্য বয়সের ছাপও পড়েছে প্রচুর। দুর্বোধ্য শিলালিপির মত অসংখ্য রেখায় তার মুখটা জটিল। মাথার একটা চুলও আর কালো নেই। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পিঠটা বেঁকে ঈষৎ নুয়ে পড়েছে। নির্ভুলভাবে বোঝা যায়, সময়ের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছে সে।

নাকটা উঁচু ঢিবির মত। একজোড়া ধূসর রঙের গোঁফ ঠোঁটের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। চোখের দৃষ্টি সারল্যমেশা। সব মিলিয়ে মুখটা তার আশ্চর্য কোমল। সে দিকে তাকালে মনে হয় লোকটার বৃদ্ধ শরীরে যার বাস সে একটি বয়সহীন অবোধ শিশু।

সে কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'আপনার কি আজ আসার কথা ছিল?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আপনার নামই তো শুভেন্দুবাবু—নয়?' সম্ভবত যাচাই করার উদ্দেশ্যে সে আবার প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'কতক্ষণ এসেছেন?'

'এই মাত্র।'

'বাঁচলাম। কাল মা-জননী বলেছিল, আজ আপনি আসবেন। আমি যেন সকালে গেটের কাছে হাজির থাকি। আপনি এলে ভেতরে নিয়ে যাই। তা শালার ঘুমটা কাল রাত্তিরে এমন চেপে ধরেছিল যে আজ উঠতে দেরি হয়ে গেছে। চোখ মেলে দেখি রোদ উঠে গেছে। দৌড়ুতে দৌড়ুতে চলে এ্যালাম।

ভয় হয়েছিল, আপনি বুঝি এসে ফিরে গেছেন।'

নিরুত্তরে তাকিয়ে রইলাম।

লোকটা আবার বলল, 'আপনি ফিরে গেলে ভারি বিপদে পড়তাম। মা জননী আমার মাথাটা কেটে লিত। বড্ড রাগ তেনার।'

চকিত হয়ে বললাম, 'মা জননী কে ? মিসেস মিত্র ?'

লোকটা ঘাড় নাড়ল।

কাল মিসেস মিত্রকে দেখেছি। স্বল্পক্ষণের পরিচয়ে তাঁর সম্বন্ধে চমৎকার একটা ধারণা হয়েছিল। কথায় বার্তায় তিনি আন্তরিক, ব্যবহারে সহৃদয়। কিন্তু এই লোকটা যা বলছে তা আমার ধারণার একেবারে উল্টো। যাই হোক, আর কোন প্রশ্ন করলাম না।

গেট বন্ধ ছিল। লোকটা টেনে খুলে দিল। বলল, 'আসেন।'

ভেতরে চলে গেলাম।

আমার হাতে সুটকেশ আর বিছানা রয়েছে। লোকটা বলল, 'ও দুটা আমায় দ্যান।'

বললাম, 'না-না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।'

'দ্যান দিকি—' বলেই বাজপাখির মত ছোঁ মেরে সে দুটো কেড়ে নিল লোকটা। কাঁধের ওপর ফেলে বলল, 'চলেন আমার সন্‌গে।'

নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। একটা অপরিচিত বয়স্ক লোক আমার মালপত্র বয়ে নিয়ে চলেছে। মনে মনে ভয়ানক লজ্জিত এবং বিব্রত বোধ করছি।

লোকটা বুঝিবা আমার মনোভাব টের পেয়েছে। পেছন ফিরে অল্প একটু হেসে বলল, 'লজ্জার কিছু লেই। আমি এ-বাড়ির চাকর, নাম আমার গুপী।' একটু থেমে কি যেন ভেবে আবার শুরু করল, 'বাবু অবিশ্যি বলত, আমি তার নাকিন ছেইলে। মা জননী বলে পনের ট্যাকা মাইনের চাকর। চাকরই আমি।' বলতে বলতে বিষণ্ণ ছায়া পড়ল তার মুখে।

বুঝলাম কোথাও একটা ক্ষোভের ব্যাপার আছে তার। সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করা বোধ হয় অনুচিত। কাজেই চুপ করে রইলাম।

গুপী মুখ ফিরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করেছে। আমি তার পিছু পিছু চলেছি।

একসময় জাহাজের মত সেই নতুন বাড়িটার সামনে এসে পড়লাম। গুপী কিন্তু ভেতরে গেল না। বাড়িটা বাঁয়ে রেখে সোজা এগিয়ে চলল।

আমার ধারণা ছিল এই বাড়িতেই থাকব। কিন্তু গুপী কোথায় নিয়ে চলেছে ! একটু অবাক হয়েই ডাকলাম, 'গুপীদা—'

গুপী দাঁড়িয়ে পড়ল। গুপীদা বলায় সে খুশি হয়েছে। অন্তত তার মুখচোখ দেখে তাই মনে হল। বলল, 'আমায় গুপীদা কইলেন !'

'হ্যাঁ।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না গুপী। কি যেন একটু ভেবে আত্মবিস্মৃতের মত

শুরু করল, 'ক' বছর আগেও এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা গুপীদা বলেই ডাকত। আজকাল বলে 'বয়'। অবিশ্যি কনক দিদিমণির কথা আলাদা। একমাত্তর সে-ই এখনও গুপীদা বলে।'

কে কনক দিদিমণি জানবার জন্য মনে মনে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ আমার বারণ। আজ এখানে আসার সময় সীতেশদা বলে দিয়েছিল, দেখবি শুনবি কিন্তু অযাচিত কোন প্রশ্ন করবি না। অর্থাৎ চোখ এবং কান নামক ইন্দ্রিয় দুটির চর্চা চালালেও মুখ খোলা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। চতুর্থ ইন্দ্রিয়টিকে একেবারেই নিষ্ক্রিয় রাখতে হবে। কাজেই নীরব রইলাম।

গুপী সমানে বকে যাচ্ছে, 'বড় ভাল মেইয়ে আমাদের কনক দিদিমণি। আলাপ পরিচয় হলেই বুঝতে পারবেন অমন মানুষ হয় না। ঐ এট্টা মাত্তর জায়গা যেখানে এট্টু জুড়োতে পারি। ট্যাকা হবার পর এ বাড়ির হালচাল বদলে গেছে। কিন্তু কনক দিদি দশ-বিশ বছর আগে যেমন ছিল এখনও তেমনটিই রয়েচে।'

গুপীর কথাগুলো থেকে দু'টি বিষয় জানতে পারলাম। প্রথমত, কিছুদিন আগেও মিসেস মিত্রদের এমন আর্থিক কৌলীন্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, টাকা হবার পর এই পরিবারের সবাই বদলে গেছে। শুধু কনক নামে একটি মেয়ে ছাড়া।

গুপী থামে নি। সমানে বলে যাচ্ছে, 'আমার ছেলেবেলা থিকে এই সোম্‌সারে আছি। কি ছিল সোম্‌সারটা, যুদ্ধু লাগবার পর কি হয়ে গেল। অথচ বাবু যদ্দিন ছিল—'

চকিত হয়ে উঠলাম। বিদ্যুৎ-চমকের মত মিসেস মিত্রের সিঁথিতে সিঁদুরের ক্ষীণ একটি রেখা মনে পড়ে গেল। অর্থাৎ তিনি বিধবা নন। কিন্তু গুপী যা বলছে তাতে—। যাই হোক, সীতেশদার নিষেধ ভুলে গিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'বাবু কে? মিসেস মিত্রের স্বামী?'

'এজ্ঞে—'

'তিনি কি—'

কি যেন বলতে গিয়ে থমকে গেল গুপী। চলার বেগ দ্রুততর করে শুধু বলল, 'উ-কথা এখন থাক। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেন।'

বুঝলাম আমার শেষ প্রশ্নটির উত্তর দিতে গুপীর নিতান্তই অনিচ্ছা। তাই আর পীড়াপীড়ি করলাম না। চুপচাপ চলতে লাগলাম শুধু।

কিছুটা যাবার পর হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলাম। ইতিমধ্যে জাহাজের মত বাড়িটা পার হয়ে এসেছি। মনে পড়ল, এই বাড়িটায় না নিয়ে অন্য কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানবার জন্য গুপীকে খানিকটা আগে ডেকেছিলাম। কিন্তু কথায় কথায় ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যেতে হয়েছিল। ঈষৎ উৎকণ্ঠিত ভাবেই বললাম, 'বাড়ি তো ফেলে এলে। ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?'

'এ বাড়িতে আপনার থাকার ব্যাওস্থা হয় নি।'

'তবে ?' জিজ্ঞাসু চোখে গুপীর মুখের দিকে তাকালাম।

সামনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে গুপী বলল, 'উই উদিকে আরেকটা বাড়িতে। চলেন, গেলেই দেখতে পাবেন।'

হাঁটতে হাঁটতে একসময় বিশাল একটা পাঁচিলের প্রাচীরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

পাঁচিলটার গায়ে ছোট নীচু দরজা। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ও-পারে চলে গেলাম।

এ এক অন্য ভুবন। চারদিক জঙ্গলমত। যেদিকেই চোখ ফেরাই লম্বা লম্বা চীনা ঘাস, কচু বন আর সুষনি শাকের উদ্দাম জটলা। এ সবের ফাঁকে ফাঁকে এলোমেলোভাবে মাথা তুলে আছে আম জামরুল আর পেয়ারা গাছেরা। এককোণে অনেকগুলো কুল এবং করমচা ঘনবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর আছে ফুল। বেল, যুঁই এবং রাশি রাশি সন্ধ্যামালতী। ফুল এবং ফলের সবগুলোই দেশী। দেশী গাছের ভিড়ে বিদেশী গাছ পুঁতে ছন্দোপতন ঘটানো হয় নি।

বাগানটার পেছনে যত্নের কোন ছাপ নেই। নিজের ইচ্ছায় এবং খুশিতে যেমনভাবে পেরেছে সেটা বেড়ে উঠেছে।

জায়গাটা ভিজে ভিজে, ছায়াচ্ছন্ন। গাছপালা এবং ঠাণ্ডা মাটি থেকে বিচিত্র মিশ্র একটি গন্ধ উঠে আসছে। কোথায় যেন পাখি ডাকছে। কোন অদৃশ্য থেকে একটানা গলা ফাটিয়ে এই সকাল বেলাতেই ঝিঁঝি পোকার ঝাঁক তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। সমস্ত পরিবেশটাই এমন যা নিমেষে স্নায়ু-গুলোকে স্নিগ্ধ করে দেয়।

এরই মধ্যে একতলা বাড়িটা চোখে পড়ল। ভিতে নোনা লেগেছে। বাড়িটা কতকাল আগের বলা অসম্ভব। বুঝিবা প্রাচীন স্থাপত্য রীতির একখানা দুষ্প্রাপ্য নমুনা হিসেবে কোনক্রমে সেটা টিকে আছে। দেওয়ালের কোথাও আস্তর নেই। ইটগুলো নোনা ধরা এবং বহু বছরের ঝড়বৃষ্টির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত আর জর্জর। বাড়িটা যে মানুষের বাসযোগ্য এমন ধারণা করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

পায়ে পায়ে কাছে এসে পড়েছিলাম। পাশ থেকে গুপী বলে উঠল, 'যদ্দিন না ও-বাড়িতে এট্টা ব্যাওস্থা হচ্ছে আপনাকে এখেনেই থাকতে হবে।'

গুপীর কথা আমার কানে গেল কি গেল না। এই মুহূর্তে আমি সেই পাঁচিলটার কথা ভাবছি। তার একদিকে নিরপেক্ষ ভাবে ছাঁটা ঘাসের লন, টেনিস কোর্ট, পামগাছের ছায়া এবং জাহাজের মত সুদৃশ্য বাড়ি। একটু আগে সেখানে ছিলাম। পাঁচিলটার অন্য প্রান্তে অর্থাৎ এখানে বিপরীত দৃশ্য। এখানে জঙ্গল, ভিজে মাটির গন্ধ, ভাঙা পুরনো বাড়ি। দুটো একেবারে ভিন্ন জগৎ। আমি যেন গ্রহান্তরে এসে পড়েছি।

এদিকে গুপী কাঁধ থেকে স্যুটকেশ এবং বিছানাটা নামিয়ে ফেলেছে। সামনেই সারি সারি সিঁড়ি, তারপর বারান্দা। বারান্দা ঘেঁষে পাশাপাশি

খানপাঁচেক ঘর। বাড়িটার আকৃতি অনেকটা ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মত।

আমি নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম। বারান্দায় উঠে গুপী ডাকাডাকি শুরু করল, 'দিদিমণি, অ দিদিমণি—'

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে মেয়ে-গলার সাড়া এল, 'কে, গুপীদা?'

'হ্যাঁ।'

'ভদ্রলোক এসে গেছেন?'

'হ্যাঁ, সন্‌গে করে লিয়ে এইচি।'

'দাঁড়াও, যাচ্ছি।' বলতে বলতে দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরখানা থেকে মেয়েটি বেরিয়ে এল।

আমার দিকে ফিরে গুপী ফিস ফিস করে উঠল, 'কনক দিদিমণি।'

কত বয়স হবে তার? খুব বেশি হলে বাইশ তেইশ। রূপ? বাঙলা দেশের আর দশটি মেয়ে যেমন, তেমনি সাদামাঠা, তেমনি সাধারণ। নাক-মুখ-ভুরু কিংবা গলা—কোথাও কোন চমৎকারিত্ব নেই। গায়ের রংটাও চারপাশের গাছপালা আর মাটির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে উজ্জ্বল শ্যাম। নিন্দে করা যাদের স্বভাব তারা অবশ্য কালোই বলবে। বলুক। আদর করার অধিকার যাদের অনায়াসে তারা শ্যামলী বলতে পারে।

পরনে রঙীন খদ্দরের শাড়ি। ব্লাউজও খদ্দরেরই। হাতে দু-গাছা করে সোনার চুড়ি, কানে মীনে-করা সোনার মাকড়ি। গলাটা কিন্তু একেবারেই খালি। প্রায় নিরাভরণাই সে। কারুকে বিস্মিত মুগ্ধ বা চমৎকৃত করার মত রূপ বা সাজসজ্জা—কিছুই নেই তার।

সে রূপসী নয়, নিতান্তই সাধারণ। তবু তার শক্ত গড়নের মাঝারি চেহারা ঘিরে স্পর্শাতীত এমন কিছু আছে যা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়। আর অনুভব করা মাত্র তার সম্বন্ধে সমস্ত মন সতর্ক হয়ে ওঠে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, মেয়েটি যেন অনেক দূরের কোন স্তব্ধ লেগুন যার চারপাশে প্রবাল-বলয়ের দুর্লঙ্ঘ্য বেষ্টনী। মনে হল, খুব সহজে তার কাছে পেঁছিনো যায় না।

মেয়েটির সমস্ত আকর্ষণ তার চোখে। এমন দূরভেদী চোখ আর কখনও দেখেছি কি? যার দিকে সে তাকায় তার প্রাণের গভীর পর্যন্ত বুঝি দেখতে পায়। তার দৃষ্টি থেকে বিচিত্র এক ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন।

কনক আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'আপনিই তো শুভেন্দুবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলাম।

'কাল রাত্তিরে মাসিমা খবর দিয়েছিলেন, আপনি আসবেন। আপনার থাকার জন্যে এ-বাড়িতে একখানা ঘরের যেন ব্যবস্থা করে রাখি।'

মেয়েটি আশ্চর্য সাবলীল। কথায় বার্তায় কিংবা তাকানোর ভঙ্গিতে, কোথাও তার অহেতুক সঙ্কোচ নেই।

আমি কিন্তু ভয়ানক আড়ষ্ট বোধ করছি। এর আগে অনাত্মীয়া কোন

তরুণীর কাছাকাছি আসার সুযোগ হয় নি। জিজ্ঞেস করলাম, 'মাসিমা কে ?'

'ঐ যিনি আপনাকে চাকরি দিয়েছেন ; মানে মিসেস মিত্র।'

আমি আর কিছু বললাম না।

মেয়েটি অর্থাৎ কনক এবার বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন, আপনার ঘরটা দেখিয়ে দি।' গুপীর দিকে ফিরে বলল, 'ওঁর জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে এস।'

কনককে অনুসরণ করে উত্তরদিকের শেষ ঘরখানায় গিয়ে ঢুকলাম। সে বলল, 'এই আপনার ঘর।'

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। ঘরটা মাঝারি মাপের। তার একধারে তক্তাপোষ, আরেক ধারে ছোট টেবিল। টেবিলের ওপর আয়না-চিরুনি এবং সামনের দিকে খান দুই চেয়ার। পুব দিকের দেওয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের একখানা বড় ফোটো। এ ছাড়া আসবাবের বাহুল্য নেই।

কনক গুপীর উদ্দেশে বলল, 'তক্তাপোষে শুভেন্দুবাবুর বিছানা পেতে ঘরটা ভাল করে পরিষ্কার করে দাও। তারপর বাথরুম-কলটলগুলো কোথায় আছে দেখিয়ে দিও।'

'আচ্ছা।' গুপী মাথা নাড়ল।

'শুভেন্দুবাবু—' কনক এবার আমাকে বলল, 'এখন আমাকে যেতে হচ্ছে। কিছু যদি দরকার হয় গুপীদাকে বলবেন।' বলেই চলে গেল সে।

বিছানা পেতে ঘর পরিষ্কার করে গুপী আমাকে উঠোনে নিয়ে গেল। সেখানে একধারে টালির চালের বাথরুম। বাথরুমের ভেতর পায়খানা, টিউবওয়েল। জলের কলও অবশ্য আছে।

সব দেখেশুনে আবার ঘরে এলাম। গুপী বলল, 'এবারে তা হলে যাই—'

'যাবে, কোথায় ?' অন্যমনস্কের মত প্রশ্ন করলাম।

'ও-বাড়িতে। ঢের কাজ পড়ে আছে। কখন যে সে সব সারব।' বলে আর অপেক্ষা করল না গুপী। বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে দিল। উঠোনে নেমে গিয়ে হঠাৎ কি ভেবে ফিরে এল সে। বলল, 'আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছলাম।'

'কী ?' চোখ তুলে তাকালাম।

'ঘরেই থাকবেন। কুথাও আবার যাবেন না যেন। গেলে মুশকিল হবে কিন্তুন।'

'মুশকিল হবে !' বিমূঢ়ের মত শব্দ দুটো উচ্চারণ করলাম।

'হ্যাঁ, মা-জননী কুথাও বেরুতে বারণ করে দিয়েচে। ডেকে পাঠালেই আপনাকে যেন পায়।' অনুচ্চ চাপা গলায় গুপী বলতে লাগল, 'মা জননীর যা মেজাজ, ডাকামাত্তর না পেলে মাথা কাটবে। আচ্ছা, এখন আসি।'

চকিত হয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল, আমার ক্রীতদাস জীবন শুরু হয়ে গেছে। মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল।

গুপী চলে গেছে। কনক নামে সেই মেয়েটিরও আর দেখা নেই। জঙ্গলাকীর্ণ স্তব্ধ পরিবেশে এই নোনা-লাগা জীর্ণ একতলা বাড়িটায় আমাকে

নির্বাসন দিয়ে তারা অদৃশ্য হয়েছে।

আস্তে আস্তে একটা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লাম। সেই ভাবনাটা একটু একটু করে আমাকে গ্রাস করতে লাগল। মাসিক মাত্র পঁচাত্তরটি মুদ্রা—এই সামান্য অঙ্কে আমার জীবন আমার স্বাধীনতা এবং অস্তিত্ব বিকিয়ে দিয়েছি। নিজের ওপর এখন আমার আর কোন অধিকারই নেই। আমার বলতে যা কিছু সবই হস্তান্তরিত হয়ে গেছে।

বসে থাকতে থাকতে ভবিষ্যতের চেহারাটা চোখের সামনে ছবির মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। অনুভব করলাম আমার নাকে এবং কোমরে অদৃশ্য একটা দড়ি পরানো হয়ে গেছে। দড়িটার এক প্রান্ত রয়েছে মিসেস মিত্রের হাতে। খুশিমত সেটা ধরে তিনি টানবেন আর নাচের পুতুলের মত আমিও উঠব-বসব-নাচব-লাফাব। অর্থাৎ এখন থেকে আমার ওঠা-বসা চলা-ফেরা সব কিছুই মিসেস মিত্রের ইচ্ছায় এবং নির্দেশে। শর্ত-কণ্টকিত এই চাকরিটা সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে নিয়েছি। হায় রে জীবন ধারণ!

ধীরে ধীরে সময় কাটতে লাগল। যতক্ষণ না মিসেস মিত্র ডেকে পাঠান ততক্ষণ এই নির্জন বাড়িটার কারাগারে আমাকে আবদ্ধ থাকতে হবে।

পাঁচ

কতক্ষণ বসে ছিলাম, মনে নেই। হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, 'দাদাবাবু—'

চমকে মুখ তুললাম। দরজার কাছে গুপী দাঁড়িয়ে রয়েছে। কখন যে আবার সে এসেছে টের পাই নি।

চোখাচোখি হতেই গুপী বলল, 'চলেন আমার সন্‌গে—'

বললাম, 'কোথায়?'

'ও-বাড়িতে, মা-জননী ডাকচে।'

'চল চল—' ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালাম।

যেতে যেতে কি মনে পড়ল গুপীর। বলল, 'ভাল কথা, মুখ-টুখ ধুয়েছেন তো?'

সকালবেলার সমস্ত কৃত্যই সীতেশদার বাড়িতে সেরে এসেছিলাম। বললাম, 'হ্যাঁ—'

এক সময় মাঝখানের সেই পাঁচিল পেরিয়ে জাহাজের মত সুদৃশ্য বাড়িটার সামনে এসে পড়লাম। এর আগে এ-বাড়িতে ঢোকার সুযোগ হয় নি। সমস্ত শরীরে কেমন যেন স্নায়বিক উত্তেজনা অনুভব করছি।

গুপী আগে আগে চলেছে। মন্ত্রচালিতের মত তার সঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

বাড়িটার মেঝের কোন অংশই অনাবৃত নয়, দামী কাশ্মীরী কার্পেটে মোড়া। গুপীর সঙ্গে যেতে যেতে যেটুকু চোখে পড়ল তাতেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দেওয়ালগুলো ডিসটেম্পার করে রঙ ফেরানো হয়েছে। লবির

কোথাও আখরোট কাঠের চমৎকার টিপর ঘিরে কয়েকটি বেতের চেয়ার সাজানো। কোথাও একটা পিয়ানো, কাচের জলাধারে লাল-নীল মাছের খেলা, ব্রোঞ্জের একটা যীশুখ্রীস্ট, কোথাও বা মার্বেল উডের একখানা ত্রিভুজ টেবিল। দেওয়ালে প্রাচীন চিত্রকলার কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য নমুনা। সীতেশদার বাড়ির মত সব একসঙ্গে জবরজঙ করে রাখা নেই। এখানকার সমস্ত কিছুই পরিমিতি এবং সুরুচিতে শোভন।

একটু পর দোতলায় একটা ঘরের কাছে এসে দু-জনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দরজা ভেজানো ছিল। কাঁপা গলায় গুপী ডাকল, 'মা—'

ভেতর থেকে মিসেস মিত্রের স্বর ভেসে এল, 'কে?'

'আজ্ঞে আমি গুপী।'

'শুভেন্দু এসেছে?'

'আজ্ঞে—'

'ভেতরে নিয়ে এস।'

দরজা ঠেলে দু-জনে ভেতরে ঢুকলাম। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে নিজের থেকেই সেটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ঘরটা চারকোণা নয়। জ্যামিতি প্যারাবোলার মত আকৃতি। মাঝখানে ঠিক ঐ রকমেরই একটা টেবিল। অনেকগুলো গদী-আঁটা চেয়ার তাদের বেষ্টন করে আছে। একপাশে ধবধবে সাদা একটা রেফ্রিজারেটর।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার উল্টোদিকের দেওয়ালে বাদামী রঙের গোলাকার একটা ঘড়ি। ঘড়িটার গায়ে কোন অঙ্ক নেই। বারোটা ঘরে বারোটা কালো দাগ মাত্র। কাঁটা দুটো নৌকোর দাঁড়ের মত। অবিরাম সময়ের সমুদ্র মেপে চলার প্রতীক যেন। দেখলাম কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটা বেজেছে।

দেওয়ালগুলো নীলাভ। স্কাইলাইটের কাচ এবং জানালার সার্সীর রঙও তা-ই। ফলে বাইরের আলো ঘরের মধ্যে এসে নীল হয়ে গেছে। অনেক দূরে কোথায় যেন খুব আস্তে আস্তে বিদেশী অর্কেস্ট্রার রেকর্ড বাজছে। মৃদু সুরটা ঘরের নীল আলোর সঙ্গে মিশে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

দেখেই বুঝেছিলাম এটা খাবার ঘর। মিসেস মিত্র এবং একটি সুদর্শন যুবক টেবিলের কাছে বসে ছিলেন। যুবকটি আমারই সমবয়সী কি দু-চার বছরের বড়ই হবে। ভাল করে তাকে দেখার আগেই মিসেস মিত্র ডাকলেন, 'এদিকে এস শুভেন্দু।' গুপীর উদ্দেশে বললেন, 'তুমি যাও।'

গুপী চলে গেল। আর আমি মিসেস মিত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে তিনি বললেন, 'বস।'

নির্দেশমত বসে পড়লাম।

মিসেস মিত্র আবার বললেন, 'তোমাদের আলাপ করিয়ে দি। এ হল আমার ছেলে জয়ন্ত।' আমাকে দেখিয়ে সেই জয়ন্তকে বললেন, 'আর এ শুভেন্দু। এর কথা তোমাকে কালই বলেছি।'

আমার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল জয়ন্ত, 'হ্যাঁ।'

মিসেস মিত্র এবার জোরে ডাকলেন, 'বোয়—'

দরজা ঠেলে উর্দি-পরা একটা বয় উঁকি দিল। তিনি বললেন, 'নীনী উঠেছে?'

'জী নেহী—' বয়টা উত্তর দিল।

'এত বেলা হল, এখনও ওঠে নি। কাল কত রাত্রে ফিরেছিল?'

'বারোটার পর।'

'বারোটার পর!' চিন্তাগ্রস্তের মত প্রায় আধফোটা শব্দদুটি উচ্চারণ করলেন মিসেস মিত্র। তারপর ঠোঁট কামড়ালেন। আস্তে আস্তে ওপরের পাটির তিনটে দাঁত নীচের রক্তাভ ঠোঁটে গেঁথে যেতে লাগল যেন। মসৃণ কপালে অনেকগুলো গভীর রেখা ফুটে বেরুল। কিছুক্ষণ পর গলার স্বরটাকে শ্রবণযোগ্য করে বললেন, 'যাও তাকে ডেকে তোল। বলবে তার জন্যে সবাই বসে আছে।

বয়টা যাবার আগেই জয়ন্ত বলে উঠল, 'মাম্মি—আমি আর ওয়েট করতে পারছি না। দিদিভাইয়ের জন্যে বসে থাকলে দশটার মধ্যে পারেখ সাহেবকে মীট করতে পারব না।'

'তা হলে ব্রেকফাস্ট করে তুমি চলে যাও। আমরা নীনীর জন্যে অপেক্ষা করছি। বোয় সাহেবকে ব্রেকফাস্ট দাও, তারপর নীনীকে ডেকে আন।' মিসেস মিত্র বললেন।

'জী—' বলেই বয়টা অদৃশ্য হল। পরমুহূর্তেই ফিরে এল সে। জয়ন্তর সামনে অনেকগুলো কাপ এবং প্লেট সাজিয়ে দিয়ে আবার চলে গেল।

মিসেস মিত্র এবার আমার দিকে ফিরলেন, 'তারপর শুভেন্দু—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলাম, 'আজ্ঞে—'

'ও-বাড়িতে তোমার ঘর-টর দেখে নিয়েছ তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কনক দেবী আর গুপীদা সব ঠিক করে দিয়েছে।'

'দ্যাখো শুভেন্দু—' মিসেস মিত্র বলতে লাগলেন, 'আপাতত কিছুদিন তোমাকে ওখানেই থাকতে হবে। কেননা এ বাড়িতে মাত্র দশখানা ঘর। দু-খানা ঘর আমার ছেলের, দু-খানা মেয়ের, দু-খানা আমার নিজের। একটা ড্রয়িং রুম, একটা ডাইনিং রুম। বাকি অবশ্য দুটো থাকে। তার থেকে তোমাকে একটা দিতে পারতাম। কিন্তু—'

কোন প্রশ্ন না করে উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

মিসেস মিত্র বলতে লাগলেন, 'এ-মাসের মধ্যেই আমার স্বামীর আসার কথা আছে। ঘর দুটো ওঁর জন্যই রেখেছি। অবশ্য এ মাসে তিনি না-ও আসতে পারেন। আসতে আসতে পরের মাস হতে পারে কিংবা তার পরের মাস।' বলতে বলতে কেমন যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন, 'কবে যে তিনি আসবেন ঠিক নেই কিছু।'

কালই মিসেস মিত্রের সিঁথিতে সিঁদুরের ক্ষীণ রেখা দেখেছিলাম কিন্তু তাঁর স্বামীকে দেখিনি। আজ সকালে গুপী তাঁর প্রসঙ্গ তুলেই চুপ করে

গিয়েছিল। যা হোক নিজের অজ্ঞাতসারে বলে ফেললাম, 'মিস্টার মিত্র কি বাইরে গেছেন ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মানে—' মিসেস মিত্র মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর সকালে গুপী যেমন বলেছিল সেই সুরেই বললেন, 'ও-কথা থাক ; এসেছ যখন সবই আস্তে আস্তে জানতে পারবে।'

বুঝলাম আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার ইচ্ছা তাঁর নেই। কাজেই চুপ করে রইলাম। মিসেস মিত্রের স্বামী অর্থাৎ মিস্টার মিত্র আমার কাছে দুর্জ্ঞেয়ই থেকে গেলেন।

এদিকে জয়ন্তর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে উঠে পড়ল। বাইরে যেতে যেতে বলল, 'চললাম মাম্মি—চলি শুভেন্দুবাবু—' সে চলে গেল।

জয়ন্ত চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উর্দিপরা সেই বয়টা ফিরে এল।

মিসেস মিত্র বললেন, 'নীনী উঠেছে ?'

'জী হাঁ। বাথরুমে গেছেন, এখুনি আসবেন।'

কি একটু চিন্তা করে মিসেস মিত্র আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল রাত্রে নীনী তো বারোটার পর ফিরেছিল ?'

'জী হাঁ।'

'একাই ফিরেছিল ?'

'জী না। মুখার্জি সাব পেঁীছে দিয়ে গিয়েছিল। আমি ছোটা মেমসাবকে ঘরে দিয়ে এসেছিলাম।'

'মুখার্জি সাব !' পেন্সিল-আঁকা ভ্রূ দুটো কুঁচকে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন মিসেস মিত্র। শেষ পর্যন্ত বলা আর হয়ে উঠল না।

তার আগেই সে এল। অনুমানে বুঝলাম নীনী। ডাইনিং রুমে ঢুকেই আমার সমস্ত মনোযোগ সে মুহূর্তে আকর্ষণ করে নিল। তার দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে ভুলে গেলাম। এমনভাবে নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকা যে রুচি এবং ভদ্রতা-বিরুদ্ধ সে কথা আমার মনে রইল না।

এক ধরনের রূপ আছে চেতনাকে যা আচ্ছন্ন করে দেয়, অস্তিত্বের গহন কেন্দ্রে যা ঢেউ তোলে এবং মানুষের দেহে যতগুলি সুপ্ত উত্তেজনা আছে সবগুলিকেই বুঝি উস্কে দেয়। নীনীর রূপও তা-ই। এই মেয়েটির শরীরের সব কিছুই চড়া সুরে বাঁধা। মুখ-চুল-কান-ভ্রূ-হাত-হাতের আঙুল—যেদিকেই তাকানো যাক সমস্ত কামশাস্ত্রটাই তার মধ্যে সোচ্চার হয়ে আছে।

কনকের মত নীনীর চোখ দুটিও বিচিত্র। তবে তফাৎ আছে। কনকের চোখ বড় বেশি তীব্র আর ব্যক্তিত্বময়। আর নীনীর ? এমন মোহময় চোখ আগে আর কখনও দেখেছি কি ! যার দিকে নীনী তাকাবে তার বুকের অতল পর্যন্তই বুঝি বিদ্ধ করে দেবে আর অসহায় শিকারটা অবিরত শুধু ছটফট করতে থাকবে।

এই মুহূর্তে নীনীর সর্বাঙ্গ ধরে রয়েছে অদ্ভুত এক শিথিলতা। চোখদুটি আরক্ত এবং প্রচুর অবসাদে ঢুলুঢুলু। মনে হয়, ঘুমের রেশ এখনও কাটে নি।

এলোমেলো পায়ে সামনে এগিয়ে এল নীনী। একটা চেয়ারে নিজেকে সঁপে দিতে দিতে হাই তুলল। তারপর মিসেস মিত্রের দিকে ফিরে বিরক্ত সুরে বলল, 'সারারাত ঘুমুতে পারি নি। সকালের দিকে সবেমাত্র ঘুমটা এসেছিল, বয়টাকে পাঠিয়ে দিয়ে সেটা ভাঙালে।'

মিসেস মিত্র এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করলেন না। একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেলেন। ঈষৎ কঠিন সুরে বললেন, 'কাল রাত্রে কখন ফিরেছিস?'

'সময় দেখে রাখার অবস্থা কি তখন ছিল? তবে বারোটা সাড়ে বারোটা তো নিশ্চয়ই হবে।'

'খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।'

'বাড়াবাড়ি!' বলেই সমস্ত ডাইনিং রুমটাকে চমকে দিয়ে সশব্দে হেসে উঠল নীনী। যেন এমন মজার কথা আগে আর কখনও শোনে নি। হাসির উচ্ছ্বাসে তার সুগঠিত সুঠাম শরীর বেঁকে চুরে ডেলা পাকিয়ে যেতে লাগল।

এখনও আমি চোখ ফেরাই নি। একদৃষ্টে তাকিয়েই আছি। নীনীর এই হাসিটা আমার কাছে কেমন যেন অস্বাভাবিক আর অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

মিসেস মিত্র কড়া সুরে বললেন, 'নীনী, কি হচ্ছে! অসভ্যের মত হাসবে না।'

হাসি তাতে বন্ধ হল না। বরং আরো প্রবল হয়ে উঠল। হাসতে হাসতে রুদ্ধ জড়িত স্বরে সে বলতে লাগল, 'এমন একটা হাসির কথা বললে তাতে হাসব না! না হাসলে কথাটার মর্যাদা থাকে!'

'নীনী!' মিসেস মিত্র ধমকে উঠলেন।

তাঁর গলায় এমন একটা কঠোরতা ছিল যাতে নীনীর হাসি থেমে গেল। ঐ থামা পর্যন্তই। আস্তে আস্তে শিরদাঁড়া সোজা করে বসল নীনী। স্থির দৃষ্টিতে মিসেস মিত্রের দিকে তাকাল। চোখদুটো ঝলকাতে লাগল যেন। অনেকক্ষণ পর ভ্রূ কুঁচকে বলে উঠল, 'এখন খুব বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে, না! কিন্তু নিজে হাতে ধরে যখন আমাকে ক্লাবে, ককটেল পার্টিতে, চৌরঙ্গীর হোটেলগুলোতে নিয়ে যেতে তখন বুঝি ভাবতে পার নি এমন অবস্থা দাঁড়াবে। তা ছাড়া কালই তো প্রথম নয়, বাড়ি ফিরতে রোজই আমার বারোটা একটা হয়ে যায়, সে তো তুমি জানই।'

একটু যেন বিব্রতই হলেন মিসেস মিত্র। আমার দিকে চকিত একটা দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন, 'মানে তোমার বাবার ফিরে আসার সময় হয়েছে তো। এখন থেকে সাবধানে না চললে—'

'তা হলে বাবার ভয়ে? চমৎকার।' বিচিত্র সুরে কথা ক'টি উচ্চারণ করল নীনী। বিদ্রূপে ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল তার।

মিসেস মিত্র উত্তর দিলেন না। নতচোখে চুপচাপ বসে রইলেন।

নীনী আবার বলল, 'বাবাকে যদি এতই ভয় তবে তাঁর কথামত চল নি কেন? তখন বুঝি হুঁশ ছিল না? ভেবেছিলে চিরজীবনই বাবা জেলে জেলে পচে মরবে, তাই না?'

মিসেস মিত্র এবারও নিশ্চুপ।

এদিকে আমি চকিত হয়ে উঠেছি। সমস্ত স্নায়ুর মধ্য দিয়ে দ্রুতবহ একটা চমক খেলে গেল। মিস্টার মিত্র তা হলে জেলে! গুপী আর মিসেস মিত্র তাঁর সম্বন্ধে বলতে বলতে রহস্যময়ভাবে থেমে গিয়েছিলেন। শুধু বলেছিলেন, এসেছি যখন ধীরে ধীরে সবই জানতে পারব।

মিস্টার মিত্র জেলে! কেন? বার বার নিজেকে প্রশ্নটা করলাম কিন্তু সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা মিলল না। ভদ্রলোক আমার কাছে দুর্বোধ্যই থেকে গেলেন। তাঁর অপার রহস্যের প্রায় কিছুই আবিষ্কার করতে পারলাম না।

মিস্টার মিত্র প্রসঙ্গে আমার ভাবনা বেশি দূর এগুলো না। তার আগেই উত্তেজিত তীক্ষ্ণ স্বরে নীনী বলে উঠল, 'কি, চুপ করে রইলে যে! বল—বল—'

মিসেস মিত্র মুখ তুললেন না।

রুষ্ট চোখে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে ঘরের অন্য প্রান্তে মুখ ফেরাল নীনী!

অপ্রীতিকর এক স্তব্ধতার মধ্যে অনেকটা সময় কেটে গেল।

উর্দি-পরা সেই বয়টা একপাশে নিষ্প্রাণ পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল। মিসেস মিত্র একসময় তার উদ্দেশে বললেন, 'ছোটা হাজরি লাগাও।'

চুপচাপ ব্রেকফাস্ট পর্ব শেষ হল। শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীনী চলে গেছে। ডাইনিং রুমে এখন শুধু মিসেস মিত্র আর আমি।

মিসেস মিত্র বললেন, 'চল আমার সঙ্গে—' বলেই উঠে পড়লেন।

নির্দেশমত আমিও উঠলাম এবং তাঁর পিছু পিছু বাইরের বিস্তৃত লবীতে এসে পড়লাম। সেখানে চমৎকার ভাবে ক'টি সোফা সাজানো রয়েছে। দু-জনে মুখোমুখি বসলাম।

মিসেস মিত্র বললেন, 'তোমাকে ক'টা কথা বলব।'

'বলুন—' আমি উন্মুখ হলাম।

'কিছু মনে করো না, তোমার জামা-কাপড় পোশাক-টোশাক কী-কী আছে?'

'তিনখানা ধুতি আর তিনটে ফুলশার্ট—'

'জুতো?'

'একজোড়া কাবলী চটি।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন মিসেস মিত্র। বললেন, 'নাঃ, ওতে চলবে না। আজ দুপুরে লাঞ্চের পর আমার সঙ্গে বেরুবে। কয়েক জোড়া সুট আর শু-র অর্ডার দিয়ে আসবে।'

বিমূঢ়ের মত বললাম, 'আমার জন্যে!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমারই জন্যে। আমার সঙ্গে সোসাইটির নানা জায়গায় তোমাকে যেতে হবে। নানা লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। সে-সব জায়গায় যেতে হলে সেই রকম পোশাকও তো দরকার।' মিসেস মিত্র সস্নেহে হাসলেন।

আমি কিছু বললাম না।

কি ভেবে মিসেস মিত্র আবার বললেন, 'আরেকটা কথা—'

'কী ?'

'আপাততঃ তুমি ও-বাড়িতে থাকছ। রোজ সকালে আটটার সময় আমাদের ব্রেকফাস্ট, দুপুর একটায় লাঞ্চ, পাঁচটায় টী, ন'টায় ডিনার। ঠিক ঐ সব সময় চলে আসবে। আচ্ছা, তুমি এখন এস।'

উঠতে উঠতে বললাম, 'কিন্তু—'

'কী ?'

'আমার কী কাজ, মানে কী করতে হবে—'

মিসেস মিত্র আমার মনোভাবটা বুঝলেন। বললেন, 'সে-সম্বন্ধে তোমাকে ভাবতে হবে না। শুধু সব সময় ও-বাড়িতে থাকবে, কোথাও যাবে না—আপাতত এ-ই তোমার কাজ।'

ছয়

পাঁচিল পার হয়ে সেই জরাগ্রস্ত একতলা বাড়িটায় আবার ফিরে এলাম। এসেই কনকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বারান্দার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সে। সামনের ছায়াচ্ছন্ন পুকুরটার দিকে তার মুখখানা ফেরানো।

সেই যে আমাকে ঘর দেখিয়ে সে চলে গিয়েছিল তারপর এই আবার তাকে দেখলাম।

কাছাকাছি আসতেই পায়ের শব্দে আমার দিকে তাকাল কনক। প্রথম পরিচয়ের সময়ই বুঝেছিলাম মেয়েটি সাবলীলা। কোথাও তার এতটুকু সঙ্কোচ নেই। সে বলল, 'কোথায় গিয়েছিলেন ?'

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে কোনরকমে আড়ষ্টের মত বলতে পারলাম, 'ও-বাড়িতে।'

'মাসিমা ডেকে পাঠিয়েছিলেন বুঝি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বলতে বলতেই হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। নিজের কুণ্ঠিত স্বভাবের কথা ভুলে গিয়ে অজান্তেই বলে ফেললাম, 'এতক্ষণ ও-বাড়িতে ছিলাম। কই, আপনাকে দেখলাম না তো ?'

'দেখবেন কি করে! আমি তো ওখানে থাকি না।'

কৌতূহলটা যদিও অশোভন তবু না বলে পারলাম না, 'কোথায় থাকেন ?'

আমার সমস্ত চেতনাকে প্রায় আলোড়িত করে কনক উত্তর দিল, 'এই বাড়িতে।'

এই জঙ্গলে-ভরা নির্জন বাড়িতে একটি প্রায় অপরিচিতা অনাত্মীয়া যুবতী মেয়ের সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে, ভাবতেই সঙ্কুচিত বোধ করলাম। কোনরকমে বললাম, 'এই বাড়িতে!'

আমার মনের কথাটা যেন পড়তে পারল কনক। মৃদু হেসে বলল, 'আমি

একাই থাকি না। আমার বাবাও থাকেন।'

খানিকটা যেন আশ্বস্ত হলাম। পরক্ষণেই বিদ্যুৎ চমকের মত একটি ভাবনা আমার স্নায়ুতে ধাক্কা দিতে লাগল যেন। বললাম, 'কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'বেশ তো, করুন—'

'মিসেস মিত্র আপনার মাসিমা তো ? সকালবেলা তাই বললেন না ?'

'হ্যাঁ।'

'কি-রকম মাসিমা ?'

'আপন। আমার মায়ের আপন ছোট বোন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'এই বাড়িটা বুঝি আপনাদের আর ওটা আপনার মাসিমার ?'

'না-না, দুটোই মাসিমাদের।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল কনক।

'তা হলে—' কথাটা শেষ না করে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম।

মৃদু হাসল কনক। বলল, 'আপনি কি বলতে চান, বুঝেছি। মাসিমা এত বড়লোক অথচ তার বোন-ঝি এমন ঘুঁটেকুড়ুনির মত এই পোড়ো ভাঙা বাড়িতে পড়ে আছে কেন, এই তো আপনার বক্তব্য ?'

বিব্রতভাবে বললাম, 'হ্যাঁ, মানে—'

'দেখুন—' কনক বলতে লাগল, 'মাসিমা আমাকে বার বার ওবাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছেন কিন্তু যাই নি। যাই নি বলে রাগারাগি করেছেন, অভিমান করেছেন, দুঃখ পেয়েছেন। তবু যেতে পারি নি।'

সীতেশদা সেই যে বলেছিল, দেখবি শুনবি কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবি না—সেই নিষেধের কথাটা বার বার ভুলে যাচ্ছি। ঘোরের মধ্য থেকে যেন বলে উঠলাম, 'কেন ?'

খুব আস্তে আস্তে স্পষ্ট উচ্চারণে কনক বলল, 'জীবন সম্পর্কে আমার যা ধ্যানধারণা তার সঙ্গে ও বাড়িতে গিয়ে থাকা যায় না।'

মেয়েটির শেষ কথাগুলো কেমন যেন হেঁয়ালির মত মনে হল। দু-চোখে সীমাহীন বিমূঢ়তা নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কনক বলল, 'বুঝতে পারছেন না, তাই না ?'

এবার আমার গলায় স্বর ফুটল, 'মানে—'

অন্যমনস্কর মত কনক বলতে লাগল, 'না বোঝারই কথা। আমার মেসোমশায়কে তো আপনি দেখেন নি। দেখলে বুঝতেন এ-বাড়ি ছেড়ে ও-বাড়ি যাওয়া যায় না।'

'আপনার মেসোমশায়! মানে মিসেস মিত্রের স্বামী ?'

'হ্যাঁ।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কনক, 'নাম বললে এখনই চিনতে পারবেন।'

'কী নাম ?' আমি উদগ্রীব হলাম।

'হেমন্তকুমার মিত্র।' প্রাণের সবটুকু শ্রদ্ধা সম্ভ্রম এবং আকুলতা মিশিয়েই

বুঝি নামটা উচ্চারণ করল কনক।

স্মৃতি তোলপাড় করে অনেক খুঁজলাম। কিন্তু না, ঐ নামটা কোনক্রমেই চেনা মনে হল না। ফলে চোখ নামিয়ে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল কনক। আমাকে নীরব দেখে রীতিমত অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কি, ঐ নামটা জানেন না?'

থতমত খেয়ে বললাম, 'আজ্ঞে—'

এবার যেন রেগেই উঠল কনক। আজই যে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এবং দ্বিতীয়বার দেখা—সে কথা তার খেয়াল রইল না। রূঢ় স্বরে বলল, 'ঐ নামটা শোনেন নি, কেমন?'

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না।

কনক থামেনি, 'তা শুনবেন কেন? এতকাল ছিলেন কোথায়?'

কনকের শ্রদ্ধাভাজন মেসোমশায়কে না জানা যে একটা মারাত্মক অপরাধ—এ ছিল আমার পক্ষে অকল্পনীয়। ভয়ে ভয়ে বলে ফেললাম, 'শ্রীরামপুরে থাকতাম।'

'খবর কাগজ পড়ার অভ্যাস-টভ্যাস বুঝি কোনকালেই ছিল না?'

আশ্চর্য দূরগামী চোখ মেয়েটার। বুকের গভীর পর্যন্তই না, জীবনের শেষ দিগন্ত অবধিই বুঝি সে দেখতে পায়। সত্যিই তো, পৃথিবীর কোন খবরের প্রতিই আমার আকর্ষণ ছিল না। মানুষ হিসেবে চিরদিনই আমি আত্মকেন্দ্রিক। বাবা বেঁচে থাকতে পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে সুরক্ষিত একটা দুর্গের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলাম। সারা পৃথিবী তোলপাড় করে এত বড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে, তার খবরই বা কতটুকু রাখতাম! হেমন্তকুমার মিত্র নামে একটি মানুষ যে আমার কাছে অজানা থেকে যাবেন এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কনক আবার বলল, 'খবর কাগজ না পড়লে মেসোমশায়কে জানবেন কেমন করে?' বলতে বলতে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল, 'কার কাছে কার কথা বলছি! আপনিও তো ঐ দলেরই লোক—'

বিহ্বলের মত বললাম, 'কোন দলের?'

'কোন দলের আবার, মাসিমার দলের। নইলে ওঁর কাছে চাকরি নিতেন!' বিদ্রূপে ঠোঁটদুটি বেঁকে গেল কনকের। কথা ক'টি বলেই এবং আমাকে কিছু সুযোগ না দিয়েই সে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরখানায় মুহূর্তে অদৃশ্য হল।

আর বিহ্বলের মত আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কনকের বিদ্রূপটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সমস্ত চেতনায় তীব্র আঘাতের মত সেটা এসে পড়েছে। মিসেস মিত্রের কাছে চাকরি নিয়েছি তার মধ্যে দোষের কি থাকতে পারে! কি যে থাকতে পারে, আমি জানি না। তবে কিছু যে একটা আছে অস্পষ্টভাবে তার আভাস যেন পাচ্ছি।

তা ছাড়া আজ সকালে এ বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সবার মুখেই যাঁর

নাম শুনেছি অথচ যাঁকে দেখি নি সেই মিস্টার মিত্র সম্বন্ধে আমার সমস্ত অস্তিত্বই বুঝি উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

অদৃশ্য থেকে মিস্টার মিত্র অর্থাৎ হেমন্তবাবু আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে শুরু করেছেন।

সাত

মিসেস মিত্রের কাছে কাজ নেবার পর সপ্তাহখানেক পার হয়ে গেছে। রোজ সকালে-দুপুরে-বিকেলে এবং রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে ডাইনিং রুমে হাজিরা দেওয়া ছাড়া আমার আপাতত আর কিছু করণীয় নেই। অবশ্য প্রথম দিন মিসেস মিত্রের সঙ্গে গিয়ে চৌরঙ্গীর অভিজাত দোকানে স্যুট এবং জুতোর অর্ডার দিয়ে এসেছিলাম।

সমস্ত দিনই ধ্বংসপ্রায় বাড়িটায় নিজের ঘরখানিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকি। বসে থাকি এই প্রত্যাশায় যে এইবার বুঝি মিসেস মিত্র ডেকে পাঠাবেন। কিন্তু না, পাঁচিলের ওপার থেকে ডাক আসে না।

সাতদিন একা একা এই ঘরটায় কাটিয়ে দিয়েছি। আর প্রতি মুহূর্তে ছটফট করেছি। প্রথমত এমন চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে একটি ঘরে আটকে থাকা যে কি দুঃসহ তা বুঝি ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বিতীয়ত প্রতীক্ষা করার মত কষ্টদায়ক ব্যাপার আর কিছু নেই।

অথচ এই শর্তেই আমার চাকরি। মিসেস মিত্রের নির্দেশ ছাড়া এই বাড়িটা ছেড়ে কোথাও বেরুবার উপায় নেই।

সাতটা দিন আমি প্রায় কারো সঙ্গেই কথা বলার সুযোগ পাই নি। রোজ ও-বাড়িতে চারবার গেছি। মিসেস মিত্র, জয়ন্ত আর নীনীর সঙ্গে দেখাও হয়েছে কিন্তু কথা হয় নি। নিঃশব্দে খাওয়া সেরে ফিরে এসেছি। অবশ্য এই সাতদিন আমাকে কিছু একটা কাজ দেবার জন্য বারকয়েক মিসেস মিত্রকে বলেছি। কিন্তু এক কথা তিনি প্রতিবারই উচ্চারণ করেছেন, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। চাকরিটা তো আমিই তোমাকে দিয়েছি। কাজ করিয়ে নেওয়াটা আমারই ব্যাপার। তুমি শুধু ও-বাড়িতে থাকবে। আমার দরকার মত ডেকে পাঠাব।'

বিনীত সুরে তাঁকে বোঝাতে চেয়েছি, এভাবে বসে থাকতে আমার ভাল লাগছে না।

স্পষ্ট কঠিন গলায় তিনি বলেছেন, 'এই শর্তেই কিন্তু তুমি চাকরিটা নিয়েছিলে।'

এরপর স্বাভাবিক নিয়মেই আর কিছু বলতে সাহস পাই নি।

একেক সময় আমার সংশয় হয়েছে সত্যিই কি কাজ করিয়ে নেবার জন্য এই চাকরিটা দিয়েছিলেন মিসেস মিত্র, না অন্য কোন গভীরতর উদ্দেশ্য তাঁর আছে? বার বার নিজেকে এই প্রশ্নটা করেছি। ঐ প্রশ্ন পর্যন্তই। সঙ্গত

কোন অর্থ খুঁজে পাই নি।

যাই হোক, এই জরাগ্রস্ত একতলা বাড়িটা একেবারে নির্জন নয়। কনক এবং তার বাবা এখানে থাকেন।

এই সাতদিনে বার কয়েক কনকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। যতবার চোখাচোখি হয়েছে ততবারই মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে সে। হেমন্তকুমার মিত্রকে চিনতে পারিনি—সেই অপরাধ এখনও ক্ষমা করে উঠতে পারে নি বুঝি।

কনক আমার সঙ্গে কথা না বললেও লক্ষ্য করেছি ন'টা নাগাদ কোথায় যেন রোজ বেরিয়ে যায়। ফেরে বিকেলে। কিন্তু তার বাবাকে এই একটা সপ্তাহের মধ্যে একবারও দেখতে পাই নি। এই পুরনো ভগ্নস্তূপের কোন অদৃশ্য বিবরে ভদ্রলোক আত্মগোপন করে আছেন, কে বলবে।

তাঁকে দেখিনি কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব টের পাই। দিনের বেলা অবশ্য নয়। অনেক রাত্রে এই বাড়িটা যখন আরো নিস্তব্ধ হয়ে যায়, নিশাচর পাখিদেরও যখন আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না, ঝিঁঝিরাও গলা সেধে সেধে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ঠিক সেই সময় জড়িত সুরে ভদ্রলোক গান ধরেন, 'বোল পাপিয়া বোল—'। কোনদিন বা গান, 'নজরা না মারকে যায়ো ও প্যারী—' সেই সঙ্গে তাল দিয়ে তুড়ির শব্দ। সুর শুনে যে কথাটা মনে আসে একমাত্র নিজের কানেই তা ফিসফিস করা যায়। অন্য কাউকে বলা যায় না। ভদ্রলোক বুঝিবা নিয়মিত নেশা করেন।

সাতটা দিন পার হয়ে গেছে। অষ্টম দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গেলাম। মুখটা ধুয়ে ঘরে এসে ঘড়ি দেখলাম। এখন সাতটা বাজে। অর্থাৎ ব্রেকফাস্টের জন্য এখনও একটি ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

এই এক ঘণ্টা কি করা যায় ?

প্রথমত, ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়ানো। দ্বিতীয়ত, খানকয়েক সস্তা ইংরেজি থ্রিলার আমার কাছে রয়েছে। সময় কাটাবার অব্যর্থ মুষ্টিযোগ হিসাবে ওগুলো ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু থ্রিলারে মনোনিবেশ কিংবা পায়চারি করা—কোনটাই এই মুহূর্তে ভাল লাগছে না।

কি যে করব যখন কিছুই স্থির করতে পারছি না ঠিক সেই সময় দরজায় একটা মুখ উঁকি দিল।

ভদ্রলোকের বয়স ষাটের ওপরে। গালদুটি নিখুঁত কামানো। উনিশ শতকের শৌখিন ইংরেজদের মত মোটা বড় জুলপি। এক জোড়া সূক্ষ্ম গোঁফ তাঁর বাবুয়ানার প্রতীক যেন। চুল ব্যাকব্রাশ করা। মুখে-গলায় পাউডারের অস্পষ্ট প্রলেপ। পরনে পাটভাঙা পায়জামা এবং পাঞ্জাবী। পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। ভদ্রলোক নিখুঁত বাবু, এই সকালবেলাতেই পরিপাটি সেজে এসেছেন।

তাঁর বাবুয়ানা সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সংশয় নেই। কিন্তু চেহারাটা কেমন যেন ভাঙাচোরা। গাল বসা। চোখের কোলে গাঢ় কালো রেখা।

অনুমান করা যায়, ভেতরটা একেবারে ফাঁপা। জীবনযুদ্ধে অর্থাৎ প্রাণধারণের জন্য যে সংগ্রাম—তাতে মানুষের শরীর ভাঙে। কিন্তু এ ভাঙনের কারণ অন্য। কি একটা উপন্যাসে অনেক দিন আগে একজন মাতাল লম্পটের বর্ণনা পড়েছিলাম। ভদ্রলোককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেই বর্ণনার প্রতিটি অক্ষর আবার মনে পড়ে গেল। শরীরময় এত যে ক্ষয় তবু মনে হয় একদিন তিনি বেশ সুপুরুষই ছিলেন।

চোখাচোখি হতেই ঈষৎ হাসলেন ভদ্রলোক। বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি করে বলে উঠলেন, 'তুমিই বুঝি সে-ই ?'

ভদ্রলোক কী বলতে চান বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কী ?'

এবার এক কাণ্ডই করলেন তিনি। দুই হাতে নাচের মুদ্রা ফুটিয়ে চাপা সুরেলা গলায় গেয়ে উঠলেন ঃ

'তুমি মনোহর রসের আগর
নাগর বকুল মূলে।
মোহনিয়া ছাঁদে চাঁদ পড়ে কাঁদে
রতি রতিপতি ভুলে।'

বাংলায় আমার অনার্স ছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আমি পড়েছি। এই পদটি কাজে কাজেই আমার অজানা নয়। ঠিক এই পদটি নয়। ভারত-চন্দ্রের রচনাকে কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক করে ভদ্রলোক গেয়েছেন। যাই হোক, কানের লতি পর্যন্ত আমার গরম হয়ে উঠল।

পরমুহূর্তেই সেই গলাটা মনে পড়ে গেল, অনেক রাত্রে মত্ত জড়িত সুরে যে গেয়ে ওঠে। অবিকল এ তো সেই গলা, সেই স্বর। তবে কি ভদ্রলোক কনকের বাবা! বিব্রতভাবে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলাম, গলায় স্বর ফুটল না।

ভদ্রলোক বললেন, 'ভেতরে আসতে পারি ?'

এবার ব্যস্তভাবে বলে উঠলাম, 'আসুন, আসুন—'

ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে নিজেকে স্থাপিত করলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, 'ক'দিন ধরেই ভাবছি তোমার সঙ্গে আলাপ করব। কিন্তু—'

'কী ?'

'ঐ কনক, মানে আমার মেয়েটা তোমার এখানে আসতে দেয় না।'

যা অনুমান করেছিলাম, ভদ্রলোক কনকের বাবাই। সবিস্ময়ে বললাম, 'কনকদেবী আমার এখানে আপনাকে আসতে দেন না কেন ?'

'সে-ই জানে।' বিরক্ত সুরে ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'আজ সকালে কোথায় যেন বেরিয়েছে ; মওকা বুঝে তোমার এখানে চলে এসেছি।'

তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্ত্রীজাতি সুলভ কৌতূহল নিয়ে আমার নাম-ধাম-জেলা-মোজা এবং পারিবারিক সব খবর সংগ্রহ করলেন। এক ফাঁকে নিজের নামটিও বললেন। নাম তাঁর সুরপতি বসু।

সুরপতিবাবু নামটাই শুধু বলেছেন। তা ছাড়া নিজের সম্বন্ধে অন্য

কোন তথ্য সরবরাহ করেন নি।

আমার সব খবর নিয়ে তিনি আবার বললেন, 'সুষুর কাছে কাজকর্ম কেমন লাগছে ?'

'সুষু ! সুষু কে ?' একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম।

'কে আবার, আমার শালী। ঐ সুষমা, মানে তোমার মালকিন।'

বুঝলাম মিসেস মিত্রের নাম সুষমা। বললাম, 'কাজকর্ম কোথায় ? চারবার গিয়ে ও বাড়িতে খেয়ে আসা আর মুখ বুজে এ-বাড়িতে পড়ে থাকা—এ ছাড়া সারাদিন আর কিছু করবার নেই।'

আমার বলার ভঙ্গিতে ক্ষোভ মেশানো ছিল। সেটা যেন লক্ষ্যই করলেন না সুরপতি। অন্যমনস্কের মত বলতে লাগলেন, 'জান ব্রাদার, তুমি যে কাজ নিয়ে এসেছ, মানে সুষুর পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টাণ্টের কাজ, সেটা একসময় আমিই করতাম। শুধু পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টাণ্টই না, আমি ছিলাম ওর ফ্রেণ্ড, ফিলজফার আর গাইড। আমার জন্যেই ওরা আজ এত বড়লোক হতে পেরেছে। নইলে কি অবস্থায় যে ওরা ছিল ! কিন্তু—'

'কী ?' উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলেন সুরপতিবাবু, 'ও সব কথা এখন থাক। কনকের ফেরার সময় হয়েছে। ফিরে তোমার ঘরে আমাকে দেখলে আর রক্ষে রাখবে না। আচ্ছা ভাই, আজ চললাম। সুযোগ-সুবিধেমত আবার আসব কিন্তু—'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবেন।'

সুরপতিবাবু চলে গেলেন। আমার মনে চমকের একটি রেশ থেকে গেল।

সুরপতি সেই যে এসেছিলেন, তারপর দিনকতক আর দেখা নেই। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মাঝে মাঝে আসবেন। আশান্বিত হয়েছিলাম, একজন সঙ্গী পেয়ে বেঁচে যাব। হায় রে দুরাশা !

প্রায় সমস্ত দিনই আমি নিঃসঙ্গ। মুখ বুজে বসে থাকতে থাকতে একেক সময় সন্দেহ হয়, কথা বলতেই বুঝি ভুলে যাব।

সপ্তাহ দুয়েক পর সুরপতিবাবু আবার এলেন। চেয়ারের ওপর জাঁকিয়ে বসে বললেন, 'ক'দিন তোমার খোঁজখবর নিতে পারি নি। ভারি ব্যস্ত ছিলাম। তা কেমন আছ, বল।'

'ভাল।' সংক্ষেপে উত্তর দিলাম।

'তারপর সুষু কিছু কাজকর্ম দিলে, না দিনরাত কড়িকাঠ গণনাই করছ ?'

'কড়িকাঠই গুনছি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কি যেন ভেবে গলার স্বরটাকে অতল খাদে নামিয়ে সুরপতিবাবু একসময় ফিস ফিস করলেন, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল ভায়া।'

ভদ্রলোকের মুখচোখের ভাবে এবং গলার স্বরে কিসের একটা আভাস যেন

পেলাম। বললাম, 'কী কথা ?'

'অভয় দিলে বলি—' সুরপতির গলায় কেমন যেন অনুনয়ের সুরই ফুটল।

একজন বর্ষীয়ান শৌখিন বাবু মানুষকে এমন সুরে কথা বলতে দেখলে রীতিমত সন্দিগ্ধ হবারই কথা। একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে বললাম, 'অত কিন্তু করছেন কেন ? বলুন না।'

এবার চেয়ারটাকে কাছে টেনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন সুরপতিবাবু। তারপর অনেকখানি ঝুঁকে মুখটাকে আমার কানে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'গোটা পাঁচেক টাকা দিতে পার ভায়া ?'

কোন জটিলতা নেই, তবু কথা ক'টি বুঝে উঠতে আমার সময় লাগল। কোন রকমে বললাম, 'পাঁচটা টাকা !'

'হ্যাঁ !' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝলেন সুরপতি। বললেন, 'ধার নিচ্ছি। ভয় নেই, ঠিক শোধ করে দেব।'

এ-বাড়িতে চাকরি নিয়ে আসার সময় হাত খরচের জন্য চল্লিশটা টাকা দিয়েছিল সীতেশদা। আমি নিতে চাই নি। একরকম জোর করেই সীতেশদা পকেটে গুঁজে দিয়েছিল। বলেছিল, 'তোর কাছে কি আছে না আছে সবই তো জানি। তা ছাড়া ওখানে গিয়েই তো আর মাইনে পাবি না। টাকাটা রাখ, কখন কি দরকার হয়।'

সীতেশদার কথায় এবং বলার ভঙ্গিতে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যা প্রাণের গভীরে স্পর্শ করেছে। আমি আর আপত্তি করি নি।

সেই চল্লিশ টাকার পুরো অঙ্কটাই অটুট আছে। একটা পয়সাও খরচ হয় নি। এ-বাড়িতে বসে খরচ করার সুযোগই পাই নি।

নিঃশব্দে উঠে পড়লাম। টিনের স্যুটকেশটা তক্তাপোষের তলায় ছিল। সেটা খুলে পাঁচটা টাকা বার করে সুরপতিবাবুকে দিলাম।

টাকাটা হাতে পেয়ে ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বাঁচালে ব্রাদার। এই পাঁচটা টাকা দিয়ে আমারই উপকার করলে না, চল্লিশ বছরের একটা বনেদী অভ্যেসকে রক্ষা করলে।'

বিমূঢ়ের মত বললাম, 'চল্লিশ বছরের বনেদী অভ্যেস ! মানে ?'

বিচিত্র হেসে সুরপতি বললেন, 'অভ্যেসটার কথা বলতে গেলে আমাদের গোটা পারিবারিক ইতিহাসটাই তা হলে বলতে হয়। শুনবে ?'

বিমূঢ়তা সত্ত্বেও কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝি বলে ফেললাম, 'শুনব।'

শুরু করতে গিয়েও থমকে গেলেন সুরপতি। কি ভেবে বললেন, 'ধীরে সজনী, ধীরে। সে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। এখন বলা যাবে না। পরে একদিন সময় করে বলব। আজ চলি ভাই।' বলতে বলতে তিনি উঠে পড়লেন এবং দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

দরজার বাইরে অবশ্য যাওয়া হল না। তার আগেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন

সুরপতি। কাছে এগিয়ে এসে আমার মুখে দৃষ্টি রেখে বললেন, 'একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কী!'

গলাটা প্রায় অতলে নামিয়ে দিয়ে সুরপতি এবার ফিস ফিস করলেন, 'তোমার কাছ থেকে এই যে পাঁচটা টাকা নিলাম, এটা যেন কনক জানতে না পারে, কেমন?'

মন্ত্রাচ্ছন্নের মত বললাম, 'আচ্ছা—'

'কনক যদি জানতে পারে তুমি আমায় টাকা দিয়েছ, তা হলে—'

'কী?'

'তা হলে আমাকে আস্ত তো রাখবেই না, তোমারও রক্ষে নেই।' কথা ক'টি বলেই আর অপেক্ষা করলেন না সুরপতি। আমাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে বিচিত্র ইঙ্গিতময় একটু হেসে চলে গেলেন।

আর বিদ্যুৎ-চমকের মত কথাটা মনে পড়ে গেল। সুরপতিবাবু ধার নেন বলেই কি কনক তাঁকে আমার কাছে আসতে দিতে চায় না?

আট

দ্বিতীয় ঋতুর শেষ দিনটিতে আমি এ-শহরে এসেছিলাম। দেখতে দেখতে আশ্বিন এসে গেল। সোনালী রোদে আর ভারহীন সাদা মেঘে শরতের মায়াবী আলো ছলকাতে লাগল যেন।

কিন্তু আমার কি-বা আশ্বিন, কি-বা ফাল্গুন!

বাবা বেঁচে থাকতে, এ-সময়টা শ্রীরামপুর থেকে মাজনা চলে যেতাম। পুজোর ছুটির দিনগুলো কাকা-কাকিমা আর খুড়তুতো ভাই-বোনদের মধ্যে কি ভাবে যে কেটে যেত, খেয়াল থাকত না।

আর এখন?

এখন মিসেস মিত্রদের এই পুরনো বাড়িতে সঙ্গীহীন উৎসবহীন দিন যাপন। এখান থেকে শরৎকালটাকে যতখানি অনুভব করা যায়, করি। চার-পাশের ঘনবন্ধ জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে যেটুকু আকাশ আর রোদ দেখা যায়, সেটুকু দেখেই শরৎ কালের তৃষ্ণা মেটাই।

দিনগুলো সেই একই খাতে স্রোতহীন মন্থরতার মধ্যেই কেটে যাচ্ছিল। সকাল-বিকেল-দুপুর এবং রাত্রি—রোজ চারবার নতুন বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসি। অবশিষ্ট সময় একা-একাই থাকি। সুরপতিবাবু বার দুই এসেছিলেন আমার ঘরে। ভেবেছিলাম একজন কথা বলার সঙ্গী পেয়ে বেঁচে গেলাম। কিন্তু পাঁচটা টাকা ধার নিয়ে সেই যে তিনি অদৃশ্য হলেন, আর তাঁকে দেখিনি।

প্রথম প্রথম দিনকয়েক এমনভাবে থাকতে ভয়ানক কষ্ট হত। আজকাল নিঃসঙ্গতার সঙ্গে খানিকটা সন্ধি করে ফেলেছি। এখানে মিসেস মিত্রের খেয়াল

অনুযায়ীই থাকতে হবে। কাজেই অস্থির বা ক্ষুব্ধ হয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে মুক্তির রাস্তা খোঁজাই ভাল। এই বিবর থেকে যেমন করে হোক আমাকে বেরুতেই হবে। অতএব মনে মনে স্থির করেছি, মিসেস মিত্রের কাছে এক দিনের ছুটি নিয়ে সীতেশদার বাড়ি যাব। তাকে বলব অন্য একটা চাকরি জোগাড় করে দাও। এমন ভাবে থাকতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

শেষ পর্যন্ত মিসেস মিত্রের কাছে ছুটির জন্য দরবার করতে হল না। তার আগেই তিনি ডেকে পাঠালেন।

একদিন সন্ধ্যের খানিকটা আগে নিজের পিঞ্জরে আবদ্ধ একটা পশুর মত ছটফট করছি। কলকাতার আকাশকে আরক্ত করে শরতের সূর্যটা তখন পশ্চিম দিগন্তে নেমে গেছে।

ঠিক সেই সময় দরজার সামনে গুপীর মুখটা ভেসে উঠল। প্রথম দিন আমাকে এ-বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল সে। এবং কিছুক্ষণ পর নতুন বাড়ির ডাইনিং রুমে মিসেস মিত্রের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে এই দীর্ঘদিন তাকে আর দেখিনি।

এই মুহূর্তে গুপীকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম, 'আরে গুপীদা যে, এস—এস—'

সে ভেতরে এল।

আমি এবার বললাম, 'কী ব্যাপার, এতদিন কোথায় ছিলে? সেই যে আমাকে এই অশোক বনে রেখে গেলে, তারপর থেকে তো আর পাত্তাই নেই। বেঁচে আছি কি মরে গেছি—মাঝে মাঝে একটু আধটু খবরও তো নিতে হয়।'

গুপী বলল, 'কি করে আসি বলুন। ও-বাড়িতে যা কাজ, দম ফেলবার পর্যন্ত ফুরসুত লেই। তাই—'

'যাক, তা হঠাৎ এখন কি মনে করে—'

'মা-জননী আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে বলেছে।'

রোজ চারবার নির্দিষ্ট সময়ে ও বাড়িতে খেতে যাই। মাসখানেক হল মিসেস মিত্রের কাছে চাকরি নিয়েছি। ঐ সময়গুলো ছাড়া কোনদিন ওখানে যাই নি। কাজেই শরতের এই অবেলায়, নিতান্ত অসময়ে হঠাৎ ডাকটা আসতে রীতিমত অবাকই হলাম। গুপী বলা সত্ত্বেও সংশয়টা যেন কাটতে চাইছে না। বললাম, 'আমাকে যেতে বলেছেন!'

'হ্যাঁ।'

'কেন, কিছু জানো?'

'আমি কি করে জানব।'

'তাও তো বটে। তুমিই বা কেমন করে জানবে। আচ্ছা চল।'

নতুন বাড়িতে এসে দোতলার লাউঞ্জে মিসেস মিত্রকে আবিষ্কার করলাম। একটি সোফায় তিনি অর্ধশায়িত। নিচের সুদৃশ্য বিস্তৃত লনের দিকে অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে ছিলেন।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মিসেস মিত্র সচেতন হয়ে উঠলেন, 'এই যে শুভেন্দু,

এসে গেছ। এখানে বস।' বলেই আঙুল দিয়ে সামনের একটা সোফা দেখিয়ে দিলেন। নিঃশব্দে সেখানে বসে পড়লাম।

মিসেস মিত্র আবার বললেন, 'এ-সময় তোমাকে কেন ডাকিয়েছি, বলতে পার ?'

'আজ্ঞে না।' খানিকটা বিমূঢ়ের মতই বলে ফেললাম।

'কাজ-কাজ করে আমাকে খুব তাগাদা দিচ্ছিলে না ?' মিসেস মিত্র স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

ভদ্রমহিলা ঠিক কী বলতে চান বুঝতে পারলাম না। তবু কোনরকমে বললাম, 'হ্যাঁ—মানে—'

'বেশ। আজ থেকেই তোমাকে কাজ দেব। সেই যে নতুন স্যুটগুলো তোমার জন্যে তৈরি করানো হয়েছিল তার থেকে একটা পরে এস। তাড়াতাড়ি আসবে। এখন ছ'টা পঁয়ত্রিশ। কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় আমরা বেরুব কিন্তু।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে একতলা বাড়িটার দিকে ছুটলাম। স্যুট পরে ফিরে আসতে বেশি সময় লাগল না।

মিসেস মিত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তীক্ষ্ম বিশ্লেষণী চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন। আপাদমস্তক দৃষ্টির নিকষে যাচাই করতে লাগলেন যেন। দেখতে দেখতে তাঁর মসৃণ কপালে ক'টি রেখা ফুটে বেরুল। চোখের কোণ দু'টি অনেকখানি কুঁচকে গেল। ঈষৎ বিরক্ত সুরে বলে উঠলেন, 'স্যুট তো পরে এলে, টাই কোথায় ?'

চিরদিন ধুতি-শার্টই পরেছি। স্যুট আমার কপালে অনভ্যাসের ফোঁটা! তাড়াহুড়োয় টাইটা পরে আসতে ভুলে গেছি।

কী করব স্থির করে উঠতে পারছি না। মিসেস মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'টাইটা পরে আসব ?'

'না, আর যেতে হবে না। এখন গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। জয়ন্তর একটা টাই দিচ্ছি। আপাতত কাজ চালিয়ে নাও। আর কখনও এমন ভুল করবে না।'

আমাকে নিখুঁত করে মিসেস মিত্র সামনের সেই 'লন'-এ নিয়ে এলেন। আধুনিক সুইস মডেলের একটা সুদর্শন মোটর সেখানে অপেক্ষা করছিল। সোফার ছিল না। তিনি স্বয়ং উঠে স্টিয়ারিং ধরলেন এবং তাঁর নির্দেশমত আমি পাশে গিয়ে বসলাম। মুহূর্তে গাড়িটা যেন দুই ডানা মেলে অনায়াস মসৃণ গতিতে উড়ে গেল।

উড়তে উড়তে কখন যে চৌরঙ্গীতে এসে পড়েছিলাম, খেয়াল নেই। মিসেস মিত্র আমাকে কী কাজের জন্য নিয়ে এসেছেন, অমোঘ নিয়তির মত কোথায় নিয়ে চলেছেন—কিছুই অনুমান করতে পারছি না। আমার কৌতূহল এবং উৎকণ্ঠা একটু একটু করে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুল। বার বার তাঁর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। মিসেস মিত্রের দৃষ্টি সামনের রাস্তায় নিবদ্ধ। মুখ ফুটে যে কিছু জিজ্ঞেস করব তেমন সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারছি না। কাজেই

ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছি।

প্রায় ঝড়ের বেগে গাড়িটা ছুটে চলেছে। জাপান যদিও বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেছে এবং কার্যত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উপর যবনিকা নেমে এসেছে তবু কলকাতার রাত্রিগুলো এখনও অন্ধ। ব্ল্যাক আউটের অভিশাপ থেকে সে মুক্তি পায় নি। রাস্তার আলোগুলোর চোখ থেকে এখনও ঠুলি খসে নি। যেদিকে যতদূর তাকানো যায় জব চার্নকের এই নগরী অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত।

চৌরঙ্গীর এক পাশের সারিবন্ধ বিশাল বাড়িগুলোর সামনে উঁচু উঁচু ব্যাফেল ওয়াল আর স্তূপীকৃত বালির বস্তা। ফুটপাথে এবং ময়দানের দিকে ইতস্তত ট্রেঞ্চ।

সামনের দিকে চোখ রেখেই মিসেস মিত্র একসময় ডেকে উঠলেন, 'শুভেন্দু—'

উন্মুখ হয়েই ছিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিলাম, 'আজ্ঞে—'

'তুমি ফোটো তুলতে পার?'

মিসেস মিত্রের কাছে চাকরি নিয়েছি। সেই চাকরির সঙ্গে ফোটো তোলার সম্পর্ক কতখানি নিবিড়, বুঝতে পারছি না। কিছুটা অবাক হয়েই বললাম, 'আজ্ঞে না।'

'পারলে ভাল হত।' মুখ না ফিরিয়ে নিস্পৃহ স্বরে মিসেস মিত্র বললেন।

একটু চুপচাপ।

মিসেস মিত্রই আবার শুরু করলেন, 'আচ্ছা শুভেন্দু, তুমি ড্রাইভ করতে জানো?'

যে পরিবারে আমার জন্ম সেখানে গাড়ি চালানো নিতান্ত স্বপ্নেই সম্ভব। যথারীতি আগের মতই উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে না।'

'তা হলে তো খানিকটা অসুবিধেই হবে দেখছি।' মিসেস মিত্রকে কিছুটা চিন্তিতই মনে হল।

এরপর কী বলব ভেবে পেলাম না।

সমস্যাটার হঠাৎ যেন সমাধান করে ফেলেছেন এমন ভঙ্গিতে মিসেস মিত্র আবার বলে উঠলেন, 'যাক গে, ফোটো তোলা আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। আর রোজ ভোরবেলা উঠে আমাদের ড্রাইভার পীর আলীর কাছে ড্রাইভ করাটা শিখে নেবে। পীর আলীকে বলে দেব।'

'আচ্ছা।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়লাম।

এরপর মিসেস মিত্র অনেকক্ষণ কিছু বললেন না। স্বভাবতই আমাকে নিশ্চুপ থাকতে হল।

গাড়িটা এক সময় পার্ক স্ট্রীটের সুবিশাল একটা বাড়ির সামনে এসে থামল। চাবি ঘুরিয়ে মিসেস মিত্র ইঞ্জিন বন্ধ করলেন। দরজা খুলে নামতে নামতে বললেন, 'এস আমার সঙ্গে।'

মন্ত্রচালিতের মত নেমে পড়লাম এবং মিসেস মিত্রকে অনুসরণ করে

হাঁটতে লাগলাম।

বেশি দূর যেতে হল না। বিশাল বাড়িটার শেষ প্রান্তের একটি দোকানে ভদ্রমহিলা আমাকে নিয়ে গেলেন। দোকানটি বেশ অভিজাত।

প্রথমটা লক্ষ্য করি নি। অন্যমনস্কের মত চারদিকে তাকাচ্ছিলাম। দোকানটা জুড়ে অসংখ্য কাচের আলমারি আর শো কেস। সেগুলোর মধ্যে নানা আকারের অগণিত বোতল চমৎকার ভাবে সাজানো। বোতলগুলোর গায়ে ছাপানো লেবেলে কি যেন লেখা রয়েছে।

কৌতূহলের বশে দু-চারটে লেখা পড়েও ফেললাম। আর পড়েই চমকে উঠলাম। ওগুলো মদের বোতল। লেবেলে তাদের নাম-ধাম ও ঠিকানা এবং বংশ-পরিচয় রয়েছে। তাদের কেউ এসেছে ফরাসী মুল্লুক থেকে, কেউ স্পেন থেকে, কেউ খাস বিলেত থেকে, কেউ বা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে সুদূর আমেরিকা থেকে। দেশ বিদেশের দ্রাক্ষাকুঞ্জ থেকে বোতলে বোঝাই হয়ে তারা এসেছে যুদ্ধোত্তর কলকাতায় হৃদয়-হরণে।

এখানে সবাই বিদেশী আর কুলীন। তাদের মধ্যে দেশী অন্ত্যজদের জায়গা হয় নি।

ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত আমাকে একটা মদের দোকানে নিয়ে এলেন! চমকটা সামলে ওঠার আগেই দেখলাম মিসেস মিত্র কাউণ্টারের কাছে এগিয়ে গেছেন। সেখানে সুবেশ দুটি যুবক, সম্ভবত সেলস্‌ম্যানই হবে, বসে ছিল। মিসেস মিত্রকে দেখামাত্র উঠে দাঁড়াল। সসম্ভ্রমে বলল, 'আসুন—আসুন—'

মিসেস মিত্র বললেন, 'মিস্টার শ্রীবাস্তব আছেন?'

'আছেন।'

'কোথায়?'

'তাঁর ঘরে। ডেকে দেব?'

'না, আমিই যাচ্ছি।'

কাউণ্টারের পেছন দিকে কাটা একটা দরজা। সেই দরজা ঠেলে মিসেস মিত্র ছোট একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও গেলাম।

চকিতের জন্য চারপাশে একবার তাকিয়ে নিলাম। এখানে বিস্ময় প্রায় কিছুই নেই। সাধারণ অফিসঘর যেমন হয় অবিকল তা-ই। একপাশে স্টীলের একটি আলমারি, তার বিপরীত প্রান্তের উঁচু র‍্যাকে স্তূপীকৃত ফাইল। মাথার ওপর সচল পাখা। মাঝখানে অর্ধবৃত্তাকার একটা টেবিল। তার ওপর টেলিফোন, বেল্‌, পেপার ওয়েট, স্কেল, টাইপ রাইটার।

টেবিলটার একপাশে খান পাঁচেক গদী-আঁটা খালি চেয়ার। অন্য দিকে একটি রিভলভিং চেয়ারে যে ভদ্রলোকটি বসে ছিলেন তাঁর বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। চেহারা বেশ স্মার্ট এবং ঝকঝকে। মাথার চুল থেকে পায়ের জুতোটি পর্যন্ত সর্বাঙ্গে এবং পোশাকরুচিতে তিনি ত্রুটিহীন।

মিসেস মিত্রকে দেখামাত্র ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। ইংরেজিতে বললেন, 'বসুন-বসুন—'

মিসেস মিত্র বসলেন। দেখাদেখি আমিও বসলাম।

মিসেস মিত্রও নির্ভুল ইংরেজিতে, বিশুদ্ধ উচ্চারণে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, কাজকর্মের ব্যাপারে কিছুদিন নানা ঝামেলা গেল। তাই আর আসা হয়ে ওঠে নি।'

চুপচাপ বসে আছি। মিসেস মিত্রদের কথা থেকে বুঝতে পারলাম, এখানকার সবার সঙ্গেই তাঁর পরিচয় আছে এবং নিয়মিত তিনি এখানে যাতায়াতও করে থাকেন।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'একটু কফি আনাই ?'

'না না মিস্টার শ্রীবাস্তব, কফি খাবার সময় এখন নেই। একটা কথা সেরে এখুনি আমরা উঠব।'

'কথা!' ভদ্রলোক অর্থাৎ শ্রীবাস্তবের চোখদুটো ঝকমক করে উঠল। বললেন, 'কি ব্যাপার, পার্টি-টার্টি কিছু দিচ্ছেন নাকি ?'

'হ্যাঁ, একটা দিতে হবে। তবে এ-মাসে নয়। আসছে মাসের মাঝামাঝি।' বলতে বলতে মিসেস মিত্র একটু থামলেন। কি যেন একটু ভেবে আবার আরম্ভ করলেন, 'এই বোধ হয় শেষ পার্টি।'

'কেন ?'

'যুদ্ধ থেমে গেল। এবার তো ব্যবসা-পত্তর গুটিয়ে আসবে। কনট্রাক্টও বিশেষ নেই। পার্টি দিয়ে আর কি করব। শুধু শুধু খরচ।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।' শ্রীবাস্তবের মুখে ম্লান একটা ছায়া ঘনীভূত হল। তিনি বললেন, 'আসছে মাসে যে পার্টি দিচ্ছেন তার ওয়াইন সাপ্লাইয়ের অর্ডারটা যেন পাই।'

'সে তো পাবেনই।' মিসেস মিত্র বলতে লাগলেন, 'পার্টির তো এখনও দেরি আছে। সে সম্বন্ধে পরে কথা হবে। এখন যে জন্যে এসেছি তা-ই শুনুন—'

'বলুন—বলুন—' শ্রীবাস্তব যুগপৎ উৎসুক এবং ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আমাকে দেখিয়ে মিসেস মিত্র বললেন, 'এই ছেলেটি আমার পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট। নাম শুভেন্দু চ্যাটার্জি।'

'কই আগে তো দেখিনি।'

'এই মাসখানেক হল আমার কাছে চাকরি নিয়েছে। এর মধ্যে আমি আসি নি, তাই দেখেন নি। যাই হোক, শুভেন্দুকে চিনে রাখুন। মাঝে মাঝে দরকার হলে ও আসবে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই।' বলতে বলতে আমার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলেন শ্রীবাস্তব। আড়ষ্টের মত আমিও হাত বাড়িয়ে সেটা ধরলাম। আমার হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শ্রীবাস্তব বললেন, 'ভেরি গ্ল্যাড টু মীট ইউ, অলওয়েজ ইউ আর ওয়েলকাম।'

অর্ধস্ফুট জড়িত স্বরে বিড় বিড় করে কী যে উত্তর দিলাম, নিজেই বুঝলাম না।

একসময় বিদায় নিয়ে মিসেস মিত্র উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে আমিও উঠলাম।

বাইরে বেরিয়ে মিসেস মিত্র বললেন, 'দোকানটা চিনে রাখ।—নম্বর পার্ক স্ট্রীট।'

এর পর আমরা গেলাম এক ডাক্তারের কাছে। সেখান থেকে ফোটো তোলার একটা স্টুডিওতে। সব জায়গায় আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিসেস মিত্র এবং বললেন, 'ঠিকানাগুলো মনে রেখ।'

পরিচয়-পর্ব শেষ করে পার্ক স্ট্রীট থেকে আবার আমরা চৌরঙ্গীতে ফিরে এলাম। যথারীতি মিসেস মিত্রই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। চালাতে চালাতে হঠাৎ ডেকে উঠলেন, 'আচ্ছা শুভেন্দু—'

'আজ্ঞে—' পাশ থেকে সাড়া দিলাম।

'তুমি ড্রিঙ্ক ট্রিঙ্ক কর তো?'

শব্দ ক'টি এমন অনায়াসে আর আচমকা মিসেস মিত্র উচ্চারণ করলেন যে হকচকিয়ে গেলাম। প্রশ্নটা অভাবিত এবং আমার প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত। উত্তর দিতে তাই অনেকক্ষণ সময় লাগল।

ড্রিঙ্ক অর্থাৎ পান করা। মিসেস মিত্র যে বিশেষ একটা পানীয়ের ইঙ্গিত করেছেন সে-সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। সিগারেট আমি খেতাম। কিন্তু মদ! সে ছিল আমার সুদূর কল্পনারও বাইরে। কোনরকমে স্খলিত ভীত স্বরে বললাম, 'আজ্ঞে না, আমি ড্রিঙ্ক করি না।'

লক্ষ্য করলাম, মিসেস মিত্রের মসৃণ কপালে মুহূর্তের জন্য ক'টি রেখা ফুটে উঠেই অদৃশ্য হল। আমার দিকে চোখ না ফিরিয়েই আস্তে আস্তে তিনি বললেন, 'তাই তো, ভারি মুশকিল হল। রোজ সাতটা থেকে দশটা এগারটা পর্যন্ত তোমাকে ওখানে থাকতে হবে। একা একা মুখ বুজে বসে থাকা, সে তো সহজ নয়। তার চাইতে—' বলতে বলতে চুপ করে গেলেন।

চকিত হয়ে উঠলাম, 'একা-একা বসে থাকতে হবে! কোথায়?'

'কোন খারাপ জায়গায় না, একটা কেবিনে।'

'কেবিনে! মানে!'

মিসেস মিত্র হাসলেন, 'অত তাড়া কিসের। চল, গেলেই বুঝতে পারবে।'

আমার কাজটা যে কী, মদের দোকানে, ফোটোগ্রাফারের স্টুডিওতে অথবা ডাক্তারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, না কেবিনে বসে থাকা—কিছুই বুঝতে পারছি না। সব কিছুই কেমন যেন দুর্বোধ্য আর প্রহেলিকার মত মনে হচ্ছে।

নানা পথ ঘুরে শেষ পর্যন্ত গাড়িটা ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার সব চেয়ে বড় একটি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। হোটেলের প্রকাণ্ড বাড়িটা আগেও আমি দেখেছি। ভেতরে ঢোকার সৌভাগ্য কোন দিনই হয় নি। দূর থেকে তাকে স্বপ্নলোক বলেই মনে হয়েছে।

মিসেস মিত্র আমাকে নিয়ে সেই হোটেলে গেলেন। দীর্ঘ একটা প্যাসেজ পার হয়ে শেষ পর্যন্ত যেখানে এসে পেঁছিুলাম সেটা একটা বিস্তৃত 'হল্'।

সেখানে চারদিকে তাকিয়ে আমার ঘাম ছুটল।

উগ্র নীলাভ আলোতে এখানে অর্ধবাস্তব এক স্বপ্নময়তা। একদল যুবতী একদল পুরুষের কণ্ঠলগ্ন হয়ে প্রমত্ত পা ফেলে দুলছে। মেয়েগুলোর পরনে খুবই সংক্ষিপ্ত পোশাক।

আমি শ্রীমান শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, নিরীহ চট্টো বংশজাত নৈকষ্য কুলীন, কাশ্যপ গোত্র, আদি নিবাস হুগলী জেলা, মৌজা-মাজনা, তিন পুরুষ আগেও যার পূর্বপুরুষেরা টোলে পণ্ডিতী করতেন—চারদিক দেখতে দেখতে তার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে এল যেন। মনে হল, পৃথিবী নামে পরিচিত গ্রহটির বাইরে একটা বিচিত্র অজ্ঞাত জগতে এসে পড়েছি।

দীর্ঘদিন অবশ্য এখানে থাকতে হল না। 'হল্'টার গা ঘেঁষে সারি সারি অসংখ্য কেবিন। মিসেস মিত্র একটা কেবিনে আমাকে নিয়ে এসে বসতে বলে নিজেও মুখোমুখি বসলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কাটা দরজা ঠেলে একটা বেয়ারা উঁকি দিল। মিসেস মিত্র বললেন, 'দু পেগ হুইস্কি আর সোডা ; একটু বরফও এন।' বলতে বলতেই বুঝি আমার কথা মনে পড়ে গেল। ব্যস্তভাবে তৎক্ষণাৎ অর্ডারটা সংশোধন করে দিলেন, 'না-না, দু পেগ না—এক পেগই এন। আর—আর দু আউন্স পাইন এ্যাপল জুস আনবে।'

বেয়ারা অদৃশ্য হতেই তাঁর দৃষ্টি এসে আমার ওপর স্থির হল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তিনি বললেন, 'তুমি হয়ত অবাক হয়ে ভাবছ কেন তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম।'

ঠিক এই কথাটিই আমি ভাবছি। একটু থতমত খেয়ে বললাম, 'আমি—আমি—মানে—'

'আপাতত এই কেবিনেই তোমার কাজ। রোজ সাড়ে সাতটা নাগাদ এখানে এসে বসবে। হোটেলের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করা আছে। যাবার আগে ম্যানে-জারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে যাব'খন।' মিসেস মিত্র বলতে লাগলেন, 'সাড়ে সাতটা থেকে দশটা এগারটা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করবে। যা খেতে ইচ্ছে হয় বেয়ারাকে বলবে। সে এনে দেবে।'

কী উত্তর দেব, ঠিক করতে পারলাম না।

মিসেস মিত্র আবার বললেন, 'কিন্তু কত আর খাবে! তার চাইতে যদি ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করতে, একা-একা বসে থাকতে অসুবিধে হত না। তিন চার ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে কেটে যেত টেরই পেতে না।'

আজন্মের এই অনভ্যস্ত অপরিচিত পরিবেশে রোজ তিন চার ঘণ্টা কাটিয়ে যেতে হবে, ভাবতেই সমস্ত স্নায়ুতে বিচিত্র এক অস্থিরতা অনুভব করলাম। বললাম, 'এখানে আমাকে কী করতে হবে?'

'বিশেষ কিছুই না। এই কেবিনটার নম্বর সতের। পাশের আঠার নম্বর কেবিনে প্রত্যেক দিন—'

'প্রত্যেক দিন কী?'

মিসেস মিত্র আমার দিকে অনেকখানি ঝ‌ুঁকে বললেন, 'কারা আসে, কী কী কথাবার্তা বলে সব নোট করে আমাকে দেবে। আর যদি তোমার জানাশোনা কাউকে দেখ, তার ওপর নজর রাখবে। সে এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যায় তার খবর নেবে। সে-জন্য তোমার জিম্মায় একখানা মোটর থাকবে। যতদিন না গাড়ি চালাতে শিখছ একজন ড্রাইভারও পাবে।'

কিছ‌ু বলতে চেষ্টা করলাম। গলায় স্বর ফ‌ুটল না।

মিসেস মিত্র আবার বললেন, 'তা হলে রোজ ভোর বেলা উঠে গাড়ি চালানো শিখবে পীর আলীর কাছে। বিকেলে ফোটো তোলা শিখবে আমার কাছে। রাত্রে এখানে এসে বসবে। আর দিনের বাকি সময়টা তোমাকে ভাঙা বাড়িতে আটকে থাকতে হবে না। ইচ্ছামত তুমি বেড়াতে যেতে পার।'

এবারও কিছ‌ু বললাম না।

একদিন স্বপ্ন দেখতাম বি. এ. পাশ করে ভদ্র রকমের একটা চাকরি করব। মাসের শেষে মোটা অঙ্কের মাইনে পাব। তার বদলে কি না হোটেলের কেবিনে বসে গ‌ুপ্তচরব‌ৃত্তি! আমার সব স্বপ্ন সব উচ্চাশার কী সকর‌ুণ পরিণতি!

নয়

পরের দিন থেকেই আমার কাজ শ‌ুর‌ু হয়ে গেল। ভোরবেলা, তখনও ঘ‌ুমটা ভাল করে ভাঙে নি, তরল শিথিল এক তন্দ্রার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছি, ঠিক সেই সময় ড্রাইভার পীর আলী এসে ডাকাডাকি শ‌ুর‌ু করে দিল, 'চ্যাটার্জি সাব, চ্যাটার্জি সাব—'

আমি, শ‌ুভেন্দ‌ু চট্টোপাধ্যায়, এ-বাড়ির চাকার-বাকর-ড্রাইভার-মালীদের কাছে সাহেব হয়ে গেছি। অবশ্য গ‌ুপী ব্যতিক্রম। সে আমাকে প্রথম দিনের মত দাদাবাব‌ুই বলে।

ধড়মড় করে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পীর আলী বারান্দার নিচে উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখেই বলে উঠল, 'কাল রাত্রে বড় মেমসাব হ‌ুকুম দিয়েছেন আজ থেকে যেন আপনাকে গাড়ি চালানো শেখাই। চলিয়ে—'

'চল।' তৎক্ষণাৎ বাসিম‌ুখেই বেরিয়ে পড়লাম।

পীর আলী প‌ুরনো মডেলের একটা অস্টিন গাড়িতে আমাকে তুলে সোজা চৌরঙ্গীর ময়দানে নিয়ে এল। তারপর প্রায় সারাটা সকাল গাড়ির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চেনাল এবং তাদের নাম ম‌ুখস্থ করাল।

প্রথম দিনের পক্ষে যথেষ্টই শেখা হয়েছিল। এক সময় প্রায় ঘণ্টাদ‌ুয়েক পর ছ‌ুটি মিলল। আমাকে ভাঙা বাড়ির ভিতরে পেঁাছে দিয়ে পীর আলী বলল, 'আবার কাল আয়েব।'

'আচ্ছা।' আমি মাথা নাড়লাম।

পীর আলী চলে গেলে ম‌ুখ ধ‌ুয়ে নতুন বাড়িতে ব্রেকফাস্ট সেরে এলাম।

তারপর উত্তেজক ইংরেজি থ্রিলারে নিজেকে সঁপে দিলাম। থ্রিলার পড়তে পড়তে লাঞ্চের সময় হল। লাঞ্চ খেয়ে সারাটা দুপুর নিটোল এক ঘুমে পার করে বিকেলের চা খেতে গেলাম।

চা-পর্ব সমাপ্ত হলে মিসেস মিত্র ক্যামেরা নিয়ে এলেন। এবং ছবি তোলার প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি শিখিয়ে দিতে লাগলেন। আর অনুগত মেধাবী ছাত্রের মত তাঁর প্রতিটি কথা গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম।

ছবি তোলার তালিম নিতে নিতে সন্ধ্যে হয়ে এল। হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলেন মিসেস মিত্র। বললেন, 'যাও যাও, আজ আর নয়। এখনই আবার তোমাকে হোটেলে যেতে হবে। ড্রেস ট্রেস করে তৈরি হও গিয়ে। আমি ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ক্যামেরা নিয়ে এমনই মগ্ন ছিলাম যে হোটেলে যাবার কথাটা মনে ছিল না। সেই সুবিশাল হোটেলের সতের নম্বর কেবিনে বসে আঠার নম্বর কেবিনের ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে—এ-কথাটা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। যাই হোক, মিসেস মিত্র মনে করিয়ে দিতেই পাঁচীলের ওপারে ভাঙা বাড়ির দিকে ছুটলাম।

গিয়ে আর দেরি করলাম না। স্যুটে টাইয়ে নিজেকে নির্ভুল সাহেব তৈরি করে ড্রাইভারের জন্য বসে রইলাম।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পীর আলীই আবার এল। মৃদু হেসে বলল, 'সকাল বেলা বলেছিলাম কাল আবার আসব। লেকেন আজই আসতে হল। বড় মেমসাব পাঠিয়ে দিলেন। আইয়ে—'

নিঃশব্দে তার পিছু পিছু একটা নতুন আমেরিকান মডেলের গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। নিমেষে গাড়িটা স্টার্ট নিল।

কখন যে চৌরঙ্গীতে এসে পড়েছিলাম, খেয়াল ছিল না। কাল এখানে যা দেখে গিয়েছিলাম, রাস্তার দু-পাশে সে সবই রয়েছে। কোথাও কোন পরিবর্তন ঘটে নি। রাস্তার আলোগুলো চোখে ঠুলি লাগিয়ে তেমনই অন্ধ। তার একপাশে যোজন যোজন অন্ধকার নিয়ে সুবিশাল ময়দানটা একই ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। পাশে উঁচু উঁচু বাড়িগুলো আকাশকে বিদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ময়দান, কর্পোরেশনের আলো কিংবা ঊর্ধ্বমুখ বাড়িগুলো—কোনদিকেই আমার লক্ষ্য নেই। ড্রাইভারের পাশে বসে আমি শুধু ঘামছিলাম।

সময়টা আশ্বিনের মাঝামাঝি। এ-সময় কলকাতায় শীতের আশা নিতান্তই দুরাশা। তবু রাত্রের দিকে বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ লেগে যায়। আমি কিন্তু সে আমেজের ছোঁয়া পর্যন্ত পাচ্ছিলাম না। শুধু বুঝতে পারছিলাম, গাড়িটা হোটেলের দিকে যত এগুচ্ছে আমার হৃদপিণ্ডের ওঠানামা ততই দ্রুততর হচ্ছে।

কাল মিসেস মিত্র আমার সঙ্গে ছিলেন। অমোঘ নিয়তির মত যেমনভাবে তিনি চালিত করেছিলেন তেমনভাবেই আমি চলেছিলাম। কিন্তু আজ?

আজন্মের অনভ্যস্ত পরিবেশে অর্থাৎ হোটেলের সেই সতের নম্বর কেবিনে

একা একা গিয়ে বসতে হবে। ভাবতেই আমার হাত-পা যেন শিথিল হয়ে আসতে লাগল।

আমার ভাবনার মধ্যেই গাড়িটা একসময় হোটেলের সামনে এসে থামল। পীর আলী বলল, 'চ্যাটার্জি সাব, আমরা এসে গেছি।'

উত্তর না দিয়ে নেমে পড়লাম। হোটেলের পোর্টিকোর তলায় এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর মরিয়ার মত দীর্ঘ প্যাসেজ পার হয়ে নির্দিষ্ট কেবিনের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

পেছন থেকে পীর আলী বলে উঠল, 'গাড়ি নিয়ে আমি উল্টোদিকের ফুটপাথের পাশে আছি।'

তার কথাগুলো আমার কানে গেল কি গেল না।

কেবিনে পৌঁছে অনেকখানি স্বাভাবিক হলাম। শ্বাসক্রিয়া সহজ হল।

কেবিনের সামনের সেই বিস্তৃত 'হলে' কালকের মতই নাচের আসর জমেছে। নাচ আর কি, একদল মাংসল মেয়েমানুষ একদল পুরুষেয় কণ্ঠলগ্ন হয়ে তালে তালে দুলছিল ঠিক কালকের মতই। নীলাভ আলোয় পরিবেশটা আশ্চর্য স্বপ্নময়। কালকের মতই প্রমত্ত সুরে অর্কেস্ট্রা বাজছিল।

কালকের কোন কিছুতেই ছন্দোপতন ঘটে নি, তাল কাটে নি। হোটেলের উন্মত্ত জীবনস্রোত একই খাতে বয়ে চলেছে।

নাচের আসর, নীল আলো কিংবা বিদেশী অর্কেস্ট্রার উগ্র বাজনা—কোন কিছুই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছে না। স্নায়ুগুলোকে কুকুরের মত টান টান করে পাশের কেবিনটার দিকে তাকিয়ে আছি।

বসে আছি তো বসেই আছি। কতটা সময়, বুঝি বা একটা যুগই পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কালকের সেই বেয়ারাটা বার কয়েক খোঁজ নিয়ে গেছে, আমার কিছু দরকার আছে কি না। যতবারই সে এসেছে ততবারই কাঁপা গলায় বলেছি, 'না, কিছু দরকার নেই।'

সাতটার একটু পরে এখানে এসেছি। এখন প্রায় দশটা। অর্থাৎ তিন ঘণ্টা চুপচাপ বসে আছি। কিন্তু আঠারো নম্বর কেবিনে এখন পর্যন্ত কেউ আসে নি।

আমার ডান পাশে অর্থাৎ ষোল নম্বর কেবিনে ক্রমাগত লোক আসছে। প্রথমে এল একদল আমেরিকান টমি, তারপর তিনটে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, তারও পর এক প্রৌঢ় বাঙালী দম্পতী।

আমেরিকান এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানগুলো যতক্ষণ ছিল হুল্লোড়ে চিৎকারে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। অবশ্য বাঙালী দুটি কোন উপদ্রব করে নি। প্রায় নিঃশব্দে তিন পেগ করে হুইস্কি খেয়ে চলে গেছে।

বসে থাকতে থাকতে আমি প্রায় অস্থির হয়ে উঠেছি। শুধু কি অস্থির, সেই সঙ্গে যুগপৎ উৎকণ্ঠ এবং উত্তেজিত। মিসেস মিত্র বলেছেন, আঠারো নম্বর কেবিনে যারা আসবে তাদের কথাবার্তা নোট করে এবং তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে তাঁকে রিপোর্ট দিতে হবে। এখান থেকে বেরিয়ে তারা যেখানে

যেখানে যাবে, অনুসরণ করে সেখানে সেখানে যেতে হবে। কারা আসবে আঠারো নম্বর কেবিনে ? কারা, কারা ? তাদের পেছনে ছুটে কোন বিপদে পড়ব না তো ?

চাকরি করতে এসে একটা ভয়াবহ রহস্য কাহিনীর প্রায় মাঝখানে যেন ঢুকে পড়েছি। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথই বুঝি কোনদিকে খোলা নেই।

অবশেষে উৎকণ্ঠা যখন চরমে পৌঁছেছে সেই সময় আঠার নম্বর কেবিনে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে দ্রুতবহ একটা স্রোত বয়ে গেল যেন। অসহ্য উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডটা স্ফীত হয়ে উঠছে। বুঝিবা সেটা ফেটেই যাবে। নিশ্বাস রুদ্ধ করে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে রইলাম।

একটু পরেই মোটা পুরুষ-গলা শুনতে পেলাম, 'কী খাবে ? ক্রিম বেকটি আর হুইস্কি ?'

'ও নো—নো—নো, নো হুইস্কি। আজ ফ্রেঞ্চ কনিয়াক খাব।' যে উত্তর দিল তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু গলা শুনে আমার চারপাশে সমস্ত পৃথিবী যেন টলমল করতে লাগল। স্বরটি নীনীর।

আচ্ছন্নের মত কিছুক্ষণ বসে রইলাম। খানিকটা সামলে নেবার পর মনে হল, তবে কি মিসেস মিত্র নীনীর পেছনে আমাকে গুপ্তচর লাগিয়েছেন! কথাটা যতবার ভাবলাম, অস্তিত্বের গভীর কেন্দ্র থেকে দুঃসহ এক উত্তাপ উঠে এসে আমাকে বেষ্টন করতে লাগল যেন।

মেয়ের গতিবিধির ওপরে নজর রাখার জন্য মা লোক লাগিয়েছে! এ কোন দেশ ? বাঙলা দেশই তো ? আমার কেমন যেন সংশয় হতে লাগল।

ভাবনাটা বেশিদূর এগুলো না। তার আগেই পুরুষ গলাটা আবার শুনতে পেলাম, 'কনিয়াক খাবে ?'

নীনী বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ও তো স্ট্রং ড্রিংক।'

'স্ট্রং ড্রিংকই তো চাই।'

'দেখ নীনী, আমাদের গরমের দেশে কনিয়াক টনিয়াক খাওয়া ঠিক না। শরীর কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে।'

'তোমার আর ডাক্তারি করতে হবে না। যা বললাম তাই অর্ডার দাও।'

অসহায় সুরেই পুরুষ সঙ্গীটি বলল, 'অল রাইট।' তার পর বয়ের উদ্দেশ্যেই বুঝি বলল, 'দো পেগ কনিয়াক আওর দো প্লেট ক্রিম বেকটি। কুইক।'

এই কেবিন থেকে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবু বুঝতে পারলাম, অর্ডার দেবার সঙ্গে সঙ্গে বয়টা ছুটল।

একটু চুপচাপ।

সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কানের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে বসে আছি। খানিকটা পরেই নীনীর গলা শোনা গেল, 'এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে ?'

তার সঙ্গী বলে উঠল, 'সোজা বাড়ি চলে যাব ভাবছি।'

'সে কি, আজ এত সতী হয়ে গেলে! বউ-র গা ছুঁয়ে প্রমিজ করে এসেছিলে বুঝি দশটার ভেতর ফিরবে।'

'আ-রে না-না, সে সব কিছু নয়। শরীরটা আজ ভাল লাগছে না। বিকেল থেকেই কেমন যেন একঝস্টেড্ ফিল করছি।'

'বেশ, তা হলে তুমি আমাকে রজতের ফ্ল্যাটে নামিয়ে দিয়ে যেও। দশটার মধ্যে আমি বাড়ি ফিরতে পারব না।'

'আবার রজতের ওখানে কেন?' কিছুটা ক্ষুব্ধ সুরেই নীনীর সঙ্গী বলে উঠল।

নীনী বলল, 'জানোই তো, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে আমার ভাল লাগে না। রজতের সঙ্গে খানিকটা গল্প-টল্প করে ফিরব।'

'রজতের ওখানে গিয়ে দরকার নেই। আমি বাড়ি যাব না। চল, হোটেল থেকে বেরিয়ে বি. টি. রোডের দিকে বেড়াতে যাই।'

বিচিত্র শব্দ করে হেসে উঠল নীনী, 'ভারি হিংসুক তুমি মুখার্জি। অক্টোপাশের মত আট হাতে আমাকে আটকে রাখতে চাও।'

মুখার্জি! সতের নম্বর কেবিনে বসে আমি প্রায় চকিত হয়ে উঠলাম। প্রথম দিন মিসেস মিত্রদের ডাইনিং রুমে খেতে গিয়ে বয়ের মুখে এই নামটি শুনেছিলাম। মুখার্জি নামে সেই লোকটি প্রচণ্ড মাতাল অবস্থায় নীনীকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছিল। তবে কি সেই মুখার্জি এবং এই মুখার্জি অভিন্ন?

এক সময় পাশের কেবিনে খাওয়ার পালা চুকল। অনুভব করলাম, নীনী এবং মুখার্জি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

যদিও মিসেস মিত্র নির্দেশ দিয়েছিলেন নীনীর পিছু নিতে তবু এই মুহূর্তে যেন দিশেহারা হয়ে পড়লাম। ধাতস্থ হতে খানিকটা সময় লাগল। তারপর বলরুম এবং দীর্ঘ প্যাসেজ পার হয়ে ঘোরের মধ্যে হোটেলের বাইরে চলে এলাম। পোর্টিকোর তলায় দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। কিন্তু না, মুখার্জী বা নীনী, কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। অসংখ্য মানুষ আর অগণিত গাড়ির জঙ্গলে তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নীনীকে যখন পাওয়াই গেল না, স্থির করলাম মিসেস মিত্রের কাছেই ফিরে যাব। অতএব রাস্তা পেরিয়ে উল্টো দিকের ফুটপাথে গেলাম। সেখান থেকে পীর আলীকে নিয়ে বাড়ির দিকে।

যেতে যেতে একটা ভাবনা আমাকে বার বার বিদ্ধ করতে লাগল। সত্যিই কি, মিসেস মিত্র নীনীর পেছনে আমাকে গুপ্তচর লাগিয়েছেন না অন্য কারো আঠারো নম্বর কেবিনে আসার কথা ছিল? হঠাৎ নীনীরা এসে গেছে!

হাজার ভেবেও কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। সবই দুর্বোধ্য আর রহস্যময় থেকে গেল।

অনেকখানি সংশয় আর উদ্বেগ নিয়ে একসময় বাড়ি পৌঁছুলাম।

দোতলার লাউঞ্জে মিসেস মিত্রকে পাওয়া গেল। একটা সোফায় চুপচাপ বসে ছিলেন। আমাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'তারপর শুভেন্দু, কী খবর!'

উত্তেজিত কাঁপা সুরে বলতে লাগলাম, 'সাতটা থেকে এগারটা পর্যন্ত সতের নম্বর কেবিনে আমি ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে আঠার নম্বর কেবিনে দু'জন মাত্র এসেছেন।'

'তারা কারা?'

নীনীদের নাম করব কি-না, বুঝতে পারছি না। দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে মিসেস মিত্রের মুখের দিকে একবার তাকালাম। পর মুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নিলাম। আবার তাকালাম। আবার চোখ সরালাম।

মিসেস মিত্র তাড়া দিয়ে উঠলেন, 'কি, চুপ করে রইলে কেন—বল।'

দ্বিধার ভাবটা আমার কাটতে চাইছে না। আধফোটা গলায় বললাম, 'দেখুন—'

'কী?'

'আমি যাদের দেখেছি তাদের নাম বলতে সাহস পাচ্ছি না।'

'ভয় নেই, বল।'

অভয় পেয়ে চোখ বুজেই প্রায় বলে ফেললাম, 'নীনীদেবীকে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে মিস্টার মুখার্জি নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন।'

সামান্য হেসে মিসেস মিত্র বললেন, 'ঠিকই দেখেছ। আঠারো নম্বর কেবিনটা ওরা রিজার্ভ করে রেখেছে।'

এরপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নীনী আর মুখার্জি সম্বন্ধে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করলেন মিসেস মিত্র। তাদের কথাবার্তা যা-যা শুনেছি, অকপটে সব বললাম। এবং এও বললাম হোটেল থেকে বেরিয়ে তারা বি. টি. রোডের দিকে গেছে। কী-কারণে তাদের অনুসরণ করতে পারিনি, তা-ও গোপন করলাম না।

সব শুনে মিসেস মিত্র বললেন, 'কাল থেকে আর একটু অ্যালার্ট থাকবে। যেমন করে পার ওদের পিছু নেবে। কোথায় কোথায় নীনী যায়, কী করে, সব খবর আমার চাই।'

দশ

ভোরবেলা পীর আলীর কাছে গাড়ি চালানো শিখি। বিকেলে মিসেস মিত্রের কাছে ফোটো তোলার তালিম নিই। রাত্রে নীনীর গতিবিধি লক্ষ্য করি। এ ছাড়া বাকি সময়টায় আমার অফুরন্ত অবসর। মিসেস মিত্র অবশ্য করুণা করে বলেছেন, দিনের বেলাটা ইচ্ছামত আমি বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আসতে পারি। ভাঙা বাড়িতে আটকে না থাকলেও চলবে।

এই সুবিশাল নগরীতে মিসেস মিত্ররা ছাড়া আর একটি মাত্র পরিবারই আমার পরিচিত। মাঝে মাঝে সেখানে চলে যাই। সেখানে বলতে

সীতেশদাদের বাড়ি।

মিসেস মিত্রের কাছে চাকরি নেবার পর বার কয়েক সেখানে গেছি। কিন্তু সীতেশদার সঙ্গে একদিনও দেখা হয় নি।

বউদির মুখে শুনে বুঝেছি তার চরিত্র বা অভ্যাসের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। দিন দিন আরো উচ্ছৃঙ্খল আরো বেপরোয়া হচ্ছে সীতেশদা। সেই সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া, মাঝরাত্রে টলতে টলতে ফিরে আসা, কোনদিন আবার না ফেরা, হোটেলে রাত কাটানো—একই নিয়মে সেই উদ্‌ভ্রান্ত জীবন চালিয়ে যাচ্ছে সে।

এত বড় ফ্ল্যাটটায় বউদি যথারীতি একা। যেদিন যাই, প্রায় সারাদিনই কাটিয়ে আসতে হয়। বউদির হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি মেলে না।

আর যতক্ষণ থাকি, বসে বসে বউদির দিনযাপনের পদ্ধতি লক্ষ্য করি।

পদ্ধতি আর কি! মিসেস মিত্রের বাড়ি চাকরি নেবার আগে কিছুদিন এখানে থেকে গেছি। অতএব কিছুই আমার অজ্ঞাত নয়। বউদির দিন কিভাবে কাটে, সবই জানি।

সীতেশদার মত একই নিয়মে বউদিও নিজের অভ্যাসগুলির পুনরাবৃত্তি করে যায়। সেখানে নতুনত্বের কোন সুরই লাগে নি।

সমস্ত দিন উৎকট সাজগোজ চলতেই থাকে। একেক বার একেক রকম সাজে সেজে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় বউদি। এবং তাকে কতখানি মনোহারিণী দেখাচ্ছে প্রশ্ন করে করে সেটা যাচাই করে নেয়।

সীতেশদার নিশি-সঙ্গিনীদের সঙ্গে প্রাণান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে বউদি। হায় রে প্রাণধারণ!

সীতেশদার বাড়িতে রোজই আমি যাই না। যেতে ইচ্ছাও করে না। একটি স্থূলাঙ্গিনী বীভৎস স্ত্রীলোকের রুচিহীন সাজসজ্জার পেছনে এ-যুগের যে ট্রাজেডি রয়েছে প্রতি মুহূর্তে তা আমাকে পীড়িত বিদ্ধ এবং বিচলিত করতে থাকে।

মাঝে মাঝে লক্ষ্যহীনের মত এই শহরের পথে পথে আমি ঘুরে বেড়াই।

কিন্তু এটা উনিশ শ পঁয়তাল্লিশের কলকাতা। কোথায় কোন দিকে আমি পা বাড়াব!

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে আর দাক্ষিণের ঢলে বাঙলাদেশের নানা দিগন্ত থেকে যারা এখানে ভেসে এসেছিল দু-বছরে তারা প্রেত হয়ে গেছে। বিশ শতকের সভ্য সুসজ্জিত আধুনিক এই শহরে সেই প্রেতমূর্তিরা একমুঠো খাদ্যের প্রত্যাশায় হন্যে হয়ে ঘোরে। লঙ্গরখানার কাছের বাতাস দিবারাত্রি তাদের নাকিসুরের কান্নায় মথিত হতে থাকে। কলকাতার আত্মা মুহূর্তের জন্যও বুঝি বিচলিত হয় না। নিজের কক্ষে পরম নির্ভাবনায় অবিরত ঘুরেই চলেছে সে। হায় আত্মবিস্মৃত শহর!

একদিকে এই প্রেতের মিছিল। আরেক দিকে বিপরীত ছবি। যুদ্ধ

থামলেও তার জের কাটে নি। সব বাড়ির সামনেই ব্যাফেল ওয়াল, পার্কে পার্কে ট্রেঞ্চ কাটা, রাস্তার আলোগুলোর চোখে এখনও ঠুলি-পরানো। গাড়ি-ট্রাক-জীপ—সব ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায়। তেতাল্লিশের ঢলে যারা ভেসে এসেছিল তাদের বেশির ভাগকেই এই শহর হত্যা করেছে। দুর্জয় প্রাণশক্তি নিয়ে এখনও যারা টিকে আছে তাদের কেউ কেউ বেপরোয়া ধাবমান মিলিটারি ট্রাকের তলায় চ্যাপ্টা হয়ে মোক্ষ লাভ করে বসে।

তৃতীয় একটি ছবিও চোখে পড়ে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। কাজেই প্রাচ্যের এই সুবিশাল নগরকে রক্ষা করার জন্য যে সব ব্রিটিশ আর আমেরিকান বংশ অবতংসরা এসেছিল তাদের এখন নৈষ্কর্ম ব্রত চলছে। অখণ্ড অবকাশ কাটাবার জন্য কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় তারা ঘুরে বেড়ায়। মুদ্রাস্ফীতির কল্যাণে তাদের পকেট কখনই ফাঁকা নয়। মুঠোয় মুঠোয় রেজগি ছুঁড়ে হরির লুট দেয় তারা। তেতাল্লিশের প্রেতেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে কাড়াকাড়ি মারামারি রক্তারক্তি শুরু করে দেয়। ফোটো তুলতে তুলতে টমিরা উৎসাহ দেয়, 'বাক আপ—বাক আপ—'

এই কলকাতার চতুর্থ আরেকটা দিকও আছে। দিনের বেলাতেই আজকাল বেশ্যার পাল অন্ধকার বিবর থেকে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। এই শহরের পথে পথে বিষাক্ত জীবাণুর মত তারা কিলবিল করে বেড়ায়।

যুদ্ধের আগে যে স্তিমিত সুস্থ সহিষ্ণু কলকাতাকে আমি জানতাম, আট বছরে তার আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে গেছে। এখন সে অস্বাভাবিক, অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত। তার ধমনী অতিমাত্রায় চঞ্চল আর উত্তেজিত।

একদিন অন্যমনস্কের মত মধ্য কলকাতার একটা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সময়টা দুপুর। রাস্তাটা প্রায় নির্জনই ছিল।

হঠাৎ সমস্ত নির্জনতাকে চকিত করে চিৎকার উঠল। ভয়ার্ত তীক্ষ্ণ স্বরে কে যেন পেছন থেকে ডেকে উঠল, 'শুনছেন—শুনছেন—'

ফিরে তাকালাম। যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে প্রথমটা বিহ্বল হয়ে পড়লাম। একটি তরুণী ঊর্ধ্বশ্বাসে আমার দিকে ছুটে আসছে। তার পিছু পিছু একটা মিলিটারি টমি।

ছুটতে ছুটতে মেয়েটা প্রায় মূর্ছিতের মত আমার ওপর এসে পড়ল। দু-হাতে তাকে ধরে কোন রকমে টাল সামলালাম।

ওদিকে টমিটা আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কি ভেবে সে আর এগুলো না। বাঁ দিকের একটা রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে মেয়েটির বুক তোলপাড় করে জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে। সর্বাঙ্গে আতঙ্কের ছাপ মাখা। স্খলিত রুদ্ধস্বরে সে বলল, 'আপনি না থাকলে আজ কি যে হত।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। বলা হল না। এতক্ষণ ভালভাবে লক্ষ্য করি নি। এবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার গলা থেকে প্রায় চিৎকারই বেরিয়ে এল, 'আপনি!'

প্রায় নাটকীয় যোগাযোগই বলতে হবে। মেয়েটা বুলাকি।

বুলাকিও অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার আতঙ্কগ্রস্ত মুখচোখের সঙ্গে অনেকখানি বিস্ময় যেন মিশেছে। আধফোটা গলায় সে বলল, 'সীতেশবাবুদের বাড়ি আপনাকে দেখেছিলাম না!'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এখানে—এভাবে—' বলতে বলতে থমকে গেলাম।

আমার মনোভাব যেন বুঝতে পারল বুলাকি। টমিজনিত সেই ভীতি এখনও তার কাটে নি। সন্ত্রস্ত সুরে সে বলল, 'চাকরির খোঁজে এদিকে এসেছিলাম। রাস্তা ফাঁকা ছিল। ঐ মাতাল টমিটা—ওঃ, আপনি না থাকলে আজ—'

'চাকরি খুঁজতে এসেছিলেন!' দ্বিতীয় বার আমাকে অবাক হতে হল। এই শরীর-সর্বস্ব মেয়েটি সম্বন্ধে শ্যামবাজারের সেই বাড়িওলার মুখে যে মন্তব্য শুনেছি এবং সীতেশদার বাড়িতে যে অবস্থায় দেখেছি তাতে এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। বরং প্রথম দিন থেকেই আমার সমস্ত অস্তিত্ব তার প্রতি বিমুখ হয়ে আছে। সীতেশদার মত মুরুব্বি যার পেছনে সে যে ঘটা করে চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছে—ব্যাপারটা কেমন যেন অবিশ্বাস্যই মনে হল।

দ্বিতীয় বিস্ময়টা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। নিজের অজ্ঞাতসারে অতর্কিতে বলে ফেললাম, 'আপনার আবার চাকরির দরকার কি!' বলেই বুঝলাম শ্লেষে ব্যঙ্গ আমার গলা অত্যন্ত নিষ্ঠুর শোনাচ্ছে। আর এ-ও বুঝলাম প্রায় অপরিচিত একটি মেয়েকে এ-জাতীয় কথা বলা একান্তই অশোভন।

একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বুলাকি। বিচিত্র করুণ একটু হেসে সে বলল, 'আমার চাকরির দরকার নেই? আমার সম্বন্ধে কতটুকু জানেন আপনি!'

তার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চকিত হয়ে উঠলাম। কিছু একটা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলার কাছে অনেকগুলো ভারী স্তর যেন পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। সেই স্তর ঠেলে স্বরটা মুক্তি পেল না।

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

একসময় বুলাকিই স্তব্ধতা ভাঙল, 'একটা কথা বলব, যদি কিছু মনে না করেন—'

'কী?'

'আপনার এখন কোন কাজ আছে?'

'না।'

'দেখুন আমার খুব ভয় করছে। টমিটা অনেকক্ষণ আমার পেছনে লেগেছে। হয়ত কোথাও লুকিয়ে আছে। আপনি চলে গেলেই সে আবার তাড়া করবে। আপনি যদি—'

'কী?'

'দয়া করে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসেন—'

একটু ইতস্তত করে বললাম, 'চলুন—'

শ্যামবাজারের সর্পিল গলিতে সেই জীর্ণ দোতালা বাড়িটায় আমাকে নিয়ে এল বুলাকি।

যুদ্ধের আগে সীতেশদারা যখন এখানে থাকত বহুবার এসেছি। যুদ্ধের পর একবার মাত্র এসেছিলাম। আজ আবার এলাম।

এ-বাড়িতে সদর-অন্দর সবই আমার পরিচিত। শান-বাঁধানো বিস্তৃত একটি উঠোনকে বৃত্তাকারে ঘিরে সারি সারি অগুণতি ঘর। ঘর বললে যথেষ্ট বলা হয়। অতখানি মর্যাদা অবশ্যই এগুলোর প্রাপ্য নয়।

এ-বাড়িতে শীত-গ্রীষ্ম-শরৎ-হেমন্ত—বছরের কোন ঋতুই ঠিকমত টের পাওয়া যায় না। সব সময় ছায়া-ছায়া অন্ধকার; একটা বিষণ্ণ সন্ধ্যা প্রতি মুহূর্তেই যেন ঘনিয়ে থাকে। অন্য ঋতু না হোক, বর্ষাটা কিন্তু এখানে বড় বেশি সোচ্চার আর অকৃপণ। প্রলয় পয়োধি জলে বাড়িটা তখন একটা দ্বীপ হয়ে যায়। বর্ষা যেন একাই অন্য সব ঋতুর ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

উঠোন পেরিয়ে বুলাকির পিছু-পিছু দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরখানায় গিয়ে ঢুকলাম। সেখানে কোন চমকই নেই। মধ্যবিত্ত ক্লাসের নিম্নতম স্তরে যাদের স্থান তাদের ঘরে কি থাকে, আমার অজানা নয়। একটা তক্তাপোশ, তার উপর ছেঁড়া তোষক, বিবর্ণ বিছানা। এ-কোণে ও-কোণে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বালতি-উনুন-হাঁড়ি-কড়া-ট্রাঙ্ক-টিনের স্যুটকেস। একপাশে একটা আলনা। ক'টি ময়লা কাপড় সেখানে ঝুলছে। বোঝা যায়, এটা শোবার তথা রান্নার তথা বসবার ঘর।

বুলকি বলল, 'বসুন—'

তার নির্দেশমত তক্তাপোশে বসে পড়লাম।

ঘরখানি মালপত্রেই ঠাসা নয়। ক'টি জীবন্ত মানুষও এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে একজন মধ্যবয়সী বিধবা প্রৌঢ়া বসে আছেন। অনুমান করলাম বুলাকির মা। ষোল-সতের বছরের একটি মেয়ে এবং বছর তের চোদ্দর একটি ছেলেকেও আবিষ্কার করা গেল। ছেলে আর মেয়েটির চেহারা আর মুখচোখের ছাঁদ দেখে বুঝলাম বুলাকির ভাই-বোন।

আমাকে বসিয়ে বুলাকি বোনের কাছে গেল। চাপা নিচু স্বরে বলল, 'মা আজ কেমন আছে রে সন্ধ্যা?'

মেয়েটি অর্থাৎ সন্ধ্যা বলল, 'তুমি বেরিয়ে যাবার পর খুব বাড়াবাড়ি করছিল। খানিকটা আগে শান্ত হয়েছে।'

মায়ের সম্বন্ধে বুলাকি আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়ে গলার স্বরটাকে আরো অতলে নামিয়ে দিল, 'দুধ-চিনি আছে ঘরে?'

'আছে।'

'তা হলে বাড়িওলাদের উনুন থেকে একটু চায়ের জল করে আন।'

যত অস্পষ্টই হোক, বুলাকির কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলাম। ব্যস্তভাবে বলে উঠলাম, 'না-না, এখন আর চা করতে হবে না।'

বুলকি আমার আপত্তি গ্রাহ্য করল না। একটা কেটলি দিয়ে সন্ধ্যাকে বাড়িওলার ঘরে পাঠিয়ে দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি একটু বসুন। আমি হাত মুখটা ধুয়ে আসি।' বলতে বলতেই বেরিয়ে গেল সে।

বুলকিরা অনেকক্ষণ গেছে। লক্ষ্য করি নি, এতক্ষণ সেই প্রৌঢ়াটি স্থির চোখে প্রায় নিষ্পলকে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অন্যমনস্কের মত চার-পাশের পরিবেশ দেখতে দেখতে চোখাচোখি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠলাম। স্নায়ুর মধ্য দিয়ে একটা চমক বয়ে গেল। এমন ক্রূর সন্দিগ্ধ ভয়াবহ চোখ আগে আর কখনও দেখেছি কি! দৃষ্টিতে পৃথিবীর সবটুকু বিষ, হিংস্রতা এবং সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে মহিলাটি আমাকে দেখছেন। অসহায় একটা শিকারের মত ঘামতে লাগলাম। হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে আসতে লাগল যেন।

কতক্ষণ পরস্পরের দিকে আমরা তাকিয়ে ছিলাম, বলতে পারব না। এক সময়ে প্রৌঢ়া উঠে পড়লেন। পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর দু-হাতে আমার গলাটা টিপে ধরে দাঁতে দাঁত পিষে তীব্র উন্মত্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আবার এসেছিস রাক্ষস! মেয়েটাকে চিবিয়ে না খাওয়া পর্যন্ত বুঝি ছাড়বি না! কিন্তু তা হবে না, আমার জ্ঞানটা যদ্দিন আছে—'

এমন একটা পরিস্থিতিতে যে এসে পড়ব, এ ছিল আমার পক্ষে অকল্পনীয়। যুগপৎ ভয় এবং বিহ্বলতা আমাকে ঘিরে ধরল যেন। সন্ত্রস্তের মত এদিক সেদিক তাকাতে লাগলাম।

বুলকির ছোট ভাইটি ঘরেই ছিল। সে চিৎকার করে উঠল, 'বড়দি বড়দি, শিগগির আয়—'

বাইরে কোথা থেকে যেন ছুটে এল বুলকি। আমার গলা থেকে প্রৌঢ়ার হাত ছাড়িয়ে তাঁকে মেঝেতে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'কী হচ্ছে মা!'

প্রৌঢ়া আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'এই রাক্ষসটা তোকে গিলতে এসেছে। তাই গলাটা টিপে—'

'আঃ চুপ করবে—' বুলকি ধমকে উঠল।

ধমকে খানিকটা কাজ হল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বিড় বিড় করে প্রৌঢ়া কি বকতে লাগলেন, বোঝা গেল না।

তাঁকে শান্ত করে আমার কাছে এল বুলকি। অনুনয়ের সুরে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মা'র মাথার গণ্ডগোল আছে।'

'না-না, মনে কিছু করি নি। আপনার মা'র অবস্থা বুঝতে পেরেছি।' বুলকিকে আশ্বস্ত করলাম।

'সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সত্যি।'

এরপর সামান্য কিছু কথা হল। অবশেষে এক সময় চা খেয়ে উঠে পড়লাম।

বুলাকি ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে এল। বলল, 'আবার আসবেন।'

'আসব। এবার আপনি বাড়ি ফিরুন।' আমি বিদায় নিলাম।

সেই প্রথম দিনটির পর শ্যামবাজারের সেই বাড়িটায় আমি আরো কয়েকবার গেছি। না গিয়ে পারি নি। দুর্বার আকর্ষণে বুলাকিরা আমাকে টেনে নিয়ে গেছে যেন। সে আকর্ষণ উপেক্ষা করব, সাধ্য কি!

দু-একবার যাবার পরই বুলাকির ছোট ভাই-বোন দু'টি সন্ধ্যা এবং মণ্টুর সঙ্গে আলাপ জমে উঠেছে। তাদের বা আমার—কোন পক্ষেরই আর আড়ষ্টতা নেই। প্রথম পরিচয়ের সব জড়তাটুকু কেটে গেছে। আজকাল অসঙ্কোচে অবাধে তারা সব কথা বলে।

বুলাকি কিংবা তার ভাইবোন দুটির কাছে আমার অস্বাচ্ছন্দ্য নেই। তবে তার মায়ের কাছ থেকে একটা সভয় দূরত্ব বজায় রেখেই চলি। প্রথম দিনের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ভুলে যাই নি।

এ বাড়িতে আমার ভূমিকা কী, আবিষ্কার করতে গিয়ে একদিন অনুভব করেছি, বুলাকিদের আমি শুভাকাঙ্ক্ষী। তারাও প্রথম দিন থেকে সে-ভাবেই আমাকে মেনে নিয়েছে।

নিয়মিত যাতায়াত করতে করতে বুলাকিদের পারিবারিক ইতিহাস জেনেছি। একদিনে নয়, ধীরে ধীরে। কিছুটা বুলাকির মুখে, কিছুটা সন্ধ্যার মুখে, আবার কিছুটা বা মণ্টুর কাছে।

যতই তাদের কথা শুনেছি ততই স্তব্ধ অভিভূত হয়েছি। করুণ বিষাদে সমস্ত চেতনাই বুঝি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সহানুভূতি বা সমবেদনার একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারি নি। তাদের ইতিহাস ধারাবাহিক অধঃপতনের, অবিরাম ক্ষয়ের।

নদীয়া জেলার এক অখ্যাত গ্রামে বুলাকিদের আদি সাকিন। যুদ্ধের অনেক আগে কেরানীগিরির একটি চাকরি জুটিয়ে তার বাবা কলকাতায় এসেছিলেন। তারপর শুরু হয়েছিল এই শহরের খরধার স্রোতে অবিরত পাক খাওয়া। আজ কালীঘাট, কাল বাগবাজার, পরশু ভবানীপুর। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত শ্যামবাজারের জন্মান্ধ গলির রুদ্ধশ্বাস একখানি ঘরে। এই আলোবাতাসহীন অমানুষিক পরিবেশের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুঝতে পারেন নি বুলাকির বাবা। অজ্ঞাতসারে ফুসফুসে একদিন ক্ষয় ধরেছিল। যখন সেটা ধরা পড়ল, নিয়তির হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করণীয় ছিল না।

তখন যুদ্ধের মাঝামাঝি। এই শহরকে ফাঁকা করে 'ইভাকুয়েসন' শুরু হয়ে গেছে। ওষুধ-পথ্য-খাদ্য—সব কিছুই যুদ্ধের উদরে চলে যাচ্ছে। মাসখানেক শয্যাশায়ী থেকে ভদ্রলোক মারা গেলেন।

কথায় বলে 'ভেসে যাওয়া'। তার স্বরূপ যে কী, বাবার মৃত্যুর পর সেটা

প্রথম বুঝতে পারল বুলকিরা। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুলকি সবার বড়। ঝড়টা তার ওপরেই এসে পড়ল। ঝড় না বলে তাকে প্রলয় বলাই উচিত।

সঞ্চয় কিছুই রেখে যান নি বুলকির বাবা। বদলে প্রচুর ঋণের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন।

এদিকে স্বামীর মৃত্যুর আঘাতটা সামলাতে পারেন নি বুলকির মা। মাথার কিছু দোষ হয়ে গেছে। মায়ের অস্বাভাবিক অসুস্থ অবস্থা, তার ওপর নিজে, দুটি ভাই বোন—সব মিলে কী করবে, কিছুই স্থির করতে পারছিল না বুলকি। মনে হচ্ছিল অথৈ অন্ধকারে একটু একটু করে হারিয়ে যাবে।

ভরসার মধ্যে এটুকুই ছিল, বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে ম্যাট্রিকটা পাশ করে নিয়েছিল। যুদ্ধের বাজার। চাকরি পাওয়ার অসুবিধে ছিল না। বাবার মৃত্যুর আঘাত সামলে উঠে সে স্থির করেছিল, চাকরি করবে।

কিন্তু চাকরি করতে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না।

সীতেশদা তখনও এ-বাড়িতেই আছে। সাদার্ণ অ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটে উঠে যায় নি। এ-বাড়িতে থাকতে থাকতেই ইন্সিওরেন্স কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাপ্লাইয়ের ব্যবসা ধরেছিল। এবং অঢেল পয়সা সেই সূত্রে আসছিল।

সীতেশদাই যুগপৎ রক্ষক এবং হিতাকাঙ্ক্ষীর ভূমিকায় এগিয়ে এসেছিল। বুলকিদের ঋণ সে শোধ করে দিল। সংসারের সব দায়িত্ব নিল। কৃতজ্ঞতায় বুলকির মন ভরে গিয়েছিল।

কিন্তু ধীরে ধীরে একদিন বোঝা গেল সীতেশদার এই পরোপকার একেবারে নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ নয়। এ যুগের অতল অন্ধকারে বুলকিকে একটু একটু করে টেনে নিয়ে চলেছে সে।

বোঝামাত্র অস্থির হয়ে পড়েছিল বুলকি। কিন্তু কোনদিকে বেরুবার মত একটা পথও ছিল না। পাগল মা আর ভাইবোন দুটির দিকে তাকিয়ে নিদারুণ এক মৃত্যুকে মেনে নেওয়া ছাড়া তখন উপায় কী?

সীতেশদার রাহুগ্রাস থেকে কোনদিনই বুঝি বেরিয়ে আসা যাবে না।

তবু—তবু সবার অগোচরে রোজ চাকরি খুঁজতে বেরোয় বুলকি। দুঃখী অসহায় মেয়েটা এখনও মুক্তির স্বপ্ন দেখে।

এগার

চৌরঙ্গীর সেই সুবিশাল হোটেলে সতের নম্বর কেবিনটিতে গিয়ে বসা আমার রোজকার নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

মিসেস মিত্র যেদিন প্রথম আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন তার পর দু'টি সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যে হলেই দাড়ি কামিয়ে প্যান্টে-শার্টে-টাইয়ে নিজেকে নিখুঁত উজ্জ্বল করে তুলি। অবশেষে পীর আলীকে বাহন করে চৌরঙ্গীর দিকে দৌড়।

প্রথম প্রথম আজন্মের এই চির-অচেনা অনভ্যস্ত জায়গায় শ্বাস যেন

আটকে আসত। আজকাল পরিবেশের সঙ্গে অনেকখানি খাপ খাইয়ে নিয়েছি।

বিকেলের দিকে ইদানীং মিসেস মিত্রের সঙ্গে চা খাওয়া বন্ধ হয়েছে। তার বদলে হোটেলে এসেই মেনুটার মধ্যে সমস্ত মনোযোগ সঁপে দিই। খাদ্যের যে বিস্তৃত তালিকা ছাপানো রয়েছে তার কোনটা যে কী, সবই আমার অজ্ঞাত। একটা দুর্বোধ্য ধাঁধার মত মনে হয়। তাদের স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ কিছুই জানি না। এর আগে তাদের নামগুলিও অশ্রুত ছিল।

যাই হোক, আসার সময় বাড়ি থেকে ছোট ছোট কাগজের টুকরো নিয়ে আসি। একেকটা কাগজে একেকটা খাবারের নাম লিখে ডেলা পাকিয়ে ফেলি। হাতের মুঠোয় সেই ডেলাগুলোকে ঝাঁকিয়ে টেবিলে ছড়িয়ে দিই। তারপর চোখ বুজে অনেকটা লটারির মত করে একটা কাগজ তুলে নিই। সেটা খুলে যে নামটা পাওয়া যায়, বয়কে ডেকে তার অর্ডার দিই।

আগে আগে সময় আর কাটতে চাইত না। আজকাল খেয়েই দুঃসহ একাকীত্ব ভুলতে চেষ্টা করি।

কিন্তু কত আর খাওয়া যায়? আর খেয়ে সময়ের কতটুকু অংশই বা নষ্ট করা যায়!

সাতটার সময় এখানে হাজিরা দিই। প্রতিদিনই প্রায় দশটা এগারটা পর্যন্ত থাকতে হয়। কেননা পাশের আঠার নম্বর কেবিনে নীনীর কখন আবির্ভাব ঘটবে—সে এক জটিল রহস্য। কোনদিন আটটার মধ্যেই এসে পড়ে। কোনদিন বা এগারটায়।

যে ঘরটার আয়তন পঞ্চাশ বর্গফুট—তার মধ্যে তিন চার ঘণ্টা সময় নিশ্চল বসে থাকা যে কি নিদারুণ অস্বস্তি সে শুধু আমিই বুঝি।

মিসেস মিত্র বলেছিলেন, 'ড্রিংকের হ্যাবিট থাকলে সময় কাটানো আদৌ কষ্টকর নয়। তিন চারটে ঘণ্টা ঝড়ের মত উড়ে যাবে।'

আজকাল আমার সংশয় হয়, মিসেস মিত্রের কথাই বুঝি ঠিক। ফেনিল আরকে নিমজ্জিত হতে পারলে একাকীত্ব আর সময় কাটাবার দুশ্চিন্তা থেকে অনায়াসেই মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু সেই যে আজন্মের সংস্কারটা—তাকে অতিক্রম করা আমার সাধ্যের বাইরে। ফেনিলোচ্ছল পানীয় সম্পর্কে আমার চিরদিনের একটা শুচিবাই রয়েছে। অতএব মাঝে মাঝে দুরন্ত আকর্ষণ সত্ত্বেও ওটাকে দূরেই সরিয়ে রেখেছি।

দু সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন নিয়মিত সতের নম্বর এই কেবিনটায় এসে বসছি। দু সপ্তাহ অর্থাৎ চোদ্দ দিন। এর মধ্যে তিন দিন নীনী পাশের কেবিনে আসে নি। রাত এগারটা পর্যন্ত তার জন্য বসে থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত ফিরে গেছি। বাকি এগারটা দিন অবশ্য সে এসেছে। একা নয়, মুখার্জির সঙ্গে।

প্রথম দিন পাশের কেবিনে কিছুক্ষণ ড্রিঙ্ক করে নীনী আর মুখার্জি বি. টি. রোডের দিকে বেড়াতে গিয়েছিল। বাকি দশ দিন তারা কোথাও যায় নি। এগারটা পুর্যন্ত হোটেলে কাটিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে গেছে। প্রথম দিন

পারি নি কিন্তু তারপর থেকে শিকারী কুকুরের মত প্রতিদিনই তাদের পিছু নিয়েছি। লক্ষ্য করেছি, মুখার্জী রোজই নীনীকে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

এই হোটেলে নীনী আর মুখার্জীকে এ পর্যন্ত এগার বার দেখেছি। ইতি-মধ্যে মুখার্জির পরিচয়টা জানতে পেরেছি। একটা বিরাট জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজার সে।

হোটেলে যতক্ষণ থাকে প্রায় নিঃশব্দে ড্রিঙ্ক করে যায় নীনী। তার সঙ্গীও ড্রিঙ্ক করে, তবে নীরবে নয়। সর্বক্ষণই সে বকবকায়মান। অবিরাম কথা বলে মুখার্জী এবং তার বক্তব্যের প্রায় সবটুকুই নীনীর রূপের বন্দনা।

আরো একটা ব্যাপার জেনেছি, মুখার্জী বিবাহিত। কিন্তু নীনীকে দেখার পর স্ত্রীর প্রতি তার আর মোহ নেই। বরং প্রতিদিনই বিতৃষ্ণা বেড়ে চলেছে। এখন নীনী যদি সদয় হয় স্ত্রীকে বিসর্জন দিয়ে তাকে নিয়ে জীবনের সিংহাসনে বসাবে। মুখার্জীর প্রতিটি কথার মধ্যেই নিরুচ্চার একটা মন্ত্র থাকে যেন, 'দেবী প্রসীদ—দেবী প্রসীদ'—হায় রে অবোধ পতঙ্গ!

দেবী প্রসন্ন হয় কি-না জানি না। মুখার্জীর প্রতি তার সদয় হবার বিশেষ কোন লক্ষণই পাশের কেবিন থেকে বুঝতে পারি না। শুধু এটুকুই অনুভব করি, মুখার্জী যখন নীনীর একটু কৃপার জন্য উন্মাদ অস্থির, তার একটু সম্মতির জন্য উন্মুখ, বরদাত্রী দেবীটি সেই সময় একেবারেই নির্বাক। পাশের কেবিন থেকে দেখতে পাই না, তবে বুঝতে পারি সেই সময়টা নিষ্ঠুর অন্য-মনস্কের মত চুপচাপ পানপাত্রে চুমুক দিতে থাকে নীনী।

অন্য দিনের মত আজও যথাসময়ে হোটেলে এসেছি। এসেই কোনদিকে না তাকিয়ে দম-দেওয়া পুতুলের মত নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে নিজেকে স্থাপিত করেছি। তারপর লটারি করে একটা খাবারের নাম তুলে বয়কে অর্ডার দিয়েছি। অবশেষে পাশের কেবিনে নীনীদের আবির্ভাবের আশায় উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠ হয়ে আছি।

খানিকটা পরেই বয়টা সুদৃশ্য প্লেটে খাবার দিয়ে গেল। মেনুতে খাদ্যটির নাম লেখা আছে 'ক্রীম ফাউল'। বাঙলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় মাখনমুরগী।

উষ্ণ সোনালী মাখনের মাঝখানে মুরগীর মাংসের টুকরোগুলি চমৎকার-ভাবে সাজানো। এগুলির মধ্য থেকে একটা সুঘ্রাণ ধোঁয়ার আকারে উঠে এসে সমস্ত স্নায়ুর ভেতর ছড়িয়ে পড়ছে যেন।

ফর্ক দিয়ে গেঁথে মাংসের একটা টুকরো সবেমাত্র মুখের কাছে এনেছি, ঠিক সেই সময় পাশের কেবিনে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। মনে হল একজন কেউ এসেছে। মুহূর্তে চকিত হয়ে উঠলাম।

প্রতিদিন দু-জোড়া পায়ের শব্দে আমি অভ্যস্ত। মুখার্জী আর নীনী একসঙ্গে আসে। কিন্তু আজ একজন এসেছে।

মুখার্জি না নীনী, কে এসেছে? জানবার জন্য কৌতূহলটা অদম্য হয়ে উঠল। উঠে গিয়ে পর্দা সরিয়ে হয়ত উঁকিই দিয়ে বসতাম। হঠাৎ মনে পড়ল,

মিসেস মিত্র নির্দেশ দিয়েছেন আড়ালে থেকে নীনীর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে। কোন ক্রমেই যেন ধরা না পড়ে যাই। অতএব কৌতূহলটাকে সবলে মন থেকে সরিয়ে দিতে হল।

একটু পরেই বুঝতে পারলাম একটা বয় পাশের কেবিনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, 'কী আনব মেমসাব ?'

মেমসাব ! তবে কি—

আমার ভাবনাটা শেষ হবার আগেই আঠার নম্বর কেবিনে যে বসে ছিল সে বলল, 'এক পেগ হুইস্কি, তার সঙ্গে একটু পাতি লেবু মিশিয়ে আনবে। জল্‌দি—'

গলার স্বরেই নিঃসংশয় হওয়া গেল। নীনী। দু-সপ্তাহ আমি তার পেছনে ছায়ার মত আছি। কিন্তু মুখার্জীকে ছাড়া এই হোটেলে নীনীকে একা একা আগে আর দেখিনি।

এমনও হতে পারে, নীনী আগেই এসে পড়েছে। মুখার্জি পরে আসবে।

মুখার্জি যখন আসে আসবে। না আসে না আসবে। আমি তো নরকের প্রহরী কাছেই রইলাম।

ক্রীম-ফাউলের প্লেটটা ধোঁয়া উড়িয়ে উড়িয়ে ক্রমশ শীতল হয়ে যাচ্ছে। আর উপেক্ষা করা উচিত হবে না। আপাতত তার মধ্যেই মনপ্রাণ সঁপে দিলাম।

প্লেটটা যখন প্রায় নিঃশেষ ঠিক সেই সময় একটা বয় পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। আমাকে যে খাবার দিয়ে গিয়েছিল, এ সে নয়। ঈষৎ বিরক্ত সুরেই বললাম, 'কী চাই ?'

'জী—' নতচোখে বয়টা বলল, 'আপনি চ্যাটার্জি সাব তো ?'

'হ্যাঁ—' এবার একটু অবাক হয়েই বললাম, 'কিন্তু তুমি জানলে কেমন করে ?'

'পাশের কেবিনের মেমসাব বলেছেন।' আগের মতই সুরহীন গলায় বয়টা বলল।

আর সমস্ত স্নায়ুর মধ্য দিয়ে একটা দ্রুতবহ চমক খেলে গেল আমার। পাশের কামরার মেমসাব ! নিঃসন্দেহে নীনী। আমি যে এ কেবিনে বসে আছি, সে কেমন করে জানতে পারল !

বয়টা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী উদ্দেশ্যে তার আগমন জানি না। সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করার আগেই আবার বলে উঠল, 'থোড়া মেহেরবানী করে যদি পাশের কেবিনে আসেন—'

'কেন ?'

'মেমসাব আপনাকে যেতে বলেছেন।'

কাঁপা অস্ফুট স্বরে বললাম, 'চল, যাচ্ছি—'

সতের নম্বর থেকে আঠার নম্বর। কতটুকুই বা দূরত্ব ? মাত্র কয়েক ফুট। কিন্তু বয়টার সঙ্গে সেখানে পৌঁছুতে মনে হল কয়েক যোজন পাড়ি দিয়ে এলাম। পা দুটো আমার টলছে, সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘামের ঢল নেমেছে। মনে হল,

সব দূরত্ব গজ-ফুটের হিসেবে মাপা যায় না।

বিচিত্র স্নায়ুভীতিতে প্রায় আচ্ছন্নই হয়ে যাচ্ছি। নীনীর চলাফেরার ওপর তার অজান্তে এতকাল নজর রাখছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমার লুকোচুরিটা ধরা পড়ে গেল নাকি!

আমাকে তার কামরায় ডাকিয়ে কী করতে চায় নীনী? কী বলবে সে? গালাগাল দেবে? নাকি মদের ঘোরে মেরেই বসবে?

কী যে নীনী করবে, কিছুই অনুমান করতে পারছি না। আর পারছি না বলেই নিদারুণ এক আতঙ্কে আমার শ্বাস ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে।

আঠার নম্বর কেবিনের সামনে ঝুলন্ত কাশ্মীরী পর্দাটার কাছে এসে থমকে গেলাম।

বয়টা বলল, 'অন্দর যাইয়ে।' বলেই ডানদিকের বিস্তৃত বলরুম পার হয়ে ওয়াইন কাউণ্টারের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বয়টা বলল বটে কিন্তু ভেতরে যাবার মত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারলাম না। পর্দার এ-পাশে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে ইতস্তত করতে লাগলাম।

বেশিক্ষণ অবশ্য দাঁড়িয়ে থাকতে হল না। ভেতর থেকে নীনী ডাকল, 'কি আশ্চর্য, দাঁড়িয়ে আছেন কেন মিস্টার চ্যাটার্জি। আসুন, ভেতরে আসুন।'

গলার স্বরটাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু না, বিরক্তি রাগ বা অসন্তোষ—কিছুই সেখানে খুঁজে পাওয়া গেল না। বরং সাদর একটি আমন্ত্রণই রয়েছে তার মধ্যে।

অনেকখানি সংশয় আর বিচিত্র একটু উত্তেজনা নিয়ে পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

নীনীর হাতে একটা গেলাস ধরা ছিল। সেটা পরিপূর্ণ। যে ফেনিল রক্তবর্ণ তরলটুকু তার মধ্যে টলমল করছে এক চুমুকে তার অনেকখানি শেষ করে ফেলল নীনী। মুখোমুখি একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন—'

মন্ত্রাচ্ছন্নের মত তার নির্দেশ পালন করলাম।

আর নির্নিমেষ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল নীনী। তার নীলাভ চোখদুটি এই মুহূর্তে টকটকে লাল। সুরাপাত্রের রক্তিম ছটা গিয়ে যেন সেখানে লেগেছে।

নীনীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকার মত দুঃসাহস আমার নেই। মুখ নামিয়েই রাখলাম। আর ভয়ঙ্কর এক অস্বস্তি তীক্ষ্ণ সূচীমুখে আমাকে অবিরত বিদ্ধ করতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর নীনী ডাকল, 'তারপর মিস্টার চ্যাটার্জি—'

চোখ না তুলে জড়ানো গলায় সাড়া দিলাম, 'আজ্ঞে—'

'আপনি কিছু মনে করেন নি তো?'

নীনী কি বলতে চায় ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, 'কী জন্যে বলুন তো—'

'এই আপনাকে আমার কেবিনে ডাকিয়ে এনেছি বলে—'

'না-না, মনে করব কেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না নীনী। একটুক্ষণ কি যেন ভেবে শুরু করল, 'মাসখানেক ধরে আপনাকে আমাদের বাড়ি দেখছি। ঐ দেখা পর্যন্তই। এক বাড়িতে থাকি অথচ আলাপটাই হয় নি। তাই ভাবলাম একা-একাই তো বসে আছি। ভদ্রলোককে ডেকে নিই না। আলাপটা হবে, আর গল্পে গল্পে সময়টাও মন্দ কাটবে না।'

আশঙ্কা ছিল, রূঢ় অভদ্র ব্যবহারে আমাকে প্রচণ্ড অপমান করবে নীনী। কিন্তু তার কাছ থেকে যা পেলাম তা একেবারেই বিপরীত ব্যাপার। এবং অপ্রত্যাশিত। যাই হোক, নীনীর কথার উত্তর দিলাম না। শুধু বুঝতে চেষ্টা করলাম আমার সঙ্গে আলাপ করাই কি তার একমাত্র উদ্দেশ্য, না অন্য কোন গূঢ় গভীর মতলব আছে ?

নীনী আবার বলল, 'আচ্ছা মিস্টার চ্যাটার্জি'—'

'বলুন—' আমি উন্মুখ হলাম।

'আপনি তো প্রায়ই এখানে আসেন, তাই না ?'

মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটা শীতল স্রোত অতর্কিতে বয়ে গেল। ফাঁদে-পড়া অসহায় জন্তুর মত ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে লাগলাম। জড়িত গলায় কোন রকমে বলতে পারলাম, 'না-না, মানে—'

বিচিত্র একটু হাসল নীনী। বলল, 'আপনি তো আমার মা'র কাছে চাকরি নিয়েছেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী-কী কাজ করতে হয় ?'

সব জেনেও সব বুঝেও নীনী কি আমাকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলায় মেতেছে ! নতচোখে আস্তে আস্তে বললাম, 'কাজ আর কই। সারাদিনই তো একরকম বসে বসে কাটাই।'

গেলাসের অবশিষ্ট যে অংশটুকু ছিল, সব এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলল নীনী। তারপর বলল, 'সারাদিন বসে বসে কাটান, আর কাজ শুরু হয় বুঝি রাত্রে !'

থতমত খেয়ে গেলাম, 'আজ্ঞে—মানে—'

আমার কথা শেষ হল না। তার আগেই নিজের হাতঘড়িটার ওপর নীনীর নজর গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সচেতন এবং ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলল, 'ইস্, সাড়ে সাতটা বেজে গেল ! মুখার্জি বুলডগটা খুঁজতে খুঁজতে নিশ্চয়ই এখানে এসে পড়বে। তার আসার আগেই পালাতে হবে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল নীনী। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলি মিস্টার চ্যাটার্জি। আমার একটা জরুরি কাজ আছে। আচ্ছা, পরে আবার দেখা হবে। গুড নাইট।'

সামনের পর্দা সরিয়ে নীনী চলে গেল। বিমূঢ়ের মত আঠার নম্বর

কেবিনে বসে রইলাম। আমার চেতনার সকল স্তরে নীনীর সেই কথাগুলি ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, 'বুলডগ মুখার্জিটা—'

'বুলডগ মুখার্জি'—এই দুটি শব্দের মধ্যে দিয়ে মুখার্জি সম্বন্ধে নীনীর মনোভাবটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল।

কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই সচেতন হয়ে উঠলাম। এভাবে বসে বসে নীনী আর মুখার্জির সম্পর্ক নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্য আমার চাকরি হয় নি। আমার কাজ হল একাগ্র হয়ে নীনীকে অনুসরণ করা।

প্রায় লাফ দিয়েই উঠে পড়লাম। তারপর লম্বা লম্বা পায়ে সুবিশাল বলরুম পার হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

প্রথমদিন নীনী আমাকে ফাঁকি দিতে পেরেছিল। আজ পারল না। পোর্টিকোর নিচে এদিক-সেদিক তাকাতেই তাকে দেখতে পেলাম।

হাতের ইশারায় একটা ট্যাক্সি ডাকছিল নীনী। বুঝলাম আজ গাড়ি নিয়ে আসে নি সে।

একটা মুহূর্তও আর নষ্ট করলাম না। ঊর্ধ্বশ্বাসে রাস্তা পার হয়ে ওপারে চলে গেলাম। আমাদের গাড়িটা সেখানে পার্ক করা আছে। প্রায় স্টিয়ারিং ধরেই বসে ছিল পীর আলী। উঠেই বললাম, 'স্টার্ট দাও, কুইক।'

দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠেছি, পীর আলীকে স্টার্ট দেবার নির্দেশ দিয়েছি, সবই ঠিক। কিন্তু আমার একটা চোখ সারাক্ষণ নীনীর ওপর নিবদ্ধ। আমাদের গাড়িটা রাস্তায় এসে নামতেই দেখলাম নীনী ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছে। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেটা পার্ক স্ট্রীটের দিকে ছুটল।

পীর আলীকে নীনীর ট্যাক্সি দেখিয়ে বললাম, 'ওটার পিছু-পিছু চল—'

শ্রাবণের শেষ দিনটিতে আমি এই শহরে এসেছিলাম। এখন আশ্বিন যায় যায়।

আমি যেদিন কলকাতায় আসি সেদিনই জাপান আত্ম-সমর্পণ করেছিল। জাপানের সারেন্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওপর যবনিকা নেমে এসেছে।

মাস দুয়েক হল যুদ্ধ থেমেছে কিন্তু কর্পোরেশনের আলোগুলো এখনও অন্ধ। তাদের চোখ থেকে ঠুলি খসে নি। কলকাতার রাস্তাগুলো এখনও ব্ল্যাকআউটের গ্রাসে।

সময়টা যদিও আশ্বিনের শেষাশেষি, এরই মধ্যে কিন্তু হেমন্তের বিষণ্ণতার আমেজ লেগেছে কলকাতায়। ক'দিন আগেও সাদা সাদা তুলোর স্তূপের মত যে মনোহরণ ভবঘুরে মেঘগুলো ভেসে বেড়াত, এখন তাদের চিহ্নমাত্র নেই। আকাশটা রুক্ষ নীল। বাতাস জলভারহীন, শুষ্ক এবং হাল্কা।

ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার যে সাজবদল হতে শুরু করেছে সেদিকে আমার লক্ষ্য নেই। আমার ধ্যান-জ্ঞান-শিরা-স্নায়ু—সমস্ত কিছু একাকার হয়ে নীনীর ট্যাক্সিটার ওপর স্থির হয়ে আছে।

একসময় ট্যাক্সিটা চৌরঙ্গী ডাইনে রেখে পার্ক স্ট্রীটে ঢুকে পড়ল। তারপর

বাঁয়ে বেঁকে অনেকগুলো গলির গোলকধাঁধা পার হয়ে বিশাল একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

বাড়ি বললে যথেষ্ট বলা হয় না, বলা উচিত প্রাসাদ।

একটু পর ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে মুহূর্তে বাড়িটার ভেতর ঢুকে গেল নীনী।

আমাদের গাড়িটাও থেমে গিয়েছিল। পীর আলীকে বললাম, 'একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি।' বলেই নেমে পড়লাম।

সামনে এসে গুণে গুণে দেখলাম, বাড়িটা সাত তলা। একমুহূর্ত থমকে রইলাম। তারপর যে পথে নীনী ভেতরে গেছে সেই পথ ধরে এগিয়ে গেলাম।

ভেতরে ঢুকে স্তম্ভিত হতে হল। একদিকে দেওয়ালের গায়ে অগণিত লেটার বক্স। বিপরীত দিকে দুটো সদাব্যস্ত লিফ্‌ট। একবার তারা শূন্যে উঠে যাচ্ছে। পরক্ষণেই রসাতলে নেমে আসছে। লিফ্‌ট দুটোর পাশ দিয়ে ওপরে যাবার সিঁড়ি।

অসহায় দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগলাম। কিন্তু না, কোথাও নেই নীনী।

সে কি লিফ্‌টে করে উপরে গেছে? যদি যায়ই কোন তলায় গেছে, কে বলবে। আন্দাজে কোথায় খুঁজব তাকে? ভাবলাম, তার চাইতে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যাক। সব ক'টি ফ্লোর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখি যদি নীনীকে বার করতে পারি।

ভাবামাত্র সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।

দোতলায় এসে আমাকে বিমূঢ় হতে হল। সামনে-পেছনে-ডাইনে-বাঁয়ে, যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, লম্বা করিডর। সেগুলো যে কোন্ অনন্তে গিয়ে শেষ হয়েছে কে তার হদিশ দেবে।

করিডরগুলোর গায়ে সারিবন্ধ অসংখ্য ঘর। সেগুলোর সামনের দিকে কাচের জানালা আর একপাল্লার সুদৃশ্য দরজা।

আস্তে আস্তে প্রায় নিশি-পাওয়া একটা ঘোরের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিমের সমস্ত ঘরের পাশ দিয়ে একবার করে হেঁটে গেলাম। প্রতিটি ঘরেরই দরজা বন্ধ। সামনের দিকে যে কাচের জানালা রয়েছে সেগুলোও বন্ধ। ভেতরের অদৃশ্যলোকে কী রয়েছে, আমি কিছুই জানি না।

দোতলা থেকে গেলাম তিন তলায়। সেখান থেকে চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ তল পার হয়ে সাত তলায়। সর্বত্রই দোতলার মত ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পেছনে সারি সারি ঘর। তেমনই দরজা আর জানালা। সেগুলো দোতলার মতই বন্ধ।

এই অগণিত ঘরের অরণ্যের মধ্যে কোথা থেকে যে নীনীকে খুঁজে বার করব, বুঝতে পারছি না। প্রতিটি ঘরের কলিং বেল টিপে ডেকে ডেকে তার খোঁজ অবশ্য করা যায়। কিন্তু তা সময়-সাপেক্ষ। খোঁজ করতে করতেই রাত কাবার হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, তা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। তৃতীয়ত, প্রতিটি ঘরে হানা দেরার মত অতখানি দুঃসাহস আমার নেই। চতুর্থত, মিসেস মিত্রের

নির্দেশ রয়েছে নীনীর অজান্তে তার অনুসরণ করতে হবে। কাজেই ডাকাডাকি করতে গেলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাব।

এখন আমি কী করব ? ফিরে যাব কি ? না নিচের তলায় গিয়ে নীনীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকব ?

অপেক্ষাই যদি করি, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ? নিশ্চয়ই বারোটা একটা। কারণ ঘড়ির কাঁটা ঐ ঘরে না পৌঁছুলে নীনী বাড়ি ফেরে না।

ভাবনার মধ্যে অনেকক্ষণ আলোড়ন চলল। শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম নিচের তলায় গিয়ে অপেক্ষা করব। অতএব সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে লাগলাম।

আমার অনুমানই ঠিক। আটটার কিছু আগে এখানে এসেছি। কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় নীনীর দেখা মিলল। এমন আচমকা সে সামনে এসে পড়ল যে লুকোবার সুযোগ পেলাম না।

আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকেই কলকাতার বাতাসে চতুর্থ ঋতুর আমেজ লেগে গেছে। শরীরটাকে গরম রাখতে তাই একটা সিগারেট ধরিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে লম্বা টান দিতে দিতে কেমন যেন অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলাম। আর ঠিক সেই সময় মৃদু যান্ত্রিক শব্দ করে আমার ডান পাশের লিফ্‌টটা নেমে এসেছিল। আর তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল নীনী।

প্রথমটা চকিত হয়ে উঠেছিলাম। মুখ থেকে সিগারেটটা আপনিই খসে পড়ে গিয়েছিল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে লিফ্‌ট-বক্সটার দূরত্ব মাত্র কয়েক ফুট। বুঝতে পারছিলাম লিফ্‌টের এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা আমার উচিত হয় নি। কিন্তু সেই বোঝাটা এখন অর্থহীন।

এদিকে নীনীও থমকে গেছে। তার নীলাভ চোখ থেকে হিংস্র নিষ্ঠুরতা বেরিয়ে আসতে লাগল হল্কার মত।

কয়েকটা নিশ্চল স্তব্ধ মুহূর্ত। ফাঁদে-পড়া জন্তুর মত ভেতরে ভেতরে আমি তখন ছটফট করছি। হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল নীনী। বিচিত্র হেসে কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'কি সৌভাগ্য, আজ আপনার সঙ্গে দু-দু'বার দেখা হয়ে গেল।'

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলাম। গলার মধ্য থেকে জড়িত রুদ্ধ অব্যক্ত একটা গোঙানির মত কি যেন বেরিয়ে এল।

নীনী আবার বলল, 'এখানে কোন কাজে এসেছিলেন বুঝি ?'

এবারও আমি নিশ্চুপ।

নীনীর দৃষ্টি আমার মুখের ওপর স্থির হয়েই ছিল। সে বলতে লাগল, 'যাক গে ও-সব। আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে শুভেন্দু বাবু ?'

এতক্ষণে আমার গলা থেকে স্বরটা মুক্তি পেল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এখান থেকে আপনি কোথায় যাবেন ?'

'বাড়ি।'

'প্লিজ আমাকে একটু লিফ্‌ট দিন। আজ গাড়ি নিয়ে বেরুই নি। এত

রাত্রে ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল।'

নীনী আমার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখ থেকে উগ্র মিষ্টি একটা গন্ধ বেরিয়ে আসছে। সে গন্ধটি যে কিসের আমার অজানা নয়। নীল চোখ দুটিতে এখনও রক্তাভার ঘোর লেগে আছে তার।

নীনী তাড়া লাগাল, 'কি, দাঁড়িয়ে রইলেন যে। আমাকে লিফ্‌ট দিতে কি আপনার আপত্তি আছে?'

'না-না, আপত্তি কিসের। আসুন।' ব্যস্তভাবে বলে উঠলাম।

'চলুন—'

গাড়ির কাছে এসে পীর আলীর পাশে বসতে যাচ্ছিলাম। নীনী একরকম জোর করেই তার পাশে বসাল।

পাশাপাশি বসে আছি। দু-জনের মুখ কিন্তু দুই বিপরীত প্রান্তে ফেরানো। সময় এখানে স্রোতহীন, প্রায় রুদ্ধশ্বাস। আমি ভাবছিলাম, নীনী কি আশ্চর্য চতুর। আমি কী কারণে সেই সুবিশাল বাড়িটায় এসেছি তা না বোঝার কারণ নেই তার। সব বুঝেও না বোঝার ভাণ করছে সে।

গাড়িটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল। চলতে চলতে হঠাৎ মুখ ফেরাল নীনী। বলল, 'আচ্ছা শুভেন্দু বাবু—'

'বলুন—' চমকে ঘুরে বসলাম।

'আপনি সেই কবিতাটা পড়েছেন?'

'কোনটা?'

'সেই যে—' অনেকখানি এগিয়ে এসে প্রায় ঘনিষ্ঠ হয়েই বসল নীনী। তার পর শুরু করল:

জগৎ-মাঝারে যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
বসন্তে-শীতে দিবসে-নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ চিরশৃঙ্খল চরণ জড়ায়ে ধরে—
একবার তোরে দেখেছি যখন কেমনে এড়াবি মোরে?'

বিমূঢ়ের মত বললাম, 'হ্যাঁ পড়েছি। কিন্তু ঐ কবিতাটা—'

আমার মনোভাব যেন বুঝতে পারল নীনী। মৃদু হেসে বলল, 'ঐ কবিতাটার কথা হঠাৎ কেন তুললাম, আপনার প্রশ্ন এই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' মরিয়ার মত বলে ফেললাম।

নীনী আমার এত কাছে এসে বসেছে যে গাড়ির দোলানিতে তার নরম কাঁধের স্পর্শ পাচ্ছি। তার শরীর থেকে একটা প্রখর সুগন্ধ উঠে এসে চুঁইয়ে চুঁইয়ে আমার মস্তিষ্কে ঢুকে যাচ্ছে। মুখ থেকে উগ্র মিষ্টি গন্ধ বেরিয়ে আসছে। এই গন্ধটা অবশ্য আমি আগেই পেয়েছিলাম। নীনীর শরীর এবং মুখের গন্ধ—সব একাকার হয়ে আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে যেন।

স্থির নিষ্পলকে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে নীনী বলল, 'কেন কবিতাটার

কথা তুললাম, সে প্রশ্নের উত্তর না-ই বা দিলাম। নিজেই বুঝতে চেষ্টা করুন।'

বুঝতে আমি অবশ্যই পেরেছি। আমার লুকোচুরির সব খেলাই ধরে ফেলেছে নীনী। কাজেই নিরুত্তর রইলাম।

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। আর সেই নৈঃশব্দের মধ্যে গাড়িটা বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

বাড়িটা যখন একশ' গজের মধ্যে সেই সময় নীনী বলে উঠল, 'ড্রাইভার রুখো।'

গাড়ি থেমে গেল। আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই রাস্তায় নেমে পড়ল নীনী। বুঝলাম আমার সঙ্গে এক গাড়িতে বাড়িতে ঢোকার ব্যাপারে নিদারুণ অনিচ্ছা। হেঁটেই এটুকু পথ চলে যাবে সে।

অতএব পীর আলীকে নিয়ে যথারীতি গেট পেরিয়ে বাড়ির কম্পাউণ্ডে ঢুকলাম।

দোতলার কম্পাউণ্ডে মিসেস মিত্র আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে আজ রাত্রির পুঙখানুপুঙখ বিবরণ দিলাম।

শুনতে শুনতে ভদ্রমহিলার চোখ দুটি ঝকমক করতে লাগল। চাপা তীব্র স্বরে তিনি বললেন, 'ঐ বাড়িটার মধ্যে নীনী কী জন্যে যায়, কী করে—সব খবর আমার চাই।'

বার

দেখতে দেখতে অঘ্রান মাস এসে গেল। এরই মধ্যে কলকাতার বাতাসে শীতের আমেজ লেগে গেছে।

এদিকে গাড়ি চালানোটা প্রায় রপ্ত করে ফেলেছি। এখন আর পীর আলীর কাছে অ্যাপ্রেণ্টিস থাকার প্রয়োজন নেই। সকালবেলা সে-ও ডাকতে আসে না। যেদিন ইচ্ছা হয় একা একাই গাড়ি নিয়ে খানিকটা ঘুরে আসি। অভ্যাসটাকে বজায় রাখা আর কি! মিসেস মিত্র বলেছেন শিগগিরই আমার জন্য একটা ড্রাইভিং লাইসেন্সের ব্যবস্থা করবেন।

পীর আলী আসে না। অতএব ভোরবেলাগুলো একেবারেই নিরঙ্কুশ। শীতের ঘোর-লাগা অঘ্রানের সকালে কম্বলের উষ্ণ আরামের মধ্যে যতক্ষণ খুশি পড়ে থাকি।

চিরদিনই মানুষটা আমি ঘুমকাতুরে। মাঝখানে ক'টা দিন গাড়ি চালানোর ব্যাপারে মিসেস মিত্র আমাকে কি বিপদেই না ফেলেছিলেন।

যথারীতি আজও কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। ভোর যে হয়ে গেছে সেটা টের পাচ্ছি। তবে সজ্ঞানে নয়, কেমন একটা অস্পষ্ট অ-বোধ ঘোরের মধ্যে। ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা সুখপ্রদ আচ্ছন্নতা আমার চেতনা

আর অবচেতনার সকল দিককে বেষ্টন করে রয়েছে যেন।

সর্বাঙ্গ দিয়ে কম্বলের ভিতরকার উষ্ণ আরামটুকু শুষে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল। মুহূর্তে মধুর আচ্ছন্নতাটুকু ছিন্ন হয়ে গেল। মাথার উপর থেকে কম্বল সরিয়ে বিরক্ত কর্কশ স্বরে বললাম, 'কে?'

'আমি হে, আমি।' গলার স্বরেই চেনা গেল—সুরপতিবাবু। তিনি বলতে লাগলেন, 'আর কত ঘুমুবে। রোদ উঠে গেছে। চটপট উঠে পড়।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠলাম। করুণ দৃষ্টিতে একবার বিছানাটার দিকে তাকালাম। তারপর নিরুপায় হয়েই দরজা খুলে দিলাম।

সুরপতি ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে নিজেকে সঁপে দিলেন। এই সকালবেলা কি উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন তা অনুমান করা আমার পক্ষে দুরূহ নয়। কেননা এখানে আসার কয়েকদিন পর ভদ্রলোক পাঁচটা টাকা ধার নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরও তিনি অনেক বার এসেছেন। অবশ্য কনক যখন বাড়ি থাকে নি তখনই। যতবারই এসেছেন দুটো কি একটা টাকা, নিদেনপক্ষে কয়েক গণ্ডা পয়সা না নিয়ে যান নি। নিয়েছেন ঋণ হিসেবে। তবে মাসদুয়েকের পরিচয়ে এটুকু বুঝেছি ঋণ শোধ করা তাঁর চরিত্রবিরুদ্ধ।

তবু লোকটিকে আমার খারাপ লাগে নি। যতক্ষণ এই ধ্বংসস্তূপের মত বাড়িটার মধ্যে নির্বাসিত থাকি ততক্ষণ আমি একেবারেই মূক, নিঃসঙ্গ। সুরপতিবাবু এলে কথা বলে বাঁচি। কিঞ্চিৎ মূল্য দিতে হয় বটে তবু তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই সকালবেলা কিছু আদায়ের আশায় যে সুরপতি এসেছেন সে-সম্পর্কে আমি নিঃসংশয় এবং সে জন্য আমার কোনও অভিযোগও নেই। কিন্তু তন্দ্রার আবেশটা ভেঙে যাওয়াতে মনে মনে অপ্রসন্নই হয়েছি। আর সেই ভাবটা গোপন নেই, চোখমুখের প্রতি রেখায় এবং কুঞ্চনে তা ফুটে বেরিয়েছে।

সুরপতি আমার মুখের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, 'কি হে ব্রাদার, সকালবেলা ঘুম থেকে তুলতে রাগ করলে নাকি?'

'না।' ভদ্রতা বজায় রাখতে সামান্য একটু হাসলাম।

সুরপতি কি বুঝলেন তিনিই জানেন। বললেন, 'ভয় নেই, আজ আর ধার নিতে আসি নি। ভোরবেলা উঠে কনক বেরিয়ে গেছে। ফিরবে সেই রাতে। মওকা বুঝে চলে এসেছি। শুধু শুধু আসি নি। আমার কাছে তোমার একটা কৈফিয়ৎ পাওনা আছে। সেটা দিতেই এসেছি।'

'কৈফিয়ৎ!' খানিকটা অবাকই যেন হয়ে গেলাম। বললাম, 'কিসের কৈফিয়ৎ?'

'নিজেই ভেবে দেখ না।'

আকাশ-পাতাল তোলপাড় করেও কোন হদিশ পেলাম না। বললাম, 'বুঝতে পারছি না।'

'বেশ, তা হলে আমিই বলছি।' সুরপতি বলতে লাগলেন, 'তোমার কাছ থেকে বারকয়েক টাকা ধার নিয়েছি। ধার নেবার সময় প্রতিবারই তোমায়

কি বলেছি, মনে আছে ?'

কথাটা মনে পড়ে গেল। যতবারই সুরপতি ঋণ নিয়েছেন, বলেছেন, 'বুঝলে ব্রাদার, চল্লিশ বছর নিয়মিত অভ্যাস করে করে একটা ট্রাডিসান দাঁড় করিয়ে ফেলেছি। তুমি সেই ট্রাডিসানটাকে রক্ষা করলে।'

তাঁর ট্রাডিসান বা অভ্যাস যে কি, এখনও তা আমার অজ্ঞাত। প্রথম দিন ধার নেবার সময় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, সে সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে তাঁদের পারিবারিক ইতিহাসটাই বলতে হয়।

ইতিহাসটা এখনও আমার অজানাই থেকে গেছে। যদিও সে ব্যাপারে দুরন্ত একটা কৌতূহল রয়েছে তবু কোনদিন জোর করিনি। সুরপতি স্বেচ্ছায় যেদিন বলবেন সেদিনই শুনব—আমার মনোভাব ছিল অনেকটা এইরকম।

আমাকে নিশ্চুপ দেখে সুরপতি তাড়া লাগালেন, 'কি হে, মনে পড়ল ?'

ব্যস্তভাবে বলে উঠলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'গুড, ভেরি গুড। তা হলেই বুঝতে পারছ এতদিনে আমার সেই অভ্যাসটার কথা তোমাকে বলে ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু সেই উচিত কাজটি করা হয় নি। কেন হয় নি ? না সেটার কথা বলতে গেলে আমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা বলতে হয়। আর সেটা বলার জন্য প্রচুর সময় দরকার। এতদিন সেই সময়টাই করে উঠতে পারছিলাম না। আজ পেরেছি। আজ তোমায় সব বলব। কি, শুনবে ?'

উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, 'নিশ্চয়ই শুনব। তার আগে আপনি একটু বসুন, বাসি মুখটা চট করে ধুয়ে আসি।

মুখ ধুয়ে আসার পর সুরপতি শুরু করলেন। তিনি যা বললেন সংক্ষেপে এইরকম।

মধ্য কলকাতায় এক বিখ্যাত দত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। কোম্পানি আমলের শেষ দশকের কোন এক সময় তাঁর প্রপিতামহ এই শহরে এসেছিলেন। এসেছিলেন একবস্ত্রে, নিরাশ্রয় নিঃসহায় অবস্থায়। নিটুট স্বাস্থ্য এবং দুর্জয় মনোবল ছাড়া তাঁর আর কিছুই ছিল না।

ভদ্রলোক ছিলেন অসাধারণ পরিশ্রমী আর বিনয়ী। ব্যবসায়ীর সবগুলি প্রয়োজনীয় গুণই তাঁর চরিত্রে ছিল। ব্যবসা করে ধীরে ধীরে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। এবং যার অন্বেষণে জব চার্নকের এই শহরে এসেছিলেন ভাগ্য নামে সেই স্বর্ণমৃগকে শেষ পর্যন্ত করায়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর অর্থের পরিমাণ কত, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতায় তিনি যে কুবেরের মতই প্রবাদতুল্য ব্যক্তি—এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। মধ্য কলকাতার এক প্রান্তে প্রাসাদের মত বিশাল এক বাড়ি করিয়েছিলেন ভদ্রলোক।

এই শহরে দত্ত পরিবারের প্রথম পুরুষের ইতিহাস হল শুধু পরিশ্রমের। পরিশ্রমই নয়, সঞ্চয়েরও। দ্বিতীয় পুরুষ থেকেই শুরু হল অপচয়। বাঈজী রক্ষিতা মদ আর ভোগী জীবনের ধারাগুলি একত্র হয়ে বাবুতন্ত্রের যে খরস্রোত

তৈরি হয়েছিল উত্তরপুরুষেরা তাতে ভেসে গেল।

তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত একই খাতে একই স্রোতে উদ্দাম অবিরাম ভেসে যাওয়া। চতুর্থ পুরুষে এসে স্রোতটা অবশ্য একই রইল কিন্তু খাতটা একেবারেই বদলে গেল।

প্রমত্ত বিলাস এতকাল চলছিল চিরাচরিত দিশি প্রথায়। লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজী আনিয়ে গান শোনা, বুলবুলির লড়াইয়ে টাকা ওড়ানো কি বাগান বাড়িতে মেয়েমানুষ প্রতিষ্ঠা করে ধ্যান-জ্ঞান-বিত্ত অর্থ—জীবনের সর্বফল তার পায়ে সমর্পণ। এবার কিন্তু আনন্দ-সন্ধান চলল অমোঘ বিদেশী রীতিতে।

চতুর্থ পুরুষের শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের অন্তিম বর্ষে যখন জীবনের সকল দিকে অর্থাৎ শিক্ষায়-দীক্ষায়-ভাবনায়-রুচিতে ইংরেজিয়ানার ছাপ পড়েছে। ভোগের ক্ষেত্রেও বিলিতি খাদ মিশতে আরম্ভ করেছে। বাঈজী-গানের আসর, বাগানবাড়ি, বুলবুলির লড়াই—এ সব ধীরে ধীরে পুরাতত্ত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার জায়গায় আসছে পার্টি, বার, নাইট ক্লাব, হোটেল। স্থায়ী মেয়েমানুষের বদলে মোহময়ী নিশিসঙ্গিনী। অর্থাৎ আরো উত্তেজনা, আরো প্রমত্ততা, আরো উদ্দামতা। সবই কিছুই শীর্ষবিন্দুতে পেঁছুতে শুরু করেছে।

দত্ত-পরিবারের চতুর্থ পুরুষের একজন সুরপতি। আঠার বছর বয়স থেকেই তাঁর 'বার'-এ গতায়াত। মেয়ে মানুষ নিয়ে মাতামাতি অবশ্য তাঁর কোনকালেই ছিল না। তবে চৌরঙ্গীর নির্দিষ্ট একটি হোটেলে বিশেষ একটি সীটে রোজ রাত আটটায় তাঁকে আবিষ্কার করা যায়। আটটা থেকে এগারোটা—মোট তিনটি ঘণ্টা তিনি সেখানে থাকেন আর তারিয়ে তারিয়ে তিন পেগ নির্জলা হুইস্কি খান। এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। নিয়ম বললে এটাই তাঁর নিয়ম, বিলাস বললে বিলাস। আর সাধনা বললে সাধনা। মোট কথা প্রতিদিন নিয়মিত এই নেশা করাটা তাঁর জীবনের প্রধান দিক। এটাকে বাদ দিয়ে তাঁর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নিরর্থক।

আঠারো বছর বয়সে অভ্যাসটি শুরু করেছিলেন। তারপর তিন যুগেরও বেশি পার হয়ে গেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে তাঁর এই অভ্যাসটিকে ভাঙবার জন্য নানা দিক থেকে ক্রমাগত আঘাত এসেছে।

প্রথমত প্রপিতামহের ভাণ্ডারটি বিপুল হলেও অনন্ত নয়। অধস্তন তিন পুরুষের অবিরত অপচয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে সেটা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন ঋণ করে চালিয়ে অবশেষে বিশাল বাড়িটা বিক্রি করে দিতে হল।

প্রপিতামহ এ শহরে একাই এসেছিলেন। কিন্তু চার পুরুষ বংশে বাতি দিতে একশো'রও বেশি বংশধর জন্মে গেছে। কাজেই বাড়ি বিক্রির ভাগ মাত্র দশটি হাজার টাকা পেয়েই সুরপতিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

যতদিন পূর্বপুরুষের সঞ্চয় ছিল কিছুই করতেন না সুরপতি। অবশ্য বিয়েটা করেছিলেন এবং একটি মেয়েও হয়েছিল। স্ত্রী ছিলেন নিতান্তই স্বল্পায়ু। মেয়ে অর্থাৎ কনকের জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

বাড়ি বিক্রির পর অন্যান্য শরিকেরা নানা দিকে ভেসে গিয়েছিল। দশ হাজার টাকার মূলধন আর কনককে নিয়ে কোথায় যাবেন, জীবন কি ভাবে নতুন করে শুরু করবেন কিছুই স্থির করে উঠতে পারছিলেন না সুরপতি। যাই হোক, প্রথমে গিয়ে উঠেছিলেন মীর্জাপুরের এক হোটেলে।

সুরপতি বলতে লাগলেন, 'খুব বেশি দিন আমাদের হোটেলে থাকতে হয় নি। বড় জোর মাসখানেক। খোঁজ পেয়ে একদিন হেমন্ত এল—'

চকিত হয়ে উঠলাম, 'হেমন্ত—হেমন্ত কে?'

'আমার ভায়রা, তোমাদের মিসেস মিত্রের স্বামী। সে আমাদের এই ভাঙা বাড়িতে নিয়ে এল।'

মনে পড়ল, হেমন্ত নামটা কনকের মুখে শুনেছিলাম। বললাম, 'তার পর?'

'আমাদের এখানে নিয়ে আসার পেছনে হেমন্তের কিছু স্বার্থ ছিল।'

'স্বার্থ?'

'হ্যাঁ।'

'কি-রকম?' আমি উন্মুখ হলাম।

একটু ইতস্তত করে সুরপতি বললেন, 'হেমন্তের পেছনে তখন পুলিশ লেগেই আছে। মাঝে মাঝে সে অ্যাবস্কণ্ড করত।'

বিদ্যুৎচমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল। প্রথম দিন জাহাজেয় মত সেই সুদৃশ্য বাড়িটায় ব্রেকফাস্ট করতে গিয়ে কথাটা শুনেছিলাম। নীনী বলেছিল, হেমন্তবাবু নাকি জেলে। তাঁর এই জেল-গমনের সঙ্গে লজ্জাকর কোন ইতিহাস জড়িত আছে কি? নিজের অজ্ঞাতসারে বলে ফেললাম, 'হেমন্তবাবু অ্যাবস্কণ্ড করতেন?'

উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ যেন সচেতন হলেন সুরপতি। বললেন, 'ঐ দেখ, কোন কথা বলতে গিয়ে কোন কথায় এসে পড়েছি। বলছিলাম আমার চল্লিশ বছরের পুরনো অভ্যাসটার কথা—'

বাক্যটি আর সম্পূর্ণ করতে পারলেন না ভদ্রলোক। তার আগেই বলে উঠলাম, 'না-না, থামবেন না। যা বলছেন বলুন।' হেমন্তবাবু সম্বন্ধে আমার কৌতূহল দুর্বার হয়ে উঠেছে।

একটু ভেবে সুরপতি আবার শুরু করলেন, 'হেমন্ত তো পুলিশের তাড়ায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে বাড়িতে দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে সুষু থাকে। অবশ্য একটা চাকর, কি যেন নাম—হ্যাঁ, গুপী ছিল। কিন্তু তাতে তো চলে না। সুষুর বয়স আর কত তখন? তার ওপর অমন রূপ। বিপদ-আপদ ঘটতে কতক্ষণ। দেখাশোনার জন্য একজন নিজের লোকের

দরকার ! কাজেই কনককে নিয়ে আমি এখানে থেকে গেলাম ।' কিছুক্ষণ থেমে আবার, 'ওদিকে বেশিদিন পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি চালাতে পারল না হেমন্ত। ধরা পড়ে একদিন জেলে চলে গেল। সেটা বোধ হয় নাইনটি থার্টি সিক্স-টিক্স হবে ।'

নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও বনেদী অভ্যাসটিকে কিন্তু বজায় রেখেছিলেন সুরপতি। আর বুঝি সেটা বাঁচানো গেল না। প্রথমত বাড়ি বিক্রির যে দশ হাজার টাকা তাঁর ভাগে পড়েছিল সেটা ধীরে ধীরে ফুরিয়ে এসেছে। দ্বিতীয়ত সমস্ত জীবনটাই তাঁর নৈষ্কর্ম্য ব্রতের ইতিহাস। কায়িক পরিশ্রমে কোন দিন একটি পয়সাও উপার্জন করেছেন বলে স্মরণ করতে পারেন না। এই বয়সে নতুন উদ্যমে যে চাকরি বাকরি বা রোজগারের অন্য কোন পন্থায় নামবেন, সুরপতির পক্ষে তা প্রায় অকল্পনীয়। তৃতীয়ত সে সময় হেমন্তবাবুদের যে আর্থিক অবস্থা ছিল তাকে রীতিমত করুণই বলা যায়। পৈতৃক আমলের জরাজীর্ণ এই একতলা বাড়ি আর কোন একটা কোম্পানিতে কিছু শেয়ার। শেয়ার থেকে বার্ষিক সামান্য অঙ্কের একটা আয় ছিল। অতএব সংসার চালাতে সুষমাকে গানের স্কুলে মাস্টারি করতে হত। এই দুঃসহ অবস্থায় নেশার জন্য হাত পাতা অশোভন। অতএব সুরপতি স্বাভাবিক কারণেই বিচলিত হয়ে পড়লেন।

নাইনটিন থার্টি সিক্স থেকে থার্টি নাইন—এই তিনটে বছর অভ্যাসটাকে বাঁচিয়ে রাখতে কি যে করেছেন, সে শুধু সুরপতিই জানেন। অবশেষে শুভক্ষণ এল। সমস্ত পৃথিবী তোলপাড় করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। চারদিক দেখে শুনে তৃতীয় নয়ন খুলে গেল তাঁর। কলকাতার আকাশে মুদ্রাস্ফীতির কল্যাণে তখন টাকা উড়ছে। শুধু মাত্র ফাঁদ পেতে ধরার অপেক্ষা।

আজীবন সুরপতি অলস। নেশা ছাড়া অন্য কোন দিন কিছুই করেন নি। চিরকাল অন্যের পয়সায় প্রাণধারণ থেকে নেশা—সবই চলেছে তাঁর। যুদ্ধের আমলের উড়ন্ত টাকাগুলোকে যে একটু কষ্ট করে হাত বাড়িয়ে ধরবেন সেটুকু পরিশ্রমেও তিনি অরাজি। অথচ টাকার প্রয়োজন। সুতরাং অনেক ভেবেচিন্তে মিসেস মিত্রকে যুদ্ধের টাকা ধরার জন্য ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এর পেছনে দুটো ভাবনা কাজ করেছিল। প্রথমটি, পরিশ্রমের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। দ্বিতীয়টি, মহিলার শক্তি মাধ্যাকর্ষণের মত। তার হাতছানিতে অর্থাগম অনিবার্য।

প্রথম প্রথম আপত্তি করেছিলেন মিসেস মিত্র। কিছুটা বিভ্রান্তই হয়ে পড়েছিলেন ভদ্রমহিলা।

অতএব সুরপতিকে প্রচুর বোঝাতে হয়েছিল, 'গানের মাস্টারি করে এত খেটে খুটে কি এমন রোজগার করছ ! তার বদলে অনেক সহজে অনেক বেশি টাকা আসবে। চাকরি করছ, সেটা ছেড়ে দিয়ে অবশ্য ব্যবসা করতে হবে।'

মিসেস মিত্র বলেছিলেন, 'ব্যবসা তো করতে বলছেন জামাইবাবু, কিন্তু

ব্যবসার আমি কি বুঝি!'

'বুঝবার বিশেষ কিছুই নেই। তুমি শুধু চোখ বুজে রাজি হয়ে যাও।'

শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন মিসেস মিত্র। হাতে খড়ি হয়েছিল সাপ্লাইয়ের সামান্য একটা কাজ দিয়ে। প্রথম কাজেই হাজার দুয়েক টাকার মত লাভ হয়েছিল।

অর্থের আকর্ষণ অদম্য। মিসেস মিত্র ভেসে গেলেন। শুধু একাই নয়, ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়েই ভাসলেন। সাপ্লাইয়ের কাজের মধ্যেই তিনি আবদ্ধ রইলেন না। তাঁর উচ্চাশা আরো বড়। ধীরে ধীরে কণ্ট্রাক্টরি ধরলেন। যুদ্ধের সমস্ত উড়ন্ত অস্থির টাকা তাঁর ঘরেই এসে বুঝি স্থির হয়ে বসল। তারপর পাশের জমি কিনে জাহাজের মত সুদৃশ্য বাড়ি করলেন। শ্বশুরের ভাঙাচোরা বাড়িতে দরিদ্র অতীতের খোলস ছেড়ে সেখানে চলে গেলেন। সুরপতিরাও সঙ্গে গেলেন।

আমি শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বিমূঢ়ের মত হঠাৎ বলে ফেললাম, 'এভাবে টাকাপয়সা বাড়ি-ঘর হল, মিস্টার মিত্র কি তা জানতেন? তিনি তখন কোথায়?'

'হেমন্ত তখন জেলে। তার জানাজানির পরোয়া করছে কে? অশ্বমেধের ঘোড়ার মত টাকা তখন সুষুকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। ওদের কথা থাক।' সুরপতি বলতে লাগলেন, 'আগে আমার কথা শোন।'

'বলুন—'

'মিথ্যে বলব না, সুষুর কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। আমার মন্ত্র কানে নিয়েই যে তার নতুন জীবন, এত অগাধ টাকা, প্যালেসের মত এমন বাড়ি—সে কথা সে ভোলে নি। আমার পরামর্শ ছাড়া একটা পা-ও সে চলত না। তার নতুন জীবনের আমিই ছিলাম ফ্রেণ্ড ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড। ব্যবসার খাতিরে বড় বড় পার্টি দিতে হয়। কি ভাবে সে সবের আয়োজন করতে হয়, বলে দিতাম। যাই হোক, আমার যাবতীয় খরচ সে-ই দিত। ভেবেছিলাম আর দুশ্চিন্তা নেই। চৌরঙ্গীর সেই 'বার'-এ বসে বাকি জীবন আমি আমার হুইস্কির নেশা চালিয়ে যেতে পারব। কিন্তু—'

'কি?'

'ঐ হতভাগা মেয়ে বিপদ বাধালে।'

'কার কথা বলছেন?'

'কার আবার, কনকের। জানো ভায়া, মেয়েটা বিচিত্র ধাতুতে গড়া।' বিরক্ত রুষ্ট সুরেই শুরু করেছিলেন সুরপতি। আস্তে আস্তে তাঁর গলায় ভিন্ন ভাবের রং লাগল, 'বাপ ঠাকুর্দা এতকাল যে পথে হেঁটেছে, কনক পা বাড়াল তার উল্টো দিকে—'

সেই উল্টোদিকটা যে কি, তা-ও গোপন রাখলেন না সুরপতি। বেয়াল্লিশের আগস্ট মুভমেণ্টে কনক নাকি দিনকতক হাজতবাস করে এসেছে। ইদানিং কালের যত স্বাধীনতা আন্দোলন, তার সব ক্ষেত্রেই কনকের অগ্রণী ভূমিকা

রয়েছে। খদ্দর পরে। পিকেটিং হরতাল শোভাযাত্রা—সব কিছুর পুরোভাগে সে। গান্ধীজি জওহরলাল কিংবা অন্য কোন জননায়ক যখনই কলকাতার ময়দানে বক্তৃতা দেন—সে ছোটে সবার আগে।

সুরপতি বলতে লাগলেন, 'এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আবার বি. এ.-টাও পাস করে ফেলেছে।'

শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে গেলাম। ঐ শ্যামাঙ্গী সাধারণ মেয়েটার মধ্যে এমন একটা অভাবিত বিস্ময় লুকিয়ে ছিল, কে জানত। বিস্ময়টা কতক্ষণ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, বলতে পারব না। সুরপতি আবার বলে উঠলেন, 'মেয়েটা বলে কি জান?'

'কি?' চকিত হয়ে উঠলাম।

সুরপতি বললেন, 'আমরা তখন সুষুদের নতুন বাড়িতে থাকি। হতভাগা মেয়ের সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। বেয়াল্লিশের মুভমেণ্টে হাজত খেটে এসে একদিন বললে, 'এখানে আর থাকব না। মাসিমা নীনীদিরা যে ভাবে টাকা রোজগার করে সেই টাকায় বেঁচে থাকতে আমার মাথা কাটা যায়।' ঐ টাকার অন্ন নাকি বিষ হয়ে তার শরীরে ঢোকে। তার ক্রিয়ায় সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। শোন, নিরেট বোকা মেয়েটার কথা শোন। কোথায় আরামে থাকবি, তা না—'

শুনতে শুনতে যুগপৎ বিস্মিত এবং কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। বললাম, 'মিসেস মিত্ররা কিভাবে টাকা রোজগার করেন?'

'আরে ভায়া, কনট্রাক্ট ধরার জন্য মাঝে মাঝে বড় বড় পার্টি দেয় সুষু। বড় বড় অফিসার, নানা কোম্পানির ডিরেক্টর আর চেয়ারম্যানরা আসেন।' অসঙ্কোচে, সহজ সাবলীল সুরে সোনার হরিণ ধরার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে গেলেন সুরপতি, 'ভদ্রতার খাতিরে তাদের একটু আধটু ড্রিঙ্ক করাতে হয়। নীনীকে সঙ্গে দিয়ে কিংবা নিজেই তাঁদের লিফ্‌ট দেয় সুষু। নিতান্তই এ-সব ভদ্রতা। বুঝলে কিনা ব্রাদার, একটু বন্ধুত্ব একটু অন্তরঙ্গতা না করলে কাজ গুছনো যায় কি? কিন্তু আমার মেয়ে ঐ কনক এগুলোকে স্পোর্টিংলি নিতে পারলে না। এ-সবের মধ্যে সে নোংরামির গন্ধ পায়। এই পরিবেশে দম নাকি তার বন্ধ হয়ে আসে। বাপ-ঠাকুর্দা যার চূড়ান্ত ভোগী মাতাল, সে হল কি-না ঘোরতর নীতিবাদী, মরালিস্ট। আমার ভায়রা ঐ হেমন্ত—একেবারে তার আদর্শে তৈরি মেয়েটা—'

'হেমন্তবাবু কি—'

'অত তাড়া কিসের, এসেছ যখন হেমন্তকে জানতে পারবে। আগে সেই কথাটা শোন। মেয়েকে বললাম, 'এখানে থাকবি না তো যাবি কোথায়?' মেয়ে বললে, 'মেসোমশায়ের সঙ্গে জেলখানায় দেখা করে ব্যবস্থা করে এসেছি। যতদিন না তিনি ফিরে আসেন তাঁর ঐ ভাঙা বাড়িতে থাকব। আর খাওয়ার কথা বলছ? আমি স্কুলে কাজ নিয়েছি। খবরদার মাসিমার একটা পয়সাও তুমি আর ছুঁতে পারবে না।' খাওয়া-থাকার ব্যাপারে আমার বিশেষ ভাবনা ছিল না। দুশ্চিন্তা ছিল চল্লিশ বছরের সেই খানদানী অভ্যাসটিকে নিয়ে। মরিয়া

হয়ে সে কথা বলেই ফেললাম। কনক বলল, 'ঐ বদ অভ্যাস তোমাকে ছাড়তে হবে।' আমি ক্ষেপে উঠেছিলাম, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাড়তে পারি, ওটি ছাড়তে পারব না।' শুনে মেয়েটা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'বেশ আমিই তোমায় টাকা দেব।' তারপর জোর করে সে আমাকে এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছে। মাসোহারার একটা ব্যবস্থাও করেছে। কিন্তু যে টাকা কনক আমার হাতে তুলে দেয়, সে শুধু আমিই জানি।' বলতে বলতে উঠে পড়লেন সুরপতি, 'আচ্ছা ভাই, আজ চলি।'

সুরপতি চলে গেলেন। আমি বসেই রইলাম। হেমন্ত বাবু, কনক, মিসেস মিত্র, নীনী আর যুদ্ধকালীন এই নিদারুণ যুগ—সব মিলিয়ে একটা অন্তহীন জটিলতার মধ্যে ক্রমাগত হারিয়ে যেতে লাগলাম যেন।

দিন দুই পরে সুরপতি আবার এলেন। এলেন সেই সকাল বেলাতেই। আমার ঘুম ভাঙিয়ে প্রথমে দু'টি টাকা আদায় করলেন। তারপর বললেন, 'গ্র্যাণ্ড চ্যাপ, তুমি আমার জন্যে অনেক করছ। হাত পাতলে কখনও বিমুখ কর না। কিন্তু—'

'কি?' আমি উন্মুখ হলাম।

'তোমার জন্যেও আমার কিছু করা উচিত ছিল। তোমার ওপর কেমন যেন একটা নৈতিক দায়িত্ব এসে পড়েছে। অথচ এখন পর্যন্ত কিছুই করে উঠতে পারলাম না।'

'কি করবেন?' সামান্য হাসলাম।

'কি করব তুমিই আন্দাজ কর না?' কৌতুকময় বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকালেন সুরপতি।

ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যটা যে কি, বুঝতে না পেরে চুপচাপ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'পারলে না, কেমন!' সুরপতি হাসলেন, 'তা হলে আমার মুখেই শোন।'

'বলুন—' আমার গলায় এবার সুর ফুটল।

'থাকতে শ্রীরামপুরের হোস্টেলে। এখানে এসে সুষুর চাকরি নিয়ে ভাঙা বাড়ির খাঁচায় ঢুকেছ। চোখ ফোটে নি, হাত-পা-ডানা—কিছুই গজায় নি। জগতের আলোই দেখলে না। চোখ ফোটাবার ডানা গজাবার জন্যে মাঝে মাঝে তোমায় নিয়ে বেরুতে হবে, দেখছি। একটা জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাব। সেখানে গেলে দেখবে—'

'কোথায় নিয়ে যাবেন?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না সুরপতি। একটা চোখ ঈষৎ কুঁচকে রহস্যময় একটু হেসে বললেন, 'এখন বলব না। সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।'

গলার স্বরে অনেকখানি বিমূঢ়তা নিয়ে বললাম, 'না, এখনই বলুন।'

ভারতচন্দ্র, বৈষ্ণবকাব্য এবং ইংরেজিভাষার বাছা বাছা অসংখ্য আদিরসাত্মক পদ সুরপতির কণ্ঠস্থ। তাদের মধ্যে যেটি সর্বোত্তম সুর করে সেটি গেয়ে

উঠলেন, 'নাগর হে, তোমায় আমি নিয়ে যাব নাগরীর হাটে—'

কিসের একটা আভাস যেন পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্নায়ু চকিত এবং অস্থির হয়ে উঠল। বিপন্ন মুখে বলে ফেললাম, 'না-না, দেখুন—'

সস্নেহে হুঙ্কার দিলেন সুরপতি, 'গাঁইয়া কাঁহাকা—'

এরপর আর কিছু বলতে পারলাম না। স্তব্ধ বিমূঢ়ের মত বসে রইলাম শুধু।

তের

অবশেষে সেই বাড়িটার রহস্য আবিষ্কার করতে পারলাম। আবিষ্কারের কৃতিত্ব অবশ্য আমার নয়। নীনীই হাত ধরে যবনিকার আড়ালে বিচিত্র এক জগতের মাঝখানে আমাকে নিয়ে গেল।

সেই প্রথম দিনটির পর নীনীকে অনুসরণ করে এই বাড়িটায় আরো বার-কয়েক এসেছি। কিন্তু ঐ আসা পর্যন্তই।

বাড়ির ভেতর ঢুকেই ছলনাময়ী মেয়েটি মুহূর্তে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। অসংখ্য ঘরের জটিল জঙ্গল থেকে তাকে খুঁজে বার করতে পারিনি। শুধু প্রথম দিনের মত দুয়ারে দুয়ারে অন্ধের মত মরিয়ার মত হানা দিয়ে ফিরেছি।

আজও চৌরঙ্গীর সেই হোটেলটা থেকে তার পিছু পিছু এই ম্যানসনে এসেছি।

যখন এসেছিলাম তখন রাত আটটা। এখন প্রায় দশটা বাজতে চলল। এক তলা থেকে ষষ্ঠ তল পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে আর ক্রমাগত সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে হেমন্তের শেষাশেষি এই দিনটিতে প্রায় নেয়েই উঠেছি। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত পঞ্চম তলার করিডরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, একটু জিরিয়ে টপ ফ্লোরে যাব।

কিন্তু যেতে আর কোথাও হল না। হঠাৎ সামনের দিকের একখানা ঘরের দরজা যেন আশ্চর্য এক ম্যাজিকে খুলে গেল। এবং আমার সমস্ত স্নায়ুকে চকিত চমকিত করে তার ভিতর থেকে যে বেরিয়ে এল সে নীনী। কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল সে। তারপর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে অনুচ্চ চাপা গলায় আচমকা আবৃত্তি শুরু করে দিল ঃ

'এসো শ্যামল সুন্দর,
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে ॥
সে যে ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে
তমালকুঞ্জপথে সজল ছায়াতে,
নয়নে জাগিছে করুণ রাগিণী ॥

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটা আমার অজানা নয়। বিমূঢ়ের মত শুধু বলতে পারলাম, 'আজ্ঞে—'

নীনী থামে নি। সমানে আবৃত্তি করে যাচ্ছে সে ঃ

'বকুলমুকুল রেখেছে গাঁথিয়া,
বাজিছে অঙ্গনে মিলন বাঁশরি।
আনো সাথে তোমার মন্দিরা—'

কবিতাটা শেষ হবার আগেই থেমে গেল নীনী। বিচিত্র মৃদু একটু হেসে বলল, 'তারপর ?'

কিছু একটা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলাটা কেউ যেন সবলে দৃঢ়বদ্ধ শক্ত মুঠিতে চেপে ধরেছে। ফলে স্বরটা পুরোপুরি মুক্তি পেল না। অবরুদ্ধ গোঙানির মত একটা আওয়াজ বেরুল মাত্র।

নীনী আবার বলল, 'আজ আবার এখানে কি মনে করে ? খুব দরকার ছিল বুঝি ?'

নতচোখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ছেলেবেলায় একটা বেড়ালকে চড়ুই ধরতে দেখেছিলাম। চড়ুইটাকে এক আঘাতেই শেষ করে দেয় নি সে। সামান্য একটু ঘা মেরে ডানা ভেঙে দিয়ে নিজের থাবার কাছে ফেলে রেখেছিল। চড়ুইটা অবশ্য পালাবার চেষ্টা করছিল, ভাঙা ডানা নিয়ে যতবার উঠবার চেষ্টা করছিল ততবারই মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল। বিড়ালীর যেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপই ছিল না। নিরাসক্ত উদাসীনের মত সে চোখ দুটি বুজে শুয়ে ছিল। আর মাঝে মাঝে সজাগ হয়ে থাবা দিয়ে অসহায় শিকারটাকে নাড়াচাড়া করছিল। পরক্ষণেই আবার চোখ বুজছিল। ভাবখানা এই, অবোধ পাখি আমার পাল্লা এড়িয়ে তুই যাবি কোথায় ?

এই মুহূর্তে বিড়ালীর সেই নিষ্ঠুর খেলার কথা মনে পড়ে গেল আমার। নীনী কি আমাকে নিয়ে তেমনই ভয়াবহ প্রাণান্তকর এক খেলায় মেতে উঠেছে ?

নীনী তাড়া লাগাল, 'কি, মুখ বুজে কেন ?'

এতক্ষণে স্বরটাকে গলার অতল থেকে বার করে আনতে পারলাম, 'আজ্ঞে—'

সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলল না নীনী। অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর ডাকল, 'শুভেন্দুবাবু—'

তার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে আমার সমস্ত চেতনা নাড়া খেয়ে উঠল যেন। মুখ তুলে সভয়ে নীনীর দিকে তাকালাম।

নীনী আর কোন ভূমিকা করল না। স্পষ্ট উচ্চারণে সরাসরি বলল, 'আপনি কেন এখানে এসেছেন, আমি জানি। আপনাদের মিসেস মিত্র যে আপনাকে আমার চলাফেরার ওপর নজর রাখার জন্যে লাগিয়েছে, তা-ও আমার অজানা নয়। আর আমি যে এ সব জানি, তা আপনি বোঝেন। তাই না ?'

এতদিনে সব আলোছায়া আর লুকোচুরির খেলা শেষ হল। কোনরকমে আমি শুধু বলতে পারলাম, 'আজ্ঞে—'

'আচ্ছা শুভেন্দুবাবু, আপনি কি আমার মুভমেণ্ট সম্পর্কে সত্যি সত্যি খুব ইণ্টারেস্টেড?'

'আজ্ঞে, চাকরির জন্যে আমায় এ-সব—'

স্থির নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নীনী। তারপর গম্ভীর স্বরে বলল, 'আই নো, আই নো। সবই আমিই জানি। আচ্ছা আসুন আমার সঙ্গে।'

যে দরজাটা খুলে কিছুক্ষণ আগে নীনী বেরিয়ে এসেছিল সেদিকেই আবার ফিরে চলল সে। তার সঙ্গে যাব কি যাব না, ভাবতে ভাবতে আমার সমস্ত চেতনা ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হয়ে যেতে লাগল। আর সেই নিশ্চেতন সম্মোহনের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতে কখন যে দরজা পেরিয়ে তার পিছু পিছু ভিতরে চলে গেছি, খেয়াল ছিল না।

আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি সেটা মাঝারি আকারের একখানা ঘর। চমৎকার সাজানো সোফা আর টী-পয়গুলোকে দেখেই অনুমান করা গেল, এটা ড্রইং রুম।

নীনী এবং আমি ছাড়া আর কেউ নেই। অদ্ভুত স্তব্ধতার মধ্যে দেওয়ালের চতুষ্কোণ ঘড়িটা সময়ের হৃদ্‌স্পন্দনের মত অবিরাম বেজে যাচ্ছে শুধু।

নীনী বলল, 'বসুন।'

এই শূন্য ঘরে আমাকে ডেকে আনার পেছনে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, জানি না। একটা সোফায় বসে পড়লাম।

নীনীও আমার মুখোমুখি বসল। তারপর দেয়ালের ঘড়িটার ওপর দৃষ্টি রেখে মনে মনে বুঝিবা ভূমিকা তৈরি করে নিল। কিছুক্ষণ পর আমার দিকে ফিরে বলল, 'আচ্ছা শুভেন্দুবাবু—'

'আজ্ঞে—' আমি উন্মুখ হলাম।

'প্লীজ ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, ক'টা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব আপনাকে—'

'বেশ তো, করুন না।'

'আপনি থাকেন কোথায়?'

প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। তাদেরই ধ্বংসস্তূপের মতো পুরনো বাড়ির এক অংশে ক'মাস ধরে আছি, এই খবরটাই জানে না নীনী! পর-মুহূর্তেই খেয়াল হল, না জানাই তো স্বাভাবিক। হোটেল-ড্রিঙ্ক আর নৈশ বিহার নিয়ে যে অক্ষরেখা, একটা দুরন্ত অন্ধ উল্কার মত সেখানে ছুটে বেড়াচ্ছে সে। অন্য কোন দিকে তাকাবার অবকাশ কোথায় তার। যাই হোক, উত্তর দিলাম।

শুনে নীনী বলল, 'দেখুন দেখি কি কাণ্ড, ধরতে গেলে একই বাড়িতে থাকি অথচ আপনার খবরটাই রাখি না।'

এর পর একে একে আমার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যাপার—দেশ

কোথায়, বিবাহিত কি-না, সংসারে কে-কে আছে—জেনে নিল নীনী। আমিও আড়ষ্টের মত প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলাম। তার সামনে বসে কিছুতেই স্বচ্ছন্দ হতে পারছি না।

সব প্রশ্নোত্তরের শেষে সেই প্রসঙ্গটায় এসে পড়ল নীনী, 'কাজের জন্য কত টাকা আপনি মাইনে পান ?'

'খাওয়া, পোশাক আর থাকার ব্যবস্থা ছাড়া মাসে পঁচাত্তর টাকা।'

মাইনের অঙ্কটা বুঝিবা অবিশ্বাস্যই মনে হল নীনীর। আবার জিজ্ঞেস করল, 'কত বললেন ? পঁচাত্তর ! ইজ ইট !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওনলি!'

আমি এবার চুপ করে রইলাম।

নীনী বলতে লাগল, 'একটা স্লেভের মত বাড়িতে আটকে রেখে মাত্র পঁচাত্তর টাকা ! হরিবল্ !'

এবারও আমি নিরুত্তর।

কিছুক্ষণ কি ভেবে নীনী আবার বলল, 'আচ্ছা শুভেন্দুবাবু, আপনার কথা যা শুনলাম তাতে মনে হল দেশ থেকে টাকা রোজগারের জন্যেই কলকাতায় এসেছেন। তা ছাড়া কিছু অ্যাম্বিশানও ছিল।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

'তা হলে মাত্র পঁচাত্তর টাকার স্পাই হয়ে পড়ে আছেন কেন ?'

আস্তে আস্তে আমার আড়ষ্টতা খানিকটা কেটে গেছে। বেশ সাবলীল এবং সহজ হয়ে উঠতে শুরু করেছি। বললাম, 'কি করব, ওয়ার থেমে গেছে, এ-বাজারে এর চাইতে ভাল চাকরি কোথায় পাব, বলুন।'

নীলাভ স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকাল নীনী। বলল, 'চাকরিই যে করতে হবে তার কি কোন কথা আছে !'

'তা হলে ?'

'টাকা রোজগার নিয়ে কথা। চাকরি ছাড়াও তা রোজগার করা যায়।'

'ব্যবসা করে অবশ্য যায়। কিন্তু তার জন্যে ক্যাপিটালের দরকার। আমার তো তা নেই।'

আমার দিকে এবার অনেকখানি ঝুঁকে এল নীনী। চাপা ফিস ফিস গলায় বলল, 'ব্যবসা আর চাকরি ছাড়াও টাকা রোজগারের অনেক রাস্তা আছে। একদিনেই আপনি হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারেন। ইচ্ছে করলে আজই, এমন কি এখনই এই বাড়িতে বসেই পারেন।'

এই সুদেহিনী রূপসী মেয়েটির মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে হঠাৎ যেন সন্দিহানই হয়ে পড়লাম। আমার গলা থেকে প্রায় অবরুদ্ধ একটা শব্দ বেরিয়ে এল শুধু।

নীনী আবার বলল, 'কি রাজি ? রাজি থাকলে চটপট উঠে পড়ুন।'

বলামাত্রই উঠলাম না। ইন্দ্রিয়গুলো কিসের একটা আভাস পেয়ে চকিত

হয়ে উঠেছে যেন। অবরুদ্ধ গলায় শুধু বললাম, 'কোথায় ?' আমার স্বরে যুগপৎ সংশয় এবং ভয় ফুটে বেরুল।

'চলুন না। না গেলে কোথায় বুঝবেন কেমন করে ?' নীনী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

আমি বসে রইলাম।

নীনী এবার তাড়া লাগাল, 'কি হল, উঠুন। টাকা চাই না আপনার ?'

আড়ষ্ট নির্জীব গলায় বললাম, 'আমার খুব ভয় করছে।'

'ভয় !' এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল নীনী। পরক্ষণেই তার তীক্ষ্ম সুরেলা হাসি রিন রিন করে বেজে উঠল। হাসিটা থামলে এক কাণ্ডই করে বসল মেয়েটা। কাছে এসে একটা হাত ধরে আমাকে টানল, 'আসুন তো।'

বুকের কোন অতলে চড়াৎ করে একটা ধস নেমে গেল যেন। ভীত পশুর মত অস্ফুট চিৎকার করে উঠলাম, 'না।'

আমার ঐ 'না' উচ্চারণটার মধ্যে কি মেশানো ছিল, নীনী তক্ষুনি আর কিছু বলতে পারল না। হাতটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল শুধু। আর মাথা নিচু করে আমি বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর নীনী ডেকে উঠল, 'শুভেন্দুবাবু—'

মাথা না তুলেই সাড়া দিলাম।

'বেশ, টাকা রোজগার আপনি না-ই করলেন। তবু আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

নিজের অজান্তেই বুঝি প্রশ্নটা করে বসলাম, 'কেন ?'

'আপনার চাকরি বাঁচাবার জন্যে।' নীনী হাসল, 'আমার মুভমেন্টের খবর না নিয়ে গেলে আপনাদের মিসেস মিত্রকে রিপোর্ট দেবেন কেমন করে ?'

যুক্তিটা বেশ জোরালো সেটা না মেনে উপায় কি। যাই হোক, চুপ করে রইলাম। এবং নীরবতাই যে সম্মতি তা বুঝে উঠতে অসুবিধে হল না নীনীর। সে বলল, 'আপনাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব, তবে একটা শর্ত আছে।'

'কী ?'

'যেখানে আমরা যাচ্ছি সেখানে গিয়ে আমি যা বলব বা করব, সব মুখ বুজে আপনাকে সহ্য করতে হবে। কোন ব্যাপারে এতটুকু প্রতিবাদ করতে পারবেন না। কি, রাজি ?'

সংশয় আর ভয় তো ছিলই। সেই সঙ্গে রক্তস্রোতে তীব্র কৌতূহলের একটা ধাক্কা এসে লাগল। সব মিলিয়ে সমস্ত চেতনায় ঘূর্ণিঝড়ের মত কি যেন পাক খেয়ে উঠল। কিছুটা সজ্ঞানে আর কিছুটা নিজের অজান্তে বলে ফেললাম, 'আমি রাজি।'

'গুড—ভেরি গুড।'

ড্রইং রুমের ডান দিকে একটা দরজা। নীনী এগিয়ে গিয়ে সেটা খুলে ফেলল। আর খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোকিত সরু প্যাসেজ নজরে

পড়ল। প্যাসেজটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে আরেকটা দরজা।

দুই দরজার মাঝখানে যোজকের মত সেই সংক্ষিপ্ত পথটুকু বিচিত্র ডাকিনী-মন্ত্রে আচ্ছন্ন হয়েই যেন নীনীর পেছন পেছন পার হয়ে এলাম।

ওদিকের দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপল নীনী। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, দরজা খুলে গেল।

আমার মনে হচ্ছিল, এটা যেন কলকাতা শহরের একটা সুবিশাল বাড়ির কোন ঘরের দরজা নয়, আরব্য রজনীর রূপকথা জগতের সিংহদ্বার। পাল্লাটা উম্মুক্ত হলেই একটা বিচিত্র যুগের কিছু অনাবিষ্কৃত রহস্য বেরিয়ে পড়বে।

নীনীর পেছন থেকেই দরজার ওপাশটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেখানে চমৎকার সাজানো একখানা ঘর। মাঝখানে দু-খানা খাট জোড়া লাগিয়ে বিছানার ওপর তাসের আসর বসেছে।

আসরটা খুঁটিয়ে দেখবার আগেই নীনী ভেতরে পা বাড়িয়ে দিল। অতএব আমার পক্ষেও দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হল না।

ভেতরে ঢুকতেই কয়েক জোড়া কৌতূহলী জিজ্ঞাসু চোখ আমার উপর নিবদ্ধ হল। আমি তাদের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। সঙ্কোচ, অপরিচয় এবং অনভ্যস্ত পরিবেশ—সব একাকার হয়ে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

এক পাশে উর্দিপরা একটা বয় দাঁড়িয়ে ছিল। নীনী তার উদ্দেশে বলে উঠল, 'আবদুল, সাহেবকে কুর্শি দাও।'

বয়টা চেয়ার নিয়ে এলে নিজেকে সেটার ভেতর সঁপে দিলাম।

এদিকে আমার সম্বন্ধে সমস্ত আসরের কৌতূহল প্রায় শীর্ষ বিন্দুতে পেঁছেছে। না তাকিয়েও অনুভব করলাম খাটের উপর থেকে কে যেন একজন ইসারায় নীনীকে কাছে ডাকল। চাপা ফিস ফিস স্বরে কি জিজ্ঞেস করল। প্রশ্নটা যে আমার সম্পর্কেই আন্দাজ করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না।

অন্য দিকে মুখ ফেরানো থাকলেও বুঝতে পারছিলাম, তাসের আসরে মোট দশ জন রয়েছে। সাতজন পুরুষ, বয়েস পঁয়তিরিশের নিচেই হবে। সবাই সুপুরুষ। পোশাকরুচি তাদের অভিন্ন। সাতজনেরই পরনে প্যাণ্ট-সুট-টাই।

বাকি তিনজন তরুণী; নীনীরই প্রায় সমবয়সী। তিনজনের চেহারাই দুর্ধর্ষ। পাতলা সরু কোমরের তলায় বিশাল অববাহিকা; পেছন দিকটা যেন ওল্টানো তানপুরা। বুক জোড়া পাহাড়। ঝকঝকে দাঁত, মসৃণ নিটোল গলা। হেয়ার টনিক লাগানো চুল যেন রেশমের মিহি সুতো। সুঠাম হাত কাঁধ থেকে নেমে গেছে। লম্বা লম্বা নখে গাঢ় নেল পালিশ, ঠোঁটে এবং গালেও তাদের রং। যতই রূপ থাক, তবু এই মৌচাকে নীনীই যে মক্ষিরাণী বা হৃদ্‌স্পন্দন, সেটুকু কেন জানি ঘরে ঢুকেই অস্পষ্টভাবে আমার চেতনায় ধরা পড়েছে।

হঠাৎ নীনী ডেকে উঠল, 'শুভেন্দুবাবু—'

চমকে মুখ ফেরালাম।

নীনী বলল, 'আসুন আগে পরিচয়টা সেরে ফেলি।' বলেই আমাকে দেখিয়ে সেই আসরটার দিকে ফিরল। বলল, 'ইনি মিস্টার শুভেন্দু চ্যাটার্জি। গিরিডিতে দুটো মাইকা মাইন আছে। বিগ বিজনেসম্যান অ্যান্ড ব্যাঙ্কার। আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড।'

শোনামাত্র আমার স্নায়ুগুলোর মধ্য দিয়ে বরফের স্রোত নেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শারীরিক বোধ অসাড় হয়ে গেল যেন। একবার মনে হল, চিৎকার করে উঠি। পরমুহূর্তে খেয়াল হল, নীনীর কোন কাজেরই প্রতিবাদ করার উপায় নেই। সেই শর্তেই এই রহস্যালোকের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে। তবু কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু স্বরটা গলার কাছে এসে পাক খেতে খেতে আটকে গেল।

নীনী এবার আমার দিকে তাকাল। তারপর আসরের একেক জনকে দেখিয়ে বলতে লাগল, 'ইনি সুব্রত গুপ্ত, অমুক কোম্পানীর সেল্স্ ম্যানেজার। ইনি রীণা ব্যানার্জি, জাস্টিস চন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নাতনী। ইনি মিস্টার আবদানী, অমুক কোম্পানির লিয়াসন অফিসার। ইনি মিস্টার ভার্মা, ফিফ্থ প্লেটুনের মেজর।'

অনেকগুলো নাম আমার মস্তিষ্কের অবোধ স্তরে স্তরে ক্রমাগত আঘাত দিয়ে গেল। আর সেই নামের মানুষগুলি খাট থেকে উঠে এসে আমার শীতল অসাড় হাতখানা তুলে নিয়ে ঝাঁকিয়ে যেতে লাগল। প্রথম পরিচয়ের সৌজন্য-সূচক কয়েকটা কথা তারা উচ্চারণ করে যাচ্ছে। সেই কথাগুলি যে কি, বুঝতে পারছি না। এবং বিনিময়ে আমারও যে কিছু বলা প্রয়োজন, সেটা একেবারেই ভুলে গেছি।

অবশেষে সেই নামটা শুনতে পেলাম, 'ইনি মিস্টার রজত সোম, ইণ্টার-ন্যাশনাল ট্রেডিং-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

শোনামাত্র চকিত হয়ে উঠলাম। বোধহীন স্নায়ুগুলোর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-চমকের মত কি যেন একটা বয়ে গেল। চৌরঙ্গীর সেই হোটেলে আড়ালে বসে নীনীর মুখে রজতের নাম প্রথম শুনেছিলাম। মুখার্জি যদি বাড়ি চলে যায় সে রজতের ফ্ল্যাটে আড্ডা দিতে আসবে—এইরকম একটা কথাই বোধ হয় বলেছিল নীনী। মুখার্জির তাতে নিদারুণ অনিচ্ছা। নীনীকে নিয়ে বাড়ি ফেরার বদলে বি. টি. রোডের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছিল সে।

মুখার্জি যদি জগৎ সিংহ, রজত কি ওসমান?

আজ দ্বিতীয়বার রজতের নামটা শুনলাম। শুনলামই না শুধু, দেখলামও। আর্যসুলভ দীর্ঘ টকটকে রং, টান টান চেহারা, তীক্ষ্ম নাসা, উজ্জ্বল চোখ, নিখুঁত কামানো ডিম্বাকৃতি মুখ—সব মিলিয়ে রীতিমত আকর্ষণীয়।

খাট থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিল রজত। বলল, 'ভেরি গ্ল্যাড টু মীট ইউ—'

এতক্ষণে আমার গলা থেকে স্বরটা মুক্ত হতে পারল, 'থ্যাংক ইউ।'

মাথা ঈষৎ হেলিয়ে ধন্যবাদ প্রাপ্তিটা স্বীকার করল রজত। তারপর খাটে ফিরে গেল। আমি আবার চেয়ারটায় নিজেকে ছুঁড়ে দিলাম।

উর্দিপরা সেই বয়টা পুতুলের মত এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। নিচু গলায় নীনী বলল, 'আবদুল, সবার জন্যে জিনের সঙ্গে আদার রস আর একটু করে বরফ মিশিয়ে নিয়ে এস।'

'জী।' বলেই বয়টা মুহূর্তে অদৃশ্য হল।

আর যত নিচুই হোক, নীনীর গলা আমার কানে যথাযথ পৌঁছে গেছে। কথাগুলো শোনামাত্র সমস্ত অস্তিত্বই আঁতকে উঠতে শুরু করেছে। যে পানীয় সবার জন্য আসছে তার তালিকায় নিশ্চয়ই আমার নাম থাকবে। বরং একেবারে উঁচুতে সবার আগেই থাকবে।

যা আশঙ্কা করেছিলাম তা-ই ঘটল। ট্রে-তে করে বয়টা রক্তাভ পানীয় সাজিয়ে এনেছে। সে ঘরে ঢোকামাত্র রজত প্রায় লাফ দিয়েই খাট থেকে আবার নেমে এল। একটা পানপাত্র তুলে নিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'প্রথম পরিচয়টাকে আসুন স্মরণীয় করে রাখি। লেট আস সেলিব্রেট দা অকেসান।'

আমি কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না। সমস্ত অস্তিত্ব কিসের এক অতলে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। কোন রকমে শুধু বলতে পারলাম, 'দেখুন আমার এ-সব—'

এই পর্যন্তই বলেছিলাম। কথাটা সম্পূর্ণ করার আগেই নীনী কাছে এগিয়ে এল। আমার মনোভাবটা বুঝতে পেরেছে সে। নীলাভ চোখের বিচিত্র ভ্রূ-ভঙ্গি করে সস্নেহে ভর্ৎসনা করল 'নটি চ্যাপ—'

ইতিমধ্যে ঘরের প্রতিটি পুরুষ এবং তরুণী ট্রে থেকে পানীয়ের গ্লাস তুলে নিয়েছে।

নীনী এবার বলল, 'সবাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। নিন শুরু করে দিন। কুইক।'

একবার মনে হল, গলা ফাটিয়ে চেঁচাই। পরমুহূর্তে ইচ্ছা হল হাতের পাত্রটা আছাড় দিয়ে চারপাশের দেওয়াল ভেঙে পালিয়ে যাই।

কিন্তু কিছুই করা সম্ভব হল না। চেঁচিয়েও উঠতে পারলাম না। আমার পা দুটো কেউ যেন পেরেক ঠুকে আটকে রেখেছে। হাজার চেষ্টা করেও তাদের মুক্ত করা সম্ভব হবে না।

নীনী আবার তাড়া লাগাল, 'কি হল?'

আমার মধ্যবিত্ত চরিত্রের চারপাশে পাঁচিলগুলোকে আর বেশিক্ষণ খাড়া রাখতে পারলাম না। হুড়মুড় করে একসময় সেগুলোর ভিত ধসে পড়ল। প্রায় অন্ধের মত হাতের সেই রক্তবর্ণ তরল গলায় ঢেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শিরায় এবং ধমনীতে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল যেন। আর গলনলীর মধ্য দিয়ে আগুনের একটা ঢল পাক খেয়ে খেয়ে নিচের দিকে নামতে লাগল। অদ্ভুত

ঘোরের মধ্যে চেয়ারে বসে পড়লাম।

মিসেস মিত্র যা পারেন নি নীনী তা পারল। আজন্মের সংস্কারের শেষ তলানিটকু আমার নিঃশেষে মুছে দিল সে।

কতক্ষণ যে আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে ছিলাম, খেয়াল নেই। ঘোর খানিকটা কাটলে দেখলাম আসর জমে উঠেছে।

এতক্ষণ সুযোগ পাই নি। সবাই আমাকে নিয়েই মেতে ছিল। এখন আমার দিকে কারো মনোযোগ নেই। অতএব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আসরটাকে বিশ্লেষণ করার অবকাশ পেলাম।

চারজন তাস নিয়ে বসেছে। এই চারজনের একজন নীনী। বাকি দু'জন বৃত্তাকারে তাদের ঘিরে আছে।

দেখতে দেখতে প্রায় চমকেই উঠলাম। খেলোয়াড়দের কোলের কাছে নোট এবং রেজগির স্তূপ। এটা যে জুয়ার আসর, মুহূর্তে নিঃসংশয় হয়ে গেলাম।

পরিবেশটা অসহ্য লাগছে। নীনীর রহস্য আবিষ্কার করতে বেরিয়ে এ আমি কোথায় এসে পড়েছি!

বাবার মৃত্যুর পর কাকারা নিজেদের মধ্যে মারামারি খেয়োখেয়ি করে যৌথ সংসার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। বাঙলাদেশের সে এক ধ্বংসের ছবি আমি দেখে এসেছি। কিন্তু এ কোন্ দেশ, যেখানে নাম-করা সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির মেয়ে মাঝরাতে পুরুষ বন্ধুর ফ্ল্যাটে গিয়ে জুয়ার আড্ডা বসায়! বাঙলাদেশ কোন্ নরকের অতলে গিয়ে ঠেকেছে! আমার মাথা যেন চরকির মত ঘুরতে লাগল।

নতুন আরব্য রজনীর সিংদরজা খুলে নীনী আমাকে যেখানে এনে তুলেছে এক মুহূর্তও আর সেখানে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। স্নায়ুগুলোর উপরে সাংঘাতিক ঝড় চলছে যেন। ঘূর্ণায়মান মাথাটা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠেছে।

নীনীকে বলে বিদায় নেব কিনা যখন ভাবছি ঠিক তখনই রজতের দৃষ্টি এসে পড়ল আমার উপর। সে বলল, 'এই যে মিস্টার চ্যাটার্জি, এখন কিরকম ফীল করছেন?'

'ভাল।' সংক্ষিপ্ত একটা উত্তর আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'ড্রিঙ্ক করবার পরই কেমন একটু যেন হয়ে পড়েছিলেন। যাক এখন তা হলে সে অবস্থাটা সামলে উঠেছেন। তা ঐখানে অতদূরে বসে আছেন কেন? এখানে আসুন। পরিচয়টাই শুধু হল, আলাপ-টালাপ তো কিছুই হল না।'

রজত ডাকা সত্ত্বেও উঠে গেলাম না। আলাপটা নিবিড় হোক, সেটা আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। তাতে ব্যাঙ্কার এবং গিরিডির অভ্রখনির মালিকের সত্যিকারের পরিচয়টা আবিষ্কৃত হয়ে পড়ার আশঙ্কাটাই প্রবল। তা ছাড়া যে আসরে রজত আমাকে ডাক দিয়েছে সেখানে যাবার পথে কাঁটা আছে। নিজের ভেতরে কোথায় যেন অবিশ্রান্ত 'না' 'না' শুনতে পাচ্ছি।

নেশা, জুয়া এবং বেশ্যা—এই তিনটি ব্যাপারে জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

আমাদের মধ্যবিত্ত চরিত্রের কপালে নিষেধের ফোঁটা পড়ে যায়। একটা ফোঁটাকে একটু আগে প্রায় জোর করেই তুলে ফেলেছে নীনীরা। আর দু'টি সম্পর্কে প্রায় কুলের বউএর মত এখনও আমার সংস্কার রয়েছে। ঐ আসরে গেলে অবশিষ্ট সংস্কার দুটির একটির দিকে নিশ্চয়ই ওদের হাত পড়বে। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'এই তো এখানে বেশ আছি।'

এবার রজতের সুরে অন্তরঙ্গতা ফুটে বেরুল, 'আরে মশাই আসুন দেখি—'

দ্বিতীয় আমন্ত্রণটা উপেক্ষা করা আর সম্ভব হল না। গুটি গুটি খাটের ওপর গিয়ে উঠলাম।

রজত বলল, 'তারপর, চলবে নাকি ?'

সে কি বলতে চায়, বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। তবু অবুঝের মত প্রায় রুদ্ধ স্বরেই বলে উঠলাম, 'কি ?'

'কি আবার—' হাতের তাস দেখিয়ে একটা ইঙ্গিত করল রজত। সেই ইঙ্গিতের মধ্যেই উত্তরটা রয়েছে।

'না-না, দেখুন—' কোনরকমে এই পর্যন্তই বলতে পারলাম।

'এ ব্যাপারে কোন প্রেজুডিস টিস আছে নাকি ?'

এবার জবাব দেবার আগেই নীনী আমাকে বাঁচিয়ে দিল। রজতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডোণ্ট টীজ হিম। ওকে ছেড়ে দাও।'

মৃদু হাসল রজত। বলল, 'অলরাইট।'

ঘড়ির কাঁটায় যখন বারোটার সংকেত সেই সময় আসর ভাঙল। প্রচুর জিতেছে নীনী। গোছায় গোছায় নোট আর অগণিত খুচরো ব্যাগে পুরে নীনী আমাকে বলল, 'চলুন।'

বলামাত্র উঠে দাঁড়ালাম।

এদিকে নীনী সেই দরজাটা খুলে ফেলেছে। তারপর যোজকের মত সরু করিডরের দিকে পা চালিয়ে দিয়েছে।

রজতের কাছ থেকে বিদায় নেবার অবকাশটুকু আর পাওয়া গেল না। তার আগেই নীনীর পেছনে ছুটতে হল।

করিডর পেরিয়ে সেই ড্রইং রুমটা। ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে দীর্ঘ প্যাসেজ পার হয়ে দু'জনে লিফ্‌টে গিয়ে উঠলাম। মুহূর্তে স্বর্গ থেকে পাতালে পেঁাছে গেলাম।

পাতালে অর্থাৎ নিচের তলায়। সেখানে এসে নীনী বলল, 'আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে তো ?'

'আছে।'

'আমার সঙ্গেও একটা আছে।' বলতে বলতে একটু কি যেন ভেবে নিল নীনী। তারপর আবার শুরু করল, 'আপনি কি নিজেই ড্রাইভ করে এসেছেন ?'

'আজ্ঞে না। পীর আলী আমার গাড়ির ড্রাইভার।'

'আচ্ছা এক কাজ করুন।'

'কি?'

'পীর আলীকে আপনার গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলুন!'

'তা হলে আমি!'

'আপনি আমার সঙ্গে যাবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললাম না। আমার ভেতর দিকে অস্বস্তির একটা ছায়া পড়ল। আর মনে পড়ে গেল, দোতলার লাউঞ্জে মিসেস মিত্র আমি যতক্ষণ না ফিরি বসে থাকবেন। যে নীনীকে আড়ালে থেকে অনুসরণ করার জন্য আমার চাকরি, তার পাশাপাশি বসে একই গাড়িতে বাড়ি ফিরতে দেখলে মিসেস মিত্র কি সবিশেষ প্রীত হবেন! দ্বিধান্বিত সুরে বললাম, 'কিন্তু—'

'কিসের আবার কিন্তু? যা বলছি তা-ই করুন।' নীনীর স্বরটা ঈষৎ রূঢ়ই শোনাল।

এবার উত্তর দেবার বা প্রতিবাদ করার মত সাহস সংগ্রহ করে উঠতে পারলাম না। বরং ভয়ে ভয়ে নির্দেশটুকু পালন করলাম। পীর আলীকে ছেড়ে দিয়ে নীনীর গাড়িতে তার পাশে গিয়ে বসলাম।

গাড়িটা আঁকাবাঁকা গলির ধাঁধা থেকে এক সময় পার্ক স্ট্রীটে এসে পড়ল। নীনীর চোখদুটি সামনের রাস্তায় নিবদ্ধ। যদিও প্রয়োজন নেই, ওয়াইপার দুটো অবিরাম উইণ্ড স্ক্রিনের কাচ মুছে দিচ্ছে। গাড়িতে ওঠা থেকে এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি নীনী। আমিও দৃঢ়বদ্ধ আঁটা ঠোঁটে বাঁ পাশের জানালা দিয়ে প্রায় অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। তবে আমার কান দু'টি ছিল অতিরিক্ত সজাগ এবং নীনীর দিকে ফেরানো।

হঠাৎ নীনী ডেকে উঠল, 'শুভেন্দুবাবু—'

নীনী যে আমাকে ডাকবে, সে সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিতই ছিলাম। পাশে বসে নীরব সঙ্গ দেবার জন্য সে আমাকে তার গাড়িতে তোলে নি। বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সঙ্গিনীর দিকে তাকালাম।

সামনের রাস্তায় দৃষ্টি তেমনই স্থির রেখে নীনী খুব আস্তে আস্তে বলল, 'কেমন লাগল আপনার?'

প্রশ্নটি কিসের উদ্দেশ্যে বুঝতে না পেরে সভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি?'

নীনীর নীলাভ দীর্ঘ চোখ এবার আমার মুখে এসে পড়ল। সে বলল, 'কি আবার, যেখানে ঢোকার জন্যে ক'দিন ধরে আমার পিছু পিছু ঐ ম্যানসনটায় হানা দিচ্ছেন, পাঁচতলার সেই ঘরখানার কথাই বলছি। অন্য কিছু নয়।'

নীনীর জিজ্ঞাস্য যে জুয়ার আসর প্রসঙ্গে এতক্ষণে তা বোধগম্য হল। দিতে গেলে এ ব্যাপারে একটিমাত্র অভ্রান্ত অমোঘ উত্তরই দিতে হয়। অর্থাৎ বলতে হয়, 'খুব খারাপ লেগেছে'। কিন্তু যত সঠিকই হোক, এমন অপ্রিয় জবাবটা গলার ভেতর থেকে কিছুতেই বার করে আনতে পারলাম না।

নীনী আবার বলল, 'কি, মুখ বুজে কেন?'

আড়ষ্টের মত কোনরকমে বলতে পারলাম, 'আজ্ঞে—'

'ভয় না ভদ্রতা—কোনটায় আটকাচ্ছে ?' নীনী হেসে উঠল।

আগের মতই অবরুদ্ধ স্বরে বললাম, 'আজ্ঞে—'

'আশ্চর্য মানুষ তো আপনি। পরিষ্কার বলুন না, পাঁচতলার সেই ঘরখানা আপনার ভাল লাগে নি।'

আমার মনের কথাটা যদিও নীনীর মুখে উচ্চারিত হয়েছে তবু নতচোখে নিশ্চুপ বসে রইলাম।

নীনী আপাতত আর কিছু বলল না।

কতক্ষণ যে চুপচাপ বসে ছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। মুখ তুলে দ্বিধান্বিত সুরে ডাকলাম, 'নীনী দেবী—'

সঙ্গে সঙ্গেই নীনীর সাড়া পাওয়া গেল।

'আপনি—' বলতে গিয়েও থমকে গেলাম।

'কি হ'ল, বলুন।'

'আপনি—' মরিয়ার মত এবার বলেই ফেললাম, 'আপনি রজতবাবুদের কাছে আমার ঐ পরিচয় দিলেন কেন ? সত্যিই তো আমি মাইকা মাইনের মালিক বা ব্যাঙ্কার নই।'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই উচ্ছ্বসিত হেসে উঠল নীনী। বিচিত্র ঢেউয়ের দোলায় তার সুগঠিত লীলায়িত শরীর বেঁকে চুরে যেতে লাগল যেন। আমার আশঙ্কা হতে লাগল, তার হাত থেকে স্টিয়ারিংটা খুলে গিয়ে একটা দুর্ঘটনা না ঘটে যায়।

কিন্তু হাসির যা কিছু উচ্ছ্বাস বা ঢল, শরীরের ওপর দিয়েই বয়ে গেল। হাতদুটি তিলমাত্র স্থানচ্যুত হ'ল না।

আচমকা হাসি থামিয়ে নীনী বলল, 'কী পরিচয় দিলে আপনি খুশি হতেন ?'

'আমি যা তা-ই।' আমার গলার স্বর ঈষৎ দৃঢ়ই শোনাল।

'আপনি তো পঁচাত্তর টাকার স্লেভ, এই পরিচয় নিয়ে ওখানে যাওয়া যায় না। তা ছাড়া—'

'কী ?'

'একটা ঘৃণিত গুপ্তচরকে নিয়ে সোসাইটির হাইয়েস্ট লেভেলে আমার মত মেয়ে ঘুরে বেড়াবে, এ কথা আপনি ভাবলেন কেমন করে ?'

এই সোসাইটি! বিশাল ম্যানসনের ঐ জুয়ার আড্ডাটা সমাজের শীর্ষ-বিন্দু! চমৎকার। আমি কি বলব, ভেবে পেলাম না। বিমূঢ় বিস্ময়ে চুপচাপ বসে থাকাটাই শ্রেয় মনে হল।

নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার মধ্যে এর পর অনেকখানি সময় এবং রাস্তা পার হয়ে গেল। ঠিক স্তব্ধতা বুঝি নয়। কেমন এক শ্বাসরুদ্ধ জড় আড়ষ্টতা।

অনেকক্ষণ পর নীনী ডাকল। গলাটা এবার আশ্চর্য কোমল, 'শুভেন্দুবাবু, আপনি রাগ করেছেন ?'

'না, রাগ করব কেন ? আপনি যা বলেছেন, তা তো মিথ্যে নয়।' বললাম বটে, আমার স্বরে ক্ষোভটুকু কিন্তু অস্পষ্ট রইল না।

নীনী কিন্তু আমার ক্ষোভের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হ'ল না। বরং বিচিত্র চাপা শ্লেষে বলে উঠল, 'আমার জীবনযাত্রার যে ঝলকটুকু আপনার চোখে পড়েছে তাতে নিশ্চয়ই আমাকে ঘেন্না করতে শুরু করেছেন, তাই না শুভেন্দুবাবু ?'

'না, তা কেন—' থতমত ভঙ্গিতে আধফোটা উচ্চারণে কথা ক'টি বললাম।

'হ্যাঁ, তা-ই। মুখ ফুটে আপনার না-বলাটাও এক রকমের বলা-ই। সেটুকু না বুঝবার মত বয়েস আমার নয়। তবে কি জানেন, আমাদের ঐ তাস খেলাটাকে দু-ভাবে ধরতে পারেন। নির্দোষ স্পোর্ট যদি ধরেন, স্পোর্ট। আর তা না হলে ওটা একটা প্রতীক, সিম্বল।'

'সিম্বল ! কিসের ?'

'আমাদের জীবনের, আমাদের এই যুগের।'

চকিত হয়ে নীনীর মুখের দিকে তাকালাম। অদৃশ্য এক রহস্যময়তা তার চারপাশ ঘিরে রয়েছে। সেটা ভেদ করে গভীরে ঢুকব, সাধ্য কি। নিশ্চুপ তাকিয়েই রইলাম।

নীনী এবার তার বক্তব্যটাকে ব্যাখ্যা করতে লাগল, 'বুঝতে পারলেন না, তাই তো ? আমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি আপনার জানা থাকে তা হলে বুঝতে অসুবিধে হবে না। শুধু আমাদের কেন, এ যুগের যে কোন মানুষের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন। অন্যের কথা থাক, সুবিধের জন্যে আমাদেরটাই ধরুন। সুখের জন্যে, টাকার জন্যে, মেটিরিয়াল গেইনের জন্যে সময়ের কাছে আমাদের সমস্ত সততা পবিত্রতা আর ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনকে আমরা বাজি ধরে বসে আছি।'

চমকে উঠলাম। সেই সঙ্গে স্তম্ভিত এবং হতবাক নীনীর অস্তিত্বের ওপর অশরীরী কিছু ভর করেছে যেন। তার আত্মবিস্মৃত আত্মা অবচেতনের অতল থেকে সমস্ত স্তর ঠেলে বেরিয়ে এসে এ কি প্রলাপ শুরু করেছে !

নীনীদের পারিবারিক ইতিহাস এখনও আমার অজানাই। সুরপতিবাবু বা গুপীর মুখে যেটুকু শুনেছি সেই খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো আমাকে উদগ্রীব করে তুলেছিল। এই মুহূর্তে আমার কৌতূহল একটু একটু করে প্রায় শীর্ষবিন্দুতে পেঁছিুল। পেঁছিুল বটে, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। নিজের থেকেই নীনী যতটুকু বলে, তার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলাম।

নীনী বলতে লাগল, 'এই আপনার কথাই ধরুন না। শুধু বাঁচবার জন্যে দুই মুঠো ভরে সমস্ত সংস্কার, চরিত্র, আদর্শ কার পায়ে ছুঁড়ে দিয়েছেন, একবার ভাবুন। নিজের প্রাণের সঙ্গে প্রাণ ধারণের দায় নিয়ে এ কোন জুয়া !'

সে কি বলতে চায় বুঝতে না পেরে বললাম, 'প্রাণ ধারণের দায় নিয়ে জুয়া ! মানে ?'

'মানেটা নিজেই বুঝতে চেষ্টা করবেন। সেটাই ভাল। শুধু যেখানে চাকরি নিয়েছেন তার চারদিকে লক্ষ্য রাখবেন। তা হলেই কিছু অবোঝা থাকবে না।'

নীনী চাকরি প্রসঙ্গে কোন দিকে ইঙ্গিত দিয়েছে? ঝিলিক হানার মত হঠাৎ মনে হল, মিসেস মিত্রের সম্পর্কেই কি? যে সম্পর্কেই হোক, এই মুহূর্তে তা জানার উপায় নেই।

এদিকে আরো একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। তাদের পারিবারিক ইতিহাসের ওপর থেকে চকিতের জন্য একবার যবনিকা তুলেই আবার নামিয়ে দিয়েছে নীনী। অতএব সে ব্যাপারে আমার দুর্বার কৌতূহল থেকেই গেল। তবে এই মুহূর্তে চমকিত বিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম এত দিনে নীনীকে যে-ভাবে যে-রূপে দেখছি সেটা তার আসল স্বভাব নয়। তার বাইরের দিকের আবরণ মাত্র।

নীনীর ভেতর দিকে বিপরীত একটা মানুষের বাস। এই মুহূর্তে কোন এক অলৌকিক যাদুকরের মন্ত্রে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যেন।

কথায় কথায় একসময় বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছিলাম। গেটের কাছে হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে দিল নীনী। বলল, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করব শুভেন্দুবাবু, রাখতেই হবে।'

'কি?' আমি উদগ্রীব হলাম।

'আগে বলুন আমি যা বলব তাতে রাজি হবেন।'

'আপনার অনুরোধটা কি, তা-ই তো জানলাম না।'

'খুব কঠিন কিছু নয়।'

'তবু?'

নীনী বুঝল, না জেনে তার কথায় সায় দিতে আমার নিদারুণ আপত্তি। অসহিষ্ণু সুরে সে বলে উঠল, 'কেন শুধু শুধু কথা বাড়াচ্ছেন? কত রাত হয়েছে সে খেয়াল আছে?'

কোথা থেকে যেন খানিকটা দুঃসাহস আমার ওপর ভর করল। চোখ বুজেই প্রায় বলে ফেললাম, 'আপনি নিজেই বিবেচনা করে দেখুন, কোন কিছু না জেনেশুনে রাজি হয়ে যাওয়া কি উচিত? শেষ পর্যন্ত যদি কথা রাখা আমার পক্ষে সম্ভব না হয়।'

'বেশ তা হলে আগেই শুনুন। আজ তাস খেলায় আমি অনেকগুলো টাকা জিতেছি। আমার ইচ্ছে ওগুলো আপনাকে দিই।' বলতে বলতে ব্যাগের ভেতর থেকে এক গাদা নোট আর রেজগি বার করতে লাগল।

কিন্তু শুরুতেই বাধা দিলাম। ভীত সুরে বললাম, 'না-না, ও-টাকা আমি নিতে যাব কেন?'

'কারণ আমার টাকার দরকার নেই, আপনার আছে। আর টাকার জন্যেই তো বাড়িঘর ছেড়ে কলকাতায় এসেছেন।'

'কিন্তু—'

'কি ?'

'টাকার জন্যে তো চাকরিই করছি। নিজের গায়ে খেটেই আমি রোজগার করতে চাই।'

আমার কথাগুলোর মধ্যে একটা অনুচ্চারিত 'না' ছিল। ভ্রূকুঞ্চিত করে সেই 'না'-টাকেই বিশদ করল নীনী, 'অর্থাৎ স্বোপার্জিত অর্থ ছাড়া আপনি কিছুই স্পর্শ করবেন না, এই তো ?'

নিজের প্রায় অজান্তেই এবার বলে বসলাম, 'দেখুন নীনী দেবী, জুয়ার টাকা আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব না।'

যা ছিল আভাসে তা একেবারেই অনাবৃত করে দিলাম। আমার বক্তব্যটা এবার সরাসরি ; কোথাও বিন্দুমাত্র কারচুপি নেই।

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না নীনী। স্থির নিষ্পলকে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আস্তে আস্তে চোখের কোণদুটি কুঁচকে যেতে লাগল। রক্তাভ ঠোঁট প্রখর ব্যঙ্গে বেঁকে গেল। চাপা তীক্ষ্ম স্বরে এক সময় বলে উঠল সে, 'অনেষ্টি !'

মনে হল, অনেষ্টি শব্দটার ওপর পৃথিবীর সমস্তটুকু ঘৃণা ঢেলে দিল নীনী। আমি কিছু বললাম না।

নীনী আবার বলে উঠল, 'কিন্তু স্যার, নিজের দিকে কখনও ফিরে তাকিয়েছেন—'

রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'মানে—'

'সৎ ভাবে টাকা রোজগারের তো খুব গর্ব আপনার। কিন্তু যাঁর কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়েছেন সেই মিসেস মিত্র কিভাবে টাকা আর্ন করেন, সে-সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে ?'

সুরপতিবাবুর কাছে এ সম্বন্ধে কিছু আভাস পেয়েছিলাম। নতচোখে বললাম, 'যা আছে তা খুব ভাসা-ভাসা, পরের মুখে শোনা।'

'তবেই ভেবে দেখুন সততার গর্ব আপনার মানায় না। মিসেস মিত্রের টাকা মাসের শেষে হাত পেতে নেন ; তাঁর টাকাতেই তো আপনার প্রতিদিনের বেঁচে থাকা !'

আমার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে যেতে লাগল। বুকের মধ্যে কোথায় একটা ধস্ নামল। আর তার অতলে একটু একটু করে চেতনাটা ডুবতে লাগল। সেটা পুরোপুরি নিমজ্জিত হবার আগেই তড়িতাহতের মত আবিষ্কার করলাম, এই ক'দিনের কথাবার্তায় নীনীর মুখে 'মা' শুনিনি। বিচিত্র শ্লেষ আর ধিক্কার মিশিয়ে সে 'মিসেস মিত্র' উচ্চারণ করে।

এরপর কতক্ষণ যে স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গিয়েছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ কার স্পর্শ এসে যেন লাগল বুকের কাছে। চমকে উঠে দেখলাম নীনী আমার পকেটে নোটের তাড়া গুঁজে গুঁজে দিচ্ছে। বিব্রত শঙ্কিত সুরে বললাম, 'এ কি ! এ কি !'

অদ্ভুত হাসল নীনী, 'মিসেস মিত্রের টাকা হাত পেতে নিলে এই টাকাও

নেওয়া যায় শুভেন্দুবাবু।'

কিছু একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। গলার কাছে এসে উত্তরটা ডেলা পাকিয়ে গেল। আমার ধমনী এবং রক্তস্রোত কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগল। আর সংস্কারের যে তলানিটুকু এখনও অবশিষ্ট রয়েছে সেটা একটু একটু করে মুছে যেতে শুরু করল।

আমাকে নিয়ে নীনীর এ কোন নিষ্ঠুর হৃদয়শূন্য কৌতুক!

চোদ্দ

কাল রাত্রে মিসেস মিত্রের সঙ্গে দেখা করিনি। দোতলার লাউঞ্জে আমার জন্য অপেক্ষা করে করে ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই একসময় বিরক্ত এবং কিছুটা বা উৎকণ্ঠিত হয়ে ঘরে ফিরে গেছেন। বিরক্তির কারণ সহজেই আন্দাজ করা যায়। উৎকণ্ঠিত, কেননা আমার চাকরি জীবনের শুরু থেকেই প্রতি রাত্রে নিয়মিত তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। এবং নীনীর গতিবিধি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছি। কিন্তু কাল রাত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে। স্বভাবতই কিছুটা উদ্বিগ্ন হওয়া তাঁর পক্ষে সঙ্গত।

কাল নীনীর গাড়ি থেকে নেমে ঘোরের মধ্যে ভাঙা বাড়ির সেই বিবরে চলে গিয়েছিলাম। রাত আর বেশি ছিল না। যেটুকু ছিল, না ঘুমিয়েই নিশিপালন করে কাটিয়েছি। কি এক আচ্ছন্নতা স্নায়ুগুলোকে অসাড় করে রেখেছিল। আর বার বার আমার ছাব্বিশ বছরের জীবন, আমার ভালমন্দের বিচার এবং আমার অন্ধ-বন্ধের তলদেশ থেকে নিদারুণ এক অস্বস্তি উঠে এসে সমস্ত অস্তিত্বকে তোলপাড় করে ফেলছিল।

আজ সকাল বেলাতেও তার জের কাটে নি। অন্য সব দিন ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে মিসেস মিত্রের নতুন বাড়িতে ব্রেকফাস্ট সারতে যাই।

কিন্তু আজ কিছুই ভাল লাগছে না। যত অনিচ্ছাতেই হোক, কাল রাত্রে মদ খেয়েছি, জুয়ার টাকা পকেটে নিয়ে ফিরে এসেছি। আমার আজন্মের সমস্ত সংস্কার আর মূল্যবোধ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

আজ সকালে ব্রেকফাস্ট করতে আর নতুন বাড়িতে গেলাম না। মুখটুখ না ধুয়েই ভাঙা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলকাতার রাস্তায় এসে পড়লাম। তারপর শুরু হল আত্মবিস্মৃতের মত উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো।

উনিশ শ বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশে অর্থাৎ মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি কলকাতার তাবত দেউড়ি দিয়ে মানুষের ঢল বেরিয়ে গিয়েছিল। পঁয়তাল্লিশের শেষের দিকে সেই ঢল আবার ঘরমুখী হয়েছে। যে কলকাতা শ্মশান হয়ে গিয়েছিল তার শিরায় শিরায় গাড়ি এবং মানুষের স্রোত বইতে শুরু করেছে। সেই খরস্রোতে ভাসতে ভাসতে কখন যে শ্যামবাজারের বাসে উঠে বসেছিলাম, খেয়াল নেই। আবার কখন যে শ্বাসরুদ্ধ সরু গলিটার এক প্রান্তে বুলাকিদের সেই জরাগ্রস্ত বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, তা-ও বলতে পারব না।

বাড়ির সামনের দিকে সংক্ষিপ্ত রোয়াক। সেখানে দাবার আসর বসেছে। আসর আর কি, দু'টি মাত্র মানুষ। দু-জনেই মধ্যবয়সী। একজনের রস-কষ-বর্জিত শুকনো পাকানো শরীর, চোখে নিকেলের গোলাকার চশমা। এই লোকটি আমার পরিচিত—বুলাকিদের বাড়িওলা। দ্বিতীয় লোকটি চেহারার দিক থেকে বাড়িওলার সম্পূর্ণ উল্টো। থলথলে বাতের শরীর। পরনে হাঁটু পর্যন্ত চিটচিটে ধুতি। ঊর্ধ্বাঙ্গ উলঙ্গ থাকায় বোঝা যাচ্ছে সারা দেহ তার রোমশ। বুক-পিঠ-কান, বিশাল মাংসল পেট—সর্বত্র কাঁচা পাকা লোমের উদার অভ্যুদয় ঘটেছে। কোথাও এতটুকু চামড়া দেখার ফাঁক নেই।

বাড়িওলা এবং তার প্রতিপক্ষ দাবার ছকের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে।

যুদ্ধোত্তর কলকাতায় যেদিন প্রথম আসি সেদিনই বাড়িওলাকে দেখেছিলাম।

সেই প্রথম দিনটির পর আরো বারকতক আমি শ্যামবাজারের এই বাড়িতে বুলাকিদের কাছে এসেছি। কিন্তু বাড়িওলার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। দাবার ছকে মগ্ন লোক দুটিকে বাঁয়ে রেখে বাড়ির ভিতরে পা চালিয়ে দিলাম।

সবেমাত্র সদর দরজাটা পেরিয়েছি সেই মুহূর্তে ব্যাঘাত ঘটল। পাশ থেকে বাড়িওলা হুমকে উঠল, 'এ্যাই—এ্যাই—'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আশ্চর্য! বাড়িওলা কিন্তু মুখ তোলে নি। তার দৃষ্টি যথারীতি দাবার ছকে আবদ্ধ। সেই অবস্থাতেই হাতের ইসারায় সে আমাকে ডাকছে।

পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, 'আমাকে ডাকলেন?'

'হ্যাঁ।' দাবার ছকে চোখ রেখেই বাড়িওলা বলতে লাগল, 'অমন গুটি গুটি ভেতরে ঢোকা হচ্ছিল যে? ভেবেছিলে ঘাড় নিচু করে আছি বলে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু বাপু আমি সহস্রাক্ষ ইন্দ্র। সারা গায়ে আমার চোখ। অত সহজে ফাঁকি দিতে পারবে না। তা মতলবটা কী?'

'মতলব? কিসের?' বিমূঢ় স্বরে প্রশ্ন করলাম।

এতক্ষণে চোখ তুলল বাড়িওলা, 'ভেবেছ, চিনতে পারিনি। যদি তাই ভেবে থাক, ভুল করেছ। একবার দেখলে জীবনে আমি ভুলি না। তা এই মাসকয়েক আগে সীতেশের ঠিকানা নিয়ে গেলে। আবার এখানে ঘোরাফেরা কেন?'

বাড়িওলার স্মৃতিশক্তিকে তারিফ না করে উপায় নেই। কয়েক মাস আগের সামান্য ক'টি মুহূর্তের দেখাকে অবিকল মনে করে রেখেছে সে। যত-দূর মনে পড়ছে প্রথম দিন 'আপনি' করেই বলেছিল বাড়িওলা। দ্বিতীয় সাক্ষাতে এক ধাপ নামিয়ে একেবারে 'তুমি'তে পৌঁছে গেছে।

খানিকটা হকচকিয়ে বলে ফেললাম, 'আজ্ঞে বুলাকি দেবীর সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছি।'

'অ!' একটিমাত্র শব্দ করে চোখের বিচিত্র ভঙ্গি করল বাড়িওলা। নির্দোষ একটি শব্দের সঙ্গে মুখচোখের ভাব মিশ্রিত হলে কতখানি অর্থ আর অশ্লীলতা সৃষ্টি হতে পারে, আগে জানা ছিল না। এই মুহূর্তে জানামাত্র আমার সমস্ত

স্নায়ুর মধ্যে আগুনের ঝলক খেলে গেল। কিছু একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করলাম কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না।

বাড়িওলা আবার বলে উঠল, 'তা বাবু বদল হ'ল নাকি?'

'কী বলছেন!' এতক্ষণে কথা বলতে পারলাম।

'বলছি ঐ ছুঁড়িটার কথা। এতদিন তো সীতেশ তার মুরুব্বি ছিল। এবার থেকে কি—' বক্তব্যের শেষাংশটুকু উহ্য রেখেই থেমে গেল বাড়িওলা। শুধু তার চোখে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন এক খেলা চলতে লাগল।

উহ্য রাখলেও বাড়িওলার ইঙ্গিত অনায়াসেই বুঝতে পেরেছি। তার লক্ষ্য যে আমি সেটুকু বোঝার সঙ্গে সঙ্গে অপমানে ধিক্কারে আমার সমস্ত অস্তিত্ব কুঁকড়ে যেতে লাগল। ইচ্ছা হল, নিজেকেই আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে ফেলি। এই বিশাল শহরে গিয়ে দাঁড়াবার মত কত জায়গাই তো ছিল। কিন্তু সকাল হতে না হতেই কেন এখানে এসেছিলাম, কেন?

বাড়িওলা নামে নির্লজ্জ কুৎসিত পোকাটাকে অসহ্য লাগছে। লোকটা আমাকে ভেবেছে কি! আর কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার শিরায় শিরায় বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। হয়ত লোকটার ওপর ঝাঁপিয়েই পড়ব। তার চাইতে নিঃশব্দে সমস্ত অপমান আর ঘৃণা বহন করে ফিরে যাওয়াই উচিত।

ফিরবার জন্য সবেমাত্র ঘুরে দাঁড়িয়েছি, বাড়িওলা প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'ব্যাপারটা কি, যাওয়া হচ্ছে যে—'

এবার আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'যাব না তো একটা ইতরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকব না কি?'

আমার মুখ থেকে এমন একটা বিশেষণ বেরিয়ে আসবে, প্রথমটা যেন বিশ্বাসই করতে পারল না বাড়িওলা। একটুক্ষণ থতিয়ে থেকে সে ফেটে পড়ল, 'আমি ইতর!'

'হ্যাঁ, ঠিক তা-ই।' প্রায় ভেংচেই উঠলাম।

একমুহূর্ত কি ভাবল বাড়িওলা। তার পর আশ্চর্য, পরম শান্ত হয়ে গেল সে। এবং এক কাণ্ডই করে বসল। দুই হাত জোড় করে অনুনয়ের সুরে বলল, 'বেশ তাই। কিন্তু দয়া করে এই ইতরকে রক্ষা কর। বুলাকিদের এখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে যেখানে যত খুশি রাসলীলা চালাও গে। সে মাগীটাকে কতদিন থেকে বলছি, উঠে যা, উঠে যা। তা উঠবার নামগন্ধ নেই। যখনই যাবার কথা উঠোই খালি বলে, 'কোথায় যাব?' আরে ছুঁড়ি, কোথায় যাবি আমি তার কি জানি! এত বড় কলকাতার শহর, যে চুলোয় প্রাণ চায় চলে যা।' বলতে বলতে গলাটা পর্দায় পর্দায় চড়তে লাগল বাড়িওলার।

রুদ্ধ আক্রোশে আমি চুপ করেই রইলাম।

বাড়িওলা সমানে বলতে লাগল, 'এ্যাদ্দিন যুদ্ধু চলছিল, ছেলেমেয়ে-পরিবার—সব দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ছুঁড়ি যেমন খুশি চলেছে। চোখ থাকতে অন্ধ, কান থাকতে কালা হয়ে থেকেছি। কিন্তু এবার দেশের বাড়ি থেকে ফ্যামিলি চলে আসবে। বড় বড় সব ছেলেমেয়ে—চোখের

ওপর এমন সৎ দৃষ্টান্ত থাকলে আর রক্ষে নেই। তাই বলছিলাম আমায় বাঁচাও। এ জঞ্জাল আমার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাও।'

এক নিঃশ্বাসে উত্তেজিত সুরে কথাগুলো বলে থামল বাড়িওলা। এতক্ষণ বকবকানির ধকলে তার জীর্ণ বুকে তোলপাড় শুরু হল যেন। জোরে জোরে বারকতক শ্বাস টানল সে। বুঝলাম, তার উত্তেজনার জোয়ারে হঠাৎ ভাটার টান ধরেছে। বললাম, 'আমি বুলকির কে যে তাকে এ-বাড়ি থেকে নিয়ে যাব। আমি বললেই বা সে যাবে কেন?'

আমার কথা শেষ হবার আগেই বাড়িওলা খ্যাল খ্যাল করে হেসে উঠল। দাবার জুড়ি যে মানবেতর লোমশ থলথলে লোকটা এতক্ষণ অখণ্ড মনোযোগে আমাদের কথা গিলছিল, তার দিকে ফিরে বাড়িওলা বলল. 'শোন দাদা, জিগ্যেস করছে 'আমি বুলকির কে?' ভেবেছে আমি কিছুই জানি নে। প্রথম দিন এসে সীতেশের ঠিকানা নিয়ে গেল। তারপর একদিন দুপুরে এল বুলকির সঙ্গে। তারপর থেকে প্রায়ই আসত। বুলকিদের ঘরে বসে কত কথা! কত ফষ্টি নষ্টি, ঢলাঢলি! এখন বলছে, 'আমি বুলকির কে?' শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।'

শুনতে শুনতে চকিত হয়ে উঠলাম। সীতেশদার ঠিকানা নিয়ে যাবার পর বাড়িওলার সঙ্গে এই আমার দ্বিতীয় দেখা। এই দুই দেখার মাঝে এ বাড়িতে আমি বহুবার এসেছি। বাড়িওলাকে অবশ্য কোনবারই দেখিনি। কিন্তু আমার প্রতিটি আসা যাওয়া তার কাছে ধরা পড়ে গেছে।

লোকটা কি খড়ি পেতে গুণতে জানে! নাকি গর্ব করে নিজের সম্বন্ধে সে যা বলেছে অর্থাৎ হাজার চোখওলা ইন্দ্র, সে তা-ই। এই দোতলা বাড়ির কোন অদৃশ্য ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে সে আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখত, কে বলবে।

আপাত চোখে আমার সম্বন্ধে যা ধারণাটা করা স্বাভাবিক তা-ই করেছে বাড়িওলা। এতক্ষণে আমার সঙ্গে তার ব্যবহারের অর্থটা পুরোপুরি বুঝতে পারলাম যেন।

সহস্রাক্ষ ইন্দ্র অথবা সর্বজ্ঞ—বাড়িওলা যা-ই হোক, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। আমার মাথা টলছে, পায়ের তলার মাটিতে দুরন্ত দোলা লেগেছে। আরক্ত আহত মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে অন্ধের মত দৌড়তে শুরু করলাম। পেছন থেকে কে যেন কী বলে উঠল, শুনতে পেলাম না।

এতক্ষণ বায়ুশূন্য একটা গুহায় কেউ জোর করে আমাকে আটকে রেখেছিল। ফুসফুসের ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দৌড়তে দৌড়তে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর সামনে চলে এলাম। জোরে জোরে সমস্ত বুকটাকে তোলপাড় করে বার কয়েক শ্বাস টেনে যেন বাঁচলাম। তার পরেই খেয়াল হল, এখন আমি কোথায় যাব? মিসেস মিত্রদের বাড়িতেই কি, না আরো কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব?

মিসেস মিত্রদের বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই মনে মনে স্থির করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাস স্টপের দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাসে ওঠা আর হ'ল না। কে যেন পেছন থেকে ডেকে উঠল, 'শুভেন্দুবাবু—'

ফিরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। বুলাকি। এই মুহূর্তে তাকে আশা করিনি। দেখাটা দৈব যোগাযোগেই যেন ঘটে গেল।

বুলাকি বলল, 'কি ব্যাপার, এখানে দাঁড়িয়ে যে—'

এই মেয়েটিই আজকের সমস্ত অপমানের জন্য দায়ী। এর জন্যই বাড়িওলার কাছ থেকে অহেতুক কতকগুলো কদর্য অশ্লীল কথা শুনে আসতে হয়েছে। রুদ্ধ আক্রোশে বুলাকির দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ রুক্ষ গলায় বললাম, 'বাসের জন্যে অপেক্ষা করছি। ভবানীপুর ফিরব।'

'ওঃ, কতদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা! এদিকে কোথায় এসেছিলেন?'

'একটি মহিলার কাছে। খুব শিক্ষা হয়েছে।'

আমার মনোভাব বা একটু আগের ঘটনা—কোনটাই বুলাকির জানা সম্ভব নয়। কিন্তু গলার স্বরে আমার যে ক্ষোভ অসন্তোষ এবং রাগ রয়েছে সেটা অনায়াসেই বুঝতে পারল সে। কিসের একটা আভাস পেল যেন। একটুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে শঙ্কিত সুরে জিজ্ঞেস করল, 'এ-পাড়ায় আপনার পরিচিত মহিলা কে আছে?'

'আপনি—আপনি—' এবার প্রায় চেঁচিয়েই উঠলাম।

'আমি!' প্রথমটা যেন থতিয়ে গেল বুলাকি। তারপর নিজের অজান্তে অনেকখানি কাছাকাছি এসে ম্লান উৎকণ্ঠ সুরে বলল, 'আপনি কি আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না।'

'মা'র?'

'না।'

'মণ্টুর?'

'না।'

'তা হলে কি হয়েছে আমাকে খুলে বলুন।' গলার স্বরটা কেমন শিথিল শোনাল বুলাকির।

'তা শুনে লাভ?' আমার কাঠিন্য বিন্দুমাত্র কমলো না। অটুট শক্ত হয়েই রইলাম।

'না শুনে লাভ-লোকসান কষব কেমন করে? আপনি বলুন, বলতেই হবে।' বুলাকির ওপর কোত্থেকে হঠাৎ একটা অনমনীয় জেদ ভর করে বসল।

আমি উত্তর দিলাম না। আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালাম।

বুলাকি বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায় ?' না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

'যেখানে নিয়ে যাই।'

'আপনাদের বাড়ি যেতে পারব না।'

'সে আমি বুঝব।'

'না।'

বুলকির জেদটা এবার আলগা হয়ে এল। কিছুটা ক্লান্ত ভঙ্গিতে সে বলল, 'বেশ, যখন ইচ্ছে নয় বাড়িতে যাবেন না। অন্য কোথাও যাওয়া যাক। আসুন—'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলাম। হাঁটতে হাঁটতে বুলকি আমাকে দেশবন্ধু পার্কে নিয়ে গেল।

উত্তর কলকাতার এই সুবিশাল পার্কটা একেবারেই নির্জন। জাপানী বোমার অনিবার্য ধ্বংস থেকে বাঁচবার জন্য চারদিকে অগুণতি ট্রেঞ্চ কাটা। মানুষের খোঁড়া সেই সুড়ঙ্গগুলো অব্যবহারে অযত্নে ব্যাঙ এবং তাবত পোকামাকড়ের চরে বেড়াবার জায়গা হয়ে উঠেছে। গত বর্ষার শেওলামাখা কালচে জল, দুর্গন্ধ আর আগাছা—শোভা বলতে এ-ই, ঐশ্বর্য বললেও এ-ই। এ ছাড়া সুড়ঙ্গগুলির মধ্যে আর কিছু নেই।

এখন কত আর বেলা! ন'টার বেশি নয়। যদিও মাসটা অঘ্রাণ, শীত দুয়ারে দাঁড়িয়ে, তবু এই সামান্য বেলাতেই বাতাস গরম হয়ে উঠেছে। রোদের তাপটা গায়ে বেশ লাগে। অতএব গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চে গিয়ে আমরা বসলাম।

বসামাত্রই বুলকি বলে উঠল, 'বলুন।'

মনের ভেতর কথাগুলো সাজানোই ছিল। আজ সকালে বুলকিদের বাড়ি এসে বাড়িওলার কাছে কীভাবে অপমানিত হয়েছি—রুষ্ট উত্তেজিত মুখে সব বলে গেলাম।

সমস্ত শুনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল বুলকি। তারপর করুণ একটু হেসে বলল, 'এর মধ্যে আমার দোষ কোথায় ?'

'দোষ আপনার নয়, আমার। যেদিন টমিটা আপনাকে তাড়া করেছিল সেদিন বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলাম—ওই পর্যন্তই সব ব্যাপারটা চুকে যেত, আর কোনদিন না আসতাম, আজ আমাকে এ-ভাবে অপদস্থ হতে হত না।' আমার ক্ষোভ বুলকির কৈফিয়তে এতটুকুও কমে নি। এই যুদ্ধোত্তর কলকাতার ভেতরে বাইরে যতই ঢুকছি যতই দেখছি ততই যেন ডুবে যাচ্ছি।

কাল রাত্রে নীনী আমার আজন্মের সংস্কার ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। আজ বুলকির জন্য জীবনের আরেক দিকে ধস নামল। এই কলকাতা বুঝি আমার জন্মার্জিত অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচতে দেবে না।

ভাঙা চাপা গলায় বুলকি বলে উঠল, 'কিন্তু—'

'কী ?'

'আপনি তো সবই জানেন।'

'কী ?'

'বাড়িওলার কথা মিথ্যে। আপনার আর আমার ভেতর কোন অন্যায়ই নেই।' নতচোখে রুদ্ধশ্বাসে বলল বুলাকি।

'জানি।' এতক্ষণে প্রায় অগোচরে আমার মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রতিক্রিয়া ঘটল। আস্তে আস্তে বললাম, 'তবু—'

'কী ?'

'আমাদের মধ্যে কিছু না-থাক, তবু তো লোকের মুখ! শুধু শুধু দুর্নাম গেয়ে বেড়াবে, এটা আমার পছন্দ নয়। তাই ভাবছি—'

বুলাকি এবার মুখে আর কোন প্রশ্ন করল না। উৎসুক শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, 'ভাবছি, আপনাদের বাড়ি আর আসব না। পরিচয়ের জেরটা না টানাই ভাল।'

ঘাড় ভেঙে মাথাটা যেন ঝুলে পড়ল বুলাকির। একটা অসহায় শিথিলতা তার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করল যেন। অনেকক্ষণ পর অস্পষ্ট গলায় ফিস ফিস করে উঠল সে, 'শুভেন্দুবাবু—'

ডাকটির মধ্যে এমন এক বিষাদ ছিল যা বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলাম, 'বলুন।'

'আমি যে আপনার ওপর—আপনার ওপর—'

'আমার ওপর কী ?'

'অনেক ভরসা করে বসে আছি।'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু অনুভব করলাম ধমনীতে রক্তস্রোত মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। আর এই দেশবন্ধু পার্ক, চারপাশের জনহীন রাস্তা, অঘ্রাণের দোলা-লাগা বাতাস, রোদ—সব তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে গেল। একসময় খানিকটা ধাতস্থ হয়ে কাঁপা গলায় বলতে পারলাম, 'কিসের—কিসের ভরসা—'

'বলছি। তার আগে ক'টা কথা শুনে নিন।'

'বলুন—'

'অনেকদিন আপনি আমাদের বাড়ি আসেন নি। তাই সব ব্যাপার জানেনও না। এদিকে কত কাণ্ড ঘটে গেছে! আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না শুভেন্দুবাবু।' বলতে বলতে বুলাকির স্বর ভারী এবং বিমর্ষ হয়ে গেল। দু হাতে মুখ ঢাকল সে।

ইচ্ছা ছিল না তবু নিজের অজান্তেই কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, 'কী হয়েছে ?' আমার চোখেমুখে খানিকটা উৎকণ্ঠা ফুটে বেরুল বুঝি।

মুখ থেকে হাত সরাল না বুলাকি। একই অবস্থায় নিশ্চল হয়ে বসে রইল। আর স্খলিত আচ্ছন্ন গলায় বলতে লাগল, 'আপনি তো জানেন, বাবা মারা যাবার পর কিসের দামে আমাদের সংসারটা এতকাল চলে আসছে।'

উত্তর দিতে গিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। তার গ্লানিময়

করুণ জীবনের সব দিকের সব দুয়ার আগেই আমার কাছে খুলে দিয়েছিল বুলকি। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে খুব আস্তে প্রায় অস্ফুটে বলতে পারলাম, 'জানি, আপনিই একদিন বলেছিলেন।'

'কিন্তু—'

'কী ?'

'এত দাম দিয়েও সংসারটাকে আর বাঁচাতে পারছি না। আমি—আমি—' কথাটা আর শেষ করতে পারল না বুলকি। গলাটা এতক্ষণ কাঁপছিল। সেই কাঁপুনির ঢেউ এবার তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল।

আমি চুপ করে রইলাম।

খানিকটা সামলে উঠে বুলকি আবার শুরু করল, 'জানেন, আজ মাসখানেক ধরে সীতেশ মল্লিক একটা পয়সাও দিচ্ছে না। তার সঙ্গে দেখাই করতে পারছি না। শুনছি একটা গুজরাটি মেয়ে নিয়ে আজকাল মেতে আছে।'

'কার কাছে শুনলেন ?' মুখ ফিরিয়ে বুলকির দিকে তাকালাম।

'সীতেশ মল্লিকের খোঁজ না পেয়ে একদিন তার বাড়ি গিয়েছিলাম। গিয়ে অবাকই হতে হয়েছিল।'

'কেন ?'

'সে ভারি মজার ব্যাপার। যুদ্ধের আগে থেকে সীতেশ মল্লিকরা আর আমরা এক বাড়িতে থাকতাম। সে তো আপনি জানেনই। আগে আগে সীতেশের বউর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। আমি তাকে বৌদি বলতাম। সারা দিন আমাদের হাসিতে-গল্পে-ঠাট্টায় কাটত। দু-জনে ছিলাম একেবারে বন্ধুর মত। বেশ চলছিল। কিন্তু বাবা হঠাৎ মারা গেল। এদিকে যুদ্ধের বাজারে টাকা করে আমার দিকে ঝুঁকল সীতেশ। আর সীতেশ যেই ঝুঁকল তার বৌর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও ঘুচল। আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিল বৌদি।' বলতে বলতে মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল বুলকি। একটু থেমে পরক্ষণেই আবার আরম্ভ করল, 'সে যাক। আমি তো সীতেশ মল্লিকের খোঁজে তার সাদার্ন অ্যাভেনিউর বাড়িতে গেলাম। আশ্চর্য, যে মানুষ কোনদিন আমার সঙ্গে কথা বলে না, গেলে মুখ ফিরিয়ে থাকে, সেই মানুষ ছুটে এসে গলা জড়িয়ে বললে, 'এস ভাই, এস। তোমার পথ চেয়ে ক'দিন ধরে বসে আছি।' প্রথমটা হকচকিয়ে গেলাম। তারপর ভয়ে ভয়ে তার সঙ্গে ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। সীতেশের বৌ আমাকে বসিয়ে মুখোমুখি বসলে। বললে, 'তোমার ওপর আমার আর কোন রাগ নেই ভাই।' তার ব্যবহারটা আগাগোড়াই কেমন বেতালা লাগছিল। বললাম, 'মানে !' সে বললে, 'মনে আর কি ! তুমি আমার কপাল পুড়িয়েছিলে। তখন তো বোঝ নি, তোমার কপালও কেউ পোড়াতে পারে ! তোমার দাদা, ভুল হল, তোমার নাগর তেমন একজন জুটিয়ে ফেলেছে। একটি গুজরাটি মেয়ে, নাম চন্দ্রলেখা।' আমার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় ফিস্ ফিস করে বললে, 'তোমার চাইতে ঢের ঢের সুন্দর।' শুনতে

শুনতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কী বলব, ভেবে উঠতে পারছিলাম না। সীতেশের বৌ এবার খিল খিল করে হেসে উঠেছিল। হাসতে হাসতে দুই হাত ঘুরিয়ে বলে উঠেছিল, 'এখন তো নাগরের কাছে তোমার দাম কানা-কড়িও না। তোমার কপাল পুড়েছে। এতেই আমি খুশি। তোমার ওপর আমার আর রাগ অভিযোগ কিছু নেই। এখন কি খাবে বল ? চা না কফি ?' আমি আর বসে থাকতে পারি নি। উর্ধ্বশ্বাসে সীতেশের বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।

আমি শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, এতক্ষণ যেন বুলকির মুখে কোন বিবরণ শুনছিলাম না, একটা যন্ত্রণাদায়ক নিষ্ঠুর নাটকের মুখোমুখি বসে ছিলাম। বললাম, 'তারপর ?'

'তারপর আর কি। একটা চাকরির জন্যে সারাদিন শহর চষে ফেলি। সন্ধ্যেবেলায় ক্লান্ত হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যাই। সুপারিশ ছাড়া চাকরি অসম্ভব। এদিকে সীতেশের টাকা বন্ধ হওয়ায় সংসার ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ক'দিন ধরে উনুনে একরকম আঁচই পড়ছে না। আমি যে কি করব, কি করব—হে ভগবান—' বুলকির সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শিরা-স্নায়ু-চেতনা যেন শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল। বড় অসহায় আর উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

কি সান্ত্বনা যে দেব, ভেবে পেলাম না।

বিকৃত ভাঙা গলায় বুলকি আবার বলে উঠল, 'এদিকে মা'র পাগলামি আবার বেড়েছে। নিজের সর্বস্ব বাজি রেখে ছোট ভাইবোন দুটোকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। তা-ও পারলাম না। মণ্টুটা দিনরাত আজকাল চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়। লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খায়। আর কি করে এখনও শুনি নি। তবে একেবারেই কথা শোনে না। বাজার রেশন—সবই করতে হয় আমাকে। চার-মাসের মাইনে বাকি পড়েছে স্কুলে। নাম কাটা গেছে। পড়া-শোনার পাটই তুলে ফেলেছে ছেলেটা। সব চাইতে দুশ্চিন্তায় পড়েছি সন্ধ্যাকে নিয়ে।'

'কিরকম ?' রুদ্ধশ্বাসে বললাম।

'আমার তো সবই গেছে। ভেবেছিলাম সর্বস্ব দিয়ে ওদের আগলাতে পারব। কিন্তু সপ্তাহখানেক আগে একদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে দেখি নতুন একখানা শাড়ি পরে ঠোঁটে গালে রঙ লাগিয়ে আয়নায় মুখ দেখছে। রঙ বা শাড়ি—কিছুই আমি কিনে দিই নি।' বুলকি বলতে লাগল, 'সে যাক, ঘরে ঢুকে প্রথমটা অবাক হয়ে গেলাম। তারপর কাছে গিয়ে বললাম, 'নতুন শাড়ি কোথায় পেলি ?' সন্ধ্যা উত্তর দিল না। ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আবার বললাম, 'বল, কোথায় পেয়েছিস ? কে দিয়েছে ?' সন্ধ্যা এবারও চুপ। দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ওর চুলের মুঠি ধরে গালে-মাথায় সমানে চড়াতে লাগলাম। মার খেতে খেতে নাক ফেটে ঠোঁট কেটে রক্তারক্তি হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা স্বীকার করল, পাড়ারই একটা ছোকরা তাকে ওসব দিয়েছে। আমি চাকরির খোঁজে যখন বেরিয়ে যাই, সেই ছোঁড়াটা আমাদের

বাড়িতে আসে। মাঝে দিন তিনেক ম্যাটিনী শো-এ সিনেমা দেখতে নিয়ে গেছে।'

শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে কোথায় যেন অসহ্য এক মোচড় লাগল। নিদারুণ এক যন্ত্রণায় সমস্ত হৃদপিণ্ডটা ডেলা পাকিয়ে গেল যেন। বিকৃত সুরে বললাম, 'মাসদেড়েক আসি নি। এর মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেছে!'

'শুধু কি এ-ই, বাড়িওলা উঠে যাবার জন্যে দিনরাত পেছনে লেগে আছে। আমি পাগল হয়ে যাব শুভেন্দুবাবু।' অস্থিরভাবে মাথা নাড়তে লাগল বুলকি। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে উঠল, 'আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কোথাও কেউ নেই আমার। কারো সঙ্গে যে একটু পরামর্শ করব, তার উপায়ও নেই। শুধু একজন ছাড়া।'

'কে?'

'আপনি। এই দেড় মাস ধরে রোজ প্রতি মুহূর্তে ভেবেছি, এই বুঝি এলেন, এই বুঝি এলেন। ভেবেছি, আপনি এলে একটা পরামর্শ করব। কিন্তু মিথ্যেই আশা। আপনি আসেন নি। আজ যদি না আসতেন দু-একদিনের মধ্যেই আপনার খোঁজে বেরিয়ে পড়তাম। বিশ্বাস করুন শুভেন্দুবাবু, আমি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখানে আপনি ছাড়া মনের দিক থেকে আর কোন সহায় নেই আমার। আমি কী করব, বলে দিন।'

বুলকির গলায় এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যা মুহূর্তে আমাকে অভিভূত করে ফেলল। কিছুক্ষণ আগে মেয়েটার মুখে ভরসার কথা শুনে ধমনীতে রক্ত থমকে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে সেই আবদ্ধ স্রোত মুক্ত হয়ে আবার সহজ খাতে বইতে শুরু করল। নিজের অলক্ষ্যে বুলকির পিঠে এক-খানা হাত রেখে সিক্ত ঝাপসা গলায় ডাকলাম, 'বুলকি দেবী—'

বুলকি উত্তর দিল না। অনুভব করলাম তার সর্বাঙ্গ থরথর করছে। আর সেই থরথরানির দুরন্ত বেগ মুহূর্তে আমার সমস্ত চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর আবার ডাকলাম, 'বুলকি দেবী—'

আবছা গলায় বুলকি সাড়া দিল।

'অভয় যদি দেন, একটা কথা বলব।'

'কী?'

'আগে বলুন আমার কথা রাখবেন—'

'আপনার ওপর বিশ্বাস আছে। আমি জানি, অন্যায় কিছুই আপনি বলবেন না। না শুনেই বলছি, আপনার কথা রাখব।'

প্রথমে একটু ইতস্তত করলাম। তারপর দ্বিধামুক্ত স্বরে বলেই ফেললাম, 'দেখুন এমনিতে আমার কোন খরচই নেই। খাওয়া-পরা-থাকা—সব কিছু মিসেস মিত্রই দিয়ে থাকেন। মাস মাস যে মাইনেটা পাই বাক্সে পড়ে পড়ে পচে। যতদিন চাকরি-বাকরি কিছু একটা না পাচ্ছেন ততদিন ওটা আপনাকে নিতেই হবে। ধার হিসেবেই দিচ্ছি। পরে আপনার যখন সুবিধে হবে শোধ-

দিয়ে দেবেন। কি রাজি ?'

আমার একটা হাত বুঝিবা ঘোরের মধ্যেই আঁকড়ে ধরল বুলাকি। গভীর আবেগে ভারী আপ্লুত স্বরে ফিসফিসিয়ে উঠল; 'আমি নেব শুভেন্দুবাবু, নিশ্চয়ই নেব। না নিয়ে আমার উপায় নেই।'

'আরেকটা কথা—'

'কী ?'

'যত তাড়াতাড়ি পারেন নতুন বাড়ি ভাড়া করে উঠে যাবার ব্যবস্থা করুন। ও-বাড়িতে থাকাটা আর ঠিক হবে না।'

'হ্যাঁ, উঠে যেতেই হবে।'

কথায় কথায় এতক্ষণ লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ আকাশের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। অঘ্রাণের সূর্য কখন যেন আমাদের অজান্তে মাথার উপর এসে উঠেছে। ব্যস্তভাবে বললাম, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। চলুন, এবার ফেরা যাক।'

বলেই উঠে পড়লাম। দেখাদেখি বুলাকিও উঠল।

পনের

বুলাকিকে তাদের গলির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমি ভবানীপুরের বাসে উঠলাম।

গাড়ির জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমাদের বাস একটা পোকার মত গুটি গুটি এগুচ্ছিল। আমি জানালার ধার ঘেঁষে বসেছিলাম। রাস্তার লোকজন, গাড়ির মিছিল, ট্রাফিক পুলিশ, লাল-নীল আলোর ভ্রূকুটি, কোন কিছুই আমার স্নায়ুতে দাগ কাটতে পারছিল না। আমার দৃশ্যে-অদৃশ্যে, চেতনে এবং অবচেতনে বুলাকি ব্যাপ্ত হয়ে ছিল।

যতই তার কথা ভাবছিলাম ততই মগ্ন হচ্ছিলাম। ততই নিবিড় সহানুভূতিতে আমার সমস্ত অস্তিত্বে ঢল নামছিল। বার বার একটা কথাই মনে হচ্ছিল, যুদ্ধোত্তর এই নিষ্ঠুর হৃদয়বর্জিত কলকাতা বুলাকি এবং আমার —দু'জনেরই সমস্ত পবিত্রতা হনন করে ফেলেছে। একই যন্ত্রণার সমতলে এসে আমরা যেন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছি।

আত্মমগ্ন সেই ভাবনার মধ্যে একসময় হাজরা রোডে এসে পড়লাম। বাস থেকে নেমে ভাঙা বাড়ির সেই বিবরে পৌঁছুতে আর কয়েক মিনিট মাত্র লাগল।

উঠোনে আসতেই চোখে পড়ল গুপী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

এ-বাড়িতে আসার পর বার দু-তিনেক মাত্র তাকে দেখেছি। যদিও ভেবেছিলাম এই নির্জন প্রায় বন্দী জীবনে মাঝে মাঝে তার দেখা পাব, সুরপতিবাবু ছাড়াও একজন সঙ্গী পাব। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমাকে হতাশই হতে হয়েছে।

তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠে বললাম, 'এই যে গুপীদা, একেবারে পাত্তাই নেই। তারপর কি মনে করে—'

'আপনার কি পেরানটার জন্যে এট্টু মায়াও নেই?' গুপী বলল।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। গুপীর চোখেমুখে বিচিত্র একটা অস্থিরতা রয়েছে। সেই সঙ্গে খানিকটা উদ্বেগও। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার গুপীদা?'

'কী ব্যাপার লয়, তাই বলুন। কাল রাত্তিরবেলা মা-জননীর সন্গে আপনার দেখা করার কথা, করেন নি। তারপর আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই কুথায় চলে গ্যাছেন। ইদিকে মা-জননী সকাল থিকে পাঁচবার আমায় পাটিয়েচে আপনার খোঁজে। তা আপনার দেখা লেই। মা-জননী ক্ষেপে একেবারে রণচন্ডী হয়ে রয়েচে। আর দেরি করবেন না, শিগ্গির চলুন আমার সন্গে।'

ভীত স্বরে বললাম, 'চল।'

নিঃশব্দে গুপীর সঙ্গে নতুন বাড়িতে এসে পড়লাম।

মিসেস মিত্র দোতলার লাউঞ্জে পায়চারি করছিলেন। আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন। গুপীকে বললেন, 'তুমি যাও।' গুপী দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নিচে অদৃশ্য হয়ে গেলে আমার দিকে ফিরলেন। অনেকক্ষণ স্থির নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি ঘামছিলাম। আমার হাতের তালু ভিজে উঠেছে। শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে একটা শীতল স্রোত দ্রুতবেগে ওঠানামা করছে। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর ভাবছি, এই বুঝি পায়ের তলা থেকে মাটির আশ্রয় সরে গেল।

যেমনই হোক মিসেস মিত্রের অনুগ্রহেই এই চাকরিটা আছে। যদি চলে যায় কোন শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পড়ব? একটু আগে বুলিকে ভরসা দিয়ে এসেছি প্রতি মাসের মাইনেটা তার হাতে তুলে দেব। কিন্তু চাকরিটাই যদি না থাকে! হা ঈশ্বর, চাকরিটা যদি চলে যায়!

কতক্ষণ যে মিসেস মিত্র শ্বাসরুদ্ধ অস্থিরতার মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন বলতে পারব না। এক সময় কঠিন রুক্ষ গলায় বলে উঠলেন, 'ঐ চেয়ারটায় বস।'

বিমূঢ়ের মত সামনের একটা চেয়ারে নিজের শরীরটাকে ছুঁড়ে দিলাম।

মিসেস মিত্র এবার বললেন, 'চাকরির শর্তের কথাটা তুমি একেবারেই ভুলে গেছ শুভেন্দু—'

'আজ্ঞে—' গলা দিয়ে আমার স্বর বেরুল কি বেরুল না।

'আমার পারমিশন ছাড়া সকালে ঘুম থেকে উঠেই কেন বেরিয়েছিলে?' এবার সরাসরি কৈফিয়ৎ তলব করলেন মিসেস মিত্র।

পঁচাত্তর টাকার ক্রীতদাস আমি, কোথা থেকে যেন খানিকটা দুর্জয় সাহস সংগ্রহ করে ফেললাম। চোখ নামিয়ে বসে ছিলাম। সেই ভাবেই আস্তে আস্তে বললাম, 'আপনিই তো বলেছিলেন সকালের দিকে আমি বেরুতে পারি।'

আমার কথা বোধ হয় শেষ হল না। তার আগেই মিসেস মিত্রের দু-চোখে আগুনের ফুলকি নেচে উঠল। সুকণ্ঠি ভদ্রমহিলা কর্কশ গলায় প্রায় ভেংচেই উঠলেন, 'ও, আর্গুমেণ্ট হচ্ছে! অলরাইট, এবার থেকে আমার অনুমতি ছাড়া কোন সময় বেরুতে পারবে না। সারাদিন ও বাড়িতে থাকবে। যখনই ডাকব, যেন পাই।'

কোমরের অদৃশ্য দড়ি খানিকটা আলগা হয়েছিল। আবার তাতে শক্ত গিঁট পড়ল। মুখ বুজে নিরুপায়ের মত সেই যন্ত্রণাকে মেনে নিলাম।

মিসেস মিত্র কি একটু ভেবে বললেন, 'আমার কথামত তো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলে। কিন্তু অন্য কথাটা তো রাখ নি!'

'কী?'

'রাত্রিবেলা ফিরে এসে নীনীর সম্বন্ধে খবর দেবার কথা ছিল না?'

আমি চুপ করে রইলাম।

মিসেস মিত্র ধমকে উঠলেন, 'মুখ বুজে কেন, বল। কাল সেই বাড়িটায় গিয়েছিল?'

মাথা নাড়লাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সেখানকার খবর কী?'

কাল রাত্রের সমস্ত ঘটনা বলতে গিয়েও কেন যেন থমকে গেলাম। কেন গেলাম তার আপাত কোন ব্যাখ্যা নেই। নীনী-রহস্যের সামান্যই আবিষ্কার করেছি। যদিও সেটুকু জানানোই আমার চাকরি, তবু মনে হল নীনীর সকল দিকের যবনিকা না তোলা পর্যন্ত না-ই বা জানালাম। আস্তে আস্তে নতচোখে বললাম, 'আজ্ঞে উনি বাড়িটার ভেতর কোথায় যে ঢুকলেন খুঁজে পেলাম না।'

'অপদার্থ!' মিসেস মিত্রের গলায় ধিক্কারের সুর ফুটল, 'যাও, স্নান সেরে লাঞ্চে এস।'

বলামাত্র উঠে পড়লাম।

নিচে একতলার সিঁড়ির বাঁকে গুপীর সঙ্গে দেখা। ভয়ার্ত উদ্বিগ্ন মুখে দোতলার দিকে তাকিয়ে ছিল সে। কাছাকাছি আসতেই খপ করে আমার একটা হাত ধরে একরকম টানতে টানতেই বাইরে নিয়ে এল। বিড় বিড় করে বলল, 'ভদ্দর লোকের ছেইলে, চাকরি করতে এসে কি হেনস্থা!'

চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম।

গুপী এবার গলার স্বরটাকে আরেকটু তুলল, তা খুব অপমান করলে তো?'

'অপমান আর কি।' নিরুচ্ছ্বাস ভঙ্গিতে বললাম, 'চাকরি করতে এসেছি, হেরফের হলে কথা শুনতেই হবে।'

'আমার তো ভয়ে বুক ঢিব ঢিব করছিল। নিচে দেঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে ছিলুম। না জানি আপনার কি হাল করে ছাড়ছে!'

যদিও গুপীর সঙ্গে ক্বচিৎ দেখা হয় তবু প্রথম দিন থেকেই অনুভব করেছি আমাকে তার ভাল লেগেছে। আর এই ভাল লাগাটা খুবই আন্তরিক।

আমার সঙ্গ ছাড়ে নি গুপী। নতুন বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে পুরনো বাড়িতে সঙ্গে সঙ্গে এল। বুঝলাম, হয়ত কাজের ফাঁকে খানিকটা অবকাশ তার হাতে রয়েছে। কিংবা আমাকে কিছু বলতে চায়।

এ-বাড়িতে এসে গুপী হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা দাদাবাবু, আপনি তো ঢের লেখাপড়া শিখেচেন—'

গুপীর বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যাতে খানিকটা চমকই লাগল। বললাম, 'ঢের আর কোথায় শিখতে পারলাম, তার আগেই তো বাবা মারা গেল। হঠাৎ লেখাপড়ার কথা তুললে যে?'

'দরকার আছে তা-ই। আচ্ছা—'

'বল—'

'কিছু মনে করবেন না তো? তা হলে এট্টা কথা বলি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ বল না—'

'এত বড় কলকাতার শহর, এত আপিস-কারখানা! এ বাড়ি ছাড়া আর কি কুথাও এট্টা চাকরি জোটাতে পারলেন না!'

বুঝলাম, ঠিক জায়গামত যদি টোকা দিতে পারি মিসেস মিত্রদের কিছু অজ্ঞাত রহস্য নিশ্চয়ই গুপীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। খুব সন্তর্পণে বললাম, 'কেন, এ বাড়িটা দোষ করল কী?'

গুপী এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'আপনি কি চোখ থাকতে আঁধা (অন্ধ)! এ-বাড়িতে টাকার সন্‌গে সন্‌গে নরক ঢুকেচে দাদাবাবু। যে মেইয়েছেলেটা এট্টুস আগে আপনার ওপর তম্বি করল, তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেচেন?'

চকিত হয়ে উঠলাম। বিমূঢ় মুখে গলায় বললাম, 'কার কথা বলছ, মিসেস মিত্রের?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তেনারই।' প্রচণ্ড ঘৃণায় ঠোঁটদুটো কুঁচকে গেল গুপীর।

এতদিন জানতাম, মিসেস মিত্রের জন্য গুপীর প্রাণে যা আছে তা হল প্রবল বিতৃষ্ণা এবং নিদারুণ বিরাগ। সেই সঙ্গে অনেকখানি ভয়ের মিশ্রণও। আগে আর কখনও এমন ভয়ঙ্কর ঘৃণার প্রকাশ তার মধ্যে দেখিনি। কাজেই একই সঙ্গে বিস্মিত এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। বললাম, 'কী করেছেন মিসেস মিত্র?'

অনুচ্চ তীব্র গলায় পৃথিবীর সবটুকু ধিক্কার ঢেলে দিয়ে গুপী বলে উঠল, 'কী করে নি! এই জন্যেই তো এট্টু আগে বললাম, চোখ থাকতে আপনি আঁধা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেইয়েছেলেটাকে এট্টুখানি দেখবেন। হে ভগবান—'

বুঝলাম আর বিশদ ব্যাখ্যা সে করবে না। বক্তব্যটাকে প্রহেলিকার মোড়কে ঢেকে রাখবে। যা কিছু আবিষ্কার মিসেস মিত্রের ভেতর থেকে আমাকেই করে নিতে হবে।

একটুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর আমিই স্তব্ধতা ভাঙলাম, 'আচ্ছা গুপীদা, আমি এ-বাড়িতে চাকরি

নিয়েছি বলে তো খুশি হও নি। কিন্তু তুমি এখানে পড়ে আছ কেন?'

হৃদপিণ্ডের অতল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পাক খেতে খেতে উঠে এল গুপীর। ভারী গলায় সে বলতে লাগল, 'মায়ায় দাদাবাবু, মায়ায়। তা ছাড়া কথা দিয়েছিলুম যে—'

'কাকে?'

'এ-বাড়ির বাবুকে। যদ্দিন না উনি ফিরে আসে তদ্দিন থাকতেই হবে। ফিরে এসে ওনার হিসেব উনি বুঝে লেবেন, আমি যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাব। কিন্তু কী হিসেব দেব!' বলতে বলতে ভেঙে পড়ল গুপী, 'বিশ্বাস তো আমি রাখতে পারিনি। যাবার সময় সাচ্চা জিনিস আমার হাতে রেখে গিয়েছিল। বলেছিল, ওদের তুই আগলে রাখিস গুপী। পারিনি দাদাবাবু। কি সোমায় (সময়) যে পড়ল, কিছুতেই পারলাম নি। সাচ্চা মানুষগুলোনের বদলে মিছে কতকগুলোন মানুষ বাবুর হাতে ফেরত দিতে হবে। সে যে কী দুঃখু!' দু-হাতে মুখ ঢাকল গুপী।

কথায় কথায় খেয়াল ছিল না, অঘ্রাণের সূর্য ইতিমধ্যেই পশ্চিম দিগন্তে অনেকখানি ঢাল খেয়েছে। সেদিকে তাকাতেই অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। মিসেস মিত্র ও বাড়ি থেকে আসার সময় বলে দিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি স্নান সেরে যেন লাঞ্চ সারতে যাই। গুপীর উদ্দেশে ব্যস্তভাবে বলে উঠলাম, 'এখন আর নয় গুপীদা, চান সেরে এক্ষুনি ও-বাড়ি ছুটতে হবে। নইলে কপালে কি আছে তা তো বোঝোই!'

গুপীও সচেতন হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ আপনি চান করতে যান। আমি এখন উঠি।'

গুপী চলে গেল। আর মাথায় তেল থাবড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাথরুমের দিকে ছুটলাম আমি।

দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে এসে একটু শুয়েছিলাম। এমনিতে দুপুরে আমার ঘুম আসে না। এই কর্মহীন অলস উদাস সময়টা কিছুতেই যেন কাটতে চায় না। শুয়ে শুয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখি। শরতের মাঝামাঝি এ বাড়িতে এসেছিলাম। আকাশময় তখন ছিল তুলোর মত নরম মেঘেদের ইচ্ছামত ভেসে বেড়ানো। আর ছিল অজস্র মধুর সোনালী রোদ।

সেই আকাশেরই এখন অন্যরূপ। ঋতু বদলের সঙ্গে তার সাজ বদল হয়ে গেছে। কোথাও এতটুকু কোমলতা নেই। দিগন্ত পর্যন্ত রুক্ষ নীলের চাঁদোয়া টানা। শরতের যে পাখিগুলোকে অগাধ শূন্যে সাঁতার কাটতে দেখা যেত সেই শঙ্খচিলেরা এখন অদৃশ্য।

এই হেমন্তে ভাঙা বাড়ির ঝোপঝাড়ে আর জঙ্গলের নিবিড়ে শুধু ঘুঘুদের একটানা উদাস কান্না। পুবদিকের পুকুরটা ক'দিন আগেও পরিপূর্ণ উচ্ছ্বসিত ছিল। এখন তাতে টান ধরেছে।

একমাস আগেও যে চীনা ঘাসগুলোকে সতেজ উজ্জ্বল দেখেছি তাদের

মধ্যেও কেমন যেন বিমর্ষতার আমেজ লেগেছে। এই হেমন্তে সব দিকে ঘিরে রঙ-খোয়ানো জীবন-হারানো অনন্ত বিষাদ।

আজ সমস্ত সকাল ঘুরে বেড়িয়েছি। খেয়ে এসে সারা সকালের ক্লান্তি নিয়ে বিছানায় পড়তে না পড়তেই হাজার বাহু বাড়িয়ে অগাধ ঘুমে ডুবে গেলাম।

যখন ঘুম ভাঙল, সূর্যটা আকাশে নেই। সূর্য নেই। তবু পশ্চিম দিগন্ত লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মুখের মত আরক্ত হয়ে রয়েছে। ভাঙা বাড়ির গাছপালা ঝোপ-জঙ্গলের ওপর শীতল ছায়া এসে পড়েছে। অর্থাৎ সন্ধ্যের আর বাকি নেই।

তাড়াতাড়ি উঠে মুখে ধুয়ে নিজেকে নিখুঁত করে নিলাম। এখনই নীনীর উদ্দেশে ছুটতে হবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা লাগাচ্ছি, সেই মুহূর্তে গলাটা শোনা গেল, 'চ্যাটার্জি সাব—'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ও-বাড়ির উর্দিপরা একটা বয়। আমার মাস-কয়েকের চাকরি-জীবনে দেখে আসছি এ-বাড়ি ও-বাড়ির একমাত্র যোগসূত্র গুপী। গুপী ছাড়া নতুন বাড়ি থেকে এখানে কাউকে আসতে দেখিনি। কাজেই কিছুটা অবাক হয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার!'

'বড় মেমসাব আপনাকে যেতে বলেছেন।'

এই অসময়ে হঠাৎ আবার তলব কেন? নিজের অজান্তে আমার কপালে ক'টি রেখাই বুঝি ফুটে বেরুল। কারণ যা-ই থাক, ডাক যখন এসেছে ছুটতে হবেই। বললাম, 'ঠিক আছে, তুমি যাও। আমি আসছি।'

বয়টা চলে গেল।

ঘরে তালা লাগিয়ে একটু পর নতুন বাড়িতে এসে পড়লাম।

যদিও মাস কয়েক চাকরি করছি, এ-বাড়ির সর্বত্র আমার গতিবিধি অবাধ নয়। প্রাণধারণের জন্য প্রতিদিন নিয়মিত তিন চার বার এখানে আসতে হয়। সেই তিন চার বার সোজা ডাইনিং রুমেই চলে যাই। আর অনেক রাত্রে নীনীর খবর নিয়ে আসি দোতলার লাউঞ্জে। মিসেস মিত্র আমার প্রতীক্ষায় সেখানে বসে থাকেন।

কিন্তু এই অসময়ে আমি আর কখনও এ-বাড়িতে এসেছি বলে মনে করতে পারলাম না। ডাইনিং রুমে এখন মিসেস মিত্রকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না। দোতলার লাউঞ্জে এসেও দেখলাম সাজানো সোফাগুলো একেবারে শূন্য।

দ্বিধাগ্রস্তের মত এদিক-সেদিক তাকাচ্ছি, ঠিক সেই সময় মিসেস মিত্রের গলা শুনতে পেলাম, 'এদিকে এস।'

এ-বাড়ির ঘরগুলি জাহাজের সারিবন্ধ কেবিনের মত। আমার ডান পাশের ঘরখানার দরজা সামান্য খোলা। তার ফাঁক দিয়ে ভেতরের খানিকটা অংশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু ভিতরের দিকটাই নয়, মিসেস মিত্রের মুখটাও ভেসে উঠেছে।

চোখাচোখি হতেই হাতের ইশারা করলেন মিসেস মিত্র। নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম।

এতকাল এ-বাড়ির বাইরের সীমান্তেই ঘোরাফেরা করেছি। অন্তঃপুর সম্পর্কে চেতনে এবং অবচেতনে অনন্ত ঔৎসুক্য ছিল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার রহস্য প্রায় অনাবিষ্কৃতই থেকে গেছে। এ-বাড়ির সবদিকের যবনিকা তুলবার জন্য নিজের থেকে যে এগুব, তেমন দুঃসাহস আমার নেই।

এতদিনে এ-বাড়ির ভিতর-দুয়ার আমার কাছে খুলতে শুরু করল কি!

দরজা পর্যন্ত এগিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। আমার হৃদপিণ্ড অকারণেই থর থর করছে। আর সেই থরথরানি শিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পায়ে এসেও যেন ভর করেছে।

মিসেস মিত্র বলে উঠলেন, 'কি হল, দাঁড়িয়ে গেলে যে! ভেতরে এস।'

দরজা ঠেলে ভিতরে এলাম। ঘরখানা বিশাল। নীলাভ কোমল আলোয় ডিস্টেম্পার-করা দেওয়াল-সিলিং, সবই স্নিগ্ধ হয়ে আছে। চারদিকে কোথায় কী রয়েছে, আমার লক্ষ্য ছিল না। আমার সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়েছেন মিসেস মিত্র। তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম।

ঘরখানার দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে ফ্যাশনেবল্ খাট। নরম বিছানার গভীরে প্রায় ডুবেই ছিলেন মিসেস মিত্র। চোখের তারা দু'টি নিবিড় কালো। বাকি সাদা জমিটায় রক্তাভা মেশানো। শ্যাম্পু-করা রুক্ষ চুলগুলো এলোমেলো। গাল আর চোখের পাতা ভারী এবং ফোলা ফোলা। কেমন যেন এক আলস্য, না কি অবসাদ কিংবা অন্য কোন ব্যাখ্যার বাইরে অনুভূতি তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছে। পরনে স্লীপিং গাউন। আর কোমর পর্যন্ত হলদেটে সিল্কের একটা চাদর টানা।

মিসেস মিত্র কি এই সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠলেন, না ঘুমোতে চলেছেন!

খাটের ঠিক পাশেই মিসেস মিত্রের মুখোমুখি একটা বেতের সোফা। সেখানে বসলাম।

মিসেস মিত্র বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম, তোমাকে পাওয়াই যাবে না।'

'হ্যাঁ, নীনী দেবীর ব্যাপারে বেরিয়েই পড়েছিলাম। বয়টা গিয়ে পড়ল। আরেকটু দেরি হলে দেখা হ'ত না।' আমি বললাম।

'আজ আর নীনীর জন্যে যেতে হবে না। এখানেই বস।'

আমার সচেতন মনের অনেক স্তর নিচে যেখানে সূর্যালোক পেঁছিয় না, প্রত্যক্ষ অনুভূতির বাইরের সেই অদৃশ্য অন্ধকার জগতের কোথায় যেন টান পড়ল। ক'মাস ধরে নীনীর পেছনে সন্ধ্যে হলেই শিকারী কুকুরের মত ছুটে বেড়াই। প্রাণধারণের এই দায় আমার রুচি, বিবেক এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমার জন্মার্জিত সমস্ত সংস্কারের তলায় যে আত্মাটি রয়েছে কোন সময়ই সে এতে সায় দেয় নি। বরং প্রতি মুহূর্তেই ধিক্কার দিয়েছে।

কিন্তু স্বভাবের এ কোন বিপরীত খেলা! নীনীর পেছনে আজ আর

ছুটতে হবে না, এর জন্য মিসেস মিত্রের কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকাই তো উচিত ছিল। কিন্তু তার বদলে মনের অতল থেকে তিক্ত একটু বিষাদ, না কি হতাশাই উঠে এসে আমার উপর ছায়া ফেলল।

প্রাণধারণের জন্য একটি তরুণীর গোপন গতিবিধির পেছনে ছোটার মধ্যে যে গ্লানি রয়েছে সেটাকে এই মুহূর্তে ততটা যন্ত্রণাদায়ক মনে হল না। নিজের অজান্তেই কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়লাম।

মিসেস মিত্র আবার বললেন, 'তোমার সঙ্গে আজ কিছু আলোচনা আছে।'

মুখে কিছু বললাম না। উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগলাম।

মিসেস মিত্র আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন না। ঘরের ঠিক মাঝখান দিয়ে তিনটে মোজেক-করা পিলার উঠে গেছে। সেগুলো জড়িয়ে রয়েছে প্রাণবান দুষ্প্রাপ্য অর্কিড। অর্কিডের উপর তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে ছিল। আর নিটোল রক্তাভ সুছাঁদ আঙুলগুলো হলুদ চাদরের প্রান্ত নিয়ে অলস ভঙ্গিতে খেলা করছিল। একটু উদাস, হয়ত বা অন্যমনস্ক সুরেই তিনি বলে উঠলেন, 'আচ্ছা শুভেন্দু, একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পার?'

'কী?'

'সুখ কিসে?'

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দুপুরের সঙ্গে এই সন্ধ্যের আচরণের কোন মিলই নেই মিসেস মিত্রের। সব কেমন যেন সঙ্গতিহীন, সামঞ্জস্যবর্জিত। দুপুরে তিনি ছিলেন কর্কশ, ক্রুদ্ধ, রূঢ়। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর মুখেচোখে এবং কণ্ঠস্বরে বিচিত্র করুণ অন্যমনস্কতা।

তা ছাড়া মিসেস মিত্র এমন একটা প্রশ্ন করেছেন যাতে প্রায় হতবাক হয়ে গেছি। সুখ কিসে?

জীবন সম্পর্কে কোনদিনই ভাবনার অবকাশ ঘটে নি। আত্মজিজ্ঞাসা নামক বস্তুটি আমার মধ্যে আকারহীন নীহারিকার মত এতকাল ভাসমান ছিল। সেগুলোকে একত্র করে জমাট বাঁধিয়ে যে বিশেষ কোন রূপ দেব—তেমন তাগিদ বা প্রয়োজন প্রাণের কোথাও ছিল না।

জীবন সম্পর্কেই যে প্রায় কিছু ভাবে না বা যার ভাবার সময় নেই, সুখের প্রশ্নে স্তম্ভিত তো সে হবেই।

অবশ্য বুদ্ধি হবার পর থেকেই বাবার চলাফেরা ওঠাবসা, নিঃশ্বাস ফেলা —প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্তের খুঁটিনাটিগুলো সজ্ঞানে বা অবচেতনে দেখে আসছি। তাঁর মানসিক গঠনের কিছু কিছু ছায়া অলক্ষ্যে যেন আমার মধ্যেও এসে পড়েছিল।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফার্স্ট ট্রেন ধরে কলকাতায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা আর অনেক রাত্রে সমস্ত হুগলী জেলায় নিষুতি নামলে ফিরে আসা—দিবানিশি রক্ত মুখে তুলে পরিশ্রম করে একান্নবর্তী পরিবারের সনাতন রূপটিকে দু-হাতে আগলে রাখতে চেয়েছিলেন বাবা। এই ছিল তাঁর জীবন, হয়ত বা এতেই

তাঁর সর্বসুখ।

জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন দীর্ঘপ্রসারী কোন ধারণা না থাকলেও মোটামুটি একটা ছক প্রায় ঠিকই ছিল আমার। বি. এ.-টা প্রথমে পাশ করে ফেলব। তার পর ভদ্র রকমের চাকরি জুটিয়ে নেব। তারও পর? সে সম্বন্ধে সেদিন কিছুই সিদ্ধান্ত করিনি। কিন্তু আজ মনে হয়, আজন্ম যা দেখতে আমি অভ্যস্ত, নিজের অজান্তে যা আমার মজ্জায়-মেদে-শোণিতে এবং সত্তার দুজ্ঞেয় কেন্দ্রে সঞ্চারিত হয়ে গেছে, বাবার সেই জীবনের ছাঁচেই নিজের পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের কাঁচা তরল অস্তিত্বকে ঢালাই করে নিতাম। আকারহীন নীহারিকার মত ভাবনার মধ্যে যা ছড়িয়ে ছিল তাকে জমাট বাঁধিয়ে যৌথ পরিবারের কল্যাণে নিয়োগ করতাম। বাবার অনুকরণে হয়ত তাতেই হত আমার সুখ।

কিন্তু সে সুখ আমার ব্যক্তিগত, নিজস্ব। এই আপেক্ষিক বস্তুটিকে নিয়ে মিসেস মিত্র যে দার্শনিক প্রশ্ন তুলেছেন তার উত্তর আমার অজানা। কেননা সুখের কোন সার্বজনীন সংজ্ঞা আছে কি-না, আমার জানা নেই। অতএব মুখ বুজেই রইলাম।

মিসেস মিত্র বললেন, 'কি, চুপ করে রইলে যে?'

'আজ্ঞে—'

'বলতে পারলে না, কেমন?'

'আজ্ঞে—'

দুষ্প্রাপ্য অর্কিড থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন মিসেস মিত্র। কিছুক্ষণ কি ভেবে বললেন, 'আচ্ছা, সমস্ত জীবন উন্মাদের মত কষ্ট আর ত্যাগ করে যাব শুধু। বলতে পার এই ত্যাগের সাধনায় কতখানি সুখ আছে?'

মনে হ'ল, আমি যেন উপলক্ষ্য মাত্র। আমাকে সামনে বসিয়ে মিসেস মিত্র নিজের সঙ্গেই যেন বোঝাপড়া শুরু করেছেন এবং আপন-সৃষ্ট কোন দুর্বোধ্য আত্মজিজ্ঞাসার জবাবদিহি করছেন।

মিসেস মিত্রের ওপর কোত্থেকে যেন একটা দূরমনস্কতা ভর করল। তিনি বলতে লাগলেন, 'জীবনের কোন শখ মেটাব না, কোন সাধ তৃপ্ত করব না। সব ইচ্ছা আর আকাঙ্ক্ষাকে দু-হাতে গলা টিপে নিষ্কাম ত্যাগী হব, এর মধ্যে বাহাদুরি হয়ত আছে। কিন্তু—কিন্তু—'

কেমন এক অস্থিরতা দেখা দিল মিসেস মিত্রের মধ্যে। গলার স্বরে বা মুখচোখের কোন রেখায় বা বাইরের কোন আচরণে তার ছায়ামাত্র নেই। সেটা নিতান্তই অনুভবের ব্যাপার। বুঝতে পারছিলাম তাঁর কোন মনের দুজ্ঞেয় অদৃশ্যে, বুঝিবা কোন অতল স্তরের নিচে নিদারুণ আলোড়ন চলছে।

মিসেস মিত্র একটু আগে থেমে গিয়েছিলেন। আবার আরম্ভ করলেন, 'কিন্তু নিজেকে নির্যাতনের মধ্যে আনন্দ নেই।'

আমাকে কাছে বসিয়ে যেন অনুপস্থিত তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে সুখের জটিল

তত্ত্ব নিয়ে মেতে উঠেছেন তিনি। সমানে বলতে লাগলেন, 'আরে বাপু কিঞ্চিৎ ভোগ করে নাও। তবে না ত্যাগের মহিমা বুঝবে।'

ক'মাস হ'ল এ বাড়িতে চাকরি নিয়েছি। দূর থেকে দেখে যেটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে মিসেস মিত্রের প্রকৃতিতে হয়ত তারল্য নেই। তবে গভীরতাও যে নেই, সে-কথা অনায়াসেই বলতে পারা যায়।

সুখ-আনন্দ-পরিতৃপ্তি—সবই তাঁর দেহকে ঘিরে। দেহকে কেন্দ্র করেই তাঁর সব কিছু। অহরহ ধমনীতে একই মন্ত্র বুঝি বাজতে থাকে মিসেস মিত্রের —ভোগ, ভোগ, অফুরন্ত ভোগ। পার্থিব শরীরগত সুখের সকল উৎসকে যেমন ভাবেই হোক করায়ত্ত করার মধ্যেই তাঁর অনন্ত আনন্দ।

মিসেস মিত্র আবার বললেন, 'কি জানি শুভেন্দু, হয়ত নিজেকে কষ্ট দেওয়ার ভেতরেও এক ধরনের সুখ আছে। নইলে তেমন এক-একটা মানুষও ত চোখে পড়ল যারা সমস্ত জীবন শুধু অকথ্য কষ্ট করেই গেল। এমন শক্তি তারা পায় কোত্থেকে! সুখের বোধ হয় ধরা-বাঁধা কোন সংজ্ঞা নেই।' গলার স্বর এবার কেমন যেন নিস্তেজ শোনাল মিসেস মিত্রের। আর অদ্ভুত ক্লান্ত দেখাল মুখচোখ।

বাইরে যতটা নিজেকে প্রকাশ করেছেন মিসেস মিত্র, ভেতরে ভেতরে বুঝি তার হাজার গুণ যুদ্ধ চলছে বহুকাল ধরে। আমার অজানা কোন বোঝাপড়া যেন চলছিল তাঁর মধ্যে। এই আকস্মিক অসম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশের ভেতর দিয়ে দীর্ঘকাল যোঝার ক্লান্তি বেরিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার বিষণ্ণ একটা আক্ষেপ।

কিন্তু সুখের প্রশ্নে যার সঙ্গে মিসেস মিত্রের সংঘাত সেই তৃতীয় পক্ষটি কে? তার কোন সদুত্তর পেলাম না।

যাই হোক, স্তম্ভিত বিস্ময়ে চুপ করে রইলাম। মিসেস মিত্রও অনেকক্ষণ আর কিছু বললেন না।

এই সুদৃশ্য সুসজ্জিত ঘরের আবহাওয়া কেমন যেন ভারী আর গুমোট হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে ক্লান্তিকর শ্বাস টেনে টেনে কখন যে রাতের খাওয়ার সময় ঘনিয়ে এনেছি, খেয়াল ছিল না।

পরের দিনও নীনীর পেছনে ছোটা হল না। সন্ধ্যেবেলা নতুন বাড়ির একটা বয় আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

কাল বিষণ্ণ হতাশা আমার উপর ছায়া ফেলেছিল। আজ মনে মনে ক্ষুব্ধই হলাম। উগ্র বিতৃষ্ণার তলায় নীনীর পেছনে ছোটার মধ্যে কবে কখন যে উত্তেজক নেশা ধরতে শুরু করেছিল, জানি না।

দু-দিন ধরে সন্ধ্যে হলেই মিসেস মিত্র আমাকে আটকে রাখছেন। নেশার সময় মাতালের মুখ থেকে মদের পাত্র সরিয়ে নিলে রক্তস্রোতে কি অস্থিরতা দেখা দ্যায় তার কিছুটা যেন অনুভব করতে পারলাম।

যে বয়টা আমাকে ডাকতে এসেছিল, বলা সত্ত্বেও সে চলে যায় নি। শুধু

বলেছে, 'বড়া মেমসাব আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছে।'

নিঃশব্দে তার পিছু-পিছু নতুন বাড়িতে চলে এলাম। কাল সন্ধ্যেয় দোতলার যে ঘরে মিসেস মিত্রের সঙ্গে কাটিয়েছি, বয়টা সেদিকে গেল না। সরাসরি সামনের সুবিস্তৃত লনের ভেতরে নিয়ে গেল।

সমস্ত লক্ষণ মেলাতে বসলে এখনও ঠিকমত সন্ধ্যে হয় নি। হেমন্তের আকাশের পূব দিগন্তে অবশ্য গাঢ় ছায়া নেমে গেছে। আর পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্যটা কিছু আগে অদৃশ্য হয়েছে। সেখানে জলো আলতার মত বিষণ্ণ একটু রক্তাভা এখনও আটকে রয়েছে। দেখতে দেখতে ওটুকু আর থাকবে না।

প্রথম দিন সীতেশদার সঙ্গে এ-বাড়িতে ঢুকে লনের মাঝখানে বেতের চেয়ারগুলোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। বয়টা আমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে গেল। বয়ের ফিরে যাবার দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। সবিস্ময়ে দেখলাম বিমর্ষ ক্লান্ত মূর্তির মত মিসেস মিত্র একটা চেয়ারে বসে আছেন।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চল, একটু ঘুরে আসি।' বলেই লনের প্রান্তে বৃত্তাকার সুরকির রাস্তায় গিয়ে সোজা গেটের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

পেছনে চলতে চলতে তীক্ষ্ম চোখে লক্ষ্য করতে লাগলাম, হাঁটার ভঙ্গিটা তাঁর অত্যন্ত এলোমেলো আর অবসাদে মাখা। হঠাৎ আমার খেয়াল হল, এ বাড়িতে আসার পর কোন দিনই মিসেস মিত্রকে হাঁটতে দেখিনি। মোটর ছাড়া কখনও কোথাও তিনি বেরোন নি। তবে আজ যে বেরিয়েছেন সে কি অন্যমনস্কতার ঘোরে?

আচমকা আমার গলার মধ্য থেকে আধফোটা জড়ানো স্বর বেরিয়ে এল।

মিসেস মিত্র থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমাকে কিছু বলবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা কি দূরে কোথাও যাব?'

'হ্যাঁ, কেন?'

সাহসের অভাবে একটু আগে যে কথাগুলি আবছাভাবে উচ্চারণ করেছিলাম, এবার সেগুলোকে বেশ গুছিয়েই বলে ফেললাম, 'আজ্ঞে, দূরে গেলে গাড়িটা নিয়ে এলে হত। আপনার খুব কষ্ট হবে নইলে।'

বিচিত্র মৃদু একটু হাসলেন মিসেস মিত্র। তারপর কোন কথা না বলে আবার হাঁটতে শুরু করলেন। বুঝলাম গাড়ি নিয়ে না আসাটা অনিচ্ছাকৃত ভুল নয়। স্বেচ্ছায় তিনি এ-ভাবে এসেছেন।

হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে ট্রামে উঠলাম দু-জনে। সোজা এসে নামলাম কার্জন পার্কে। মিসেস মিত্র বললেন, 'এস, একটু হাঁটি।'

এর মধ্যে সন্ধ্যে নেমে গেছে। রাতও হয়েছে খানিকটা। হেমন্তের শেষাশেষি এই সময়টায় চারদিকে উদাস বিষণ্ণতার আমেজ লেগে গেছে। দূরে প্রসারিত যে ময়দান সেখানে মিহি কুয়াশার একটা আবরণ থিয়েটারের পর্দার

মত আকাশ থেকে সোজা নেমে এসেছে। তার ওপারে অদৃশ্য একটা মঞ্চ সাজানো হচ্ছে। কুয়াশার যবনিকা কোনরকমে একবার উঠে গেলেই নাটক শুরু হয়ে যাবে যেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এতদিন পর কর্পোরেশনের আলো-গুলোর অন্ধত্ব ঘুচেছে। চৌরঙ্গীর ওদিকটায় কুয়াশা মাখা আলোর অস্পষ্ট বৃত্তগুলি চোখে পড়ছে। আর আছে ধাবমান ট্রাম-বাসের অন্তহীন স্রোত।

আজ কি তিথি কে জানে। পূব দিগন্তে গোলাকার একটি চাঁদ দেখা দিয়েছে। তার আলো মোহময় বাতাবরণের মত কলকাতার সব রুক্ষতা-মালিন্য-উত্তেজনা আর উগ্র কর্কশ জীবনস্রোতের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে।

কার্জন পার্কের ঘাসগুলি ক'দিন আগেও ছিল সতেজ, উজ্জ্বল। কেয়ারি-করা মরসুমী ফুলের বাগানে ছিল প্রাণ এবং বর্ণের অফুরন্ত সমারোহ। কার্তিকের শুরু থেকেই তাদের সজীবতা ঘুচতে আরম্ভ করেছে। বিবর্ণ ফুলের বাগানের পাশ দিয়ে নিস্তেজ নির্জীব ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন মিসেস মিত্র। আকাশে পরিপূর্ণ চাঁদটিকে ঘিরে অগণিত তারা ছড়িয়ে রয়েছে। সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে একসময় বললেন, 'কতকাল পর এমন করে হাঁটলাম। জানো শুভেন্দু অনেকদিন আগে প্রায়ই আমরা এখানে আসতাম, বেড়াতাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখতাম। চীনা বাদাম খেতাম। ইচ্ছে হয়, সব ছেড়েছুড়ে রোজ এখানে এই সন্ধ্যেবেলার সময় একবার আসি। সেই হারানো দিনগুলোর মধ্যে আবার ফিরে যাই। রোজ আসবে আমার সঙ্গে?'

মিসেস মিত্রের দূর অতীতের মধ্যে কি আছে, আমার জানা নেই। তবে এটুকু বুঝতে পারছি এমন কিছু সেখানে ছিল যার জন্য তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব এখনও লোভী, যার জন্য ভোগের বিপুল সমারোহের মধ্যে থেকেও তাঁর গোপন একটি তৃষ্ণা এখনও আকণ্ঠ। আমার সন্দেহ হচ্ছে অনেকদিন আগের চীনাবাদাম কিনে খাওয়ার সেই তরল আবেগে আবার না তিনি ভেসে যান। কিন্তু না, অতদূর গেলেন না মিসেস মিত্র।

কাল সন্ধ্যে থেকেই তাঁর সমস্ত আচরণ, কথাবার্তা—সবই কেমন বিস্ময়কর মনে হচ্ছে। ক'মাসের সান্নিধ্যে মিসেস মিত্র সম্বন্ধে যে ধারণা করে নিয়েছিলাম এই দু-দিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই।

কিন্তু কে জানত, আজ রাত্রেই আমার জন্য আরো যে অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে তাতে আমার বিমূঢ়তা হাজার গুণ বেড়ে যাবে।

কার্জন পার্ক থেকে বেরিয়ে মিসেস মিত্র ধর্মতলা স্ট্রীটের অতি সাধারণ একটা জামাকাপড়ের দোকানে আমাকে নিয়ে গেলেন। ফুল-লতাপাতা-আঁকা চওড়া লাল পাড়ের, সাদা খোলের একখানা ফরাসডাঙার শাড়ি আর সাদা পপলিনের ব্লাউজ কিনে বললেন, 'চল, এবার বাড়ি ফিরি।'

আজ কি প্রতি মুহূর্তেই আমার চমকিত হবার দিন? আমার ধারণা এতকাল মিসেস মিত্র সম্বন্ধে যে খাত ধরে ছুটছিল ভদ্রমহিলা বার বার তার স্রোতটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। নইলে কোনদিন নতুন মডেলের গাড়ি

ছাড়া যিনি একটি পা বাইরে বাড়ান না তিনিই আজ ট্রামের ভিড়ে একাকার হয়ে গেছেন। বড় বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর ছাড়া যাঁর শপিং করা কল্পনাতীত, তিনিই আজ অতি সাধারণ একটা দোকানে গিয়ে ঢুকলেন।

আজকের এই অভিজ্ঞতাগুলি কোন যুক্তি দিয়েই ব্যাখ্যা করতে পারছি না। পারছি না বলে দুর্বোধ্য ইঙ্গিত দিয়ে সেগুলো আমাকে অস্থির করে তুলছে।

ট্রামেই বাড়ি ফিরলাম। মিসেস মিত্র আমাকে দোতলার সেই ঘরখানায় নিয়ে গেলেন। কাল রাত্রে এখানেই বসেছিলাম। আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে খাটে গিয়ে বসলেন মিসেস মিত্র। তারপর বললেন, 'আচ্ছা শুভেন্দু—'

'আজ্ঞে—'

'চাকরি নেবার সময় ত বলেছিলে মা নেই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মায়ের কথা তোমার মনে পড়ে?'

আমার জন্মের কয়েক মাস পরেই মা মারা গেছেন। তখনকার কোন কথা মনে না থাকাই স্বাভাবিক। বললাম, 'আজ্ঞে না, কিছুই মনে নেই।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন মিসেস মিত্র। কিছুটা অন্যমনস্কের মত বললেন, 'মায়ের কথা মনে নেই। বাংলা দেশের গৃহস্থ ঘরের প্রৌঢ়া গিন্নীদের তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ।'

ভদ্রমহিলা যা বলছেন তার মধ্যে বিন্দুমাত্র জটিলতা নেই। তবু যেন আমার বুঝে উঠতে অসুবিধে হল। দ্বিধাগ্রস্ত জড়িত স্বরে বললাম, 'দেখেছি।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

এক সময় স্তব্ধতা ভেঙে মিসেস মিত্র বললেন, 'তুমি একটু বস। আমি আসছি।' বলেই খানিকটা আগে কিনে-আনা নতুন কাপড়ের প্যাকেটটা নিয়ে উঠে পড়লেন। ঘরের দক্ষিণ প্রান্তের দেওয়ালে একটা দরজা। সেটা খুলে ভিতর দিকে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন মুহূর্তে।

কিছুক্ষণ পর মিসেস মিত্র যখন ফিরে এলেন অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এমন চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা যে হবে, এ-বাড়িতে চাকরি করতে আসার প্রথম দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত কখনও ভাবতে পারিনি। আমার পক্ষে এ একেবারে অভাবিত, অপ্রত্যাশিত, অকল্পনীয়। আমার সমস্ত বোধ বা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটাকে ধরতে পারছি না। পারছি না বলেই স্তব্ধ নিষ্পলকে মিসেস মিত্রের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সীতেশদার সঙ্গে প্রথম যেদিন আসি সেদিন থেকেই দেখছি স্বচ্ছ দামী সিল্ক আর সিফন ছাড়া কিছুই পরেন না মিসেস মিত্র। কার্পাস তুলোর তন্তু দিয়ে যে আচ্ছাদন তা তাঁর অস্পৃশ্য। এমন খাটো আর দুঃসাহসী ব্লাউজ তাঁকে পরতে দেখি যাতে শরীরের অনেকখানি উন্মুক্ত থেকে যায়। দু-একদিন আঁটো সাঁটো স্ল্যাকসের খাপে তাঁর স্বর্ণাভ সুঠাম দেহটিকে পুরে রাখতে দেখেছি। যদিও তিনি বর্ষীয়সী, স্ল্যাকস্-পরা চেহারায় প্রখর ধাঁধা ফুটিয়ে

যখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার স্নায়ু ঝিমঝিম করেছে। চোখ তুলে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে তাকাতে পারিনি।

কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর অন্য রূপ। একটু আগে ধর্মতলার অতি সাধারণ একটি দোকান থেকে সাদা জমির আর ফুললতা-পাতা-আঁকা লাল পাড় যে শাড়িটি কিনে এনেছেন সেটি এবং হাতায় সুতোর কাজ-করা সাদা একটি ব্লাউজ অভিজাত গৃহিণীর ভঙ্গিতে পরে এসেছেন। কপালের ওপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘোমটা টানা। তবু বোঝা যাচ্ছে সিঁথির সিঁদুর বেশ চওড়া করেই টানা এবং দুই ভুরুর মাঝখানে সিঁদুরেরই গোলাকার একটি টিপ। সব চাইতে চমকপ্রদ যা তা হল একটি নম্র অনুভূতিময় ব্রীড়া তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছে। আমার পরিচিত উগ্র আধুনিকা মহিলাটিকে এই রূপে এই অপরিচিত স্নিগ্ধ মহিমায় কোনদিন যে দেখব, ভাবিনি। দেখতে দেখতে চোখ আর ফেরানো গেল না।

মিসেস মিত্র সলজ্জ একটু হাসলেন। বললেন, 'এবার বল তো শুভেন্দু, আমাকে গৃহস্থ ঘরের বৌ-এর মত দেখাচ্ছে কিনা!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক মায়ের মত।' জড়িত গাঢ় স্বরে উত্তর দিলাম।

'কোন খুঁত নেই তো?'

'আজ্ঞে না।'

এরপর আর কিছু বললেন না মিসেস মিত্র। আস্তে আস্তে খাটে এসে আমার মুখোমুখি বসলেন।

এখনও চোখ ফেরাই নি। নির্নিমেষে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে আছি। তাঁকে দেখতে দেখতে চকিতের জন্য সীতেশদার বৌ-র মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

যে ক'টা দিন তাদের ওখানে ছিলাম সীতেশদার বৌ বার বার নতুন নতুন সাজে আমার সামনে এসে দাঁড়াত। মিসেস মিত্রও আজ এসে দাঁড়ালেন। তবে সীতেশদার বৌ-র মত উৎকট সাজে নয়, একেবারে বিপরীত রূপে।

আমি যেন একটি আয়না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে যেমনভাবে পারে আমার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে যায়।

এক সময় মিসেস মিত্র বলে উঠলেন, 'তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ, না?'

'কেন?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

'আমাকে তো এভাবে আর কখনও দেখ নি তাই আর কি।' মিসেস মিত্র স্নিগ্ধ একটু হাসলেন।

আমি উত্তর দিলাম না।

'জানো শুভেন্দু—' বলতে বলতে মিসেস মিত্র কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়লেন। কি একটা স্পর্শাতীত আলৌকিকতা তাঁর ওপর ভর করে বসল। গলার স্বরটাও ঠিক স্বাভাবিক শোনাচ্ছে না, 'হয়ত এমন দিন আসতে পারে এইভাবে ঘরের বৌ সেজেই থাকতে হবে। তাই আগে থেকেই খানিকটা মহড়া দিয়ে রাখছি। মহড়া আর কি! এমন এক দিন ছিল যখন ঘরের বৌয়ের মতই

তো ছিলাম।'

মিসেস মিত্রকে যেটুকু জেনেছি সেটুকুই সব নয়। চারদিকে ইন্দ্রিয়সুখের মেলা সাজিয়ে রেখেও হয়ত তাঁর ভেতর দিকে বিপরীত রীতির আকাঙ্ক্ষা আছে। অফুরন্ত উত্তেজক ভোগ আর স্নিগ্ধ প্রশান্তি—এই দ্বৈত জীবনের মাঝখানে দোলকের মত তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব বুঝি দোলায়িত।

তৃতীয় দিনও নিস্তার পেলাম না। মিসেস মিত্র সেদিন আমাকে কলকাতার বাইরে নিয়ে গেলেন। সেই ডায়মণ্ডহারবারের দিকে।

পুরনো মডেলের একখানা বড় কালো গাড়িতে আমরা এসেছিলাম। মিসেস মিত্র নিজে ড্রাইভ করছিলেন। আমি পাশে বসে ছিলাম।

এদিকটায় আগে আর কখনও আসিনি। মোটরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। সেখানে প্রতিমুহূর্তে দৃশ্যান্তর ঘটছে।

তখন বিকেল। কে যেন ক্ষিপ্র হাতে শেষ অঘ্রাণের শীতল ছায়া টেনে দিচ্ছিল চারদিকে। ডায়মণ্ডহারবার রোডের মসৃণ দেহ উত্তর-দক্ষিণে সরল রেখায় প্রসারিত। দু-ধারে ধানের ক্ষেত। আকাশটা পিঠ বাঁকিয়ে যেখানে দিগন্ত ছুঁয়েছে, ক্ষেতগুলো সেই পর্যন্ত ছুটে গেছে।

আমি মফঃস্বলের ছেলে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, গ্রামের ছেলে। এই ধানক্ষেত, আকাশ—সবই আমার চিরদিনের চেনা। তবে ক'মাস ধরে কলকাতার ফ্রেমে আটকে আছি। সেখানে চোখ মেললেই দৃষ্টি ইট কাঠের পুঞ্জীভূত স্তূপে গিয়ে ধাক্কা খায়। তাই বুঝি হঠাৎ এই অবাধ উন্মুক্তির মধ্যে এসে খুশি এবং দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

অঘ্রাণের শেষাশেষি মাঠের একটা ধানও আর সবুজ নেই। সব সোনার দানা হয়ে গেছে। ধারে কাছে কোথাও পাখিদের দেখা যাচ্ছিল না। তারা ছিল অনেক, অনেক দূরে। আকাশের বিষণ্ণ রুক্ষ নীলের কাছাকাছি ক্লান্ত ডানায় সাঁতার কাটছিল।

রাস্তার দু-পাশে খাল। এই অঘ্রাণেই জল তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। মাঝে মাঝে দু-চারটা ঘুনি, এক-আধটা বাঁশের সাঁকো। আর আছে সারিবদ্ধ খেজুর গাছ, ফাঁকে ফাঁকে লম্বা লম্বা তাল আর নারকেল।

ঋতুবদলের মহড়াটা যেন এখানে বেশি করে টের পাওয়া যায়। সবেমাত্র বিকেল। এরই মধ্যে বাতাস রীতিমত ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে।

মাইলের পর মাইল মাঠ পেরিয়ে চলেছি। হঠাৎ মিসেস মিত্র বলে উঠলেন, 'চমৎকার, না?'

মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কলকাতায় স্নায়ুগুলো স্টীলের তারের মত টান টান হয়ে থাকে সবসময়। এখানে এলে জুড়িয়ে যায় যেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ইচ্ছে হয়, ফাঁক পেলেই কিছুক্ষণ এখানে এসে কাটিয়ে যাব। কিন্তু

ফাঁকটাই পেয়ে উঠি না।'

আমি চুপ করে রইলাম। মিসেস মিত্রও আর কিছু বললেন না।

কতক্ষণ পর মনে নেই, গাড়িটা থেমে গেল। একটু আগেও পশ্চিম দিগন্তের মাথায় আরক্ত সূর্যটা অদৃশ্য বোঁটায় ঝুলছিল যেন। হঠাৎ কিসের একটা ঝাঁকুনি লেগে টুপ করে খসে পড়ল।

এঞ্জিনে চাবি লাগিয়ে মিসেস মিত্র বললেন, 'চল, একটু নামা যাক।'

দু-জনে নেমে পড়লাম।

ডান দিকে মজা খালের ওপর দিয়ে বাঁশের সাঁকো। সাঁকো পেরিয়ে ছোট একটা বাজার। সবসময়ের বারোমেসে বাজার।

বাজার আর কি! ইতস্তত কয়েকটি খড়ের ঘর গা-ঘেঁযাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে একটা মুদি দোকান, একটা তেলে ভাজার, একটা ধানচালের, একটা পানবিড়ির, একটা মুড়িমুড়কির। একটা দোকানে দেখলাম, ভাঙা ময়লা আলমারির মধ্যে পেতলের গামলায় হলদে রসগোল্লা ভাসছে। ক্যাঠের বারকোশে ময়দার গজা আর বোঁদে সাজানো। এমনি সব। বাজারটার দক্ষিণ প্রান্তে একটানা টিনের চালা। আপাতত সেগুলো ফাঁকা। এ অঞ্চলের তাবত ভবঘুরে কুকুর আর ছাগল সেখানে আস্তানা গেড়েছে। তবে চালাগুলোর বিশেষ চেহারাটি দেখে বোঝা যায়, সপ্তাহ শেষের কোন একটি দিনে ওখানে হাট বসে।

অঘ্রাণের সন্ধ্যে দ্রুত নেমে আসছিল। এর মধ্যে বাজারের মুদি দোকানটায় অবশ্য হ্যাচাক জ্বলছে।

বাজারের ভেতর দিয়ে ধুলোর রাস্তা। মিসেস মিত্রের পিছু পিছু এগিয়ে চললাম। দোকানে যারা বসে ছিল, শীতল কৌতূহলী চোখে আমাদের দেখতে লাগল।

বাজার এবং হাটের এলাকা আর কতটুকু! একসময় বাইরে বেরিয়ে এলাম।

দিগন্তবিসারী প্রান্তরের মাঝখানে বাজারটা একটা যতিচিহ্নের মত। ইতির পর পুনশ্চর মত তারপরেই শুরু হয়েছে মাঠ। মাঠ, মাঠ আর মাঠ। অন্তহীন অবাধ ধানের ক্ষেত। তার বুক চিরে ইউনিয়ন বোর্ডের সরু রাস্তা।

মিসেস মিত্র বললেন, 'চল ওদিকটায় ঘুরে আসি।'

হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে একখানা গ্রাম পাওয়া গেল। কৃষকদের গ্রাম। নারকেল খেজুর আর আমগাছের ঘরের মধ্যে নগণ্য নিস্তরঙ্গ ঘুমন্ত একটি জনপদ। মাত্র কুড়ি মাইলের মধ্যে যে কলকাতা শহর, তা যেন এখানে এলে বিশ্বাসই হতে চায় না। মহানগরীতে এত যে তরঙ্গ এত অস্থিরতা এত দোলা —তার কণামাত্র এখানে এসে পৌঁছয় নি।

মিসেস মিত্রের ওপর আজ ক'দিন ধরে কি এক যাদুমন্ত্রের ক্রিয়া চলছে যেন। আশ্চর্য! চাষীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাটির দাওয়ায় বসে আন্তরিক সুরে চাষ-আবাদের আর গ্রামজীবনের গল্প করলেন ভদ্রমহিলা। ব্যাগে ভর্তি

করে টফি এনেছিলেন, চাষীদের ছেলেমেয়েদের সেগুলো বিলিয়ে দিলেন। তারপর অনেক রাত্রে শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ দেখা দিলে উঠলেন।

পরের দিনও আরেকটা গ্রামে গেলেন মিসেস মিত্র। বলাই বাহুল্য, আমাকে সঙ্গী হতে হল। সেখানে ঘটা করে শনি সত্যনারায়ণের পুজো হচ্ছিল। মনোযোগ দিয়ে পুজো দেখলেন, প্রসাদ খেলেন।

এরপর থেকে গ্রামের নেশায় পেয়ে বসল যেন তাঁকে। কোন দিন সারারাত জেগে যাত্রা শোনেন, কোন দিন মাছ ধরা দেখেন, কোন দিন চাষী-বৌদের কাছে গিয়ে পিঠে তৈরির প্রক্রিয়া শিখে আসেন। পাঁচটা দিন এই রকম চলল। ফেরার সময় প্রতিদিনই বলেন, 'বেশ আছে ওরা, কত অল্পে খুশি!'

আমি সায় দিই, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মিসেস মিত্র বলেন, 'যাই বল শুভেন্দু, একমাত্র গ্রামেই যা শান্তি রয়েছে। গ্রামের লোকদের আমার ভারি হিংসে হয়। ইচ্ছে হয়, সব ছেড়েছুড়ে এখানে এসেই থাকি।' বলতে বলতে কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

লক্ষ্য করেছি, প্রতিদিনই গ্রাম থেকে ফিরে ঢক ঢক করে দু-তিন পেগ কাঁচা হুইস্কি খেয়ে ফেলেন মিসেস মিত্র। আর তখনই আমার সমস্ত কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়। মনে হয়, চারদিকে রাজসিক ভোগের উৎসব সাজিয়ে রেখে একটু শান্তির সন্ধানে স্বাদ-গন্ধহীন গ্রামের জীবনে এই যে ছোটা—এ যেন বিকার মাত্র।

মিসেস মিত্রকে কি বিকারের ঘোরে পেয়েছে!

ষোল

পর পর সাতটা দিন নীনীর পেছনে ছুটতে পারিনি। সন্ধ্যে হলেই মিসেস মিত্র আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে তাঁর জীবনের জটিলতায় আটকে ফেলেছেন। আর সেই ঘূর্ণিতে অবিরত পাক খেয়েছি।

আজ সন্ধ্যেটা কিভাবে কাটবে, আগে থেকে কিছুই নির্ধারিত নেই। মিসেস মিত্র হয়ত ডাকিয়ে পাঠাতে, কিংবা ভাঙা বাড়ির এই বিবরে বসে থাকতে বলতে পারেন। অথবা খেয়াল হলে নীনীর পেছনেও লেলিয়ে দিতে পারেন।

সকাল-দুপুর নিদারুণ আলস্যের মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে একরকম কেটে গেল। তারপর হেমন্তশেষের বিকেল একসময় চারদিকের বাগান এবং পুকুরের ওপর গাঢ় ছায়ার আবরণ টেনে দিল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে অন্যমনস্কের মত জানালার বাইরে একটা পেয়ারা গাছের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। শীতের এখনও কিছু দেরি কিন্তু এরই মধ্যে পাতা ঝরে ঝরে ডালপালা বেরিয়ে কঙ্কালসার হয়ে গেছে গাছটা।

পেয়ারা গাছটার ঠিক পেছন থেকেই চীনা ঘাস আর শুষনি শাকের জঙ্গল।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখে পড়ল সেই জঙ্গলে ফর্সা রক্তাভ একটি মুখ এবং একজোড়া দীর্ঘ নীলাভ অর্থাৎ নীনী।

প্রথমটা খেয়াল করিনি। মনে হয়েছিল অবিশ্বাস্য একটা স্বপ্ন। এই ভূতুড়ে ভাঙা বাড়িতে ঝোপঝাড় ঠেলে নীনী যে কোনদিন আসতে পারে, এ ছিল আমার সুদূর কল্পনারও বাইরে।

একটু পরে পেয়ারা গাছের তলা দিয়ে নীনী এগিয়ে আসতে লাগল।

প্রায় লাফ দিয়েই বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ততক্ষণে নীনী উঠোনে এসে পড়েছে। বিমূঢ়ের সুরে বললাম, 'আপনি!'

নীনী হাসল, 'কেন, আসতে নেই?'

থতমত খেয়ে বললাম, 'না, মানে—'

'মানে আর কি! কোনদিন আমাকে এখানে আসতে দেখেন নি, এই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোনদিন আসিনি বলে আজ আসব না, এমন কোন কথা আছে নাকি?' উঠোন থেকে বারান্দায় উঠে এল নীনী। বলল, 'আপনার ঘর কোনটা?'

'এই যে আসুন—আসুন—' ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

নীনীর কোনদিকেই আড়ষ্টতার চিহ্নমাত্র নেই। আশ্চর্য অসঙ্কোচ আর স্বচ্ছন্দগামিনী সে। ঘরে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'মিসেস মিত্র তা হলে আপনাকে এখানে রেখেছেন!' তার গলায় প্রচ্ছন্ন একটু ব্যঙ্গ রয়েছে কি?

আমি চুপ করে রইলাম। কী উত্তরই বা দেব!

নীনী এবার একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল, 'তারপর, ক'দিন দেখা পাচ্ছি না কেন?'

বললাম, 'মিসেস মিত্র একটা ব্যাপারে আটকে রেখেছিলেন, তাই—'

'জানেন শুভেন্দুবাবু, কিছুদিন ধরে এমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে যে সন্ধ্যে হলেই শুধু আপনার কথা মনে পড়ে। ছায়ার মত আপনার অস্তিত্ব যেন টের পাই। ক'দিন আপনি নেই, ভারি খারাপ লেগেছে।'

'তাই নাকি!'

'সার্টেনলি।' হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে উঠল নীনী, 'ওঃ, অনেক দেরি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিন।'

'মানে!' আমি কিছুটা অবাকই হয়ে গেলাম।

'মানে আবার কি, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। আর দেরি করবেন না।'

দ্বিধান্বিত ভীত সুরে বললাম, 'কোথায় যেতে হবে আপনার সঙ্গে?'

'আশ্চর্য, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন! আমার লাইফ স্টাইল সম্বন্ধে আপনার না খুব কৌতূহল! চলুন, কুইক।' বিচিত্র হাসল নীনী।

'কিন্তু—' আমি ইতস্তত করতে লাগলাম।

'কী হল?' নীনী অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'মিসেস মিত্রকে না জানিয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'না জানিয়ে গেলে আপনাদের মিসেস মিত্র কী করবে ? গর্দান নেবে ?'

'না ঠিক তা নয় ক'দিন ধরে উনি আমাকে ডাকিয়ে পাঠাচ্ছেন। আজও যদি ওঁর কিছু দরকার হয়—'

'আপনি বড্ড ভীতু তো। আসুন দেখি—'

নীনী কেমন করে বুঝবে, তার মত বেপরোয়া দুঃসাহসী হওয়া আমার সাজে না। মিসেস মিত্রের চাকরিটা গেলে কোথায় কোন অতলে গিয়ে ঠেকতে হবে, ভাবতেও ভয় হয়। এত বিপর্যয়ের মধ্যেও আমার ভেতর আত্মসম্মানের খানিকটা তলানি এখনও অবশিষ্ট আছে। নতুন করে সীতেশদার সংসারে তার করুণার ওপর গিয়ে যে দাঁড়াব, তা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব দক্ষিণের বন্যায় আর তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে যে মানুষগুলো প্রেত হয়ে গেছে তাদের দলেই গিয়ে হয়ত নাম লেখাতে হবে। না না, অতখানি হঠকারিতা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

নীনী তাড়া দিয়ে উঠল, 'অত কী ভাবছেন ?'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'দেখুন, মিসেস মিত্র যদি সন্ধ্যেবেলা ডেকে পাঠিয়ে আমাকে না পান, ভারি বিপদ হবে—'

'বিপদ হবে ! তা হলে তো আপনাকে নিয়ে যেতেই হবে। যান, ড্রেস বদলে নিন।' নীনীর কথায় নিদারুণ এক অনমনীয়তা ফুটে উঠল যেন। তার মুখচোখে ভাবে এমন কিছু রয়েছে যা উপেক্ষা করা যায় না।

নিজের প্রায় অজান্তেই পোশাক বদলে নিলাম। একটা ব্যাপার প্রথম থেকেই প্রায় লক্ষ্য করেছি, মিসেস মিত্র এবং নীনীর মধ্যে কোথায় যেন একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। কখনও সেটা প্রকাশ্য, কখনও বা প্রচ্ছন্ন। ভেতরে ভেতরে দু-জনে প্রবল দুই প্রতিপক্ষ।

একরকম জোর করেই নীনী আমাকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেল। এতকাল মাঝখানের পাঁচিল পেরিয়ে নতুন বাড়ি পিছনে ফেলে তবে বাইরের রাস্তায় যেতাম। আমি জানতাম না পাঁচিল না ডিঙিয়েও এই ভাঙা বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরুবার অন্য একটা সংক্ষিপ্ত পথ আছে।

সেই পথেই নীনীর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটা ট্যাক্সি সেখানে অপেক্ষা করছিল। নীনী বলল, 'উঠুন—'

শেষ দ্বিধা তখনও বুঝি খানিকটা অবশিষ্ট ছিল। তা ছাড়া জুয়ার আসরের সেই কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতার স্মৃতি এখনও বিলীন হয়ে যায় নি। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে ?'

নীনী ধমকে উঠল, 'উঠতে বলছি, উঠুন। গেলেই সব বুঝতে পারবেন। আগে থেকে অত কৈফিয়ৎ দিতে পারব না।'

অগত্যা উঠে বসলাম। নীনীও পাশে এসে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সিটা স্টার্ট দিল।

মিসেস মিত্রের বাড়িতে চাকরি নেবার পর একেক সময় আমার মনে হয়েছে এই কলকাতা শহরটা যেন স্বল্প-পরিচিত এক মহাদেশ। এতদিন যতটুকু

দেখেছি যতটুকু জেনেছি তার হাজার গুণ সেটা অনাবিষ্কৃত।

অসংখ্য অলিগলি ঘুরিয়ে শেষ পর্যন্ত নীনী আমাকে যেখানে নিয়ে এল সেটা একটা প্রাইভেট ক্লাব।

আধুনিক স্থাপত্যরীতির সুদৃশ্য একখানা দোতলা বাড়িতে ক্লাবটা। তারের জালে গুলঞ্চ লতা তুলে বিশাল কম্পাউন্ডটা ঘেরা। ক্লাব বাড়ির সামনের দিকে সুবিস্তৃত লন্। একদিকে বাদামী নুড়ির রাস্তায় গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থা। উল্টো দিকে সমান করে ছাঁটা সবুজ ঘাসের কার্পেটে টেবল-চেয়ার সাজানো। মাঝে মাঝে কেয়ারি-করা মরসুমী ফুলের বাগান আর ইতস্তত ফোয়ারা। এসবের পেছন দিকে টেনিস এবং ব্যাডমিণ্টনের কোর্ট। একেবারে শেষ প্রান্তে অ্যাসবেস্টসের আচ্ছাদনের তলায় টেবল টেনিসের আসর। আর সর্বত্র চমৎকার স্তম্ভ থেকে মার্কারি আলোর উচ্ছ্বসিত ঢল নেমেছে।

আমরা যখন সেখানে গিয়ে পেঁছুলাম সন্ধ্যে নামতে শুরু করেছে। হেমন্তের স্তিমিত বিষণ্ণ দিনান্তে ক্লাব-কম্পাউন্ডের মার্কারি ল্যাম্পগুলো অতি-মাত্রায় জমকালো। দৃষ্টিকে প্রায় ধাঁধিয়েই দিচ্ছে যেন।

আমি শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, মফঃস্বলের ভীরু ছেলে। মানুষের জীবনে কলকাতার এই ক্লাবগুলির ভূমিকা কী, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই। তবে নীনী যখন এর সঙ্গে জড়িত তখন অনিবার্যভাবেই আমার নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠেছে, এবং ভীত সংশয়ে আশংকা করছি রজতের ফ্ল্যাটের মত এখানেও যুদ্ধোত্তর নরকের সাধনা চলে।

বাদামী নুড়ির রাস্তায় ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন মডেলের অনেক নতুন গাড়ি এসে ভিড় করেছে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে নীনীও আমাকে নিয়ে নেমে পড়ল। তারপর ও-পাশের লনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

পরিবেশটা একেবারে আন্তর্জাতিক। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ, কাশী-কাঞ্চী-কোশল —ভারতবর্ষের তো বটেই, সুদূর ইউরোপ আমেরিকার অনেক আনন্দ-সন্ধানীও চারদিকে ছড়িয়ে আছে।

নিজের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় আকণ্ঠ হয়ে উঠছিল আমার। আমি যেন মফঃস্বলের সেই আড়ষ্ট, সঙ্কুচিত, প্রতি-মুহূর্তে গুটিয়ে যাওয়া ছেলেটি আর নেই। এই ক'মাসে যথেষ্ট উন্নতি হয়ে গেছে আমার। বুঝিবা সঙ্গগুণ। নইলে এমন অসঙ্কোচ সাবলীল ভঙ্গিতে নীনীর পাশ্বর্চরের ভূমিকা চালিয়ে যাচ্ছি কেমন করে! প্রতিটি পদক্ষেপেই নিজের উপর আমার শ্রদ্ধা যেন বেড়ে যাচ্ছে।

লনের কাছাকাছি আসতেই নীনীর উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনার ঢল. নেমে এল চারদিক থেকে, 'হ্যালো মিস, হাউ ডু ইউ ডু?'

'হ্যালো ডারলিং, আফটার এ লঙ অ্যাবসেন্স—'

'হ্যালো সুইটি—'

'হ্যালো প্রেটি লেডি—'

সুঠাম গ্রীবা ঈষৎ বাঁকিয়ে রক্তাভ ঠোঁটের প্রান্তে নিঃশব্দ পরিতৃপ্ত হাসির প্রায়-বিলীন একটি রেখা টেনে এবং হাতের আঙুলে বিচিত্র মুদ্রা ফুটিয়ে প্রতিটি অভ্যর্থনার উত্তর দিতে লাগল নীনী, 'হ্যালো-হ্যালো-হ্যালো—'

দেখেই বুঝলাম, রজতের ফ্ল্যাটের মত এই ক্লাবেও নীনীর অনুগ্রহ পাবার জন্য অসংখ্য পতঙ্গ রয়েছে। তিন চারজন তো লনের আসর ভেঙে ছুটে নীনীর পাশে পাশে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে চলল।

তিন চারটে সুপুরুষ তরুণ তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপই নেই নীনীর। দর্পিতা সম্রাজ্ঞীর মত নিজের মহিমায় লন্ পেরিয়ে ক্লাব বাড়িটার ভেতর চলে এল সে।

আমার ধারণা ছিল না এই আন্তর্জাতিক ক্লাবে একটা প্রাইভেট 'বার' আছে। একতলার সুবিশাল হলে চেয়ার-টেবল সাজানো। নীনী আমাকে নিয়ে সেখানে বসল। সঙ্গের স্তাবক পতঙ্গ তিনটেও তাকে ঘিরে রইল।

হলের দক্ষিণ প্রান্তে ওয়াইন কাউণ্টার, আর বয়দের ছোটাছুটি। একটা বয়কে ডেকে বীয়ারের অর্ডার দিল নীনী।

রজতের ফ্ল্যাটে নীনীর হাতে একবার মরেছিলাম। বুঝলাম, দ্বিতীয়বার মৃত্যু আসন্ন। নীনীর হাতে কতবার যে আমাকে মরতে হবে, কে বলবে।

বয় একসময় ট্রে-তে পানপাত্র সাজিয়ে নিয়ে এল। আপত্তি করে লাভ নেই। নিঃশব্দে একটা গ্লাস তুলে নিলাম।

এদিকে এক কাণ্ডই হল, স্তাবকের দল হুড়মুড় করে বয়ের ট্রে-তে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই একটা করে গ্লাস তুলে নীনীর দিকে বাড়িয়ে ধরল, 'প্লীজ, প্রেটি লেডি—'

কারুর মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হল না। কঠিন শীতল উপেক্ষা দিয়ে নীনী তাদের প্রত্যাখ্যানই করল প্রায়। ট্রে-র উপর অবশিষ্ট আরেকটা গ্লাস ছিল। নীরবে সেটা তুলে আলতো একটা চুমুক দিল সে।

মুহূর্তের জন্য স্তাবক তিনটে গুটিয়ে গেল। তারপর হাসতে হাসতে বলতে লাগল, 'ইট'স্ ক্রুয়েলটি লেডি, ইট'স্ ক্রুয়েলটি—'

নীনী নিরুত্তর। অখণ্ড মনোযোগে সে শুধু পানপাত্রে চুমুক দিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর স্তাবকগুলো নীনীর সূক্ষ্ম অপমানটা প্রায় ঝেড়েই ফেলে দিল। তার ডানপাশে যে পতঙ্গটি বসে ছিল সে বলে উঠল, 'তিন উইক আপনি এখানে আসেন না। আপনার অ্যাবসেন্সে রীয়ালি লাইফ ইজ হরিবল্ ইন দিস ক্লাব।'

দ্বিতীয় পতঙ্গ বলে উঠল, 'ড্রাই, অ্যাবসোলুটলি ড্রাই—'

তৃতীয় পতঙ্গ বলল, 'আমার তো এখানে আসতেই ইচ্ছে করত না।'

এতক্ষণে যেন ঈষৎ করুণা হল নীনীর। চোখের কোণে কৌতুকের প্রায় অদৃশ্য একটি হাসি ফুটিয়ে গলার স্বরে অনেকখানি ঢেউ দিয়ে বলল, 'ইজ ইট!'

'ওহ্ ওহ্ সিওর—' তিনজনে লাফিয়ে উঠে নীনীর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়েই

পড়বে যেন।

যদিও ছেলে তিনটি সুদর্শন তবু ভাব দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন তিনটি মানবেতর প্রাণী। শুধু পেছন দিকে একটা করে লেজুড় থাকলে চিত্রটি সম্পূর্ণ হত। সামান্য একটু অঙ্গুলিহেলনেই যারা অমন লাফাতে পারে, প্রশ্রয় পেলে না জানি তারা কি করে বসবে!

ছেলে তিনটে ঝুঁকে রয়েছে। নীনী বলল, 'প্লীজ বী সীটেড—'

তৎক্ষণাৎ তারা বসে পড়ল। একজন উৎসাহিত গলায় বলল, 'আচ্ছা মিস মিত্র—'

'বলুন—'

'আজ কি জলে নামবেন?'

নীনী বলল, 'ওহ্, ইয়েস—'

দ্বিতীয় পতঙ্গটি এবার লাফিয়ে উঠল, 'হাউ নাইস!'

তৃতীয়ও নিশ্চেষ্ট রইল না, 'ওয়াণ্ডারফুল!'

নীনীর জলে নামার ব্যাপারটা আমার কাছে স্বচ্ছ নয়। অতএব বিচিত্র একটু কৌতূহল মনের মধ্যে দোলা দিয়ে গেল। অবশ্য মুখে কিছু বললাম না।

বীয়ারের শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিঃশেষ করে নীনী একসময় আমার দিকে ফিরল, 'আপনাকে কিন্তু এখানে একা-একা খানিকক্ষণ বসতে হবে শুভেন্দু-বাবু। আমি একটু বাইরের লনে যাব। এক ভদ্রলোকের আসার কথা আছে। তাকে খুঁজে আসি।'

'আচ্ছা।' আমি মাথা নাড়লাম।

নীনী চলে গেল। তার সঙ্গে সেই ছোকরা তিনটেও ঝুলতে ঝুলতে চলল।

অনেকক্ষণ পরে একাই ফিরে এল নীনী। বিরক্ত অসহিষ্ণু স্বরে নিজের মনেই বলল, 'ছ'টার মধ্যে এখানে আসার কথা, এখনও তো এল না!'

ফস্ করে বলে ফেললাম, 'কার আসার কথা?'

অন্যমনস্কের মত নীনী বলল, 'কার আবার, তলোয়ারকরের।' বলতে বলতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আপনি আরো কিছুক্ষণ বসুন শুভেন্দুবাবু—'

নীনী চলে গেল। এবার বাইরের লনের দিকে না, ডানপাশের সিঁড়ি দিয়ে দোতলার দিকে।

কতক্ষণ পর মনে নেই, বাইরের লন্ থেকে সমস্ত মহিলা এবং পুরুষ প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে 'বার' পেরিয়ে ভেতরের দিকে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ সুস্থ স্বাভাবিকভাবে পা ফেলছিল না। দুর্নিবার এক ঘোরের মধ্যে দুরন্ত নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে উন্মাদের মত তারা দৌড়ে গেল।

'বারে'র বিস্তৃত হলটায় আমি একাই ছিলাম না। ইতস্তত আরো কয়েকজন এ-প্রান্তে সে-প্রান্তে বীয়ারের গ্লাসে ধ্যান-জ্ঞান সঁপে দিয়ে বসে ছিল। তাদের মনোযোগও বেশিক্ষণ আর নেশার মধ্যে নিবদ্ধ রইল না। দুলতে দুলতে তারাও ভেতরে চলে গেল।

'বার'টা এখন একেবারেই ফাঁকা। শুধু ওয়াইন কাউণ্টারের কাছে

দু-চারটে বয় চীনা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার হাতে বীয়ারের যে গ্লাসটা রয়েছে তার একটা বিন্দুও আর অবশিষ্ট নেই। সেদিকে তাকিয়ে নিজেরই যেন চমক লাগল। নীনীই আমার সংস্কারের ভিতে ধস নামিয়েছিল। সত্যিই কি তাই? না কি সংস্কারটা মিথ্যে আবরণ মাত্র। তার নিচে অবচেতনের কোথাও একটা উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া স্বভাব জন্মমুহূর্ত থেকেই চাপা পড়ে ছিল, একটু সুযোগ পেতেই সেটা বেরিয়ে এসেছে।

ভাবনাটা নেহাত অকারণে নয়। বয় বীয়ারের গ্লাস দিয়ে যাবার পর নীনী তো আমার দিকে তাকিয়ে ছিল না। স্তাবক তিনটে তাকে উদ্ব্যস্ত করে রেখেছিল। এদিকে আমি নিজে নিজেই নীনীর পীড়াপীড়ি এবং জেদ ছাড়াই বীয়ারের গ্লাসটা শেষ করেছি।

ভাবনার বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল না। তার আগেই উল্লসিত একটা চিৎকার ভেসে এল। কিছুক্ষণ আগে লন্ এবং 'বারে'র লোকগুলো যেদিকে ছুটে গিয়েছিল চিৎকারটা সেদিক থেকেই আসছে।

এই বিশাল হল ঘরটায় আমি একা—একেবারে একা। নীনী বলে গিয়েছিল খানিকটা পরেই সে আসবে। কিন্তু এক ঘণ্টারও বেশি সময় নিঃসঙ্গ বসে আছি তবু সে ফেরে নি।

সেই চিৎকারটা থামে নি। ক্রমাগত আরো প্রমত্ত এবং বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছে। হঠাৎ কেমন যেন দুর্বোধ্য একটা আকর্ষণ অনুভব করলাম। নিজের অজান্তে আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম। তারপর চিৎকারের উৎসটা যেখানে, গুটি গুটি সেদিকে পা চালিয়ে দিলাম।

চমৎকার ক্লাব বাড়িটার ঠিক পেছনেই আমার জন্য এমন একটা বিস্ময় যে অপেক্ষা করছিল, তা কে জানত!

সেখানে আগাগোড়া কংক্রিটে বাঁধানো একখানা সুইমিং পুল। একদিকে ডাইভিং বোর্ড। আরেক দিকে সারিবদ্ধ স্ট্যাণ্ড। সেগুলোর ওপর থেকেই সাঁতারুরা জলে ঝাঁপ দেয়।

পুলটা ডিম্বাকৃতি। সেটাকে ঘিরে লোহার রেলিং-এর বাইরে প্রচণ্ড ভিড়। মহিলা এবং পুরুষ—সবাই ডেলা পাকিয়ে একাকার হয়ে আছে। আর মত্ত স্বরে চেঁচাচ্ছে। তাদের উচ্ছ্বসিত ফেনায়িত হৈচৈ এখানেই সীমাবদ্ধ নেই, চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

এগিয়ে এসে সেই ভিড়ে মিশে গেলাম। ফ্লাড লাইটের আলোর বানে জায়গাটা ভাসো-ভাসো। তার মধ্যেই চোখে পড়ল পুলের নীলাভ স্বচ্ছ জলে এগারটি তরুণী সোনালী মাছের মত খেলা করছে আর এই খেলাটাই পারের লোকগুলোর এমন মাত্রাছাড়া উল্লাসের হেতু।

হেতুটা নিতান্ত অকারণে নয়। তরুণীরা আশ্চর্য সুরূপা। তার ওপর সুস্তনী, সুমধ্যমা, সুবর্ণা। এমনিতেই তাদের পরনে যা থাকে প্রয়োজনের তুলনায় তা অতিরিক্ত স্বচ্ছ। এই মুহূর্তে তা হ্রস্বতম। লাল-নীল-সবুজ—

বিচিত্র রঙের সুইমিং কস্টিউমে তাদের শরীর যতখানি আবৃত তার বহুগুণ উন্মুক্ত। রহস্য যেটুকু, তার মধ্যে গোপনতার প্রচেষ্টা বিশেষ নেই। হুল্লোড় এবং চিৎকারের কারণ তা হলে এই!

এ যুগের মৎস্যকন্যারা বাঁধানো 'পুলে' খেলছে। পারের পতঙ্গগুলোর ধমনীতে রক্ত ছলকে ছলকে পড়ছে। গলার স্বর যেখানে তুলে তারা চিৎকার করছে, আমার মনে হল, হৃদপিণ্ড বুঝি ফেটেই যাবে।

নির্নিমেষে জলকেলি দেখছিলাম। কখনও মেয়েগুলো পায়ে পা দিয়ে বৃত্তাকারে জলের ওপর নিস্পন্দ হয়ে যাচ্ছিল। কখনও একটা পদ্মের এগারটি পাপড়ি যেন তারা। কখনও বিচ্ছিন্ন ভাবে এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কখনও ব. দ্রুতগামী শুশুকের মত ডুবতে ডুবতে আর ভাসতে ভাসতে যাচ্ছিল।

দেখতে দেখতে আমার দৃষ্টি একসময় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। একাদশ জলপরীর মধ্যে আমাদের স্বর্ণকেশী নীলাক্ষীও রয়েছে। অর্থাৎ নীনী।

আমাকে 'বারে' বসিয়ে রেখে নীনী দোতলায় চলে গিয়েছিল। তারপর এই তাকে দেখলাম। যে পথে সে দোতলায় উঠেছিল সে পথে আর ফেরে নি। তবে কি দোতলা থেকে সরাসরি সুইমিং পুলে যাবার আর কোন রাস্তা আছে? হয়ত বা। হয়ত নয়, নিশ্চয়ই।

সোনালী মাছেদের খেলা একসময় শেষ হল। ক্লান্ত শিথিল শরীরে ডানা নেড়ে নেড়ে একে একে স্ট্যাণ্ডের দিকে আসতে লাগল তারা। মৎস্যকন্যারা এবার পৃথিবীর মানুষ হয়ে যাবে।

তারা সবেমাত্র স্ট্যাণ্ড ছুঁয়েছে, ঠিক সেই সময় বিচিত্র ব্যাপার ঘটে গেল। রেলিং-এর ওপারে যে উচ্ছ্বাস এতক্ষণ আটকে ছিল সেটা আর বাধা মানল না, মুক্তি-পাওয়া ঢলের মত রেলিং উপচে ঊর্ধ্বশ্বাসে স্ট্যাণ্ডের দিকে ছুটল।

এক-একটি তরুণীর দিকে প্রায় বিশটা করে হাত প্রসারিত। অবসন্নের মত যে যে হাতটা পারল সেটা ধরে ওপরে উঠে এল।

সবার শেষে নীনীর পালা। লক্ষ করলাম, পারের সবগুলি হাতই তার দিকে এগিয়ে গেছে। নীনী কিন্তু কোনটাকেই ধরল না। শুধু সারি সারি প্রসাদলোভী বিগলিত মুখগুলির ওপর দিয়ে নীল চোখের দৃষ্টি লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত নীনীর দৃষ্টি যে মুখটির ওপর এসে পড়ল তার বয়স ত্রিশের সামান্য উপরে। মাথার তামাটে চুল কোঁচকানো, তামাটে ভ্রূর তলায় দীর্ঘ চোখ, গায়ের রঙ হলদেটে, চিবুক গোলাকার। চোখ দু'টি কালো, আশ্চর্য কালো। খয়েরী বুশ শার্টের তলায় তার বলিষ্ঠ পেশল বুকের আভাস পাওয়া যায়। নৃতত্ত্বের ইতিহাসে যাঁদের কৌতূহল তাঁরা হয়ত প্রথম দর্শনে গ্রীক ভাবতে পারেন। আবার কালো চোখের দিকে তাকিয়ে বিভ্রান্তও বোধ করবেন। কেন না সেখানে বাঙলা দেশের শীলমোহর মারা আছে।

নীনী তার দিকেই হাত বাড়িয়ে দিল। হাল্কা একটা পাখির মত সে নীনীকে জল থেকে তুলে নিয়ে এল। বুকের নিবিড় ঘনত্বে দাঁড়িয়ে ভ্রূ-ভঙ্গ

করে ফিস ফিস গলায় নীনী বলল, 'আমি খুব রাগ করেছি তলোয়ারকর।'

এই তলোয়ারকর! অর্থাৎ মারাঠী ব্রাহ্মণ। এর জন্যই খানিকটা আগে অস্থির অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল নীনী!

তলোয়ারকরকে বিশেষ চিন্তিত দেখাল না। মৃদু হেসে বলল, 'ইজ ইট!'

'ওহ্, ইয়েস।' অবুঝ আদুরে মেয়ের মত নীনীর ঠোঁট স্ফুরিত হল।

'কেন?'

'আবার জিজ্ঞেস করছ! লজ্জা করে না! সেই ছ'টার সময় তোমার পৌঁছুবার কথা। এখন ক'টা বাজে দেখ।'

তলোয়ারকর উত্তর দিল না। ঠোঁটের সেই অদৃশ্য হাসিটাকে আরেকটু বিস্তৃত করল মাত্র।

চারপাশে ফ্লাড লাইটের আলোয় মানুষগুলো কিলবিল করছে। আশ্চর্য, স্নানের সংক্ষিপ্ত পোশাকের মধ্যেও নীনী সঙ্কোচহীনা। একটা পিছল মাছের মত স্পর্শের মধ্যে কিন্তু ধরার বাইরে। অকুণ্ঠগামিনী মেয়েটা তার সঙ্গীকে নিয়ে ভিড়ের ভেতর দিয়ে ক্লাব বাড়িটার দিকে অদৃশ্য হল। আমি যে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার হাতের আলতো একটা স্পর্শ যে আমার স্নায়ুর ভেতর ঢেউ তুলে গেছে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তার। শুধু সে সম্পর্কেই কি, চারদিকের ফেনিয়ে-ওঠা হুল্লোড় আর লুব্ধ অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতিও তার শীতল নিষ্ঠুর উপেক্ষা।

নীনীরা চলে গেছে। ধীরে ধীরে আমি আবার 'বারে'র সেই নির্দিষ্ট সীটটিতে গিয়ে বসলাম।

কিছুক্ষণ পর নীনী তলোয়ারকরকে সঙ্গে নিয়ে এল। বলল, 'খুব রাগ করেছেন, না?'

অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

'অনেকক্ষণ একা-একা বসিয়ে রেখে গেছি বলে।'

'না, মানে—'

'কী?'

'সারাক্ষণ বসে তো ঠিক থাকিনি, সবাই সুইমিং পুলের দিকে ছুটল। আমিও তাদের পিছু পিছু—'

শব্দহীন অদ্ভুত একটু হাসল নীনী। অনেকখানি ঝুঁকে আধফোটা গলায় বলল, 'আই সী, আই সী, পৃথিবীতে যোগী কেউ নেই তা হলে—'

ইঙ্গিতটার মধ্যে জটিলতা নেই বিন্দুমাত্র। আমার কানদুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। বুকের ভেতর কোথায় যেন উন্মুক্ত সোডার বোতলের মত রক্ত ফেনাতে লাগল। আর আপনা থেকেই ঘাড় ভেঙে মাথাটা ঝুলে পড়ল যেন।

নীনী আর তার সঙ্গী এরপর বীয়ার আনিয়ে নিল। আমার জন্যও আনতে চেয়েছিল। আপত্তি করেছিলাম। নীনীও আর জোর করে নি।

বীয়ার-পর্বের পর আমরা গিয়ে তলোয়ারকরের গাড়িতে উঠলাম। ক্লাবের লন্ পেরিয়ে গাড়িটা মুহূর্তে বাইরের রাস্তায় এসে পড়ল।

গাড়িতে একটা কথাও হল না। সবাই চুপচাপ। লক্ষ করেছি, রজতের ফ্ল্যাটে সবার সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল নীনী কিন্তু তলোয়ারকরের ব্যাপারে ব্যতিক্রম ঘটল।

গাড়িটা যখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে, ঠিক সেই সময়ে স্তব্ধতা ভাঙল নীনী, 'শুভেন্দুবাবু—'

'আজ্ঞে—' আমি তাকালাম।

'একটা ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করতে হবে।'

'কী?'

'আজ আপনাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসবার সময় বলেছিলাম আমার জীবনের সব দিক দেখাব। কিন্তু একটা জায়গায় আমি হেলপলেস। যদি কিছু মনে না করেন এখানে নেমে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যান। যা ভাড়া লাগে আমি দিয়ে দেব। তলোয়ারকর গাড়িটা থামাও তো একটু।'

যদিও সবিনয়ে অনুরোধের সুরে নীনী কথাগুলো বলেছে তবু এটা যে আদেশেরই ছদ্মবেশ বুঝতে অসুবিধে হল না। গাড়ি থেমে গিয়েছিল। আমি নেমে পড়লাম।

মুখার্জি, রজত, অবশেষে তলোয়ারকর—নীনীর আগুনের খেলায় তিনটি মোমের পুতুল। আরো কেউ আছে কি-না, আপাতত আমার জানা নেই।

সতের

কর্পোরেশনের আলোগুলোর ঠুলি কবেই খসে গিয়েছিল। অন্ধ কলকাতা আবার চোখ মেলেছে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে যে ফুটপাথ, নীনীরা আমাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

স্কোয়ারের ভেতরে সুশৃংখল পামগাছগুলির পাতায় পাতায় এখন শেষ হেমন্তের মন্থর বাতাস দোলা দিয়ে যাচ্ছে। আইভি লতার ঝোপগুলোর মধ্যে টুকরো টুকরো অন্ধকার। কোণের ব্যায়ামাগারে কুস্তি চলছে। রণোন্মত্ত দুটো হিন্দুস্থানীকে ঘিরে কিছু বিহারী আর ফিরিঙ্গি থেকে থেকে হল্লা করে উঠছে। কাছেই কোন একটা বাড়ি থেকে পেটা ঘড়িতে রাত আটটার ঘোষণা শোনা গেল।

কোনদিকেই আমার লক্ষ্য ছিল না। দুরমনস্কের মত স্কোয়ারের পাশ দিয়ে এলোমেলো পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। দুরমনস্ক, কেননা আমার সমস্ত মনোযোগ রয়েছে নীনীর দিকে।

স্বর্ণকেশী নীলনয়না মেয়েটা। হোটেলের আঠার নম্বর কেবিন থেকে রজতের ফ্ল্যাট পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাইভেট ক্লাবের সুইমিং পুল পর্যন্ত আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে। আরো কতদূর যে সে আমাকে ছোটাবে, জানি না। জানি না, তবে আমার কৌতূহল দুর্বার। সেই সঙ্গে দুরন্ত আশংকা।

ভয় আর নেশায় মেশানো সে এক বিচিত্র আলোছায়ার খেলা।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন মীর্জাপুর পার হয়ে ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি এসে পড়েছি। কয়েক পা এগুলেই সিনেট হল, উল্টোদিকে কলেজ স্কোয়ার। বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচুর ঠিক পেছনেই স্কোয়ারের জলে অল্প অল্প ঢেউ। ঢেউ-এর মাথায় মাথায় পড়ে আলো দোল খাচ্ছে।

সিনেট হল পেছনে পড়ে রইল। হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ পেরিয়ে একসময় ওয়াই. এম. সি. এ.-র লাল বাড়িটার তলায় এসে দাঁড়ালাম। সামনেই চৌরাস্তা। কলেজ স্ট্রীটকে আড়াআড়ি ফুঁড়ে হ্যারিসন রোড পূব-পশ্চিমে প্রসারিত। মাঝখানের আইল্যাণ্ডে ট্রাফিক পুলিশ।

অফুরন্ত খরস্রোতে মানুষ এবং ট্রাম-বাস-রিক্সা-ট্যাক্সি সব একাকার হয়ে ছুটছে। যুদ্ধের ক'টা বছর স্তব্ধ থাকার পর কলকাতার শিথিল ধমনী এখন অতিমাত্রায় সচল।

নীনীর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কের মত এখানে এসে পড়েছি। এখন আমি কী করব? উল্টোদিকের ফুটপাথে একটা বইয়ের দোকানে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ঘড়িতে আটটা পঁচিশ। নীনীর পেছনে যেদিন ছুটি বাড়ি ফিরতে বারোটা একটা হয়ে যায়। সেদিক থেকে এখনও ফেরার সময় হয় নি।

মানুষ এবং গাড়ির স্রোত দেখতে দেখতে হঠাৎ বুলাকির কথা মনে পড়ে গেল। এখান থেকে তাদের বাড়ি কত দূর আর? একবার ঘুরে এলে হয়। তা ছাড়া সেদিন ভরসা দিয়ে এসেছিলাম মাসের শেষে মাইনেটা ওদের হাতে তুলে দেব। বাড়ি বদলের কথাও সেদিন হয়েছিল। এর মধ্যে নতুন ঠিকানায় উঠে গেছে কি-না বুলাকিরা, কে জানে। এই সাত-সাতটা দিন নানা আবর্তে পাক খেয়েছি। বুলাকিদের কোন খবর নিতে পারিনি। অথচ নেওয়া একান্ত উচিত ছিল। আমার মনের এ-প্রান্তে সে-প্রান্তে সঙ্গত কারণেই অস্বস্তির ছায়া পড়ল।

সেদিনই শুনে এসেছিলাম বুলাকির হাতে পয়সা-কড়ি কিছুই নেই। দু-বেলা নিয়মিত খাওয়া হচ্ছে না। উচিত ছিল এই তিন দিনের মধ্যে একটু সময় করে তাদের ওখানে আসা। ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। একটা পীড়াদায়ক অনুভূতি আমার শ্বাসক্রিয়াকে কণ্টকর করে তুলল।

পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম গোটা তিরিশেক টাকা আছে। আপাতত তা-ই দিয়ে আসা যাক। পরে আরো কিছু দিয়ে আসব। ভাবনার বৃত্তটা সম্পূর্ণ হবার আগেই শ্যামবাজারের ট্রাম এসে গেল। উঠে পড়লাম।

বুলাকিদের সেই জীর্ণ দোতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াতে কতক্ষণ আর লাগল! দিন কয়েক আগের মতই বাড়িওলা সামনের রোয়াকে বসে ছিল। অঘ্রাণ মাসের এখনও কয়েকটা দিন অবশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে পুরনো ধুসো একখানা কোট গায়ে তুলেছে সে।

বাড়িওলা একাই বসে আছে। সেদিনের দাবার সঙ্গীটিকে আজ দেখা

গেল না।

বাড়িওলাকে দরজার কাছে আশা করিনি। মুখোমুখি পড়ে থমকে গেলাম। সেদিনের স্মৃতিটা খুব সুখকর নয়। তেমন বিশ্রী অপ্রীতিকর একটা কিছু আবার না ঘটে যায়! উপকারের প্রেরণায় যতখানি ছুটে এসেছিলাম ভেতরে ভেতরে ঠিক ততখানিই গুটিয়ে গেলাম।

বাড়িওলা বলল, 'এসো, ভায়া এসো।'

ডাকামাত্রই কাছে গেলাম না। সন্দিগ্ধভাবে তার গলার স্বর, মুখ-চোখের ভঙ্গিটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। কিন্তু না ব্যঙ্গ না শ্লেষ, কিছুই তার ভেতর থেকে আবিষ্কার করা গেল না। তবু যেন সংশয়টা ঘুচতে চায় না। বাড়িওলার চোখে দৃষ্টি স্থির রেখে দাঁড়িয়েই রইলাম।

বাড়িওলা আবার ডাকল, 'কি ভায়া, অত দূরে দাঁড়িয়ে রইলে যে?'

কোন কারচুপিই নেই। বাড়িওলার গলায় সস্নেহ সাদর একটা অভ্যর্থনা ছড়ানো রয়েছে। গুটি গুটি এগিয়ে গেলাম।

বাড়িওলা বলল, 'বাঁচিয়েছ ভায়া, বয়সে তুমি আমার চেয়ে ঢের ছোট। আশীর্বাদ করছি, বেঁচে থাক।'

অবাক হয়ে গেলাম। সে কি বলতে চায় বুঝতে না পেরে বললাম, 'মানে—'

'মানে আর কি, তুমি কি মন্তর দিয়েছ ছুঁড়িটাকে, দিনকয়েক আগে বিকেলে ঠেলাগাড়ি এনে মালপত্তর চাপিয়ে বাড়ি থেকে উঠে গেল। এ্যাদ্দিন পর হাড়ে আমার বাতাস লাগল। নিশ্চিন্তিতে এবার ছেলে-মেয়ে-পরিবার নিয়ে আসতে প্যরব। তোমায় কি বলে যে—'

সেদিন বুলকিদের উঠে যাবার ব্যাপারে আমার সাহায্য চেয়েছিল বাড়িওলা। এতদিনে বুলকিরা বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। বাড়িওলার ধারণা, আমার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। স্বভাবতই সে আমার প্রতি এ-কারণে কৃতজ্ঞ। তার শেষ কথাগুলো আমি যেন শুনতে পাই নি। মাঝখানেই বলে উঠলাম, 'বুলকিরা কোথায় গেছে জানেন?'

'হ্যাঁ, তোমার নাম শুভেন্দু তো?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'ছুঁড়িটা তোমার নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে। বলে গেছে তুমি এলে যেন দিয়ে দিই। একটু দাঁড়াও, নিয়ে আসছি।' হাতে ভর দিয়ে উঠে পড়ল বাড়িওলা। তারপর বাড়ির ভেতর চলে গেল। একটু পর ফিরে এসে সাদা খামের একখানা চিঠি দিয়ে বলল, 'এই নাও! ভাগ্যিস আমি থাকতে থাকতে এসেছ, নইলে চিঠিটা পেতে না।'

আমার ওপর বাড়িওলার প্রসন্নতার কারণ আগেই বুঝেছিলাম। বললাম, 'আচ্ছা আসি।'

'এসো। কি উপকার যে তুমি করলে ভায়া—'

বাড়িওলার বকবকানি শোনার জন্য আর দাঁড়ালাম না। লম্বা লম্বা পায়ে গলিটা পেরিয়ে শ্যামবাজারের ট্রাম ডিপোর কাছে এসে পড়লাম। একটা ল্যাম্প-পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে খামটা ছিঁড়ে চিঠি বার করলাম।

চিঠিটা সংক্ষিপ্ত, সম্বোধনহীন।

'আশা করেছিলাম, এর মধ্যে আপনি একদিন আসবেন। সর্বক্ষণ আপনার পথ চেয়ে থাকতাম। কেন যে এলেন না, বুঝতে পারছি না। সেদিন আমাদের কথা শুনে হয়ত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। সেই মনোভাবটা যদি কেটে গিয়ে থাকে দুঃখ করব না। আমার যা অদৃষ্ট তাতে মানুষের স্নেহ প্রীতি সহানুভূতির দাবি বড় একটা করি না। করাটা বোধ হয় অন্যায়।

'যাই হোক, হঠাৎ একটা বাড়ি পেয়ে আজই উঠে যাচ্ছি। জানি না সেদিনের ঘোর কেটে গেছে কি-না। যদি না কেটে থাকে আর ঘুরতে ঘুরতে যদি এদিকে এসেই পড়েন সেই প্রত্যাশায় বাড়িওলার কাছে এই চিঠিখানা রেখে গেলাম। সেই সঙ্গে নতুন বাড়ির ঠিকানা দিয়ে গেলাম।—নং রামকৃষ্ণ লেন। বাগবাজার। জানি না আপনার পক্ষে আসা সম্ভব হবে কি-না। সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে দাঁড়িয়েই এই চিঠিখানা লিখলাম।

'সেদিনের সহানুভূতির কণামাত্রও যদি অবশিষ্ট থাকে, আমাদের নতুন ঠিকানায় যাবেন। তাতে আপনার লাভ কতখানি বলতে পারব না। তবে আমার সাহস এবং পৃথিবীর অন্তহীন প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝবার মনোবল অনেকখানিই বাড়বে। ইতি বুলকি।'

চিঠিখানার প্রতিটি ছত্রের ফাঁকে ফাঁকে একটা স্ফুরিত ঠোঁট, অভিমানী মুখ ছায়াছবির মত ভেসে উঠছে।

বুলকি এবং আমার সম্পর্কের মধ্যে কোথাও লুকোচুরি নেই। সব দিকই স্পষ্ট সহজ এবং অনর্গল। তার অভিমানের নেপথ্যে ভিন্ ভাবের ছায়া পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর বিপরীত রীতিগুলির কাছে মার খেয়ে খেয়ে শূন্যতার মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। সেখানে আঁকড়াবার মত কিছুই ছিল না। অকস্মাৎ আমাকে পেয়ে প্রাণের সবটুকু আকুলতা দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল।

ঠিকানাটা লেখাই আছে। আর বাগবাজারও সুদূর উত্তর মেরু নয়, নিতান্তই নাগালের মধ্যে। হাঁটতে হাঁটতে চলেই গেলাম।

রামকৃষ্ণ লেন। গলিটা বাগবাজার স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে সোজা উত্তর দিকে গেছে। আঁকাবাঁকা সর্পিল পথের শেষ প্রান্তে একেবারে বাগবাজার খালের ধার ঘেঁষে বাড়িটা। খুঁজে বার করতে অনেকটা সময় লাগল।

বাড়িটা লম্বা ব্যারাকের মত। ছাদ নেই, মাথায় টিনের চাল। চুনসুরকিতে গাঁথা পাকা দেওয়াল, তবে প্ল্যাস্টার নেই। ইটগুলো তাই মনে হয় দাঁত বার করে রয়েছে।

সদর দরজায় দাঁড়িয়েই অনুমান করা যায়, ভেতরে বারো ভাড়াটের বাস। বস্তি ঠিক না, তার চাইতে ভালও নয়।

ডাকাডাকি করতে একটা কেশো বুড়ো বেরিয়ে এল। ঘড়ঘড়ে জড়িত স্বরে বলল, 'কাকে চাই?'

'বুলাকি দেবী, মানে ক'দিন আগে এক ঘর নতুন ভাড়াটে এসেছে না, তাদের কাউকে যদি ডেকে দ্যান—' আমি বললাম।

'অ—অ—নতুন ভাড়াটে—' বলতে বলতেই শ্লেষ্মার টান উঠল। বুকে হাত চেপে কাশতে কাশতে বসে পড়ল বুড়ো। অনেকক্ষণ পর খানিকটা সামলে উঠে নির্জীব গলায় বলল, 'নতুন ভাড়াটে! তা—'

'কী?'

'ওরা কিছু হয় নাকিন?'

সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম। ডেকে দিতে বলেছি, তার বদলে বুড়োটা জেরা শুরু করেছে। বিরক্ত মুখে বললাম, 'কেন?'

'দরকার আছে, তাই শুদোচ্ছি।' বুড়োকে কেমন যেন অনমনীয় মনে হল।

বুলাকিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী, সেটাই জিজ্ঞেস করছে বুড়ো। কী সম্পর্কই বা বলা যায়? মরিয়ার মত বলে ফেললাম, 'ওরা আমার আত্মীয়।'

'কেমন আত্মীয়?'

'তারও দরকার আছে নাকি?'

আমার গলায় তিক্ততা এবং রাগ মেশানো রয়েছে। তা যেন অগ্রাহ্যই করলো বুড়ো। বলল, 'হ্যাঁ।'

বুলাকিরা ভাল ঠিকানাই খুঁজে বার করেছে যা হোক। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।'

'তা হলে তো—'

'কী?'

'কথাটা কওয়া কি ঠিক হবে?'

বুড়োর চাপা দমবন্ধ গলায় এমন কিছু রয়েছে যাতে চকিত হয়ে উঠলাম। বললাম, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'দেখুন বাবা, আমার কইতে সাহস হচ্ছে না।' বলেই বাড়ির ভেতরে মুখ বাড়িয়ে ডাকতে লাগল, 'শ্যাম—শ্যাম—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যবয়সী কোলকুঁজো একটা লোক বেরিয়ে এল। বলল, 'ডাকছ কেন?'

বুড়ো বলল, 'কাল যে নতুন ভাড়াটেরা এয়েছে এই ভদ্দরলোক তেনাদের আত্মীয়। ওদের কি হয়েছে একে বল।'

লোকটা কেমন অসহায় বোধ করল। বুড়োর উদ্দেশে বলল, 'কেন, তুমিই বল না।'

'আমি বাপু সাহস পাচ্ছি না।'

আমার উৎকণ্ঠা এবং কৌতূহল শীর্ষবিন্দুতে পেঁছেছিল। চেঁচিয়েই উঠলাম প্রায়, 'অত ভয় পাচ্ছেন কেন, কী হয়েছে তাড়াতাড়ি বলুন।'

শ্যাম নামধারী লোকটা খানিকটা ইতস্তত করল। তারপর কাঁপা শিথিল

স্বরে বলল, 'আজ্ঞে কওয়াও যায় না, আবার না কইলেও নয়। ওই যে নতুন ভাড়াটেরা এসেছিল তাদের মা আজ দুপুরে গাড়ি চাপা পড়েছে। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও লাভ হয় নি। বিকেলে মারা গেছে। নতুন ভাড়াটেরা দু'জন মাত্তর মেইয়েছেলে আর ছোট মতন একটা ব্যাটাছেলে। মড়া নিয়ে সবাই শ্মশানে গেছে। আবিশ্যি এ-বাড়ির ক'জন ভাড়াটেও তাদের সঙ্গে গেছে।'

পায়ের তলায় রাস্তাটা দুলে উঠল। রুদ্ধ গলায় বললাম, 'কোন শ্মশানে গেছে ওরা ?'

'নিমতলায়।'

অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে শেষ পর্যন্ত কিভাবে যে শ্মশানে পৌঁছেছিলাম, বলতে পারব না।

তখন চিতাটা প্রায় নিবে এসেছে। বুলাকির মায়ের ছোট্ট শীর্ণ দেহের অবশিষ্ট আর কিছুই নেই।

সন্ধ্যা আর মণ্টু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদছিল। তাদের চোখ ফোলা ফোলা, আরক্ত। গালের ওপর নোনা জলের মোটা দাগ আঁকা রয়েছে।

একপাশে গালে একখানা হাত রেখে স্তব্ধ মূর্তির মত বসে ছিল বুলাকি। ভাবলেশহীন স্থির দৃষ্টি তার মায়ের অন্তিম মুহূর্ত ক'টির দিকে নিবদ্ধ। আশ্চর্য, সে কাঁদছে না। পরম শোকে একেবারে অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে। বুঝিবা কতখানি তার ক্ষতি হল, সেটাই ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছে না।

আমার ছাব্বিশ বছরের জীবনে একটি মৃত্যুই শুধু দেখেছি। আমার বাবার মৃত্যু। সেদিন মনে হয়েছিল পায়ের তলার আশ্রয় একেবারেই বিলীন হয়ে গেছে। কি এক অলৌকিক মন্ত্রে বাতাস সেদিন স্তব্ধ, আলোশূন্য জগতটা যেন 'নিবিড় তিমির নিশীথিনী।' প্রিয়জনের মৃত্যু যে কি ভয়ংকর, সেদিন আমিই শুধু অনুভব করেছিলাম। কিন্তু অন্যের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না আমার। চরম শোকের মুহূর্তে কী ভাবে কী কথায় সান্ত্বনা দিতে হয়, জানি না। বিব্রত মুখে অনেকক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বুলাকি যেন আমাকে দেখতেই পেল না। ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসা চিতার আগুনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

প্রথমটা কী করব ভেবে পেলাম না। ডাকব যে, গলায় স্বর ফুটছে না। আস্তে আস্তে নিজের অজান্তেই যেন ডান হাতটা তার মাথায় রাখলাম। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম হাতখানা ভয়ানক কাঁপছে আর সেই কাঁপুনির বেগ হাত থেকে দ্রুত গতিতে সমস্ত শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে।

বুলাকি এবার তাকাল। চোখদুটি উদ্‌ভ্রান্ত এবং রক্তিম। চিতার আগুনের দাহ এসে যেন লেগেছে সেখানে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। যেন আমাকে চিনতেই পারছে না।

অনেকখানি ঝুঁকে ফিস ফিস গলায় বললাম, 'আমি—আমি শুভেন্দু—'

বুলাকির মুখখানা এতক্ষণ ছিল ভাবলেশহীন, যেন নিরেখ কঠিন পাথরে

খোদাই। এবার চোখের কোণ দু'টি কুঁচকে যেতে লাগল। আবদ্ধ ঠোঁটদু'টিতে চিড় ধরল। নাকের দুই প্রান্ত থরথর করতে লাগল। রেখাহীন মসৃণ পাথরের তলদেশ থেকে ঢেউ উঠে এসে উপরিভাগে দোলা দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। অসহ্য এক কষ্টে আর উদ্গত কিসের এক অনুভূতিতে প্রাণপণে ঠোঁট কামড়ে ধরল বুলাকি। তার সমস্ত শরীর ঝড়ের আঘাতে নিদারুণ কাঁপতে লাগল।

ঝাপসা গলায় ডাকলাম, 'বুলাকি-বুলাকি—' ডাকটা বুঝি আমার অবচেতন থেকেই উঠে এল।

তার মাথার ওপর আমার হাতটা ছিল। দু-হাত বাড়িয়ে সেটা দেহের সমস্ত শক্তিতে আঁকড়ে ধরল বুলাকি। তারপর ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল। জমাট বাঁধা তুষার স্তূপ সামান্য একটু উত্তাপে এতক্ষণে গলতে শুরু করল যেন।

অনেকক্ষণ কাঁদল বুলাকি। আমি কিছু বললাম না। কেঁদে কেঁদে প্রাণের স্তব্ধ অনড় যন্ত্রণা যতখানি বার হয়ে যায় ততই ভাল।

একসময় ধরা-ধরা ভারী ভাঙা গলায় বুলাকি বলল, 'মা মরে গেল, আমাদের—আমাদের কী হবে!'

প্রায় যন্ত্রের মত সেই বহু-ব্যবহারে জীর্ণ পুরনো সান্ত্বনার কথাটি উচ্চারণ করলাম, 'মা তো চিরকাল কারো থাকে না বুলাকি। ভেবে আর কি করবে বল।'

আমার বয়সের তুলনায় কথাগুলো রীতিমত গুরুগম্ভীর। কিন্তু মৃত্যুর সান্ত্বনা হিসেবে এই সনাতন বাক্যটি ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যাই হোক, একটা ব্যাপারে আমি কিন্তু চকিতই হয়ে উঠলাম। আজ প্রথম বুলাকিকে নাম ধরে ডেকেছি, 'তুমি' বলেছি। আমার সচেতন মনের কয়েক স্তর নিচে বুঝিবা দুঃখী মেয়েটাকে 'তুমি' বলার সাধ বহুদিন আগে থেকেই ছিল। পরম শোকের মুহূর্তে অনায়াসেই অসঙ্কোচে তা বেরিয়ে এসেছে।

অনেক রাত্রে চিতা নিভল। গঙ্গায় স্নান সেরে বুলাকিরা তিন ভাইবোন এবং শ্মশানে আর যারা গিয়েছিল বাড়ি ফিরল। আমিও তাদের সঙ্গেই গেলাম।

বাড়ি এসে মৃত্যুর ব্যাপারটা শুনলাম। বুলাকিই বলল। সেটা যেমন মর্মান্তিক তেমন করুণ এবং আকস্মিক।

দিনকয়েক আগে বাসাবদল করে তারা এখানে এসেছে। এ বাড়িটা বুলাকির মায়ের একেবারেই পছন্দ হয় নি। খালি বলত, 'এ আমাকে কোথায় এনে তুললি, পুরনো বাড়িতে আমায় নিয়ে চল। এখানে আমি থাকব না, থাকব না।' পাগলের খেয়াল, ছুটে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইত। বুলাকিরা ধরে রাখত। বোঝাত, আগের বাড়িতে আর যাওয়া সম্ভব নয়। বুলাকির মা বুঝতে চাইত না। শুধু চিৎকার করত, 'না-না-না—' বেশি বাড়াবাড়ি করলে ধমকাত বুলাকি।

কেন যে শ্যামবাজারের সেই বাড়িটার জন্য মায়ের প্রাণে এত ছটফটানি, কে বলবে। হয়ত দীর্ঘকাল সেখানে থাকার কল্যাণে মায়া পড়ে গিয়েছিল। কিংবা অন্য কিছু। যে মানুষের মাথার সুস্থতা নেই তার মনের গতিবিধি কোন জটিল দুর্বোধ পথে তা বুঝি ব্যাখ্যা করা যায় না।

প্রায়ই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইত বুলকির মা। এ-বাড়িতে এসে এই এক নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। অতএব কাউকে না কাউকে পাহারায় থাকতেই হত। বুলকি যতক্ষণ বাড়িতে থাকত সে-ই আগলে রাখত। নতুবা সন্ধ্যা আর কদাচিৎ মণ্টু। মণ্টুর বেলায় কদাচিৎ, কেন না সারাদিনের মধ্যে কতটুকু সময়ই বা সে বাড়ি থাকে! সকাল হলেই পুরনো পাড়ায় ছোটে। সমস্ত দিন শুধু আড্ডা। বাড়ির সঙ্গে শুধু খাওয়া আর ঘুমের সম্পর্ক।

আজ দুপুরে বাড়িতে কেউ ছিল না। মণ্টু যথারীতি পুরনো পাড়ায়। বুলকি গিয়েছিল কিছু টাকার খোঁজে। মাকে আগলে রাখার দায়িত্ব ছিল সন্ধ্যার ওপর। সারাটা সকাল আগলেই রেখেছিল সন্ধ্যা। দুপুরে খাইয়ে দাইয়ে মাকে ঘুম পাড়িয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গিয়েছিল। (কোথায় গিয়েছিল বুলকি জানে না।) ফিরেছিল বিকেলে।

ইতিমধ্যে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল বুলকির মা। হাঁটতে হাঁটতে বাগবাজারের খালের দিকে গিয়ে উঠেছিল। পুল পেরিয়ে ওপারে কাশীপুর। মিলিটারি ছাউনি রয়েছে সেখানে। জীপ আর ট্রাক অবিরাম ছুটছে। একটা ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল সে।

কাঁদতে কাঁদতে অস্থির গলায় বুলকি বলল, 'এ-বাড়িতে এসেই মাকে খেলাম। এখানে আর থাকব না। না-না—' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল সে।

তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে আবছা স্বরে বললাম, 'বেশ তো, থেকো না। মনকে এখন শান্ত কর। পরে যা হয় করা যাবে।'

শ্মশান থেকে যখন ফিরেছিলাম তখন রাত প্রায় বারোটা। রাতের অবশিষ্ট অংশটুকু বুলকির মায়ের কথায় কাটিয়ে দিয়ে ভোরবেলা ভবানীপুর ফিরে এলাম। আসার সময় সঙ্গে যে টাকাগুলো ছিল বুলকিকে দিয়ে এসেছি। বলেছি, 'দু-চার দিনের ভেতর আবার আসব।'

'আসবেন তো?' জীবনের সমস্ত আকুলতা দিয়ে বলেছিল বুলকি।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আসব। নিশ্চয়ই আসব। তবে আমি কি জাতের চাকরি করি সবই তোমাকে বলেছি। যদি দেখ আসছি না, আমার ঠিকানা তো তোমার কাছে আছেই, সিধে চলে যাবে। কোনরকম সঙ্কোচ-টঙ্কোচ করবে না। কেমন?'

'আচ্ছা।'

কাল রাত্রে শ্মশান থেকে ফেরার সময় গঙ্গায় স্নান করি নি। আশৈশব আমার শ্লেষ্মার ধাত। অত রাত্রে স্নান করতে সাহস হয় নি।

ফার্স্ট ট্রামে ভবানীপুর ফিরেছি। তখনো ঠিকমত সকাল হয় নি। ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো অন্ধকার আকাশময় ছড়িয়ে রয়েছে। বাগানের পাখিরা তখনো বাসা ছেড়ে বেরোয় নি। মেয়ে-পাখিরা পুরুষ-পাখিদের সঙ্গে রাতের শেষ খুনসুটিটুকু সেরে নিচ্ছে। অবশ্য হাঁসেদের প্যাঁকপ্যাঁকানি এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এই ক'মাসেই জেনে গেছি খুব ভোরে ওঠা কনকের অভ্যাস। উঠেই তার প্রথম কাজটি হল, খাঁচা থেকে হাঁসেদের মুক্তি দেওয়া। বর্ষা কবেই ফেরারী হয়েছে। গোয়েন্দা লাগালেও আকাশের কোথাও এক টুকরো মেঘের খোঁজ পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখনও পুকুরের ধারে ধারে, জলঘাসের ঝাড়ের মধ্য থেকে ব্যাঙেদের কনসার্ট শোনা যায়।

নিজের বিবরে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে সারারাত জেগে থাকার সামান্য ক্ষতি-পূরণ করে নিলাম। তারপর অঘ্রাণের সূর্য পূবের আকাশ বেয়ে অনেকখানি উঠে এলে স্নান সেরে নতুন বাড়িতে ডাইনিং রুমে চলে এলাম।

ডাইনিং রুমে মিসেস মিত্র একাই ছিলেন। ভয়ে ভয়ে নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে তাঁর মুখোমুখি গিয়ে বসলাম। কাল বিকেলে বেরিয়েছি, আজ ফিরেছি। এই সুদীর্ঘ সময় আমি অনুপস্থিত। এর মধ্যে মিসেস মিত্র যদি ডাকতে পাঠিয়ে থাকেন! শেষ পর্যন্ত ভাবতে সাহস হল না।

প্রায় নতচোখেই বসে ছিলাম। তবে মাঝে মাঝে আড়ে আড়ে মিসেস মিত্রের মুখ-চোখ-নাক লক্ষ করতে লাগলাম। কিন্তু না, ভীতিজনক কিছুই সেখানে খুঁজে পাওয়া গেল না। মুখটা একেবারেই ভাবলেশশূন্য, কোথাও একটা কুঞ্চন অথবা বিরক্তি এবং রাগের চিহ্নমাত্র নেই।

ইতিমধ্যে বয় খাবার দিয়ে গিয়েছিল। নিঃশব্দে খেতে লাগলাম।

মিসেস মিত্র হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কাল বিকেলে তোমার ওখানে লোক পাঠিয়েছিলাম—'

আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। অর্ধ-উচ্চারিত কি একটা শব্দ গলার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল যেন; ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মিসেস মিত্র আবার বলে উঠলেন, 'লোকটা ফিরে এসে বলল, তোমার ঘরে তালা লাগানো।'

কোনরকমে বলতে পারলাম, 'আজ্ঞে—'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিসেস মিত্র বললেন, 'অবশ্য আমি খবর পেয়ে-ছিলাম, নীনী তোমাকে নাকি জোর করে নিয়ে বেরিয়েছে। কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?'

গলার স্বরে মনোভাবটা বুঝতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু না, রুষ্ট বা বিরক্ত

—কী যে তিনি হয়েছেন কিছুই বোঝা গেল না। কাঁপা গলায় বললাম, 'একটা ক্লাবে—'

'আচ্ছা!' মিসেস মিত্র আমার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে এবার বললেন, 'নীনীর সঙ্গে তোমার তা হলে বেশ খাতির-টাতির হয়ে গেছে, না কি বল? কিন্তু—'

'আজ্ঞে?'

'একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না।'

কিছু বললাম না। শুধু জিজ্ঞাসু সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

মিসেস মিত্র বলতে লাগলেন, 'তোমাকে তো লুকিয়ে লুকিয়ে নীনীর মুভমেণ্টের ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম। তবে এমন ঘনিষ্ঠতা হল কেমন করে যে তোমাকে নিয়ে নীনী ক্লাবে ঘোরাফেরা করছে? তা হলে কি তুমি আমার কাছে লুকিয়েছ?'

উত্তর দিলাম না। হৃদ্‌পিণ্ড সেই যে থমকে গিয়েছিল আর বুঝি সেটা সচল হবে না। মুখের ভিতর লালাসিক্ত চর্বিত খাদ্য অনড় হয়ে আছে। কিছুতেই গলার সীমানা পার করে তাদের নামিয়ে দিতে পারছি না। অবরুদ্ধ অব্যক্ত গোঙানির মত বুকের মধ্যে কি যেন একটা পাক খেতে লাগল।

মিসেস মিত্র ধমকে উঠলেন, 'কি, চুপ করে রইলে যে! নীনীর পেছনে ঘুরতে গিয়ে ওর হাতে ধরা পড়েছ, না নিজেই ধরা দিয়েছ?'

মিসেস মিত্র যখন বুঝতেই পেরেছেন আর লুকোচুরি চালিয়ে কী লাভ! মরিয়ার মত বলে ফেললাম, 'আজ্ঞে নীনী দেবী আমাকে ধরে ফেলেছিলেন। হোটেলের আঠার নম্বর কেবিনে একদিন বসে ছিলাম, উনি পাশের কেবিন থেকে ডাকিয়ে পাঠালেন।'

'তারপর?'

তারপর সেই বিশাল ম্যানসনে রজতের ফ্ল্যাটে জুয়ার আড্ডা থেকে শুরু করে সবই বলে গেলাম।

'এতদিন তা হলে এ-সব কথা বল নি কেন? তোমাকে যে মাসে মাসে মাইনে দিচ্ছি সে কিসের জন্যে?' মিসেস মিত্রের উত্তেজিত গলা কঠিন হয়ে উঠল।

আমি নিশ্চুপ। ঘাড়টা এত নিচু হয়ে গেল যে টেবিলের সঙ্গেই বুঝি মিশে যাবে।

আশ্চর্য! এরপর মিসেস মিত্র যে সুরে কথা বললেন তাতে বিস্মিতই হলাম। একটু আগের উত্তেজনা শান্ত হয়ে গেছে। সহজ স্বাভাবিক গলায় খানিকটা ব্যঙ্গ মিশিয়ে তিনি বললেন, 'আই সী, আই সী, ওর ফাঁদে তা হলে তুমিও পড়েছ!'

এবারও আমি নিরুত্তর।

মিসেস মিত্র কি একটু ভেবে বললেন, 'যাক, তা কাল তো তোমাকে ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিল নীনী, সেখানে কি হল না হল, সে সম্বন্ধে তো কিছু বললে না!'

এতক্ষণে মুখ খুললাম, 'আজ্ঞে, ক্লাবের পুলে নীনীদেবী সাঁতার কাটলেন। আর—'

'আর কী?'

'মিস্টার তলোয়ারকর নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কোথায় যেন চলে গেলেন।'

'তলোয়ারকর!' মিসেস মিত্রের চোখদুটি শাণিত হয়ে উঠল। আমার ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে তিনি বললেন, 'কোথায় গেল তুমি কিছু জান?'

'আজ্ঞে না। ক্লাব থেকে আমরা তিনজনেই মিস্টার তলোয়ারকরের গাড়িতে উঠেছিলাম। আমাকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে নামিয়ে দিয়ে ওঁরা চলে গেলেন।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর মিসেস মিত্রই স্তব্ধতা ভাঙলেন। স্বরটাকে যতখানি সম্ভব খাদে নামিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, 'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে শুভেন্দু। কিন্তু ভেরি কেয়ারফুল।'

একটু যেন চকিতই হয়ে উঠলাম। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কী কাজ?'

'কাজটা কঠিন। তুমি তো ছবি তুলতে শিখেছ। এখন থেকে সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাটা রাখবে। যদি কখনও ওদের ইন্‌টিমেট্ অবস্থায় দেখ একটা ফোটো তুলে ফেলবে। মনে রেখ, ওরা যেন টের না পায়। খুব সাবধান। আর আজ থেকে যথারীতি সন্ধ্যেবেলা নীনীর মুভমেণ্টের খবর আনতে বেরুবে।'

ছবি তোলার কাজটা যেমন বিপজ্জনক তেমনই দুরূহ। একটা ঢোক গিলে বললাম, 'আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা—'

'কী?'

'আমার ছেলে জয়ন্তর অফিস চেন?'

'আজ্ঞে না।'

'—নং ক্লাইভ স্ট্রীট। জি. পি. ও.-র কাছে হলুদ রঙের পাঁচতলা বাড়ি। ওর অফিস দোতলায়; নাম প্যারাগন বিল্ডার্স।'

পরবর্তী নির্দেশের জন্য নিরুত্তরে তাকিয়ে রইলাম।

মিসেস মিত্র বললেন, 'তুমি তো জান, দুপুর একটায় লাঞ্চ করতে বাড়ি আসে জয়ন্ত। সেই সময়টা ও যখন থাকবে না তুমি ওর অফিসে যাবে। দীপালি মুখার্জি বলে একটা টাইপিস্ট আছে। ট্যাক্টফুলি তার ঠিকানাটা যোগাড় করে নিয়ে আসবে। একদিনে না পার দু-দিনে, দু-দিনে না হয় চারদিনে। যেমন করে হোক, ঠিকানাটা আনবেই। দীপালি বা জয়ন্ত যেন বুঝতে না পারে।'

কয়েকমাস আগে নিছক বেঁচে থাকার একটা উপায়ের খোঁজে কলকাতায় এসেছিলাম। কিন্তু কে জানত, ধীরে ধীরে একটা জটিল রোমাঞ্চকর কাহিনীর আবর্তে এসে পড়ব! রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'আচ্ছা।'

মিসেস মিত্র আবার বললেন, 'পার্ক স্ট্রীটে শ্রীবাস্তবের দোকানটা মনে

আছে তো ?'

এ বাড়িতে চাকরি নেবার দিনকতক পরেই মিসেস মিত্র উত্তেজক পানীয়ের সেই দোকানটায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেটা ভুলে যাবার সঙ্গত কোন হেতু নেই। বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে।'

'আজ বুধবার। আসছে মঙ্গলবার পার্টি দিচ্ছি। শ্রীবাস্তবের কাছে অর্ডারের এই লিস্টটা আজই দিয়ে আসবে। মঙ্গলবার সকালেই যেন লিস্ট মিলিয়ে সব কিছু বাড়ি পেঁৗছে দেয়।'

সামনেই একটা ব্যাগ পড়ে ছিল। সেটা খুলে ভেতর থেকে ভাঁজ-করা একখানা কাগজ আমার হাতে দিলেন মিসেস মিত্র। দিতে দিতে বললেন, 'রাত্রে খাবারের লিস্টটা করে রাখব। কাল হোটেলে গিয়ে দিয়ে আসবে।'

আমি মাথা নাড়লাম। মনে পড়ল, যে মাসে এখানে এসেছি তার পরের মাসেই পার্টি দেবার কথা ছিল মিসেস মিত্রের। এতদিনে তার তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

বুধ থেকে মঙ্গল। অর্থাৎ মোট সাতটা দিন। এর মধ্যে অলৌকিক আধিদৈবিক কিছু একটা যেন আমার ওপর ভর করল। বুধবার মিসেস মিত্র দু'টি কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। শুক্রবারের মধ্যে জয়ন্তর টাইপিস্ট দীপালি মুখার্জির ঠিকানা যোগাড় করে ফেললাম। আর শনিবার রাত্রে আন্তর্জাতিক সেই ক্লাবে তলোয়ারকরের দুই হাতের নিবিড় বেষ্টনীর মধ্যে নীনীর আবিষ্ট আত্মসমর্পিত অবস্থার একখানা ছবি তুলে ফেললাম। সেই ছবিটা স্টুডিওর ডার্করুমে নেগেটিভ থেকে ফুটে উঠে এন্‌লার্জড হয়ে এখন মিসেস মিত্রের আলমারিতে গিয়ে উঠেছে।

উনিশ

শুক্রবার দীপালি মুখার্জির ঠিকানা যোগাড় করে এনেছিলাম। রবিবার খুব ভোরে ঘুমটা তখন গভীরও নয় আবার তরলও নয়, গাঢ়ত্ব এবং তারল্যের মাঝামাঝি একটা জায়গায়, ঠিক সেই সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল।

মাসখানেক ধরেই শেষরাতের দিকে শীত পড়ছে। পায়ের কাছে অতএব একটা পাতলা কম্বল মজুদ রাখি। মাঝরাত পর্যন্ত প্রয়োজন হয় না। তারপরেই অঘ্রাণের রাত্রিটা তবলার দ্রুত লহরার মত যতই ভোরের দিকে এগুতে থাকে ঘুমের ঘোরে হাত বাড়িয়ে কম্বলটা টেনে এনে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিই। যতক্ষণ না জানালার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ে কম্বলের সুখকর উষ্ণ বেষ্টনীর নিচে চোখ বুজে থাকি।

কড়ার আওয়াজটা এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। ভোরের উপভোগ্য ঘুমের সুখটুকু মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল। প্রথমটা মনে হয়েছিল সুরপাতি। পরক্ষণেই ডাকটা শুনতে পেলাম, 'শুভেন্দু—'

গলার স্বরেই চেনা গেল। মিসেস মিত্র। কম্বলটা ছুঁড়ে তড়াক করে

লাফিয়ে উঠে পড়লাম। মিসেস মিত্র যে কখনও এ বাড়িতে আসেন না, প্রয়োজনে আমাকেই ডেকে পাঠান, এই বিস্ময়ে অভিভূত হবার অবকাশটুকুও পাওয়া গেল না।

দরজা খুলতেই মিসেস মিত্র ভিতরে ঢুকলেন। বললেন, 'পাঁচ মিনিটের ভেতরে তৈরি হয়ে নাও। এক্ষুনি আমরা বেরুব।'

সেদিন এসেছিল নীনী। আজ এলেন মিসেস মিত্র। এত দিনের মধ্যে কখনও তাঁদের এখানে আসতে দেখিনি। অবাক হবার মত সময় একটু আগে আমার ছিল না। খানিকটা পর বাথরুমে ঢুকে মুখ ধুয়ে জামাকাপড় বদলাতে বদলাতে সেই বিস্ময়টাই একটু একটু করে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল যেন। সেদিন নীনী আমাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে তার জীবনের একটা অচেনা দিকের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। মিসেস মিত্র আমাকে কোন্ অনাবিষ্কৃত দিগন্তে নিয়ে যেতে চান?

পাঁচ মিনিটও লাগল না। তার আগেই তৈরি হয়ে গেলাম। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে মিসেস মিত্রের সঙ্গে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ির কাছে যেই এসেছি ঠিক সেই সময় ব্যাপারটা ঘটে গেল। উত্তর প্রান্তের শেষ ঘরখানা থেকে কনক বাইরে বেরিয়ে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে মিসেস মিত্রের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার।

কনক দাঁড়িয়ে পড়েছে। মিসেস মিত্রও থমকে গেলেন। দু'জনের চারটি নিষ্পলক চোখ পরস্পরের দিকে নিবদ্ধ। লক্ষ করলাম, কনকের চোখে নিষ্ঠুর এক ঘৃণা ফুটে বেরিয়েছে। আর মিসেস মিত্রের দৃষ্টিতে যা আছে তা হল আক্রোশ এবং প্রতিহিংসা। যুদ্ধোদ্যত দুটো হিংস্র পশুর মত তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে যেন।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে এইরকম একটা অপ্রীতিকর পারিবারিক দৃশ্যের সাক্ষী হতে হবে, কে ভেবেছিল। ভেতরে ভেতরে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ স্থির হয়ে থাকার পর কনকই প্রথম নড়ে উঠল। পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'পরশুদিন মেসোমশায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।'

'পরশু কেন, প্রায়ই তো তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাও।' দাঁতে দাঁত চাপলেন মিসেস মিত্র।

'সে তো যাই-ই, তবে পরশু দিনের যাওয়াটা একটু আলাদা।'

'তার মানে?'

'মানে আর কি, মেসোমশায় একটা খবর দিলেন সেদিন।'

'কী?' গলার স্বরটা এবার শিথিল হয়ে শোনাল মিসেস মিত্রের।

কনক বলল, 'ডিসেম্বরেই উনি রিলিজড্ হচ্ছেন।'

'তাতে, তাতে কী হয়েছে!' মিসেস মিত্র চেঁচিয়ে উঠতে চাইলেন। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে অনুভব করলাম, মুখচোখ কেমন যেন সন্ত্রস্ত দেখাল তাঁর।

'না, কি আর হবে। তবে—' বাক্যের শেষাংশটুকু পূরণ না করেই থেমে গেল কনক। মনে হল, এই থেমে যাওয়াটা ইচ্ছাকৃত। মিসেস মিত্রকে নিয়ে নিদারুণ এক খেলায় মেতে উঠেছে সে।

'তবে কী?' এবার সত্যি সত্যিই চিৎকার করে উঠলেন মিসেস মিত্র।

তাঁর চোখে চোখ রেখে কনক বিচিত্র একটু হাসল। তারপর কিছুটা ঝুঁকে স্বরটাকে গভীরে নামিয়ে ফিস ফিস করে উঠল, 'খুব—খুব সাবধান।'

'সাবধান! সাবধান কেন!'

আমার চোখ দুটো যুগপৎ কনক এবং মিসেস মিত্রের মুখের উপর ক্রমাগত নাচানাচি করছিল। লক্ষ করলাম, মিসেস মিত্রের মুখের সবগুলি পেশী এবং রেখা আর গলার স্বর, সব একসঙ্গে কেঁপে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, হেমন্তবাবু ফিরে আসবেন বলে মিসেস মিত্রও একদিন নীনীকে সাবধান হতে বলেছিলেন।

'কেন, আপনি জানেন না!' কনক যেন ব্যঙ্গই করে উঠল।

মিসেস মিত্র এবার আর উত্তর দিলেন না। রুদ্ধ আক্রোশে ভ্রূকুটি করে রইলেন।

কি ভেবে কনক বলল, 'মেসোমশায়ের টেম্পারেমেণ্ট কেমন, তা আপনি ভাল করেই জানেন।'

মিসেস মিত্র হঠাৎ ফেটে পড়লেন, 'না, তোমার কাছে জানতে হবে!'

কনক কিন্তু বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হল না। শান্ত সকৌতুক সুরে শুধু বলল, 'জানেন যে তা তো আগেই বললাম। আর সেই জন্যেই বলছি—'

'কী?'

'একটু সামলে চলবেন। নইলে বিপদ আছে।'

দেখলাম নিষ্ঠুর ডাকিনীমন্ত্রে মিসেস মিত্রের উদ্যত ফণা ঢলে পড়েছে। চোখে একটু আগের সেই দপদপানি আর নেই। ক্লান্ত স্বরে টেনে টেনে তিনি বললেন, 'সেই বিপদটার জন্যে তুমিই দায়ী। আমার নামে রোজ রোজ লাগিয়ে তাঁর মন বিষাক্ত করে দিয়েছ।'

কনকের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। সুঠাম শ্যাম গ্রীবা কেমন যেন পাথুরে। আর টানা চোখদুটি ঝলকাচ্ছে। চাপা রুষ্ট স্বরে সে বলল, 'একটা বর্ণও আপনার সম্বন্ধে মিথ্যে বলেছি? আপনি যা করে বেড়ান শুধু সেটুকু মেসোমশায়কে জানিয়েছি। তা-ও পুরোপুরি নয়। সবটা জানতে পারলে ঘেন্নায় লজ্জায় উনি আত্মহত্যা করতেন।'

বিড় বিড় করে আধফোটা গলায় মিসেস মিত্র বললেন, 'একটা ডার্টি স্পাই!'

আমি চকিত হয়ে উঠলাম। নীনীর গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য মিসেস মিত্র আমাকে গুপ্তচর রেখেছেন। কনকও কি তা-ই? মিসেস মিত্রের চলাফেরা ওঠা-বসার সমস্ত খবর মিস্টার মিত্র কনকের কাছ থেকেই পেয়ে থাকেন?

মিসেস মিত্র আর দাঁড়ালেন না। আমার দিকে ফিরে বললেন, 'চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বারান্দা থেকে দু'জনে উঠোনে নেমে এলাম। পেছন থেকে কনক বলে উঠল, 'আমার কথাটা একটু মনে রাখবেন।' শ্লেষে তার গলাটা নির্মম শোনাল।

মিসেস মিত্র উত্তর দিলেন না। মুখের পেশীগুলো কঠিন হয়ে উঠল তাঁর। আমার উদ্দেশে বললেন, 'তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

দিনকয়েক আগে নীনী আমাকে যেখান দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই সংক্ষিপ্ত পথেই মিসেস মিত্রের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। সোফার ছিল না। মিসেস মিত্র উঠে স্টীয়ারিং ধরলেন, আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। মুহূর্তে স্তব্ধ গাড়ির হৃদপিণ্ড সচল হয়ে উঠল। তারপর ট্রাম রাস্তায় বেরিয়ে এসে গাড়িটা উত্তর দিকে ছুটল।

আমাদের গন্তব্য কোথায়, জানি না। আড় চোখের চোরা দৃষ্টি একবার মিসেস মিত্রের মুখে হানলাম। সে মুখ শক্ত, নিরেখ এবং ভাবলেশবর্জিত। বাইরের স্তরে কোন ছায়া না থাকলেও যেন অনুভব করলাম ভেতর দিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত কি একটা ঘনিয়ে আছে তাঁর। হয়ত একটু আগে কনকের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম এবং দৃষ্টিটাকে ফিরিয়ে এনে জানালার বাইরে ছুঁড়ে দিলাম।

অনেকক্ষণ পর গাড়িটা চৌরঙ্গী পেরিয়ে যখন সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউতে এসে পড়েছে সেই সময় মিসেস মিত্র হঠাৎ ডেকে উঠলেন, 'শুভেন্দু—'

জানালার বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'আজ্ঞে—'

'দীপালি মুখার্জির ঠিকানা এনেছ, তা হলে সে তো তোমাকে চেনে।'

লক্ষ করলাম, খানিকটা আগের সেই ঘটনার কোন ছাপই নেই মিসেস মিত্রের কণ্ঠস্বরে। একান্তই সহজ, স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক তিনি। বললাম, 'আজ্ঞে না।'

'চেনে না বলছ। তবে ঠিকানা আনলে কেমন করে?'

'আজ্ঞে অফিসের একটা ক্লার্ককে কিছু খাইয়ে ঠিকানাটা যোগাড় করেছি।'

'আই সী, আই সী—' সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে চকিত একটা দৃষ্টিক্ষেপ করলেন মিসেস মিত্র। মৃদু হেসে সস্নেহে বললেন, 'তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণাটাই একেবারে বদলে গেল দেখছি। বেশ এফিসিয়েণ্ট হয়ে উঠেছ আজকাল। এবার থেকে নতুন করে তোমার অ্যাসেসমেণ্ট করতে হবে।'

আমি চুপ করে রইলাম।

মিসেস মিত্র আবার বললেন, 'তা হলে তোমাকে সেফলিই নিয়ে যাওয়া যায়। চেনাশোনা থাকলে অবশ্য অসুবিধে হত। তোমাকে দূরে নামিয়ে দিয়ে আমি একলাই ওদের বাড়ি যেতাম। আমি চাইনা, তোমাকে দিয়ে যাদের খবর আমি যোগাড় করি তারা তোমাকে চিনুক।'

আমি যেন শেষ কথাগুলো আর শুনতে পেলাম না। রুদ্ধ কাঁপা গলায়

বললাম, 'আমরা কি দীপালি মুখার্জিদের বাড়ি যাচ্ছি ?'

'হ্যাঁ।'

আমার যেন খেয়াল রইল না নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজে মিসেস মিত্রের প্রতিটি নির্দেশ পালন করাই আমার চাকরির প্রধান শর্ত। কোন সংশয়, প্রতিবাদ বা জিজ্ঞাসার বাষ্পমাত্র যেন মনের কোথাও না থাকে, সেই চুক্তিতেই আমি আবদ্ধ আছি। তবু আত্মবিস্মৃতের মত বলে উঠলাম, 'কেন ?'

মিসেস মিত্রের কাছ থেকে উত্তরের বদলে ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি অথবা ধমকই প্রত্যাশিত ছিল। তার বদলে শান্ত স্বরে তিনি বললেন, 'একটু অপেক্ষা কর, সেখানে পৌঁছলেই বুঝতে পারবে।'

আমি আর প্রশ্ন করলাম না।

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা থেকে উত্তরে আর কিছুটা এগিয়ে শহর যেন থমকে গেছে। তারপর পর পর দুটো ওভার ব্রিজ পেরিয়ে টালা ট্যাঙ্ক এবং মিলিটারি ব্যারাক ডাইনে রেখে বি. টি. রোড। পলক ফেলতে ফেলতে সিঁথির কাছাকাছি এসে পড়লাম। মিসেস মিত্র বেশ জোরে চালাচ্ছেন। স্পীডোমিটারের কাঁটায় প্রায় চল্লিশ মাইলের সংকেত।

শ্যামবাজারের উত্তর প্রান্তে শহরটার ইতি হয়ে গিয়েছিল। অনেকখানি এগিয়ে এই সিঁথির কাছে পুনশ্চর মত কলকাতার খানিকটা রেশ টানা। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খানকতক বাড়ি এদিক সেদিক ছড়িয়ে রয়েছে। উনিশ শ পঁয়তাল্লিশের শহরতলী। বাড়ি আর ক'খানা! বেশির ভাগই ফাঁকা মাঠ অথবা জঙ্গল। পানা পুকুর আর চৌহদ্দি-ঘেরা বাগানও কিছু কিছু চোখে পড়ল।

কানায় কানায় ভরা শহরের সীমানা উপচে মানুষ তখন সবেমাত্র বাইরের দিকে বেরুতে শুরু করেছে। সিঁথির শান্ত নিরিবিলি পাড়ায় দীপালিদের বাড়িটা খুঁজে বার করতে খুব বেশিক্ষণ লাগল না।

কনকের সঙ্গে মিসেস মিত্রের সংঘাতে খানিকটা সময় নষ্ট হয়েছে। তবু বেশ সকালেই আমরা সিঁথি পৌঁছেছি। সবেমাত্র রোদ উঠেছে। পুবের গাছপালার মাথায় সোনালি ঢল নেমে আসতে শুরু করেছে।

হলদে রঙের একতলা ছোট বাড়ি। পাঁচীল দিয়ে ঘেরা, তবে খুব পুরনো নয়। মনে হয় যুদ্ধের আগেই তৈরি হয়েছিল। সদর দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। মিসেস মিত্র বললেন, 'কেউ এখনও ওঠেনি, মনে হচ্ছে।'

উৎকর্ণ হলাম। কিন্তু না, বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ। ভেতর থেকে কোন শব্দই আসছে না।

মিসেস মিত্র বললেন, 'ডাক।'

'দীপালি দেবী' এই নামে ডাকতে পারতাম। কিন্তু অচেনা অদেখা একটি তরুণীকে এভাবে ডাকতে কেমন যেন সংকোচ হল। অগত্যা কড়া ধরে নাড়লাম।

একটু পরে দরজা খুলে চৌকাঠের ওপারে যে দাঁড়াল আগে না দেখলেও নির্ভুল বলতে পারি সে দীপালি। বয়েস কত আর, কুড়ি একুশের মধ্যেই। বেশ লম্বা। রঙখানি ফর্সা। নাক-মুখ ধারাল। দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির দেহে লাবণ্যের চাইতে বুদ্ধির দীপ্তিই যেন বেশি। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে। তার রেশটা যেন এখনও কাটে নি। মুখেচোখে, এলোমেলো শিথিল শাড়ি আর ভাঙা খোঁপায় স্খলিত একটা আলস্য এখনও যেন জড়ানো।

বিস্মিত জিজ্ঞাসায় মেয়েটির ভ্রূ দুটি কিছুক্ষণ টান টান হয়ে রইল। তারপর অবাক গলায় বলল, 'আপনারা ?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই মিসেস মিত্র বলে উঠলেন, 'আমাদের কথা পরে শুনো। তোমার নামই কি দীপালি ?'

চোখের দৃষ্টি এবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল মেয়েটির। দ্বিধান্বিত সংশয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ।'

মিসেস মিত্র বললেন, 'তোমার সঙ্গে ক'টা কথা ছিল মা।'

'বেশ তো, ভেতরে আসুন।'

'ভেতরে!' একমুহূর্ত ইতস্তত করলেন মিসেস মিত্র। তারপর বললেন, 'ভেতরে আর কী করতে যাব! গেলেই দেরি হয়ে যাবে। তার চাইতে—' সামনের দিকে খানিকটা দূরে একখানা মাঠ। দু-তিনটে অন্ত্যজ বুনো গাছ সেখানে ছাতা ধরা আছে। সেদিকটা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'চল ওখানে গিয়ে বসি। বেশিক্ষণ তোমাকে আটকাব না। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দেব।'

কি একটু ভেবে দীপালি বলল, 'বেশ চলুন।'

আমরা তিনজনে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলাম।

দীপালি উন্মুখ হল। 'বলুন—'

সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বললেন না মিসেস মিত্র। দূরের অস্বাভাবিক লম্বা একটা নারকেল গাছের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। সম্ভবত যে কথাগুলি বলবেন মনে মনে তার মহড়া দিয়ে নিলেন। তারপর একসময় শুরু করলেন, 'আচ্ছা দীপালি, এ পাড়ায় তোমরা কতদিন আছ ?'

'বছর পাঁচেক।'

'পাঁচ বছর, তা হলে তো যুদ্ধের সময় এখানেই ছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের দেশ কোথায় ?'

'হাওড়া জেলায়, গ্রামের নাম নাজীপুর।'

'তোমরা ক' ভাইবোন ?'

'চার। তিন বোন, এক ভাই।'

'তুমিই বড় ?'

'হ্যাঁ।'

'মা-বাবা আছেন ?'

'আছেন।'

পাশে বসে দীপালির মুখের উপর দৃষ্টি স্থির করে রেখেছিলাম। লক্ষ্য করলাম তার চোখদুটি আশ্চর্য শাণিত। প্রায় দপ্দপ্ই যেন করছে। দেখা যায় না তবু বুঝতে পারছি তার অদৃশ্য গভীরে অদ্ভুত এক কাঠিন্য ক্রমশ পাথরের মত অটুট হয়ে উঠছে। সুশ্রী মুখ কেমন যেন শক্ত। আর বুকে চেপে চেপে খুব আস্তে নিঃশ্বাস ফেলছে সে।

মিসেস মিত্র আবার বললেন, 'কতদূর পড়াশোনা করেছ?'

'আই. এ. পর্যন্ত। দু-বছরের কোর্স কম্প্লিট করেছিলাম। ফাইনাল পরীক্ষাটা দেওয়া হয়নি।'

'কেন?'

'বাবার হার্টের অসুখ ছিল। হঠাৎ তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন, তাই। সে থাক, দেখুন—'

দীপালির গলায় এমন কিছু ছিল যাতে চকিত হয়ে উঠলেন মিসেস মিত্র। ঈষৎ স্খলিত সুরে বলে উঠলেন, 'কি, আমায় কিছু বলবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী?'

দূরভেদী দপদপে চোখে তাকিয়ে ছিল দীপালি। কিছুটা ঝুঁকে জড়তা-মুক্ত স্পষ্ট গলায় বলে উঠল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি এত ভণিতা করছেন কেন?'

'ভণিতা!' মুহূর্তের জন্য মিসেস মিত্রের মুখের পেশিগুলো কেমন যেন শিথিল দেখাল। আড়ষ্ট বিব্রত স্বরে তিনি বললেন, 'তার মানে! কী বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি—' সেই অন্তর্যামী তীক্ষ্ম দৃষ্টি এখনও সরায় নি দীপালি। অবিচলিত ঋজু গলায় সে বলতে লাগল, 'ভণিতা নয় তো কী? সকালবেলা ঘুম থেকে তুলে মামুলি বংশ-পরিচয় নিতে এসেছেন, এ-কথা বিশ্বাস করবার মত এতই খুকি কি আমি! সত্যি করে বলুন তো, কী চান আপনি? কে আপনারা?'

শুধু বুদ্ধির শানই নয়, দীপালির কথায় বার্তায়, বসার ভঙ্গিতে এবং খাড়া শিরদাঁড়ায় নিটুট ব্যক্তিত্বের একটা ছাপ আছে। দেখামাত্রই যেন চেতনায় সেটা সঞ্চারিত হয়ে যায়। অনেকটা কনকের মত। আবার পার্থক্যও আছে। দীপালির ঋজুতা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। এমন কি স্পর্শের সীমার মধ্যেই যেন। কনকের ব্যক্তিত্ব অবশ্য স্পর্শাতীত কোন রহস্যময়তা দিয়ে ঘেরা।

মিসেস মিত্র ইতিমধ্যে অনেকটা ধাতস্থ হয়ে উঠেছেন। বিচিত্র মৃদু হেসে বললেন, 'ইন্টেলিজেন্ট গার্ল। ঠিকই ধরেছ, তোমাদের পারিবারিক কোন ব্যাপারেই আমি ইন্টারেস্টেড নই।'

'তবে?'

'বিশেষ দরকারে তোমার কাছে এসেছি।'

'কী ?'

মিসেস মিত্র একটু ইতস্তত করে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'তুমি একটু গাড়িতে গিয়ে বস। দীপালির সঙ্গে ক'টা কথা বলে এক্ষুনি আমি আসছি।'

খানিকটা দূরে রাস্তার এক ধারে গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। নির্দেশ অনুযায়ী ক্ষুণ্ণমনে ওটার মধ্যে গিয়ে বসলাম। ক্ষুণ্ণ মনে, কেন না দীপালি সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। মিসেস মিত্র কী উদ্দেশ্যে তার কাছে এসেছেন, জানবার জন্য নিতান্ত অকারণেই সমস্ত প্রাণ ছটফট করছে। অথচ কৌতূহলটা মিটল না।

কিছুক্ষণ পর মিসেস মিত্র ফিরে এলেন। গাড়ির জানালা দিয়ে দেখলাম দীপালিও বাড়িতে ঢুকে সদর বন্ধ করে দিল। দু'জনের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে, জানি না। তবে তার প্রতিক্রিয়ার কিছু কিছু ছাপ সর্বাঙ্গে বহন করে এসেছেন মিসেস মিত্র। ফর্সা মুখটা টকটকে লাল। ওপরের পাতলা ত্বকের তলা থেকে আবদ্ধ রক্তস্রোত ক্রমাগত আঘাত দিচ্ছে। মনে হয় যে কোন মুহূর্তে সেটা ফেটে যাবে। নাকটা অস্বাভাবিক স্ফীত। চোখ আরক্ত। পরিপূর্ণ অনুন্ধত বুক উত্তেজনায় দ্রুত ওঠানামা করছে।

কৌতূহল একটু আগে আকণ্ঠ ছিল। সেই সঙ্গে উদ্বেগ এবং অস্বস্তি একাকার হয়ে গেল। শঙ্কিত চোখে মিসেস মিত্রের দিকে তাকালাম।

মিসেস মিত্র কিন্তু ফিরেও দেখলেন না আমাকে। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতে দিতে অস্পষ্ট ক্রুদ্ধ গলায় শুধু গজগজ করলেন, 'আনম্যানারলি ব্রুট, আচ্ছা আমিও দেখব।'

দুপুরে খেতে এসে সকালবেলার সেই রহস্যটার ওপর থেকে যবনিকা উঠল। সকাল থেকেই অতৃপ্ত উদগ্র জিজ্ঞাসায় মনটা প্রায় আচ্ছন্নই ছিল। এত ভোরে যা আমার স্বপ্নের বাইরে, ঘুম থেকে উঠে স্বয়ং ছুটে এসে আমাকে তুলেছেন মিসেস মিত্র, তারপর সিঁথিতে গিয়ে দীপালির সঙ্গে কথা বলেছেন। কী বলেছেন তিনিই জানেন, তবে তার প্রতিক্রিয়া ভয়াবহই হয়েছে। সমস্ত শরীরের মধ্যে টগবগে গলা ধাতুর মত কিছু ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। আমার মনে হয়েছিল, আগ্নেয়গিরির মত যে কোন মুহূর্তে তিনি ফেটে পড়বেন।

যাই হোক, তিনজনে খেতে বসেছিলাম। মিসেস মিত্র, জয়ন্ত এবং আমি। জয়ন্ত লাঞ্চের সময় রোজই বাড়ি চলে আসে। ডাইনিং হলে নীনী আজ অনুপস্থিত। শুধু আজ না, গত দু-দিন ধরেই। তার জ্বর হয়েছে।

মিসেস মিত্র আর জয়ন্ত মুখোমুখি বসে ছিলেন। তাঁরা ডাইনিং হলে যাবার কিছুক্ষণ পর আমি ঢুকেছিলাম। ঢুকে স্পর্শ বাঁচিয়ে টেবিলের শেষ প্রান্তে বসেছিলাম।

ঘরটা আশ্চর্য স্তব্ধ। এই স্তব্ধতার মধ্যে থমথমে কি একটা দুর্যোগ যেন ঘনিয়ে আছে। আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় হঠাৎ তীক্ষ্ন হয়ে উঠল। কুকুরের মত কিসের

আভাস যেন পেয়েছে সেটা। ভয়ে ভয়ে দু'জনের দিকে তাকালাম। সকালবেলা মিসেস মিত্রের চোখ সেই যে আরক্ত হয়ে ছিল আর বুঝি সে দুটো স্বাভাবিক হয় নি। জয়ন্তর মুখেচোখেও দেখলাম, বিরক্তি, ক্ষোভ আর অসন্তোষ মেশানো কেমন এক ভাব। আমার হৃদ্পিণ্ড দুলে উঠল।

এক সময় বয় খাবার দিয়ে গেল। খেতে খেতে জয়ন্ত চাপা তীব্র গলায় বলতে লাগল, 'এসব আমি পছন্দ করি না। মোস্ট ইনডিসেণ্ট ব্যাপার।'

'কী পছন্দ কর না?' মিসেস মিত্র তির্যক দৃষ্টি হানলেন।

'কেন, কেন তুমি আজ দীপালিদের বাড়ি গিয়েছিলে?' জয়ন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'প্রয়োজন ছিল, তাই।'

'তার সঙ্গে তোমার কী প্রয়োজন থাকতে পারে?'

'নিশ্চয়ই কিছু আছে।'

'কী কী?' চিৎকার করে উঠল জয়ন্ত।

'আমার সামনে বসে চেঁচাচ্ছ! এতখানি সাহস তোমার হয় কোথা থেকে?' মিসেস মিত্র প্রথমটা অবাক হলেন। তারপরেই ধমকে উঠলেন, 'বী ডিসেণ্ট! ভদ্রভাবে কথা বল।'

ধমকে কাজ হল। উত্তেজনার পারা অবশ্য নামল না, তবে জয়ন্তর গলার স্বর অনেকখানিই নেমে গেল। সংযত গলায় সে বলল, 'দীপালির সঙ্গে তোমার কী দরকার ছিল, বল।'

'না শুনে যখন ছাড়বে না তখন শোন। আমি দেখতে গিয়েছিলাম, দীপালি আর তোমার মধ্যে সম্পর্কটা কতদূর এগিয়েছে।'

'কী দেখলে?'

'জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করে না! মোস্ট অর্ডিনারি একটা মেয়ের সঙ্গে, যার কোন ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই, অ্যারিস্টোক্র্যাসি নেই,—ফ্লার্ট করে বেড়াচ্ছ!'

'ফ্লার্ট!' বলেই উত্তেজিত ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল জয়ন্ত, 'মা!'

মিসেস মিত্র এবার যেন একটু বিচলিতই বোধ করলেন। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যই। তারপরেই ব্যঙ্গে ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল। গলার স্বরটাকে টেনে টেনে বললেন, 'নয় তো কী!'

টেবিলের দূর প্রান্তে বসে আকণ্ঠ অস্বস্তিতে ডুবে ছিলাম। এই পারিবারিক কুশ্রী কলহ আমার স্নায়ুর ওপর অসহনীয় চাপ দিচ্ছে। খাওয়ার কথা ভুলেই গেছি। বিব্রত বিশৃঙ্খল ভঙ্গিতে ঘাড়টা ভেঙে যেন ঝুলে পড়েছে। উঠে যে যাব, তারও উপায় নেই। প্রথমত সেটা অশোভন, দ্বিতীয়ত অদৃশ্য ফাঁদে কেউ যেন আমার পা দুটো আটকে রেখেছে।

মিসেস মিত্রের মুখ থেকে শেষ কথাগুলি বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘরটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর মত একটা নিস্পন্দ আড়ষ্টতা যেন চারদিক বেষ্টন করে রয়েছে। আমরা তিনটি সজীব সচল মানুষ একেবারে চুপচাপ বসে আছি।

অনেক, অনেকক্ষণ পর হঠাৎ জয়ন্ত বলে উঠল, 'আমি—আমি দীপালিকে বিয়ে করব।'

'বিয়ে!' অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন মিসেস মিত্র। বললেন, 'যা বলছ, বুঝে বলছ তো জয়ন্ত! না কি প্রলাপ বকছ!'

'বুঝেই বলছি।' জয়ন্তর মুখচোখ এবং কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার আভাস পাওয়া গেল।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'না, ঠিকই আছে।'

'বিয়ে তা হলে দীপালিকে করবেই?'

'সেইরকম কথাই তো দিয়েছি।'

এবার সামনের দিকে ঝুঁকে কিছুটা এলেন মিসেস মিত্র। চোখ দুটির পেছনে কেউ যেন তীব্র জোরালো আলো জেবলে দিয়েছে তাঁর। অনুচ্চ ফিস ফিস গলায় তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা কি, ইজ দেয়ার এনিথিং রঙ্!'

'মানে!' জয়ন্ত যেন চমকেই উঠল।

'তোমার যা বয়েস তাতে আমার ইঙ্গিতটা ব্যাখ্যা করে না বললেও বোধ হয় বুঝতে অসুবিধে হবে না।'

জয়ন্তর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। রুষ্ট ক্ষুব্ধ স্বরে সে বলল, 'না-না, সেসব কিছু নয়।'

'দেন?'

'কী?'

'বাধ্যবাধকতা তা হলে কোথায়?'

'আমার বিবেকের কাছে।'

'ইজ ইট? কিন্তু—'

'কী?'

'এরকম কথা তো ছিল না। এভাবে একটা বাজে মেয়ের পেছনে সময় নষ্ট না করে সচদেবের বোন কি মিহির বোসের মেয়ের সঙ্গে ইণ্টিম্যাসি করলে ব্যবসার দিক থেকে অনেক বেশি লাভ হত। একটু বুদ্ধিমান হলে তুমি তা-ই করতে। তোমার বোঝা উচিত ছিল সচদেব আর মিহির বোস তাদের বোন আর মেয়ের ব্যাপারে তোমার সম্বন্ধে ইণ্টারেস্টেড। তারা কত বড় অফিসার তুমি জান। একটু ট্যাক্টফুলি চললে কতগুলো কনট্রাক্ট পেতে ভেবে দ্যাখ।'

টেবিলের উল্টো প্রান্তে আমি প্রায় শিউরে উঠলাম। এই কথাগুলোর মধ্যে মিসেস মিত্রের মানসিকতা অনেকখানিই যেন ধরা পড়েছে। হৃদয় নয়, প্রীতি নয়, সখ্য নয়—শুধুমাত্র বুদ্ধি আর চাতুর্যকে মূলধন করে একটি মাত্র মন্ত্র জপ করে যাওয়া, 'অর্থ! অর্থ! অর্থ!'

লক্ষ করলাম, জয়ন্ত উত্তর দিল না। স্থির নিষ্পলকে মিসেস মিত্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

মিসেস মিত্র বললেন, 'একটা পরামর্শ দিচ্ছি জয়ন্ত, মনে হয় তোমার পক্ষে ভালই হবে।'

'কী?'

'দীপালির ব্যাপারে যদি কোন গোলমাল থেকে থাকে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে—'

'স্টপ ইট্, স্টপ প্লীজ—' তীরের মত খাড়া হয়ে উঠল জয়ন্ত। তারপর এক রকম দৌড়েই ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

দূর প্রান্তে বসে স্তম্ভিতের মত ভাবতে লাগলাম এই দু'টি মানুষের পারিবারিক পরিচয় কী? মা এবং ছেলেই তো? না কি অন্য কিছু? দিন কয়েক আগে সুস্থ শান্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন মিসেস মিত্র। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষাটাকে ব্যঙ্গ করার মত এমন নিদারুণ উপাদান যে তাঁর চরিত্রের মধ্যে রয়েছে, কে জানত।

কতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলাম, খেয়াল নেই। একসময় মিসেস মিত্র বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলব শুভেন্দু—'

'কী?' আমি চোখ তুললাম।

একটু ইতস্তত করে মিসেস মিত্র শুরু করে দিলেন, 'একটু আগে দীপালি মুখার্জির কথা শুনলে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ও ব্যাপারে জয়ন্তকে তোমার রাজি করাতেই হবে।'

'রাজি! কী ব্যাপারে?' স্তম্ভিত বিস্ময়ে আমি চমকেই উঠলাম।

'বোকা ছেলে।' মিসেস মিত্র হাসলেন, 'দীপালির ব্যাপারে কিছু যদি গোলমাল থাকে, আই মীন, ডাক্তার তো আমাদের হাতেই রয়েছে।...বুঝতেই পারছ ছেলের সঙ্গে তো সব কথা খোলাখুলি আলোচনা করা যায় না, তাই...'

আমার চারপাশে পৃথিবীটা যেন আগুনের চাকার মত ঘুরতে লাগল। শুধু প্রাণে বেঁচে থাকার জন্য আমি গুপ্তচর হয়েছি। মিসেস মিত্র আরো কোন্ অন্ধকার পাতালে আমাকে ঠেলে দিতে চান!

মিসেস মিত্র আবার বলে উঠলেন, 'জয়ন্তর সঙ্গে ইন্টিম্যাসি করবে। তার পর খুব ট্যাক্টফুলি কথাটা পাড়বে।' বলতে বলতেই তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন, 'ওকি, হাত গুটিয়ে বসে কেন? তাড়াতাড়ি খেয়ে ও বাড়ি চলে যাও। এখন দেড়টা বাজে। একটু বিশ্রাম করে তিনটে নাগাদ চলে এস। মঙ্গলবার পার্টি, মনে আছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজকের মধ্যেই নিমন্ত্রণ সেরে ফেলতে হবে।'

এত অনায়াসে এবং স্বাভাবিক গলায় কথাগুলি বলে গেলেন মিসেস মিত্র যাতে অবাকই হলাম। যেন খানিকটা আগে কোন অপ্রীতিকর ব্যাপারই ঘটে নি।

কুড়ি

কাঁটায় কাঁটায় তিনটে বাজলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। নিমন্ত্রণপত্র আগেই ছাপানো হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো সঙ্গে নিয়েছেন মিসেস মিত্র।

প্রথমেই আমাদের গাড়ি ছুটল ডালহৌসিতে। অফিসে অফিসে ঘুরে নিমন্ত্রণ করতে পাঁচটা বাজল। নানা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, চেয়ারম্যান, ম্যানেজার, ডাইরেক্টর—যেখানেই গেলেন মিসেস মিত্র প্রচুর গল্প করলেন, চা খেলেন, হাসিতে-পরিহাসে সবাইকে মাতিয়ে রাখলেন। তারপর বিদায় নেবার সময় অন্তরঙ্গ মধুর স্বরে ভ্রূ বাঁকিয়ে বললেন, 'পরশু অবশ্যই যাওয়া চাই। প্লীজ—'

ওই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যেন ধন্য হয়েছেন এমন ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, 'সিওর—সিওর—'

পাঁচটার সময় আঠার নম্বর অফিস থেকে যখন বেরিয়ে এলাম অধিকাংশেরই নিমন্ত্রণ বাকি। অতএব স্থির হল বাকিদের বাড়িতে গিয়েই সেরে আসা হবে।

সবে মাত্র পাঁচটা। কিন্তু এরই মধ্যে কলকাতার আকাশে গাঢ় ছায়াচ্ছন্নতা নেমে এসেছে। আর ক'দিন পরেই সূর্য উত্তরে হেলে যাবে। উত্তর-দক্ষিণের এই মধ্য পর্বে দিনের আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসছে। বিকেল দেউড়ি পেরুতে না পেরুতেই এখন লম্বা পায়ে সন্ধে এসে পড়ে।

অফিস-পাড়া থেকে বেরিয়ে সেই হোটেলটায় গিয়ে কিছু খেয়ে নিলাম দু'জনে। তারপর নিমন্ত্রণের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল।

শহরের উত্তর প্রান্ত শেষ করে দক্ষিণে এলাম। দক্ষিণের নিমন্ত্রণ সারতে সারতে রাত এগারটা বেজে গেল। আর সেই সময় মিসেস মিত্র অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'খুব টায়ার্ড ফীল করছ, তাই না শুভেন্দু?'

সেই ভোর থেকেই গাড়িতে গাড়িতে ঘুরছি। এগারটা পর্যন্ত কলকাতার উত্তরে আর দক্ষিণে অবিরাম ছুটেছি। শ্রান্ত হয়েছি বৈকি। অপরিসীম ক্লান্তিতে হাত-পা আলগা হয়ে আসছে। সেই সঙ্গে পাচ্ছে ঘুম, সমস্ত স্নায়ুর ওপর দিয়ে নিশ্ছেদ আবরণের মত সেটা নেমে আসছে। মুখে অবশ্য বললাম, 'না, টায়ার্ড আর কি।'

মিসেস মিত্র আমার মনের এবং মুখের কথা—দুটোই বুঝলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'সব শেষ করে ফেলেছি। শুধু আলিপুরের একটা মাত্র বাকি। সেটা সেরেই বাড়ি ফিরব। আজ সারাদিন খুব খেটেছ; কালকের দিনটা তোমার পুরো ছুটি। যেখানে ইচ্ছে যখন ইচ্ছে বেরুতে পার।'

মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু প্রাণের খুশিটার পুরোপুরি স্বাদ অবসন্ন শিথিল শরীর বুঝতে পারছে না।

গাড়িটা যখন আলিপুরের কাছাকাছি, মিসেস মিত্র বললেন, আমরা এখন

যার কাছে যাচ্ছি তুমি তাকে চেন শুভেন্দু।'

'আমি চিনি!' বিহ্বলের মত মিসেস মিত্রের দিকে তাকালাম।

'হ্যাঁ।'

'কে তিনি?'

'আর দশ মিনিট কৌতূহল দমন কর। দেখলেই বুঝতে পারবে। তা ছাড়া—'

'কী?'

'লাক ফেভার করলে খুব সম্ভব একটা ভাল নাটকও তুমি দেখতে পার।'

সমস্ত চেতনার ওপর যে ঘুম নেমে আসছিল মুহূর্তে সেটা যেন গুটিয়ে গেল। এলোমেলো পেশিগুলো আবার টান টান হয়ে গেল।

আর একটু পরেই আলিপুরের অভিজাত নিরিবিলি পাড়ায় একখানা চমৎকার দোতলা বাড়ির সামনে মিসেস মিত্র গাড়ি পার্ক করলেন।

একতলার গ্রীল্-দেওয়া বারান্দায় নীল আলো জ্বলছিল। মিসেস মিত্র আমাকে নিয়ে সেখানে গেলেন। বললেন, 'কলিং বেল টেপ।'

বেল টেপামাত্র উর্দিপরা একটা বয় দরজা খুলে দিল। মিসেস মিত্র বললেন, 'সাহেব আছেন?'

'জী না।' বয়টা সসম্ভ্রমে মাথা নাড়ল।

'তবে কে আছেন?'

'মেমসাব।'

'মেমসাব।' লক্ষ করলাম, মিসেস মিত্রের চোখে একঝলক আগুন নেচে গেল যেন। তিনি বললেন, 'আচ্ছা তাঁকেই ডাক।'

'জী—' বলেই বয়টা ছুটল। কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত! তারপরেই সঙ্গে করে যাঁকে নিয়ে ফিরল রূপশাস্ত্রের বিধান মানতে গেলে তিনি সুন্দরী নন, তবে অনন্তযৌবনা। আশ্চর্য অটুট তাঁর দেহের গঠন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইংরাজিতে তিনি বললেন, 'আপনাদের তো চিনতে পারলাম না।'

মিসেস মিত্র ইংরেজিতেই বললেন, 'আমার নাম সুষমা মিত্র। মিস্টার তলোয়ারকরের সঙ্গে একটু দরকারে দেখা করতে এসেছি।'

তলোয়ারকর! আমি প্রায় চমকে উঠলাম। নীনীর প্রখর শেখার চারপাশে ঘুরপাক-খাওয়া সেই মারাঠী পতঙ্গ! তাকে প্রথম দেখেছিলাম সেই আন্তর্জাতিক ক্লাবের সুইমিং পুলের কাছে। দ্বিতীয় বার চুপিসাড়ে তার এবং নীনীর বাহুবন্ধ আবিষ্ট অবস্থার একখানা ছবি তুলেছি। খানিকটা আগে মিসেস মিত্র বলেছিলেন পার্টিতে নিমন্ত্রণ করার জন্যই তাঁর এখানে আসা। কিন্তু আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন ফিস ফিস গলায় অস্পষ্ট উচ্চারণে বলতে লাগল, নিমন্ত্রণের ছদ্মবেশের তলায় গূঢ়তর গভীরতর আরো কিছু আছে।

সেই মহিলাটি বললেন, 'তলোয়ারকর তো এখনও বাড়ি ফেরে নি।'

'কখন ফিরবে?'

'আজ অফিসে বেরুবার সময় বলে গিয়েছিল ফিরতে রাত হবে। তা

হলেও বাই দিস টাইম ফিরে আসা উচিত ছিল! কেন যে এখনও আসছে না, বুঝতে পারছি না।'

'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলব।' মিসেস মিত্র ঈষৎ হাসলেন।

'বলুন—' মহিলার দুই চোখে প্রশ্ন ফুটল।

'আমরা মিস্টার তলোয়ারকরের জন্যে একটু অপেক্ষা করতে চাই। অবশ্য আপনার যদি কোন অসুবিধে—'

'না-না, অসুবিধে কি।' বাধা দিয়ে মহিলা বললেন, 'আসুন, ভেতরে বসবেন আসুন।'

তাঁকে অনুসরণ করে পার্লারে গিয়ে বসলাম। ঘরখানা সুরুচিতে শোভন।

মহিলা বললেন, 'এক্সকিউজ মী, যদি আপত্তি না থাকে তলোয়ারকরের সঙ্গে আপনার দরকারের ব্যাপারটা আমাকে বলতে পারেন।'

মিসেস মিত্র স্থির চোখে তাঁকে দেখলেন। তারপর খুব আস্তে বললেন, 'আপনি?'

'আমি, মানে আমার পরিচয় জানতে চাইছেন?'

মিসেস মিত্র মাথা নাড়লেন, মুখে কিছু বললেন না।

মহিলা বললেন, 'আমি মিসেস তলোয়ারকর।'

শান্ত স্বাভাবিক গলায় মিসেস মিত্র বললেন, 'আমিও সেইরকম আন্দাজ করেছিলাম। সে যাক, আপনাকে বলতে আপত্তির কিছু নেই। মিস্টার তলোয়ারকরকে একটা পার্টিতে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।'

'ও, আচ্ছা। তা একটু চায়ের ব্যবস্থা করি?'

'না-না, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। এত রাত্রে আর চা খাব না।'

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে তলোয়ারকর এসে পড়ল। পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ নয়, পা অল্প অল্প টলছে। তবু পার্লারে ঢুকে ভূত দেখল যেন সে। নেশার ঘোরের সেই দোলানিটা আচমকা একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে রইল সে? তারপর সরব উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে চাইল। একরকম লাফ দিয়েই কাছে এসে গদগদ গলায় বলল, 'মিসেস মিত্র যে, আমার কি সৌভাগ্য!'

তলোয়ারকরের ওপর আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে ছিল। স্পষ্টই বুঝতে পারছি তার উচ্ছ্বাস, গলার স্বর, মিসেস মিত্রকে দেখে খুশি হয়ে ওঠা—সবই ভান। নকল এবং চেষ্টাকৃত।

মিসেস মিত্রও তলোয়ারকরের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'আসতেই হল। পরশু আমাদের বাড়ি পার্টি, তার নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। অবশ্যই যাওয়া চাই কিন্তু।'

'এ তো সুখবর, নিশ্চয়ই যাব। তা ছাড়া আপনার নিমন্ত্রণে না গিয়ে উপায় আছে!' বলতে বলতেই যেন নিজের স্ত্রী সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল তলোয়ারকর। তাঁর দিকে ফিরে বলল, 'আরে, কি আশ্চর্য, তোমার না শরীর

খারাপ নন্দা! যাও, শুতে চলে যাও। এত রাত পর্যন্ত তোমার জেগে বসে থাকা ঠিক নয়।' একরকম তাড়া দিয়েই তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল সে।

যাবার আগে সলজ্জ কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে নন্দা অর্থাৎ মিসেস তলোয়ারকর আমাদের উদ্দেশে বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারলাম না। ক'দিন ধরেই আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। রাত্রে ইকসম্নিয়া হচ্ছে। আমার অবস্থা বিবেচনা করে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। আচ্ছা, গুড নাইট।'

মিসেস মিত্র ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনি যান। শুধু শুধু বসে থেকে শরীর নষ্ট করার কোন মানে হয় না। গুড নাইট।'

তলোয়ারকর নন্দাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভেতরে গেছে। আমার মনে হল, তলোয়ারকর যেন কী এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাকে এ ঘরে থাকতে দিতে চায় না।

একটু পর ফিরে এসে তলোয়ারকর সামান্য হাসল। হাসিটা নিষ্প্রভ। বলল, 'আজ আপনি প্রথম আমার বাড়ি এলেন। অথচ জানতাম না। আগে থেকে জানলে—'

তার কথা শেষ হবার আগেই মিসেস মিত্র বিচিত্র হাসলেন। বললেন, 'তা হলে অনেক দিক থেকেই খুব সুবিধে হত, না কি বল—'

অর্ধ-উচ্চারিত জড়িত গলায় তলোয়ারকর কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না।

মিসেস মিত্র কিছুই বললেন না। শুধু তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে রইলেন।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর তলোয়ারকরই একসময় স্তব্ধতা ভাঙল। রুদ্ধ স্তিমিত গলায় বলল, 'সামান্য একটা নিমন্ত্রণের জন্যে এত রাত্রে আবার কষ্ট করে বাড়ি পর্যন্ত এলেন কেন? একটা ফোন করে দিলেই তো হত—'

'তা হয়ত হত।' মিসেস মিত্রের দৃষ্টি আগের মতই প্রখর। গলাটা কিন্তু আশ্চর্য শান্ত। কণ্ঠস্বরে মৃদু একটা ঢেউ দিয়ে তিনি বললেন, 'তবে—'

'কী?'

'তোমার এখানে না জানিয়ে হানা না দিলে এমন সারপ্রাইজটা পেতাম না।'

'কিসের সারপ্রাইজ?' তলোয়ারকরকে কেমন যেন শ্বাসরুদ্ধ দেখাল।

'তুমিই ভেবে দ্যাখো না।'

'বুঝতে পারছি না।'

'পারছ, তবে মুখ ফুটে বলতে সাহস হচ্ছে না—কেমন?'

ভীত বোবা চোখে তাকাল তলোয়ারকর। একটা অস্থির অসহায়তা ভেতরে ভেতরে পাক খাচ্ছে তার। ঘাড় ভেঙে মাথাটা কেমন যেন ঝুলে পড়ল।

মিসেস মিত্র একটু ঝুঁকে চাপা তীব্র গলায় বললেন, 'কি, কথাটা সত্যি না?'

তলোয়ারকর মাথা তুলল না। নতচোখে চুপ করে রইল।

মিসেস মিত্র স্বরটাকে এবার বেশ উঁচুতে তুললেন, 'কি, মুখ বুজে বসে

রইলে যে—'

এতক্ষণে মুখ তুলল তলোয়ারকর। কাঁপা অবরুদ্ধ গলায় বলল, 'কি বলব—'

'যা জিজ্ঞেস করছি। তুমি যে বিবাহিত, কথাটা এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলে। ভেবেছিলে আমি টের পাব না। জেনে রেখো তলোয়ারকর, আমার চোখকে ফাঁকি দেবার সাধ্য তোমার নেই।'

তলোয়ারকর এবার শিউরে উঠল। শঙ্কিত করুণ সুরে বলল, 'আমি হাত জোড় করছি মিসেস মিত্র। এখানে নয়, আপনার বাড়ি পরশুই যাব। সেখানে যা ইচ্ছে বলবেন—'

মিসেস মিত্রের ঠোঁটের সেই বিচিত্র হাসিটা আরেকটু টান টান হল। একটু আগে গলার স্বরটা অনেকটা উঠেছিল। সেটাকে খাদে নামিয়ে বললেন, 'আই সী, বৌকে বুঝি খুব ভয় পাও?'

তলোয়ারকর উত্তর দিল না।

শরবিদ্ধ রক্তাক্ত শিকারটার দিকে তাকিয়ে করুণাই হল মিসেস মিত্রের। ব্যাগ খুলে একখানা কার্ড বার করে তাকে দিতে দিতে বললেন, 'এই নাও তোমার কার্ড। আজ আমরা চলি; অনেক রাত হয়ে গেল।'

ঠিক যেন সচেতনভাবে নয়, একটা ভয়াতুর আচ্ছন্নতার ঘোরে হাত বাড়াল তলোয়ারকর।

একুশ

অবশেষে সেই দিনটা এসে গেল। নতুন বাড়ির সামনে সুবিস্তৃত সবুজ লন্‌টাকে ঘিরে চমৎকার একখানা প্যাণ্ডেল তোলা হল। প্যাণ্ডেলের এক প্রান্তে সিমেণ্টের অস্থায়ী বিশাল একটা প্ল্যাটফর্ম। এখানে মহিলা এবং পুরুষেরা পরস্পরের বাহুবদ্ধ হয়ে যুগলে বল্‌ নাচবে। আরেক প্রান্ত অসংখ্য বেতের চেয়ার আর টেবিল দিয়ে সাজানো।

হেমন্তশেষের সন্ধ্যা নামতে না নামতেই ফ্লুরোসেণ্ট আলোর ঢলে ঘনায়মান অন্ধকার ধুয়ে গেল। আর আসতে লাগল গাড়ির স্রোত। যুদ্ধকালীন নতুন নতুন মডেলের চমকপ্রদ সব গাড়ি।

নানা কারুকাজে সজ্জিত প্যাণ্ডেলের গেটের সামনে মিসেস মিত্র, নীনী, জয়ন্ত এবং আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। জয়ন্ত এবং আমার পরনে ডিনার স্যুট। মিসেস মিত্র পরেছেন একখানা সোনালি বেনারসী; তার সঙ্গে রং মিলিয়ে সোনালী ব্লাউজ। গলায় হীরের চিক, কানে হীরের ফুল, অনামিকার আংটিটিও হীরক-খচিত। পায়ে সোনালি স্ট্র্যাপের চটি। নিবিড় চুলের মধ্যে যে সিঁথি, সেখানে সিঁদুরের চিহ্নমাত্র নেই। পাস্তুরাইজড ফেস-ক্রীমে মুখ-খানা মাজা; আই-ব্রো পেন্সিলে ভ্রূ আঁকা। নিখুঁত সরু ভ্রূ আর কপালের ঠিক মাঝখানে নীলাভ মাদ্রাজী সিঁদুরের গোলাকার প্রকাণ্ড একটা টিপ।

নীনীকে আজ আর চেনাই যাচ্ছে না। এমনিতেই সে দুরন্ত মাধ্যাকর্ষণের মত। তার দিকে যে তাকায় সে-ই বুঝি অন্ধ পতঙ্গ হয়ে যায়। আজ নীনী সত্যিই মৃত্যুরূপিণী। সিফন শাড়ি পরেছে সে, যার রং লাল রক্তের মত। ব্লাউজের রঙও অভিন্ন। অল-টোন শ্যাম্পুতে রুক্ষ নরম চুলগুলি হর্স টেলের অনুকরণে আবদ্ধ। মিসেস মিত্রের মতই তার ভ্রূ আঁকা, হাত এবং পায়ের নখ রঞ্জিত। মিসেস মিত্রের প্রতিটি অলঙ্কারে দুষ্প্রাপ্য হীরে কিন্তু নীনীর গয়না অতি সাধারণ। বাদামী রঙের দার্জিলিং স্টোনের মালা, কানে সবুজ পুঁতির দুল, তর্জনীতে ঝিনুকের আংটি। অতি সাধারণ অতি সুলভ তবু নীনীর শরীরে উঠতে পেরে তারা অলৌকিক হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্য থেকে দুর্লভ দীপ্তি যেন ঠিকরে পড়ছে।

নিমন্ত্রিতেরা কেউ এলেই মিসেস মিত্র, নীনী আর জয়ন্ত ছুটে যায়। আমি অবশ্য দূরেই দাঁড়িয়ে থাকি। মিসেস মিত্র স্বয়ং গাড়ির দরজা খুলে অতিথিকে বার করে আনেন। মধুর হেসে বলেন, গুড ইভনিং মিস্টার সচদেব অথবা পারেখ অথবা সেন। তারপরেই নীনীর হাতে সঁপে দেন। নীনীর রূপের মৃত্যুফাঁদে অবোধ পতঙ্গটা একেবারে বোবাই হয়ে যায় বুঝি। মুখে কিছু কথা ফুটবার আগেই নীনীর হাত থেকে সে চলে যায় জয়ন্তর হাতে। হস্তান্তরিত হতে হতে অবশেষে আমার কাছে। যান্ত্রিক নিয়মে তাদের প্যাণ্ডেলের সুসজ্জিত আসরে নিয়ে বসিয়ে দিই।

একটা জিনিস লক্ষ করেছি, মিসেস মিত্র, নীনী বা জয়ন্তর মধ্যে যে যুদ্ধোদ্যত আরণ্যক সম্পর্ক সেটা এই মুহূর্তে টের পাবার উপায় নেই। পার্টিটাকে সর্বাঙ্গশোভন করার জন্য তিনজনের সন্ধি হয়ে গেছে।

সেই সন্ধ্যের পর থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। একসময় শেষ অতিথিটিও এসে গেলেন। নিমন্ত্রিতদের সবাই উঁচুতলার জীব। স্বর্গলোকের বাসিন্দা। কেউ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, কেউ বিগ বিজনেসম্যান, বড় কোম্পানির কেউ ডিরেক্টর, কেউ ম্যানেজার।

একপায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঁচুতলার জ্যোতিষ্কদের দেখছিলাম। হঠাৎ সীতেশদার সেই মন্ত্রগুপ্তিটা মনে পড়ে গেল। একটা চান্স, সুযোগ! সুযোগ ছাড়া কেউ বড় হতে পারে না। আর সুযোগ পায়ে হেঁটে এসে ধরা দেয় না। তাকে ধরতে হয়। তার জন্যে তাকে তাকে থাকতে হয়।

সুযোগ তো হাতের কাছেই রয়েছে। ক্ষমতাবান এতগুলো ঈশ্বরের মত মানুষ আমার সামনেই বসে। এঁদের যে কেউ সামান্য আঙুল তুললে পঁচাত্তর টাকার ক্রীতদাসের জীবন থেকে ভদ্ররকমের একটা জাতে গিয়ে উঠতে পারি। আর স্বচ্ছন্দে না হলেও খুব একটা কঠিনও তা নয়। অন্তত আজই না হোক, এখান থেকে বেরিয়ে যাবার ভূমিকাটুকু তো করে রাখতে পারি। টেবিলে টেবিলে ঘুরে হাত কচাল হেঁ-হেঁ করে কার কি প্রয়োজন তার খবর নিতে নিতে তাঁদের নজরে তো আগে পড়ি।

কিন্তু ঐ ভাবনা পর্যন্তই। তোষামোদ করার কায়দা আমার জানা নেই।

মোসাহেবদের সংহিতা আমার অনায়ত্ত। তা ছাড়া স্বর্গলোকের এই বাসিন্দাদের সামনে যাবার মত দুঃসাহসও নেই। কাজেই প্যাণ্ডেলের এককোণে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এদিকে মিসেস মিত্র, নীনী এবং জয়ন্ত টেবিলে টেবিলে ঘুরে অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্যের তদারক করছেন। লক্ষ করলাম নীনী যে টেবিলে যাচ্ছে সেখানকার পরিবেশটা ঠিক স্বাভাবিক থাকছে না।

কোথাও গিয়ে নীনী হয়ত বলল, 'হ্যালো মিস্টার আয়েঙ্গার, হাউ ডু ইউ ডু—'

আয়েঙ্গার নামধারী সম্মোহিত জীবটা খানিকক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল নীনীর দিকে। কথা বলতেও ভুলে গেল যেন। তারপর হঠাৎ কিছুটা সচেতন হয়ে আধফোটা কেমন এক স্বরে বলে উঠল, 'অলরাইট, ইউ ?'

'ভেরি ওয়েল।'

'তোমাকে আজ যা দেখাচ্ছে মিস মিত্র—'

'কিরকম ?' নীল তারা দু'টিকে চোখের কোণে এনে বিচিত্র হাসে নীনী।

আয়েঙ্গার মন্ত্রোচ্চারণের মত বলে, 'এক্সকুইজিট্‌লি বিউটিফুল।'

'ইজ ইট !'

'ওহ্‌ সিওর। এস না, খানিকটা গল্প করি।'

'তুমি একটু কষ্ট করে একা-একা থাকো। আমি ওদিকটা ঘুরে আসছি। এক্ষুনি আসব।' বলেই আরেক টেবিলে চলে যায় নীনী।

প্রতিটি টেবিলের প্রান্ত ছুঁয়ে যায় সে। কোথাও বসে না। টেবিলের ওপর ঈষৎ ঝুঁকে দু-একটা কথা, রক্তোষ্ঠের প্রান্তে একটু হাসি আর নীল চোখে রহস্যময় কোন সংকেত—এর বেশি অপব্যয় করার মত উৎসাহ বা সময় কোনটাই তার নেই। চোখের কোণ থেকে অগ্নিবাণ হেনে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায় নীনী। যে টেবিল থেকে সে একবার যায় আর সেখানে ফেরে না। কিন্তু অব্যর্থ সন্ধানে মৃগয়াটি শেষ করে রেখে যায়। অবোধ শিকারগুলি আহত রক্তাক্ত হয়ে পড়ে থাকে পেছনে। অধরা কুরঙ্গীর মত সবার ফাঁদ এড়িয়ে যায় নীনী।

একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলাম, নীনীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্যাণ্ডেলের প্রায় সমস্ত চোখই যেন শ্বাপদের মত জ্বলছিল। আমার মনে হচ্ছিল এটা যেন সভ্য মার্জিত মানুষের মেলা নয়, একটা জঙ্গল। পৃথিবীর অরণ্যের কত রকমফেরই না আছে !

মিসেস মিত্র টেবিলে টেবিলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এতদিনে তাঁর বয়েসটা জেনে ফেলেছি। সাতচল্লিশ বছর। জীবনের প্রায় চারটি যুগ পার করেও যৌবন একেবারে নিশ্চিহ্ন নয়। জোয়ারের বেগ হয়ত নেই, ভাটার টানও সবেমাত্র লেগেছে। রূপের ওপরও সূর্যাস্তের ছায়া পড়তে শুরু করেছে। পড়ন্ত বেলার রূপ এবং যৌবনকে মেজে ঘষে আজ মধ্যাহ্নের গনগনে আগুন করে তুলেছেন মিসেস মিত্র। আর সেই আগুনের ছটা পার্টিটাকে প্রায় ধাঁধাই

লাগিয়ে দিচ্ছে।

মিসেস মিত্র ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত সেই টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি টেবিলটা সেখান থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে।

টেবিলটাকে ঘিরে তিনখানা চেয়ার। একটির চেয়ারে মধ্যবয়সী দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন। এক নজরেই বোঝা যায় অবাঙালী। চোখেমুখে চেহারায় ভারতের পূর্ব প্রান্তের কোন ছাপই নেই, বরং আর্যাবর্তের অনেক লক্ষণ রয়েছে।

বাকি চেয়ারদুটো ফাঁকা ছিল। মিসেস মিত্র একটাতে বসে পড়লেন। বললেন, 'তারপর খান্না, দিন দিন খুব ফর্মাল হয়ে উঠছ দেখছি।'

যদিও ইংরেজীতেই বললেন মিসেস মিত্র এবং 'ইউ' শব্দটা 'তুমি' এবং 'আপনি' উভয়েরই সমার্থক তথাপি কেন যেন আমার মনে হল, তাঁর 'ইউ' উচ্চারণের মধ্যে 'তুমি'টাই ফুটে উঠেছে।

ভদ্রলোক অর্থাৎ খান্না একটু অবাকই হলেন। বললেন, 'কিরকম ?'

মিসেস মিত্র বললেন, 'ইনভিটেসন কার্ড না পাঠালে এ-বাড়িতে আজকাল আস না।'

'সে কি ! এই তো সপ্তাদুয়েক আগে রাত্রিবেলা এলাম।'

'সপ্তাদুয়েক আগে ! সে কি আজকের কথা !' সাতচল্লিশ বছরের মহিলার আরক্ত ঠোঁট ষোল বছরের তরুণীর মত নকল অভিমানে স্ফুরিত হল।

খান্না যেন ঈষৎ বিব্রত হলেন, 'কী আশ্চর্য, এবারই না হয় দু সপ্তাহের গ্যাপ পড়ল। জরুরি কিছু কাজ হাতে ছিল, তা-ই আসতে পারিনি। কিন্তু তার আগে ?'

'তার আগে কী ?'

'প্রতি রাত্রেই তো আড্ডা দিতে আসতাম।'

কয়েক ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে প্রায় চমকেই উঠলাম। চারবেলা খাওয়ার ব্যাপারে নতুন বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক। খেয়ে আর একটা মুহূর্তও অপেক্ষা করি না। সন্ধ্যায় আমি যখন নীনীর পেছনে হানা দিয়ে ফিরি কিংবা অন্য সময় যখন এ-বাড়িতে থাকি না তখন খান্নার মত আরো অনেকেই কি আসেন ?

আমার কৌতূহলের উত্তরটা একটু পরেই পেয়ে গেলাম। প্রায় নিষ্পলকেই মিসেস মিত্রের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আরো কিছুক্ষণ খান্নার সঙ্গে কথা বলে তিনি অন্য একটা টেবিলে গেলেন। সেখান থেকে আরেক টেবিলে। লক্ষ্য করলাম খান্নার মত মধ্যবয়সী আরো কয়েকজনের সঙ্গে মিসেস মিত্রের গাঢ় অন্তরঙ্গতা। এই কয়েকজনের নাম মিস্টার নাইডু, মিস্টার বাসু, মিস্টার সাঠে এবং মিস্টার গিদোয়ানী। কথাবার্তায় বোঝা গেল তাঁরাও প্রায়ই রাতের দিকে এখানে এসে থাকেন।

আশ্চর্য ! ক'মাস এখানে আছি। অথচ এখনও এ-বাড়ির সমস্ত দিকের

যবনিকা আমার সামনে থেকে ওঠে নি। এই বিচিত্র বাড়িটায় কত অনাবিষ্কৃত অজ্ঞাত দিকই না রয়েছে।

এদিকে উর্দি-পরা বয়েরা ট্রে-তে পানপাত্র সাজিয়ে টেবিলে টেবিলে ঘুরছে। দূরে সিমেন্টের অস্থায়ী মঞ্চে একটা মিউজিক পার্টি মৃদু সুরে বিলিতি অর্কেস্ট্রার গত বাজাচ্ছে। মিসেস মিত্র বাজনার দলটাকে ভাড়া করে এনেছেন। মনে হয়, একটা হোটেলকেই নিজের বাড়িতে তুলে এনেছেন তিনি।

আজকের প্রোগ্রামটা এইভাবে স্থির করা আছে। প্রথমে লাইট ড্রিংকস, তারপর বল্ নাচ। অবশেষে ডিনার এবং ড্রিংকস।

লাইট ড্রিংক শেষ হয়ে এসেছিল। সবার চোখে এবং মেজাজে অল্প স্বল্প আমেজ লেগেছে। এ যেন পার্টিটাকে পুরোপুরি উপভোগ করার জন্য ভূমিকা তৈরি করে নেওয়া।

ড্রিংকের পর শুরু হল নাচ। পার্টিতে শুধু পুরুষরাই আসে নি। শোভা বাড়াবার জন্য তাদের অনেকেই সঙ্গিনী নিয়ে এসেছিল। বাহুবন্ধ যুগলেরা মঞ্চের উপর বাজনার তালে তালে পা ফেলছে। মিসেস মিত্রের নাচের পার্টনার হয়েছেন খান্না। আর আশ্চর্য, নীনী সমস্ত যুবক প্রার্থীদের আবেদন নাকচ করে দিয়ে একজন দীর্ঘদেহী প্রৌঢ়কে কণ্ঠলগ্ন করেছে। জয়ন্তও একজন সহচরী জুটিয়ে নিয়েছে।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে আস্তে আস্তে মঞ্চের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। ঘোরের মধ্যে তাকিয়ে রয়েছি যেন। সাপের মত হেলেদুলে এতগুলো মানব-মানবী নাচছে। মনে হল, সমস্ত মঞ্চটাই যেন দুলছে। সেই দুলুনি যেন অজ্ঞাতসারে আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে।

নাচটা কতক্ষণ চলেছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখলাম, খান্না মিসেস মিত্রকে একরকম পাঁজাকোলে করে মঞ্চের বাইরে নিয়ে আসছেন। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। কাছে এসে দেখলাম মিসেস মিত্রের চোখদুটি স্তিমিত, প্রায় স্থির। বুক ঘনশ্বসিত, হাত-পা শিথিল। যন্ত্রণায় মুখটা কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে।

খান্না বললেন, 'আপনি কি এ-বাড়ির কেউ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—' উদ্বিগ্ন সুরে উত্তর দিলাম।

'মিসেস মিত্র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওঁকে এক্ষুনি ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া দরকার।'

'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।'

দৌড়ে প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে গুপী এবং দুটি বয়কে ডেকে আনলাম। তারপর ধরাধরি করে মিসেস মিত্রের প্রায়-নিশ্চেতন অসাড় দেহটিকে নতুন বাড়িতে এনে শুইয়ে দিলাম। খান্নাও আমাদের সঙ্গে এলেন। প্যাণ্ডেলের অস্থায়ী মঞ্চে চড়া সুরের ইংরেজি বাজনার সঙ্গে প্রাক-ডিনার বিলিতি নাচ চলতেই লাগল।

বিছানায় শুইয়ে চোখেমুখে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতেই মিসেস

াখ মেললেন। চোখ মেললেন ঠিকই কিন্তু অনুমান করলাম, যন্ত্রণাটা বিন্দুমাত্র কমে নি। শরীরের অভ্যন্তরে তীক্ষ্ম নখে সেটা ক্রমাগত আঁচড় কাটছে। দাঁতে দাঁত চেপে তার বেগ সহ্য করতে চেষ্টা করছেন তিনি।

আমরা উৎকণ্ঠ হয়েই ছিলাম। অনেকখানি ঝুঁকে খান্না বললেন, 'কেমন ফীল করছ এখন?'

বিকৃত কাতর গলায় মিসেস মিত্র বললেন, 'পেইন, পেটে-বুকে অসহ্য যন্ত্রণা! আমি আর সইতে পারছি না খান্না। ওহ্ হরিবল্—'

'তা হলে তো ডাক্তার ডাকতে হয়।'

'হ্যাঁ। কিন্তু—'

'কী?'

'ওদিকে ড্যান্স নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণে। ডিনার শুরু হবে। এদিকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। নীনী আর জয়ন্ত ঠিকমত সবাইকে আপ্যায়ন করতে পারবে কি! ওরা ছেলেমানুষ—' বলতে বলতে খান্নার একটা হাত ধরে মিসেস মিত্র বললেন, 'কাইন্ডলি আমার হয়ে তুমি যদি—'

খান্না ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'ওহ্ সিওর, ওদিকটা আমি দেখব'খন। কোন ত্রুটি হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তবে—'

'কী?'

'তোমার এ-দিকটা?'

'সে জন্যে ভেব না। শুভেন্দু আছে, ওকে দিয়ে ডাক্তারকে ফোন করাচ্ছি। তুমি তাড়াতাড়ি প্যান্ডেলে চলে যাও।'

খান্না চলে গেলেন। মিসেস মিত্রের কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের সেই ডাক্তারকে (এখানে চাকরি নেবার দিনকয়েক পরই এই ডাক্তারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন মিসেস মিত্র) ফোন করলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার এসে গেলেন। বুক-পিঠ-জিভ-চোখ পরীক্ষা হলে সন্দিগ্ধ কোঁচকনো দৃষ্টিতে মিসেস মিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী ট্রাবল্ হচ্ছে?'

মিসেস মিত্র সেই উত্তরই দিলেন, 'বুকে-পেটে দারুণ যন্ত্রণা।'

'আর কিছু?'

'কেমন একটা বমি বমি ভাব।'

কি যেন ভেবে ডাক্তার বললেন, 'দেখুন মিসেস মিত্র আপনাকে ক'টা কথা বলতে চাই। এক্সক্লুসিভলি আপনার আমার মধ্যে সেই কথাগুলো থাকা উচিত।'

ঘরের মধ্যে ডাক্তার এবং মিসেস মিত্রকে বাদ দিলে একমাত্র আমিই তৃতীয় পক্ষ দাঁড়িয়ে ছিলাম। ডাক্তারের ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধে হল না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের লাউঞ্জে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখান থেকে প্যান্ডেলটা দেখা যাচ্ছে। ফ্লুরোসেণ্ট আলোর সমুদ্রে বিশাল একটা মাছের মত প্যান্ডেলটা ভাসছে যেন। টুকরো টুকরো জড়িত গলার হৈ চৈ সেখান থেকে উঠে

আসছে। পৃথিবীর স্বাদুতম খাদ্যে আর পানীয়ে পরিতৃপ্ত পুর্ণোদর মানুষের উৎসব দূর থেকে দেখতে লাগলাম।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, মনে নেই। তবে সময়টা যে প্রায় ঘণ্টাখানেকই হবে সে সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। একঘণ্টা পর ঘরের দরজা খুলে ডাক্তার ডাকলেন, 'শুভেন্দুবাবু—'

আমি এগিয়ে এলাম।

ডাক্তার বললেন, 'আপনিই শুভেন্দুবাবু ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ভেতরে আসুন।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ল মিসেস মিত্র শিথিল ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন। জ্ঞান অনেক আগেই ফিরে এসেছিল। তবে চোখের দৃষ্টি এখনও স্তিমিত। মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ আর ভয়ার্ত। সর্বাঙ্গে বিষাদের ছায়া।

ডাক্তার বললেন, 'প্রেসক্রিপশন করে দিচ্ছি। আপনি এক্ষুনি গিয়ে এস্‌প্ল্যানেড থেকে ওষুধগুলো নিয়ে আসুন শুভেন্দুবাবু। যেমন লেখা থাকবে পেশেণ্টকে তেমন খাওয়াতে হবে।' বলেই ব্যাগ থেকে কলম এবং প্যাড বার করে লিখতে শুরু করলেন।

প্রেসক্রিপশনটা আমার হাতে দিয়ে ডাক্তার আবার বললেন, 'চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে ওঁর একজন অ্যাটেণ্ডাণ্ট দরকার। আমি একজন নার্স ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি এক কাজ করুন।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে ডাক্তারের দিকে তাকালাম।

ডাক্তার বললেন, 'আমার গাড়িতেই চলুন। এসপ্ল্যানেডে আপনাকে নামিয়ে দেব'খন। ওষুধ নিয়ে আমার চেম্বারে চলে আসবেন। বাই দিস টাইম নার্সের ব্যবস্থা করে রাখব। তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন।'

মিসেস মিত্রের সম্মতির জন্য তাঁর দিকে তাকালাম। নির্জীব ক্লান্ত স্বরে তিনি বললেন, 'তাই যাও। ওষুধের জন্যে তো টাকা লাগবে। এই চাবি নাও। ঐ আলমারিটায় টাকা আছে। পঞ্চাশ টাকা বার কর—'

নির্দেশ মত দক্ষিণ প্রান্তের দেওয়ালে স্টিলের যে আলমারিটা দাঁড় করানো রয়েছে, সেটা খুলে টাকা নিয়ে এবং মিসেস মিত্রের হাতে চাবি ফিরিয়ে দিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম।

লনের একপ্রান্তে ভোজ্যে, পানীয়ে আর বিলিতি অর্কেস্ট্রার তীব্র বাজনায় যেখানে পার্টির উৎসব শীর্ষবিন্দুতে পেঁছেছে তার প্রায় গা ঘেঁষেই ডাক্তারের গাড়িটা দাঁড় করানো। দু-জনে নিঃশব্দে গিয়ে তাতে বসলাম। সোফার স্টিয়ারিং-এ হাত রেখেই বসে ছিল। ওঠামাত্র গাড়িটা স্টার্ট দিল। আমরা রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে মিসেস মিত্র সব সময়েই ভরপুর। সুদেহিনী অটুট শরীরের এই মহিলাটিকে ক'মাস ধরেই দেখছি। কিন্তু কোনদিনই জ্বর বা অন্য কোন অসুখে তাঁকে পীড়িত হতে দেখিনি। সামান্য মাথা ধরাটুকু

পর্যন্ত তাঁর নেই। আজ খানিকটা আগে পর্যন্তও তিনি ছিলেন নীরোগ, সম্পূর্ণ সুস্থ। হঠাৎ এমন কি হল যাতে বিনা ভূমিকায় একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন!

মনে মনে যতখানি শঙ্কিত হলাম তার হাজার গুণ হলাম কৌতূহলী। নিজের অজান্তে মুখ ফসকেই যেন কথাগুলো বেরিয়ে এল, 'আচ্ছা ডাক্তারবাবু একটা কথা বলছিলাম—'

ডাক্তার আমার পাশেই বসে ছিলেন। চোখদু'টি তাঁর বোজা; কপালের ওপর দু-হাত আড়াআড়িভাবে ক্রশ চিহ্নের মত স্থাপিত। খুব সম্ভব মগ্ন হয়ে কি যেন চিন্তা করছিলেন। চোখ না মেলেই সাড়া দিলেন, 'কী?'

'মিসেস মিত্রের কী হয়েছে?'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চকিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার। চোখ মেলে কপাল থেকে হাত নামিয়ে সন্ত্রস্ত চাপা স্বরে বললেন, 'কি আবার হবে! তেমন কিছু না। এই একটু—'

ডাক্তারের বক্তব্যের শেষাংশটুকু উহ্য রয়ে গেল। মিসেস মিত্রের সঠিক অসুখটা যে কী, জানতে পারলাম না। তবে মনে হল ডাক্তার যেন আমার কাছে রোগটা গোপনই করলেন। তা ছাড়া অসুখের কথা জিজ্ঞেস করাতে ডাক্তার এমন সন্ত্রস্তই বা হয়ে উঠলেন কেন? আমার সমস্ত চেতনা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

এ-প্রসঙ্গে আমি আর কোন প্রশ্ন করলাম না। গাড়ির হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দটুকু ছাড়া দু-জনে অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে আবার ডুবে গেলাম।

একসময় এসপ্ল্যানেডের সুবিখ্যাত এবং সুবিশাল একটা ডিস্‌পেনসারির সামনে আমাকে নামিয়ে দিয়ে ডাক্তার তাঁর চেম্বারে চলে গেলেন।

মোট তিন রকমের ওষুধ। মিক্সচার, পাউডার আর ট্যাবলেট। মিক্সচার আর পাউডার তৈরি করতে হবে। ট্যাবলেটটা বিদেশী একটা কোম্পানির। সেটা তৈরিই ছিল।

ওষুধগুলো পেতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল। দাম দিতে গিয়ে হঠাৎ আমার মধ্যে কি একটা বিপর্যয় ঘটে গেল যেন। একটু আগে ডাক্তারের কথায় এবং ভাবভঙ্গিতে যে সন্দেহটা ঘনীভূত হয়েছিল সেটা সকল দিক আচ্ছন্ন করে আমাকে আত্মবিস্মৃত করে ফেলল। একটা রুচিহীন সন্দিগ্ধ শয়তান আমার ভেতর থেকে উঠে এসে গলায় ভর করল। তারপর সে যা বলাল আমি তা-ই বললাম। যা করাল তা-ই করলাম। যেভাবে চালিত করল সেই ভাবেই চললাম।

যে লোকটি ওষুধ দিয়েছিল তার হাতেই দাম দিয়েছি। টাকা নিয়ে ক্যাশ কাউণ্টারের দিকে চলে গেছে সে। একটু পর ক্যাশ মেমো এবং ব্যালান্স নিয়ে যখন সে ফিরে এল, ফস করে বলে ফেললাম, 'আচ্ছা দাদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব—'

'কী?' লোকটি শান্ত কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকাল।

'এই যে ওষুধগুলো দিলেন, এগুলো কিসের জন্যে ?'

'মানে ?'

'মানে কী অসুখ হলে এগুলো খাওয়ান হয় ?'

আমার মনের সেই সন্দিগ্ধ কুটিলতার খবর লোকটির পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ব্যস্তভাবে সে শুধু বলল, 'কেন, যে ডাক্তার রুগী দেখেছে সে কিছু বলে নি ?' প্রশ্নটা করেই এবং আমার উত্তরের প্রত্যাশা না রেখেই সে বলতে লাগল, 'এই পাউডারটা হল বমি-বমি ভাব কাটাবার জন্যে। মিক্সচারটা নির্জীব হয়ে পড়লে চাঙ্গা করবে আর বাওয়েলস্ পরিষ্কার রাখবে। এদের এই ট্যাবলেটটা—'

'ট্যাবলেটটা কী ?' আমি সামনের দিকে ঝুঁকলাম।

জবাব না দিয়ে লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'রুগী কি আপনার স্ত্রী ?'

চমকে উঠে থতমত খেয়ে বললাম, 'আজ্ঞে না। কেন বলুন তো ?'

'এটা খুব স্ট্রং ওষুধ ! প্রেসক্রিপসনে লেখা নেই কিভাবে ব্যবহার করতে হবে। পেসেন্টের হেলথ্ যদি খারাপ হয় পুরো ট্যাবলেট দেওয়া ঠিক হবে না। আপনি এক কাজ করবেন খাওয়াবার আগে ডাক্তারকে একবার জিজ্ঞেস করে নেবেন।'

'আচ্ছা। কিন্তু—'

'আবার কী ?'

'আপনি তো বললেন না ট্যাবলেটটা কোন রোগে খেতে হয়।'

'প্রেগনান্সি হয়েছে কি-না সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যে।'

এরকম একটা উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। হৃদ্‌পিণ্ডটা মুহূর্তের জন্য থমকে গেল যেন। শিরায় শিরায় রক্ত ঝিম ঝিম করতে লাগল। আর চকিতের জন্য গুপীর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঘৃণা এবং ধিক্কার মিশিয়ে কুঞ্চিত মুখে সে বলেছিল, 'পাপ পাপ ! এ বাড়িতে নরক ঢুকেচে দাদাবাবু। তবে কি, তবে কি—'

ওষুধ নিয়ে আর ডাক্তারের চেম্বার থেকে নার্সকে সংগ্রহ করে অনেক রাত্রে যখন ফিরে এলাম পার্টির উৎসব শেষ হয়েছে। নিমন্ত্রিতেরা সবাই চলে গেছেন। প্যাণ্ডেলের আলোগুলো নিভে গেছে।

দোতলায় মিসেস মিত্রের ঘরে এসে দেখলাম, বমি করে ভদ্রমহিলা বিছানা ভাসিয়েছেন। শিয়রের কাছে হতবুদ্ধির মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে জয়ন্ত। আর দুটো বয় ক্ষিপ্র হাতে বিছানা পরিষ্কার করছে। নীনীকে অবশ্য কোথাও আবিষ্কার করা গেল না।

মিসেস মিত্রকে দেখিয়ে আমার সঙ্গিনী নার্সের উদ্দেশে বললাম, 'এই আপনার পেশেণ্ট—'

নার্স কোন উত্তর না দিয়ে কাছে এগিয়ে গেল। তার কর্তব্য শুরু হল।

মিসেস মিত্র অসুস্থ হবার পর একে একে সাতটা দিন পার হয়ে গেছে।

এর মধ্যে রোজ সকালে এবং সন্ধ্যেয় দু-বার করে ডাক্তার তাঁকে দেখতে এসেছেন। সেই যে নার্সকে নিয়ে এসেছিলাম এখনও তার ছুটি মেলে নি।

মিসেস মিত্রের অন্য উপসর্গ, যেমন দুর্বলতা আর নির্জীব আচ্ছন্নতা আস্তে আস্তে এই সাত দিনে কমে গেছে কিন্তু সেই বমির ভাবটা একেবারেই কাটে নি। যখন তখনই বমি করে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। বিছানা থেকে উঠে বাথরুম পর্যন্ত যাবার তরটুকু সয় না। তার আগেই গলার মধ্য থেকে অজীর্ণ খাদ্যাংশ সবেগে উঠে আসে।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করছিলাম, ভদ্রমহিলার দীর্ঘ আয়ত চোখ দ্রুত বসে যাচ্ছে যেন। আর তার ঠিক নিচে গাঢ় গভীর ছায়ার মত কালির পোঁচ কেউ টেনে দিচ্ছিল। আরো একটা বিসদৃশ ব্যাপার আমার চোখে পড়ছিল। অসুস্থ হবার দিন থেকে এই এক সপ্তাহে একবারও মিসেস মিত্রের ঘরে উঁকি দেয় নি নীনী। জয়ন্ত অবশ্য সকালে-দুপুরে এবং রাত্রে তিনবারই তাঁকে দেখতে এসেছে।

অষ্টম দিনের সকালে রুদ্ধদ্বার ঘরে রোগিণীর হার্ট পিঠ এবং পেট পরীক্ষা করে বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে দরজা খুলে ডাক্তার বললেন, 'মনে হচ্ছে পেসেণ্টের পেটে টিউমার হয়েছে। অবজারভেশনের জন্য আমার নার্সিংহোমে কিছুদিন ওঁকে রাখা দরকার। যদি বুঝি আমার অনুমানই ঠিক, তা হলে একটা অপারেশন করে ফেলব।'

সেই দিন বিকালেই থিয়েটার রোডের নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে গেলেন মিসেস মিত্র।

বাইশ

মিসেস মিত্র যেদিন নার্সিংহোমে গেলেন তার পরের দিন সকালে ভাঙা বাড়ির সেই বিবরে নীনী এসে আবার হানা দিল।

খানিকটা আগে নতুন বাড়ি থেকে ব্রেকফাস্ট সেরে এসেছি। কী করব, ঠিক ভেবে উঠতে পারছিলাম না। অনেক দিন হল সীতেশদাদের কোন খবর রাখি না। তাদের সঙ্গে সংযোগ একরকম বিচ্ছিন্নই হয়ে গেছে। একবার ভাবলাম সাদার্ন অ্যাভেনিউতে গিয়ে দেখা করে আসি। পরমুহূর্তেই বৌদির গোলাকার স্থূল দেহ আর উৎকট রূপচর্চা আর সীতেশদার উদ্‌ভ্রান্ত জীবন-যাত্রার স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে অদ্ভুত এক বিতৃষ্ণা অনুভব করলাম। সেখানে যাওয়ার ইচ্ছাটা মুহূর্তে গুটিয়ে গেল।

এই শহরে দ্বিতীয় যে পরিবারটির সঙ্গে আমার পরিচয় সেটা বুলাকিদের। বুলাকির মায়ের শেষ কাজ সেরে শ্মশান থেকে তাদের বাগবাজারের নতুন বাসায় গিয়েছিলাম। সেখানে রাতের বাকি অংশটুকু কাটিয়ে সেই যে চলে এসেছিলাম আর যাবার অবকাশ হয় নি। এর মধ্যে বুলাকি একবার এসে টাকা নিয়ে গেছে। তার মুখেই শুনেছি, এই ক'দিনের মধ্যে বাগবাজারের সেই

বাসা ছেড়ে রাজাবাজারের কাছে উঠে এসেছে তারা। মায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর স্মৃতি জড়িত বাগবাজারের সেই বাসাটা তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

রাজাবাজারের নতুন বাসার ঠিকানা রেখে গেছে বুলাকি। স্থির করলাম তাদের ওখানেই সকালটা কাটিয়ে আসি। আমি গেলে ওরা ভরসা পাবে। দুঃখী মেয়েটার জন্য সহানুভূতি এবং মমতাবোধে আমার সমস্ত চেতনা হঠাৎ বড় বেশি আর্দ্র হয়ে উঠল।

উঠতে যাব, ঠিক সেই সময় পূর্বদিকের ঝোপঝাড় ঠেলে নীনী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'তারপর ?'

ঠিক এই মুহূর্তে নীনীর কথা ভাবি নি। তার জন্য আমার প্রাণে যতখানি আকর্ষণ, বিকর্ষণও প্রায় সেই পরিমাণেই। একটু অবাক, বুঝিবা কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়েই বললাম, 'আপনি !'

'হ্যাঁ, আমিই।' ঘরে এসে ঢুকল নীনী। বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। দশটা নাগাদ রেডি থাকবেন। আমি এসে নিয়ে যাব।'

'আমার সঙ্গে কী দরকার ?'

'বা রে, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন !'

'কী ?'

'কি ভুলো মন আপনার !' কতই না আশ্চর্য হয়েছে এমন ভান করে নীনী চোখ গোল করল। তারপর গালে হাত দিয়ে রক্তাভ সুঠাম গ্রীবা বাঁকিয়ে বলল, 'আমার জীবনের সমস্ত দিক দেখার সাধ কি এর মধ্যে মিটে গেল !'

'কিন্তু—' আমি ইতস্তত করলাম।

'আবার কী ?'

'আমি যে এখন একবার বেরুব।'

'কখন ফিরবেন ?'

'তার কিছু ঠিক নেই। দুপুরেও হতে পারে, আবার সন্ধ্যেও হতে পারে।'

'কী ব্যাপার ?'

'একটু কাজ আছে।'

'আপনার আবার কাজ কী ? মিসেস মিত্র নার্সিংহোমে। এখন তো আপনি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ।' ভ্রূভঙ্গ করে নীনী বলতে লাগল, 'কোন অজুহাত শুনতে চাই না। দশটার সময় এসে যেন আপনাকে পাই।'

'দেখুন—' আমি প্রায় মরিয়া হয়ে উঠলাম।

অনেকক্ষণ হল নীনী চলে গেছে। আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছি। আজকের এই ব্যাপারটা প্রায় জুলুমের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ নীনীর কাছে আমার কোনরকম বাধ্যবাধকতা থাকার কথা নয়। তার কথামত না চললে গর্দান কাটা যাবার সম্ভাবনা নেই। স্থির করলাম, বুলাকিদের ওখানেই চলে যাব। প্রতিনিয়তই যদি নীনীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি তার খেয়ালের মাত্রা, সীমা ছাড়িয়ে যাবে। আজ আমি তার অবাধ্য হবই, এ ব্যাপারে কেমন যেন জেদ চেপে গেল আমার।

কিন্তু কি আশ্চর্য, বাইরের স্তরে নীনীকে যতই অমান্য করতে চাই না কেন ভেতর দিকে মাধ্যাকর্ষণের মত দুরন্ত এক ফাঁদে আমাকে আটকে রাখল নীনী। দশটার সময় যখন আবার সে এল দেখলাম, একই জায়গায় প্রায় ঘণ্টাদুয়েকের মত অনড় দাঁড়িয়ে রয়েছি।

নীনী বলল, 'এ কি, এখনও রেডি হন নি! যান যান—'

একরকম তার তাড়াতেই জামা-কাপড় বদলে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় গিয়ে নীনী একটা ট্যাক্সি নিল। রজতের ফ্ল্যাট, জুয়ার আড্ডা, আন্তর্জাতিক ক্লাবে সেই সুইমিং পুল—একে একে ছায়াছবির মত কতকগুলো ঘটনা, মানুষ এবং পরিবেশ আমার চোখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। আগের অভিজ্ঞতার সেই অস্বস্তিকর স্মৃতিগুলির কথা মনে ছিল। কাজেই গাড়িতে উঠে শঙ্কিত সুরে বললাম, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

বিরক্ত গলায় নীনী বলল, 'আপনার ভয়ানক বদ অভ্যাস! কৌতূহলটা কিছুক্ষণের জন্যে একটু গুটিয়ে রাখুন তো। গাড়িতে উঠেছেন, পনের মিনিটের মধ্যেই দেখতে পাবেন কোথায় যাচ্ছি।' আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে এর পর ড্রাইভারের দিকে মনোনিবেশ করল নীনী। বলল, 'খিদিরপুর চল।'

খিদিরপুর এসে ড্রাইভার মুখ ফেরাল, 'আভি?'

'সিধে চল—'

খিদিরপুরের পুল পার হয়ে ঢালু বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল গাড়িটা। রেসকোর্সের কাছাকাছি আসতেই নীনী চেঁচিয়ে উঠল, 'এই ড্রাইভার, রুখো—'

গাড়িটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'এখানে কী?'

'আবার?' নীনী ধমকে উঠল। তারপর ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে। এখানে কী জন্যে এসেছি, এক্ষুনি বুঝতে পারবেন।'

চারপাশে যতদূর তাকানো যায়, শুধু গাড়ি আর গাড়ি। কলকাতা শহরের তাবত গাড়ি এসে রেসের মাঠটাকে ঘিরে মেলা বসিয়ে দিয়েছে যেন। সেই মেলার মধ্য দিয়ে আমাকে টানতে টানতে রেসকোর্সের ভেতরে নিয়ে গেল নীনী।

রেস সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন কোন জ্ঞান ছিল না। তবে ভাসা ভাসা অস্পষ্ট কিছু ধারণা ছিল। এ যে এক জুয়ার জগৎ এবং রজতের ফ্ল্যাটের সেই মধ্যরাতের আসরের চাইতেও এ জুয়া যে অনেক উঁচুদরের সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই আমার। চাপা রুদ্ধস্বরে নীনীর উদ্দেশে বললাম, 'দেখুন, এ-সব খেলা আমি জানি না।'

নীনী আগে আগে হাঁটছিল। মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'আপনাকে জানতে হবে না।'

'আমি এ-সব পছন্দ করি না।'

'পছন্দ করতে হবে না। আপনি শুধু আমার সঙ্গে চলে আসুন।'

অনেকখানি ভেতরে চলে এসেছিলাম। আমার জানাশোনা পরিচিত পৃথিবীর বাইরে এ এক অন্য জগৎ। আমি যেন গ্রহান্তরে এসে পড়েছি।

নুড়ি-বিছানো চমৎকার রাস্তার দু-পাশে সারিবন্ধ ইউক্যালিপ্টাস আর দেবদারু গাছ। কেয়ারি-করা টুকরো টুকরো বাগান আর ঝাউ গাছও চোখে পড়ল। রাস্তার ডানদিকে টিনের শেডে অগণিত ঘোড়া—মসৃণ সবল দেহ তাদের। স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে মনে হয় গা থেকে তেল চুঁইয়ে পড়ছে। পুরাকালের পক্ষীরাজদের বংশাবতংস।

রাস্তাটার বাঁ দিকে টিকিটের কাউণ্টার। সেখানে অসংখ্য মানুষ সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু বাঙালীই নয়, পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুর্জর, কাশী-কাঞ্চী-কোশল—দাক্ষিণাত্য আর আর্যাবর্তের কোন প্রান্তই এখানে প্রতিনিধি পাঠাতে ভুল করে নি। শুধু কি ভারতবর্ষের, ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া—সব মহাদেশই জুয়ার এই রাজসূয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ছুটে এসেছে। তাদের সবার হাতেই রয়াল টার্ফ ক্লাবের মনু-সংহিতা অর্থাৎ রেসের বই। চোখের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক উত্তেজনা। আর মুখে পক্ষীরাজের বংশধরদের বয়স, কৌলীন্য, গতি—সব নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা। লক্ষ্য করলাম, প্রতিটি ঘোড়ার বংশ-পরিচয়, ঠিকুজি কোষ্ঠি—সবই তাদের কণ্ঠস্থ।

কাউণ্টারের সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে নীনী টিকিট কিনে আনল। বলল, 'ব্ল্যাক প্রিন্সে'র ওপর একশ' টাকা ধরলাম। মনে হচ্ছে লেগে যাবে। পরশুদিন লণ্ডন থেকে প্লেনে এসেছে। ওর মা নাইজেরিয়ান আর বাবা মিশরী। এই মিলনের ফলে আমার ভাগ্য নিশ্চয়ই ফিরবে।'

'ব্ল্যাক প্রিন্স!' বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঘোড়া।'

'ঘোড়ার আবার নাম আছে নাকি!'

নীনী যেন কৌতুকই বোধ করল আমার কথায়। বলল, 'বা রে, মানুষের নাম থাকতে পারে আর ঘোড়ার থাকবে না! চমৎকার চমৎকার নাম তাদের। লাইট্‌নিং, ব্লু অ্যারো, সানবীম—এইরকম। জানেন শুভেন্দুবাবু—'

'কী?'

'একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। আপনি তো মাসের শেষে পঁচাত্তর টাকা মাইনে পান আর একেকটা রেসের ঘোড়ার পেছনে মাসিক খরচ কত জানেন?'

'কত?' নিজের অজান্তেই জিজ্ঞেস করে ফেললাম যেন।

'আপনিই আন্দাজ করুন না।' নীনী হাসল।

'পারব না।'

'হাজার টাকার মত।'

'হাজার টাকা!'

'নিশ্চয়ই। জানেন, ওরা লক্ষ লক্ষ লোকের হার্ট থ্রব। একটা ঘোড়া

যদি এতটুকু অসুস্থ হয়ে পড়ে খাস লণ্ডন থেকে ওষুধ আর ডাক্তার প্লেনে ছুটে আসবে। নিন, এখন চলুন—'

প্রভূত পরিমাণে জ্ঞান বিতরণ করে নীনী আমাকে উত্তর দিকের গ্যালারিতে নিয়ে তুলল। সামনে কাঠের রেলিং-এর বেষ্টনীতে বৃত্তাকার রেসকোর্স। খানিকটা দূরে দূরে কাঠের স্ট্যাণ্ডের মাথায় উঁচু চতুষ্কোণ বোর্ডে ইংরেজিতে লেখা আছে, এক, দুই, তিন, চার। নীনী বুঝিয়ে দিল ওগুলো দূরত্বের নিশানা। এক অর্থাৎ এক ফার্লং, দুই মানে দু ফার্লং—

আমরা গ্যালারিতে আসার পরই দেখলাম, আটটা ঘোড়া নিয়ে আটজন জকী রেস কোর্সের মধ্যে স্টার্টিং পয়েণ্টের পাশে এসে দাঁড়াল। স্টার্টার ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছিল। হাতে তার একটা পিস্তল।

আমাদের চারপাশে গ্যালারির সীটগুলো কানায় কানায় ভরা। শুধু পুরুষই না, অগণিত সুবেশা স্ত্রীলোকও চোখে গগল্‌স্ এঁটে ভেতর ডেলা পাকিয়ে রয়েছে। ঘোড়াগুলো আসার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন অস্থিরতা দেখা দিল সব দিকে। কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য আর সচকিত উন্মাদনা।

নীনীর সঙ্গে ঝোলানো বড় একটা ব্যাগ ছিল। তার ভেতর থেকে দূরবীন বার করে চোখে লাগাল সে। দেখলাম, চারদিকে আরো অনেকের চোখেই দূরবীন উঠেছে।

একসময় স্টার্টার পিস্তল ছুঁড়ে সংকেত জানাল। ঘোড়াগুলোর মুখের সামনে রবারের দড়ির একটা নিষেধ আটকানো ছিল। পিস্তলের আওয়াজটা বাতাসে মিশিয়ে যাবার আগেই দড়িটা অদৃশ্য হল, আর ঘোড়াগুলো উল্কার মত উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

পাশে বসে নীনীকেই দেখছিলাম। ধ্যান-জ্ঞান—সমস্ত কিছু দূরবীনের মধ্যে সঁপে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বসে রয়েছে সে। অনুভব করতে পারছি, চার-পাশের সবারই নীনীর মত অবস্থা।

ঘোড়াগুলো ছুটছে। তাদের পা দেখা যাচ্ছে না। যতই তারা গন্তব্যের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে নীনীর গলার শিরগুলো মোটা নীল দড়ির মত স্ফীত হয়ে উঠছে। গালের এবং হাতের পেশিগুলো পাথরের মত এখন শক্ত। দাঁতে দাঁত চেপে বসছে। উত্তেজনা শীর্ষবিন্দুতে উঠে মত্ততার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেন।

একসময় দমবন্ধ উত্তেজক সেই অবস্থাটা কেটে গেল। ব্ল্যাক প্রিন্স জিততে পারে নি। মুখের এবং হাতের পেশিগুলো দ্রুত শিথিল হয়ে যাচ্ছে নীনীর। রক্তবাহী স্ফীত শিরাগুলো চুপসে গেছে। একটা স্খলিত অবসাদ নীনীর ওপর যেন ভর করে বসল। হতাশার একটা অব্যয় তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'যা!' শুধু এটুকু উচ্চারণ করে অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল নীনী। তারপর আবার বলল, 'প্রথম বাজিতেই হেরে বসলাম! দেখি সেকেণ্ডটার কি অবস্থা হয়। আপনি বসুন, আমি আসছি।'

নীনী চলে গেল। খানিকটা পর দ্বিতীয় বাজির টিকিট নিয়ে ফিরল সে।

এবার পঞ্চাশ টাকা ধরেছে। আশ্চর্য! এবারও টাকাটা জলে গেল। তৃতীয় বাজিরও সেই একই অবস্থা।

হারতে হারতে কেমন যেন রোখ চাপল নীনীর। ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধ লুপ্ত হয়ে গেল। দুপুরে সে বলল, 'আমি এখন আর খাব না। ব্যাগে খাবার আছে, আপনি খেয়ে নিন।'

আমি ইতস্তত করতে লাগলাম, 'আপনি খাবেন না, আর আমি—'

একরকম ধমক দিয়েই আমাকে খাওয়াল নীনী। তারপর কাউণ্টারে মুঠো মুঠো টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বাজির পর বাজি হারতে লাগল। হারার নেশায় পেয়ে গেছে যেন তাকে। সন্ধ্যে পর্যন্ত প্রায় হাজার দেড়েক টাকা হারাল সে। তারপর আজকের মত রেস যখন বন্ধ হল, বলল, 'চলুন—'

দু-জনে গ্যালারি থেকে নেমে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

একটা ব্যাপার আগাগোড়াই লক্ষ্য করছি। প্রতি বাজির সময় ঘোড়াগুলো যখন উল্কাবেগে ছুটছিল, উত্তেজনায় নীনীর শরীরের সমস্ত স্নায়ু আর পেশী ছিলার মত টান টান হয়ে যাচ্ছিল। তারপর যখন তারা গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছিল শিথিল এক অবসাদ তাকে বেষ্টন করে ফেলছিল যেন।

অশ্বক্ষুরের উড়ন্ত ধুলোর সঙ্গে দেড় হাজার টাকা অদৃশ্য হয়েছে। সে-জন্য বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই নীনীর। আমার মনে হল জুয়ার বাজি ধরে যদি সে জিতত খুব একটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত না। হেরেও তেমন বিচলিত হয় নি। আসল কথা হারজিতের যে ফলাফল তার আগের মুহূর্তে শ্বাসরুদ্ধ উত্তেজনাটুকু উপভোগ করতেই যেন তার এখানে আসা।

দু-জনে বেরিয়ে এসেছিলাম। ইতিমধ্যে বাইরে সেই গাড়ির মেলা ভেঙে যেতে শুরু করেছে।

অনেক খুঁজেও ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। অগত্যা নীনী বলল, 'চলুন, এস্‌প্লানেড পর্যন্ত হেঁটে যাই। হাঁটতে আপত্তি আছে?'

'আজ্ঞে না।' আমি মাথা নাড়লাম।

হাঁটতে হাঁটতে নীনী বলল, 'আজ একটা জিনিস পরীক্ষা করলাম।'

'কী?' আমি উদগ্রীব হলাম।

'আপনার ভাগ্য।'

'পরীক্ষার কী ফল পেলেন?'

'আপনি অতি হতভাগা।'

এ-রকম উত্তর প্রত্যাশা করিনি। থতমত খেয়ে বললাম, 'আমি হতভাগা!'

'নয় তো কী!' নীনী সস্নেহে হাসল, 'তিন চার বছর রেসকোর্সে আসছি। এ-রকম বাজে ব্যাপার আর কখনও হয়নি। এতগুলো বাজি ধরলাম অথচ একটাও জিততে পারলাম না। এ শুধু আপনাকে নিয়ে এসেছি বলে। মোস্ট আনলাকি চ্যাপ্‌।'

কিছুদূর এগিয়ে একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। কলকাতার এই প্রান্তে রেসের আসর-ভাঙা জনস্রোতের মাঝখান থেকে একখানা ট্যাক্সি সংগ্রহ করা

প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। প্রায় ঈশ্বর-প্রেরিতই মনে হল ট্যাক্সিটাকে।

গাড়িতে উঠেই বললাম, 'আমরা এখন বাড়ি ফিরছি তো?' বলেই এই কৌতূহলের জন্য নীনীর ধমকের আশঙ্কায় কাঠ হয়ে রইলাম।

'না, আপনাকে নিয়ে পারা যাবে না। কিউরিওসিটিটা আপনার বড্ড বেশি মাত্রাছাড়া।' নীনী হেসে ফেলল, 'বাড়ির জন্যে এত মন কেমন করছে কেন? আপনাদের মিসেস মিত্র তো নেই। যখন খুশি ফিরলেই তো হয়—'

'আপনি সারাদিন কিছু খান নি। তাই—'

'আমার খাবার জন্যে? সে তো যেখানে ইচ্ছা খেয়ে নিলেই হয়। তার জন্যে বাড়ি ফেরার কী দরকার? আর ব্যাগেও এখন অনেক খাবার আছে।'

'তা ছাড়া—'

'কী?'

সারাদিন রেসকোর্সে কাটিয়ে দিয়েছি। সমস্ত শরীর ভীষণ ক্লান্ত এবং অবসন্ন। আর কোথাও ঘোরার মত শারীরিক সামর্থ্য আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। সেই কথাটা অনেক দ্বিধা করে অবশেষে বলেই ফেললাম।

নীনীর এবার করুণাই হল। বলল, 'বেশ, টায়ার্ড যখন ফীল করছেন, এসপ্ল্যানেডে নামিয়ে দেব'খন। ওখান থেকে ট্রামে হোক বাসে হোক, বাড়ি চলে যেতে পারবেন।'

পরের দিনও নীনী এসে আমাকে নিয়ে গেল। তারপরের দিনও। পর পর দিনচারেক সে এল। মিসেস মিত্র নার্সিংহোমে। নিষেধের সামান্য একটু ভ্রূকুটি যা-ও ছিল তা আর নেই। অতএব উত্তেজনা-লোভী মেয়েটা দুরন্ত স্রোতে ভেসে গেল।

আজকাল বাড়ি ফেরার বিন্দুমাত্র স্থিরতা নেই নীনীর। বাধ্যবাধকতাও নয়। একদিন রাত্রে সে তো ফিরলই না।

যেদিন নীনী আমাকে রেসকোর্সে নিয়ে যায় তার পরের দিন আবার সেই আন্তর্জাতিক ক্লাবে যেতে হল। রাতের মাঝামাঝি পর্যন্ত সুইমিং পুলে সাঁতার কাটল সে। তারপর ভোরের কিছু আগে বাড়ি ফিরে এল।

একদিন সে আমাকে নিয়ে গেল রজতের সেই ফ্ল্যাটে। সেদিন আর জুয়া খেলল না। নিজের সুঠাম উত্তেজক দেহটিকে স্বচ্ছ আবরণে ঢেকে প্রায় সমস্ত রাত্রি নাচল। নীনী যে এমন পটিয়সী নর্তকী, জানতাম না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার হাতের মুদ্রা আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উত্থান পতন দেখছিলাম। আর রজতের ফ্ল্যাটের মৃত্যুপিপাসু পতঙ্গগুলো লুব্ধ লালাসিক্ত স্বরে ক্রমাগত চিৎকার করছিল। আরেক দিন সে আমাকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রাঁচি পর্যন্ত। তেমন বিদ্যুৎগতিতেই আবার ফিরে এসেছিল।

এই গতি আমার শান্ত স্তিমিত জীবনের পক্ষে প্রায় অসহনীয়। দু হাতে সীট আঁকড়ে ধরে সভয়ে বলেছিলাম, 'এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছেন কেন?'

আমার দিকে ফিরে তাকায় নি নীনী। তার চোখ সামনের রাস্তায় নিবদ্ধ

ছিল। দৃষ্টিটাকে সেখানে রেখে গতির তীব্রতা আরো বাড়াতে বাড়াতে সে বলেছিল, 'এনজয় দি স্পীড্—'

'একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে যেতে পারে।'

'হলে হবে।'

ধীরে ধীরে নীনীর জীবনের সব কিছু আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ক্লাব, হোটেল, জুয়া, ড্রিঙ্ক, রেস—এই নিয়েই তার ভোগী পৃথিবী। আমার মধ্যবিত্ত ভালমানুষের ইন্দ্রিয় এত উত্তেজনা, এত নেশা, আর মত্ততা সহ্য করতে নিদারুণ পারছে না। মনে হচ্ছে, স্নায়ুর ভেতর তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যহের জীবনযাত্রায় আর ধ্যান-ধারণায় সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে।

তা ছাড়া নীনীর এই যে অসুস্থ বিকারগ্রস্ত জীবন, এর জন্য মনে মনে উদ্বিগ্ন হচ্ছি। এই উদ্‌ভ্রান্ত আত্মহননের পথ থেকে কেউ যদি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারত! অক্ষম এক সহানুভূতিতে আমার সমস্ত চেতনা ভারী হয়ে উঠে।

মনে মনে প্রার্থনা করলাম, টিউমার অপারেশন করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন মিসেস মিত্র। নইলে নীনী আমাকে তার জীবনের আবর্তে পাক খাওয়াতে খাওয়াতে কোথায় কোন অতলে নিয়ে যাবে কে জানে।

তা ছাড়া মিসেস মিত্র ফিরে এলে এতখানি স্বেচ্ছাচার চালাতে সাহস পেত না নীনী। যত রাত্রিই হোক, আর যত অনিচ্ছাই থাক, বাড়ি সে ফিরে আসত ঠিকই।

যাই হোক, শেষ দিন নীনী আমাকে চৌরঙ্গীর সেই অভিজাত হোটেলটায় নিয়ে গেল। সতের নম্বর কেবিনে (মিসেস মিত্র আমার জন্য যেটা রিজার্ভ করে রেখেছেন) বসে নীনী বলল, 'আজ আপনাকে কেন এখানে এনেছি বলুন তো?'

'কেন?' আমি তার দিকে তাকালাম।

'আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন আমি ভাল ড্রাইভ করতে পারি, ভাল নাচতে পারি, ভাল সাঁতার কাটতে পারি।'

'হ্যাঁ।'

'আজ আপনাকে আরেকটা গুণ দেখাব।'

'কী?'

'আমি কিরকম ড্রিঙ্ক করতে পারি।' বলেই নীনী বাইরে বেরিয়ে বয়কে ডাকল, 'এক পেগ হুইস্কি আর এক পেগ বীয়ার—' ভেতরে এসে বলল, 'আপনার জন্যে বীয়ারই আনতে বললাম। হুইস্কি নিশ্চয়ই স্ট্যাণ্ড করতে পারবেন না।'

আমি উত্তর দিলাম না।

একটু পরেই বয় পানপাত্র সাজিয়ে দিয়ে গেল। এই ক'মাসের মধ্যেই পানীয় সম্বন্ধে অনেকখানি জ্ঞান সঞ্চয় করে ফেলেছি। বুঝলাম নীনীর গেলাসের আগ্নেয় তরলটুকু একেবারেই নির্জলা।

এক চুমুকে গেলাসটা নিঃশেষ করে ফেলল নীনী। তারপর বয়কে ডেকে আবার গেলাস ভরে নিল। একবার, দু-বার, তিনবার—কতবার যে বয়টা গেলাস ভরে দিয়ে গেল তার হিসেব রাখতে পারিনি। আমি শুধু স্তম্ভিত সভয় বিস্ময়ে নীনীর মদ্যপান দেখছিলাম।

মেয়েটা কি উম্মাদ হয়ে গেল! এমন পাগলের মত কেউ নেশা করে!

যতবার বয়টা গেলাস ভরে দিয়েছে ততবারই আমার শারীরিক গ্রন্থিগুলো কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে গেছে। বিস্ফারিত নিষ্পলক চোখে নীনীর দিকে তাকিয়েই আছি। আমার সামনে যে বীয়ারের সুদৃশ্য পাত্রটা সাজানো, সেটা স্পর্শ পর্যন্ত করিনি এখনো। পেগের পর পেগ নির্জলা হুইস্কি গলায় ঢেলে দেবার মধ্যে কি এমন কৃতিত্ব থাকতে পারে, বুঝে উঠতে পারছি না।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে হল, তবে কি শুধুমাত্র বাহাদুরি দেখাবার উদ্দেশ্যেই নয়, রেসের পেছনে টাকা ওড়ানো জুয়া খেলা বা সুইমিং পুলে প্রায়-নগ্ন দেহ ছুঁড়ে দিয়ে সোনালি মাছের খেলার মত এই মদ খাওয়াটা একটা উত্তেজক ব্যাপার! অর্থাৎ নীনীর যা জীবন সেখানে রোজ চড়া সুরের উত্তেজনা ছাড়া বাঁচা তার পক্ষে অসম্ভব। নিদারুণ উত্তেজনার অসহায় শিকার সে।

এদিকে গেলাসটা বার বার যতই নিঃশেষিত হচ্ছিল ততই নীনীর চোখের সাদা জমি রক্তিম হয়ে উঠছিল। ফর্সা মুখখানা, গ্রীবা, ঘাড়, কান—সব রক্তাভ, স্ফীত। কয়েক পাউণ্ড আগ্নেয় পানীয় ভেতর থেকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাইছে যেন। মাথাটা, হাতের আঙুলগুলো অল্প অল্প কাঁপছে। স্খলিত বিশৃঙ্খল একটু হাসি দু-ঠোঁটের ফাঁকে কোনরকমে ঝুলে আছে। দৃষ্টি কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত, নিশ্চল এবং অস্বাভাবিক।

আমার ভয় করতে লাগল। খুব আস্তে, রুদ্ধস্বরে ডাকলাম, 'নীনী দেবী—'

নীনী সাড়া দিল না। যেন শুনতেই পায় নি।

আবার ডাকলাম, 'নীনী দেবী—'

'ইউ সোয়াইন—' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নীনী।

চমকে উঠে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আজ্ঞে—'

'কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছিল? বেরিয়ে যাও, গেট আউট—'

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। পরক্ষণেই খেয়াল হল, হুইস্কির তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে নখী শৃঙ্গী এবং দন্তুর প্রাণীদের কাছ থেকে বহু হাত দূরে থাকবে। মাতালের কাছ থেকে কত হাত দূরে থাকা নিরাপদ, আমার জানা নেই। না জেনেও যখন এসেই পড়েছি, নীনীকে থামানো দরকার। নইলে ফলাফল কী দাঁড়াবে ভাবতেও ভরসা হয় না।

শেষবার বয় যে পানীয়টুকু ঢেলে দিয়ে গিয়েছিল, নীনী তাতে একটামাত্র

চুমুকই দিয়েছিল। দ্বিতীয় বার যখন সে গেলাস তুলল, আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, 'নীনী দেবী—'

নীনীর কাঁপা-কাঁপা শিথিল হাত মুহূর্তের জন্য থমকে গেল যেন। তার পরেই রক্তাভ নীল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে ফেটে পড়ল, 'কী—কী ব্যাপার?'

'আর খাবেন না।'

আমি যে এরকম একটা কথা বলতে পারি, নীনী যেন প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারল না। নেশার ঘোরে বিস্ময়টা সামলে উঠতে খানিকটা সময় লাগল তার। তার পরেই চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমার কথায় রাস্কেল!' বলেই গেলাসটা তুলল।

আমার চাকরি, নীনীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক—সমস্ত কিছু মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলাম। আমার শিরা-স্নায়ু-অস্তিত্ব—সব একাকার হয়ে শীর্ষ-বিন্দুতে পেঁছিল যেন। আত্মলুপ্ত হঠকারী অস্তিত্বের ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে কেউ যেন নীনীর গেলাসটা কেড়ে নিল। আমার গলার মধ্যে দ্বিতীয় কোন অলৌকিক সত্তা কথা কয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, আমারই কথায়। রেসের মাঠে, জুয়ার আড্ডায়, সুইমিং পুলে—যেখানেই গেছি তোমাকে তিলে তিলে আত্মহত্যা করতে দেখেছি। দেখতে দেখতে যন্ত্রণায় প্রাণ ফেটে গেছে আমার। না না, এমনভাবে তোমাকে আমি মরতে দেব না।'

প্রচণ্ড ঝাঁকানি লেগে নেশাটা একেবারেই কেটে গেছে নীনীর। মাথা বা হাতের আঙুলগুলো এখন আর কাঁপছে না। আরক্ত স্তব্ধ মুখে কিছুক্ষণ আমাকে দেখে ঠাস করে আমার গালে একটা চড় বসিয়ে দিল নীনী। ক্রুদ্ধ কাঁপা গলায় বলল, 'পঁচাত্তর টাকার একটা চাকর, তোমার স্পর্ধা এতদূর বেড়ে গেছে!'

একটি চড়ে আত্মবিলুপ্ত শূন্যলোক থেকে কঠিন মাটিতে আছড়ে পড়লাম। আশ্চর্য, চুম্বকের মত দুর্বার টানে নীনীর দিকে ছুটে গিয়েছিলাম। মিসেস মিত্র যতটুকু চাইতেন তার বেশি নীনীর পিছনে যাবার প্রয়োজন ছিল না। তা ছাড়া তার কাছে কোন দিক থেকেই আমার বাধ্যবাধকতা নেই। তবু সে ডাকলেই আমি আচ্ছন্নের মত বেরিয়ে যেতাম। নিশির ডাকের মত তার হাতছানিকে উপেক্ষা করবার শক্তি আমার ছিল না। ডাকিনী মন্ত্রের মত তা ছিল অপ্রতিরোধ্য।

তবে কি তার পিছনে অন্ধের মত ছুটতে ছুটতে তাকে···তবে কি—

সেদিন হোটেল থেকে কী ভাবে ভাঙা বাড়ির সেই বিবরে ফিরে এসেছিলাম, আজ আর মনে করতে পারি না। আমার সমস্ত অনুভূতি বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আর চেতনাটা গাঢ় গহন অন্ধকারে একবার ডুবছিল, পরমুহূর্তে ভেসে উঠছিল। চেতনার ডুবে-যাওয়া আর ভেসে-ওঠার মধ্যেই অন্ধের মত পথ হাতড়ে হাতড়ে শেষ পর্যন্ত এখানে এসে পৌঁছেছিলাম।

সেই যে ফিরে এসেছিলাম তারপর পাঁচটা দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে একবারও নতুন বাড়িতে যাই নি। খিদে এবং তৃষ্ণার বোধটাই কেমন বিকল হয়ে গিয়েছিল। তবে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের অভ্যাস এবং নিয়ম। নিয়মরক্ষার জন্যই মাঝে মাঝে এ-বাড়ি থেকে সেই সংক্ষিপ্ত পথে রাস্তায় বেরিয়ে বাইরের পাইস হোটেলে খেয়ে এসেছি। মিসেস মিত্র এখনও নার্সিংহোমে। টিউমার অপারেশনের আগে অবজারভেশনে আছেন। তিনি থাকলে এভাবে পালিয়ে থাকা সম্ভব হত না। ও বাড়ি যেতেই হত। মিসেস মিত্র নেই, এ একরকম ভালই হয়েছে।

নতুন বাড়িতে এ ক'দিন যাই নি, সেটা নিতান্ত অকারণে নয়। যাই নি ভয়ে। হোটেলের সেই ব্যাপারটা আমার সব দিকে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে যেন। গেলেই তো নীনীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আমার নেই।

প্রথম দুটো দিন ভাল করে ঘুমোতে পারি নি, খেতে পারি নি। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে নিদারুণ এক অস্বস্তি আমাকে ঘিরে ছিল। একটা রুদ্ধশ্বাস আতঙ্ক চারপাশ থেকে ঘন হয়ে আসছিল। আর মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে একটা খড়্গ আমার কাঁধে নেমে এল বলে।

তৃতীয় দিনের সকাল থেকে কেমন যেন অবসাদ দেখা দিল আমার মধ্যে। ভয়ের সেই অনুভূতিটা শিথিল হয়ে যেতে আরম্ভ করল। তার বদলে অদম্য মরিয়া একটা ভাব মাথা তুলতে লাগল। যা হবার হবে। আসল কথা, ভয়-আনন্দ-বিষাদ—আমার নরম ধাতের নিরীহ স্নায়ুর পক্ষে কোন কিছুই দীর্ঘকাল চড়া সুরে বেঁধে রাখা অসম্ভব। ব্যাপারটা হঠাৎই যেন আবিষ্কার করে ফেললাম। কিংবা এ-ই হয়ত সত্যি, অনুভূতির বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আমরা নিজেদের কোন কোন অদৃশ্য দিগন্তকে আবিষ্কার করে ফেলি।

যাই হোক, ভয়ের বিন্দু থেকে আলগা হয়ে আমার ভাবনাটা দ্রুত আরেক দিকে ফিরে গেল। শেষ দুটো দিন সেই ভাবনাটা আমাকে গ্রাস করে রাখল।

চাকরি নিয়ে প্রথম যেদিন এ বাড়িতে ঢুকি, মনে হয়েছিল নির্বাসনে

এসেছি। জঙ্গলে-ঘেরা এই শান্ত স্তব্ধ প্রায়-নির্জন বাড়িটাকে সানন্দে গ্রহণ করতে পারিনি।

মানুষ হিসেবে আমি তেমন বহির্মুখী নই। আবার অন্তর্মুখীও তো না। কাজেই একশ বর্গফুট আয়তনের একখানা ছোট্ট ঘরে আটকে থাকতে দম বন্ধ হয়ে আসত। কিন্তু শেষের এই দুটো দিন কি যেন হল আমার। এই নিরিবিলি বাড়ির নির্বাসনটাকে অদ্ভুত ভাল লেগে গেল। কয়েক মাস আগের সেই বিতৃষ্ণা বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। আশ্চর্য মানুষের মন!

আমার ছাব্বিশ বছরের জীবনে, বিশেষ করে কয়েক মাসের চাকরিতে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা নিয়ে একটা ঘরে অনন্তকাল দুয়ার বন্ধ করে থাকা যায়। সেগুলোকে নাড়াচাড়া করে তাদের ঘ্রাণ নিয়ে নিজেকে মগ্ন রাখতে পারি। মোট কথা বাইরের ঘটনাগুলি নিরর্থকই হয়ে যায় যদি না মনের ভেতর স্তরে তারা ঢেউ তুলতে পারে।

ক'মাসের চাকরিতে নীনী-সুরপতি-সীতেশদা-মিসেস মিত্র, সীতেশদার বউ বুলকি—নানা মানুষের বিচিত্র এক মিছিল দেখলাম। যুদ্ধকালীন যুগের শিকার এই মানুষগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে দুটো দিন সমস্ত অস্তিত্ব আলোড়িত হয়ে রইল।

ষষ্ঠ দিন সকালে রোদ উঠলে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। স্নান খাওয়ার সময়টুকু বাদ দিলে এই পাঁচ দিন আমার সেই গুহা থেকে বার হই নি।

প্রথমে মনে হচ্ছিল, অভিজ্ঞতার অনন্ত সঞ্চয় নিয়ে রুদ্ধদ্বার ঘরে আজীবন কাটিয়ে দিতে পারব। কিন্তু সেই যে আমার স্বভাব, সেটাই হয়ে দাঁড়াল বাধা। কোন কিছু নিয়ে দীর্ঘকাল মগ্ন থাকার শক্তি আমার নেই। অতএব বাধাটাকে অতিক্রম করা গেল না।

পাঁচদিন পর আজ কিছুই ভাল লাগছে না। সময় যেন মন্থর ভারবাহী একটা পশু। সামনের দিকে একটা পা-ও ফেলতে চাইছে না। একবার ভাবলাম, বুলকিদের বাড়ি যাই। ইচ্ছা করল না। স্থির করলাম, সীতেশদার সঙ্গেই দেখা করে আসি। মনের দিক থেকে সায় মিলল না। আবার ভাবলাম, ক'দিন ধরে মিসেস মিত্র নার্সিংহোমে আছেন। তাঁর একটা খোঁজ নেওয়া দরকার। কিন্তু ইচ্ছেটা তাতেও বেঁকে বসল। সময় যে কী-ভাবে কাটাব!

চারদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চোখ পড়ল। বাড়িটা ইংরেজি থার্ড ব্র্যাকেটের মত। পর পর ছ' খানা ঘর সারিবন্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ প্রান্তের শেষ ঘরখানা আমার। উত্তর প্রান্তের শেষ দু' খানা নিয়ে কনক এবং তার বাবার ছোট্ট সংসার। মাঝখানের তিনখানা ঘরে কী আছে, আমার কাছে তা রহস্য। অবশ্য রহস্য উন্মোচনে কোনদিন চেষ্টা করিনি।

আজ কর্মহীন অস্থির অবসরে আমার উপর কী যেন ভর করে বসল। ঠিক করলাম, ঘর ক'খানার মধ্যে কী আছে, দেখব। নিছক কৌতূহল, হয়ত

ছেলেমানুষিই। কিংবা সময় কাটাবার নতুন এক উপায়।

পুরনো জীর্ণ বাড়ি। ঘরগুলির মধ্যে কী-বা থাকতে পারে! হয়ত ভাঙাচোরা বাতিল কোন আসবাব, নতুবা ব্যবহারের অযোগ্য অন্য কিছু।

জানা সত্ত্বেও এমন গাম্ভীর্য নিয়ে এগিয়ে গেলাম যাতে মনে হতে পারে লিভিংস্টোনের মত অভিনব কিছু একটা আবিষ্কার করতে চলেছি। সর্বাঙ্গে তেমনই একটা রোমাঞ্চ।

প্রথম ঘরটির সামনে এসে কিন্তু দমে যেতে হল। লোহার কড়ায় প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। দ্বিতীয় ঘরখানিরও একই অবস্থা। অবশেষে অনেকখানি সংশয় নিয়ে তৃতীয় ঘরটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভেবেছিলাম এটির ললাটলিপিও বুঝি একই রকম। কিন্তু না, তালার চিহ্নমাত্র নেই। দরজাটা আলগোছে ভেজানো।

কেউ নেই তো? কিছুক্ষণ ইতস্তত করে আস্তে ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে রীতিমত অবাকই হয়ে গেলাম।

ভেবেছিলাম, পুরনো বাড়ির ভ্যাপসা ভারী বিষাক্ত দুর্গন্ধ উঠে এসে ইন্দ্রিয়গুলোকে অসাড় করে দেবে। ভেবেছিলাম, বহুকালের স্তূপীকৃত আবর্জনা দেখতে পাব। তার বদলে দেখলাম, চারপাশ আশ্চর্য পরিচ্ছন্ন। এককোণে বিশাল একখানা তক্তাপোষে নিভাঁজ বিছানা। শিয়রের দিকে তিনখানা বড় বড় আলমারি অসংখ্য বইয়ে ঠাসা। যেটুকু পড়তে পারছি, বইগুলোর অধিকাংশই বিভিন্ন দেশের ইতিহাস। কয়েক ভলিউম বিশ্বকোষও আবিষ্কার করা গেল। আলমারিগুলো অবশ্য তালাবন্ধ। চার দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং গান্ধীজীর চারখানা পূর্ণাবয়ব ছবি।

আরেক ধারে বার্মা টীকের প্রকাণ্ড একখানা টেবল আর খানচারেক চেয়ার। একটা টাইমপীস্ কালের হৃদ্‌স্পন্দনের মত অবিরত বেজে চলেছে। মনে হয় এ ঘর অব্যবহৃত বা পরিত্যক্ত নয়। নিয়মিত বাস করার সমস্ত লক্ষণই এখানে রয়েছে।

ঘরখানার পরিবেশ এমনই যে ঢোকামাত্র আমার শ্রদ্ধা এবং শুচিতার বোধকে সজাগ করে দিয়েছে।

চারদিক দেখতে দেখতে টেবলটার ওপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। অনেকগুলো নতুন এবং পুরনো খাতা—খান পঞ্চাশেক হবে—থাকে থাকে সাজানো রয়েছে সেখানে। খাতাগুলোর আকৃতি অনেকটা বইয়ের মত।

পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম এবং শোভনতা অশোভনতার কথা ভুলে গিয়ে একটা খাতা খুলে দেখলাম প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে লেখা আছে, 'ইংরাজি ১৯৩০ সাল, বাঙলা সন ১৩৩৭'। নাম-ধাম কিছু নেই। পাতা উল্টে বুঝলাম দিনলিপির ধরনে খাতাময় বিবরণ রয়েছে। আরেকটা খাতা টেনে নিলাম। আগেরটার মত এটারও প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা, 'ইংরাজি ১৯২২ সাল, বাঙলা সন ১৩২৯'।

মোট পঞ্চাশ খানা। একে একে সবগুলি উল্টে গেলাম। আঠার শ

তিরানব্বই থেকে উনিশ শ বেয়াল্লিশ—মোট পঞ্চাশ বছর। প্রতি বছরের জন্য একখানা করে খাতা। গুণে গুণে দেখলাম, সব ক'টি খাতাই বছর অনুযায়ী সাজানো আছে।

দেখতে দেখতে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে একটা চেয়ার টেনে নিলাম। তারপর আঠার শ তিরানব্বুইর প্রথম খাতার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে যতই গভীরে যাচ্ছি ততই যেন ডুবে যাচ্ছি। কে জানত, ছেলেমানুষি খেলাচ্ছলে এ ঘরে এসে অকস্মাৎ এমন একটা অভাবিত বিস্ময়কে আবিষ্কার করে বসব!

আরম্ভটি এই রকম ঃ

'উনিশ শতকের শেষাংশে আমার জন্ম। রূপার চামচ মুখে লইয়া পৃথিবীতে আসি নাই। যে পরিবারে জন্মিয়াছি তাহাদের বিত্ত নাই কিন্তু এই কলিকাতা শহরে মর্যাদা এবং গরিমায় বিশিষ্ট একটি স্থান তাহারা অধিকার করিয়াছিল।

আমাদের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার মামুদপুর নামক গ্রামে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে এই শহর যখন ভ্রূণের আকারে, আমার প্রপিতামহ স্থায়ীভাবে এখানে বাস করিতে আসেন। তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত পুরুষ। দূর এবং দিব্যদর্শীও। বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নূতন যে যুগ আসিতেছে তাহার সূর্যোদয় হইবে কলিকাতায়। আর এই সূর্যোদয়ের আলোয় স্নান না করা মূঢ়তা তো বটেই, অন্যায়ও। আত্মবিকাশের জন্য এখানে আসা একান্ত প্রয়োজন। এই শহরে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনা করিতেন তিনি। বাবার মুখে শুনিয়াছি সে-যুগের প্রায় সকল কীর্তিমান পুরুষই প্রপিতামহের কাছে নিয়মিত আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন, উইলিয়াম কেরী, ডাক্তার মার্শম্যান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামমোহনের যুক্তিবাদ, ব্রহ্মবাদ এবং ব্রহ্মোপাসনার বিষয় লইয়া সে-সময় তুমুল তর্ক হইত।

আমার প্রপিতামহ যদিও সংস্কৃতের অধ্যাপক তথাপি কোন প্রকার গোঁড়ামি তাঁহার ছিল না। নিজেকে কোনদিন অচলায়তনে বন্দী করিয়া রাখেন নাই। ইংরাজি ভাষার অফুরন্ত শক্তিকে সংস্কার বশে তিনি বর্জন তো করেনই নাই বরং তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং নিষ্ঠাবান ছাত্রের মত সসম্ভ্রমে তার চর্চাও করিয়াছিলেন।

'যাহা হউক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইওরোপের জ্ঞানরাজ্যের ছটা এদেশে আসিয়া লাগে। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় ভল্টেয়ার, হিউম, লক, টম পেইন প্রভৃতি চিন্তানায়কদের অমূল্য গ্রন্থ আসিতে থাকে। বাঙলাদেশের উর্বর পলিমাটিতে সেই সব চিন্তার বীজ উপ্ত হইয়া পরবর্তীকালে বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছিল। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর শিক্ষা ও এইসব গ্রন্থের প্রত্যক্ষ প্রভাব উনিশ শতকে ইয়ং বেঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছিল।

'মোট কথা, উনিশ শতকটাই আমাদের ইতিহাসের সুবর্ণময় যুগ। রামমোহনের যুক্তিবাদ হইতে শুরু করিয়া স্ত্রীশিক্ষা, ধর্মান্দোলন, সমাজ-

সংস্কার, সিপাহী বিদ্রোহ, নীল আন্দোলন—সকল দিকেই আলোড়ন উঠিয়াছে। এই এক শতাব্দীর সুবিশাল পটভূমিতে বিভিন্ন দিকের দিক-পালেরা, যেমন বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত —আমাদের বাড়িতে আসিতেন। কলিকাতা শহরে তাঁহারা ছিলেন উজ্জ্বল প্রাণধারার বাহক। অন্যদিকে এই শহরেই আরেক দল মানুষ তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে অর্থের পিছনে ছুটিয়াছে, একদল ইংরাজের গোলামখানায় নাম লিখাইয়াছে। অপর এক গোষ্ঠী বাবুতন্ত্রে আর প্রমোদের জোয়ারে গা ভাসাইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। সেই সময় আমাদের বাড়িতে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি—জীবনের এমন কোন দিকই নাই যাহা লইয়া আলোচনা না হইত।

'আমার পিতামহ এবং বাবা প্রপিতামহের ধারা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারাও অধ্যাপনা করিতেন। পিতামহ প্রপিতামহের মত সংস্কৃতেরই অধ্যাপক ছিলেন। বাবা ছিলেন ইংরাজির অধ্যাপক।

'অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রতিটি মনীষীই আমাদের পরিবারে কিছু না কিছু ছাপ রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের সংসার যেন সহিষ্ণু তটভূমি, দেশের সমস্ত প্রাণবান আন্দোলনই তাহার পাড়ে ঢেউএর মত দাগ আঁকিয়া আঁকিয়া গিয়াছে।

'দরিদ্র অধ্যাপকের ঘরে জন্মিয়াছিলাম ঠিকই। ঐশ্বর্য বা বৈভবের মধ্যে মানুষ হইতে পারি নাই। তবু দুই শতাব্দীর ভাবনা-চিন্তা এবং জীবনচর্যার অনেকখানি উত্তরাধিকার আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

'কৈশোরে দেখিয়াছি অরবিন্দ ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা আমাদের বাড়ি আসিতেন। দেশে তখন প্রবল জোয়ার আসিয়াছে। স্বাদেশিকতার জোয়ার। একদিন সেই জোয়ারে ভাসিয়া গেলাম।'

•

প্রথমে মনে হয়েছিল, খাতাগুলোতে সাধারণ দিনলিপির মত কিছু লেখা আছে। এখন দেখছি, এর জাত আলাদা, স্বাদ এবং মেজাজ একেবারেই ভিন্ন। লেখকের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন যুগ কী ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে লেখাগুলো তারই মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ। শুধু কি তাই, লেখকের আত্ম এবং জীবনজিজ্ঞাসার দীপ্তিও এর মধ্যে ফুটে বেরিয়েছে। সেই সঙ্গে আছে দেশের রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক, প্রধান প্রধান সকল ঘটনার ইতিহাস।

একদিনে এই বিপুল সংখ্যক খাতা পড়ে ওঠা অসম্ভব। এর পর প্রতিদিন সকালে কনক স্কুলে বেরিয়ে গেলে দুর্বার আকর্ষণে সেই ঘরখানায় গিয়ে ঢুকি। খাতাগুলোর মধ্যে ডুবে যাই। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মনে থাকে না। বিচিত্র তন্ময়তার মধ্যে কী-ভাবে সময় কেটে যায়, বুঝতে পারি না।

এর মধ্যে লেখক সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যই জেনে ফেলেছি। এবং তিনি যে কে, তা-ও আবিষ্কার করেছি। তিনি হেমন্তবাবু,—মিসেস মিত্রের স্বামী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে দেশের সব ক'টি স্বাধীনতা সংগ্রামের

পুরোভাগে থেকে হেমন্তবাবু বার বার জেলে গেছেন। জীবনের এক তৃতীয়াংশ তাঁর কারাগারেই কেটে গেছে।

এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'এতকাল 'সেল্‌ফ গভর্নমেণ্ট' বলিয়া একটা শব্দ চালু ছিল। প্রস্তাবকর্তা চাতুর্যের সহিত শব্দটির পিছনে 'কলোনিয়াল' কথাটি জুড়িয়া দিয়া শ্যাম এবং কূল—দুই-ই রক্ষা করিতেন। ইহাতে ব্রিটিশ সরকারের রোষভাজন হইতে হইত না। উপরি পাওনা ছিল দেশের লোকের হাততালি। কিন্তু আমরা যাহা দাবি করিতেছি তাহা হইতেছে, কোন শর্ত নয়, চুক্তি নয়, 'কলোনিয়াল' শব্দের লেজুড় নয়—পূর্ণ নিঃশর্ত স্বাধীনতা। তাহাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। যতদিন তাহা না পাইতেছি ততদিন সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে।'

স্বাভাবিক নিয়মেই লেখকের পারিবারিক ইতিহাস আমার অজ্ঞাত নয়। উনিশ শ পনের'র খাতাটিতে তিনি লিখেছেন, 'দুই বৎসর আগে প্রথম বার বিবাহ করিয়াছিলাম। একটি কন্যাসন্তান হইয়াছে। নাম দিলাম নীনী। কিন্তু আমার একান্ত দুর্ভাগ্য নীনীর মাতা আজ স্বর্গে গেলেন। এই শোকে নিজেকে নিজে যে সান্ত্বনা দিব তেমন শক্তি আমার নাই।'

উনিশ শ আঠারোর খাতাটিতে লেখা আছে, 'নীনীর প্রাণরক্ষার জন্য একটি মায়ের অবশ্যই প্রয়োজন। তাই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলাম। দ্বিতীয়া স্ত্রীকে যে সংসার হইতে আনিয়াছি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভোগে বিলাসে এবং চূড়ান্ত বাবুয়ানায় তাহাদের খ্যাতি ছিল। বর্তমানে অবশ্য তাহারা শূন্যকুম্ভ। আমার তারে সে সুর বাঁধিতে পারিবে কি-না, বুঝিতে পারিতেছি না।'

পড়তে পড়তে চমকে উঠলাম। মিসেস মিত্র তাহলে নীনীর সৎ-মা! এই কারণেই কি তার প্রাণে এত নিদারুণ বিতৃষ্ণা, সৎ-মাকে 'মা' বলে না সে!

উনিশ শ একত্রিশের খাতায় আছে, 'গত বৎসর অর্থাৎ তিরিশ সালে চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়া গেল। আর সমস্ত দেশে আসিল অপূর্ব প্রাণবন্যা। অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন। পিকেটিং, ধর-পাকড়, গুলি, বিলাতি-বর্জন—দেশ এমনভাবে আর কোন দিন সাড়া দেয় নাই। আসমুদ্র হিমালয় এই বিশাল বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষ ইহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কী হইল তাহাতে? আরউইন চুক্তিতে এই প্রাণস্রোত রুধিয়া গিয়াছে। এই জীবনবন্যাকে কাজে লাগাইতে পারিলে প্রচুর ফল পাওয়া যাইত। এইভাবে চলিলে কতদিনে যে স্বাধীনতা আসিবে!'

উনিশ শ পঁয়ত্রিশের খাতায় আছে, 'বুঝিতে পারিতেছি পুরাদমে তোড়-জোড় চলিতেছে। দুই-একদিনের মধ্যেই জেলখানার তলব আসিল বলিয়া। নীনী, দ্বিতীয়া স্ত্রী সুষমা এবং তাহার গর্ভজাত পুত্র জয়ন্তকে দেখাশুনার জন্য ভাবিতেছি আমার ভায়রা সুরপতিবাবু এবং তাঁহার মেয়ে কনককে আমার বাড়ি আনিয়া রাখিব।'

উনিশ শ বেয়াল্লিশের খাতায় আছে, 'পঁয়ত্রিশ সালে সেই যে সরকারের

লাল বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিলাম এখনও সেইখানেই কায়েমী হইয়া আছি। জেলে বসিয়াই নানা খবর শুনিতে পাই। দুই গোলার্ধে যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। এদেশেও তাহার প্রবল ধাক্কা আসিয়া লাগিয়াছে, ফলে ভিত্তিমূল নড়িয়া উঠিয়াছে।

'ইহার মধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই অক্ষশক্তির প্রচণ্ড আঘাতে জর্জরিত হইয়া ব্রিটিশ সিংহ ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়াছে। পার্লামেণ্টে ধুরন্ধর ক্রীপস্ কয়েক খণ্ড মাংসের প্রলোভন দেখাইয়া এই বিশাল দেশের জনবল, সম্পদবল নিজেদের অনুকূলে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রীপস্ প্রস্তাবের ভিক্ষামুষ্টি দেশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। গান্ধীজী ইহাকে বলিয়াছেন 'পোস্টডেটেড চেক'। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী দেশকে একটি মন্ত্রই দান করিয়াছেন—'কুইট ইণ্ডিয়া'। কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটিতে তাহা অনুমোদিত হইল।

অবশ্য 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব গান্ধীজীর পূর্বে দিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্র। ১৯৩৮-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে জলপাইগুড়ি অধিবেশনে। ইংরাজকে ছয় মাসের নোটিশে 'ভারত ত্যাগের' দাবি জানাইয়া প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ১৯৩৯-এ সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হন। তাঁহার 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব এই অধিবেশনে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতায় গৃহীত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্র 'ভারত ছাড়' মন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা।

'যাই হোক, সুভাষচন্দ্রের 'ভারত ছাড়' গান্ধীজীর মুখ হইতে বাহির হইয়া নূতন তাৎপর্য লাভ করিল। সমস্ত দেশ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত সজাগ হইয়া উঠিল।

''ভারত ছাড়' নীতিকে পূর্ণ রূপ দিতে গিয়া গান্ধীজী হইতে শুরু করিয়া দেশের সমস্ত নেতা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। নেতৃত্বহীন দেশ স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইহাই আগস্ট বিপ্লব। মেদিনীপুর হইতে সাতারা, মাদ্রাজ হইতে পাঞ্জাব—এই সুবিপুল দেশের এমন কোন প্রান্ত নাই যেখানে আগস্ট বিপ্লবের দোলা না লাগিয়াছে। ইংরাজও ইহাকে দমন করিবার জন্য রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছে। হত্যা জেল নারীধর্ষণ নিপীড়ন অত্যাচার—বর্বর-যুগের সমস্ত নীতিই ইহারা পাইকারিভাবে প্রয়োগ করিয়াছে। পৃথিবীতে ইংরাজ সভ্য মার্জিত জাতি বলিয়া নাকি গর্ব করে!

'ইহা হইল বৃহত্তর দেশের রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির দিক। কিন্তু বাঙলাদেশের ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনকে এই যুদ্ধ ওলট পালট করিয়া দিয়াছে। যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশ উদ্‌ভ্রান্ত আর ভোগবাদী হইয়া উঠিয়াছে। জেলে বসিয়া সব খবরই পাই। সমাজদেহের কোথাও সুস্থতা বা শালীনতার চিহ্নমাত্র নাই। আমার স্ত্রী-পুত্রকন্যা এই যুদ্ধকালীন প্রমত্ততার আঘাত সামলাইতে পারে নাই। অর্থ এবং ভোগের সন্ধানে তাহারা উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীর কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। তাহার শরীরে তো ভোগ এবং বাবুয়ানার যুগের রক্তই প্রবাহিত, কিন্তু নীনী বা জয়ন্ত—তাহারা

ভুল করিল কি করিয়া ? তাহারা তো আমারই ঔরসজাত। দুই শতাব্দীর যে উত্তরাধিকার তাহাদের চেতনায় প্রবেশ করাইতে চাহিয়াছিলাম তাহা কি ব্যর্থ হইয়া গেল ? 'হেরিটেজ' শব্দটা সম্পর্কে নতুন করিয়া ভাবিতে হইবে।

'অথচ আশ্চর্য মেয়ে এই কনক। তাহার বাবা তো চূড়ান্ত ভোগবাদী, মদ্যপ, বিলাসী। কিন্তু সে তো পূর্বপুরুষের ধারা বহন করিল না। সে আসিল আমার পথে। আমার প্রকৃতি হইতে ধাতু সংগ্রহ করিয়া সে নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই জেলে আমার সহিত দেখা করিতে আসে। সব কেমন যেন তালগোল পাকাইয়া যাইতেছে।

যাহা হউক, জেল হইতে যদি কোনদিন মুক্তি পাই নতুন করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করিবার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক ক্ষেত্রেও সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমার আদর্শের সহিত যুদ্ধকালীন উদ্‌ভ্রান্তির সংঘাত।'

শেষ খাতাখানা শেষ করতে পারলাম না। তার আগেই ধরা পড়ে গেলাম।

অসন্তুষ্ট বিরক্ত সুরে কে যেন ডাকল, 'শুভেন্দুবাবু—'

চমকে পিছন ফিরতেই দেখলাম, ঘরের মাঝখানে কনক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ভয়ে ভয়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম।

আগের সুরেই কনক বলল, 'এ সব কী ?'

সে কী বলতে চায় বুঝতে পেরেছি। নতমুখে বললাম, 'দেখুন—'

'কী আবার দেখব, এ ঘরে কে আপনাকে আসতে বলেছে ? কে আপনাকে এইসব পার্সোনাল ডায়েরী পড়ার হুকুম দিয়েছে ?'

কিছু একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করলাম। কনক কোন কথাই শুনল না। ক্ষিপ্তের মত বলে উঠল, 'যান, বেরিয়ে যান।'

ম্রিয়মাণ পাংশুমুখে বেরিয়ে এলাম।

আশ্চর্য ! পরের দিন সকালে সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছি, কনক এল। অনুতপ্ত সুরে বলল, 'দেখুন, কাল আপনার ওপর ভয়ানক অন্যায় করে ফেলেছি। রাগের মাথায় যা-তা বলেছিলাম।'

বললাম, 'দোষ তো আমারই হয়েছিল, আপনার অন্যায় কোথায়। সত্যি, ওভাবে খাতাগুলো পড়া আমার উচিত হয় নি।'

'যা হবার হয়ে গেছে, আপনি যেন কালকের ব্যবহারের জন্যে মনে কোন ক্ষোভ রাখবেন না।' বলতে বলতে বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে দিল কনক। প্রায় বেরিয়েও গিয়েছিল সে। কি ভেবে ফিরে আবার বলল, 'খাতাগুলো সব পড়েছেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে শেষ খাতার খানিকটা বাকি আছে।'

'তা হলে তো কনট্রাস্টটা বুঝতেই পেরেছেন।'

বিমূঢ়ের মত বললাম, 'কিসের ?'

তীক্ষ্ম দূরভেদী দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল কনক। বলল, 'আপনি যার কাছে কাজ নিয়েছেন—মানে মাসিমার—তবে মেসোমশায়ের—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল।

মেয়েটি কী বোঝাতে চায়, আমার কাছে অবোধ্য থেকে গেল। তবু বলার ভঙ্গিতে এটুকু বুঝলাম, মিসেস মিত্রের সম্বন্ধে তার মনে নিদারুণ বিরূপতা আছে। অবশ্য এই বিরূপতার পরিচয় আমি পেয়েছিলাম।

একটুক্ষণ চুপচাপ। তারপর কনক বলল, 'আচ্ছা যাই।'

'যাবেন!' ফস করে কথাটা মনে এল। বললাম, 'আমাকে ক্ষমা যখন করেছেন, একটা কথা বলব?'

'কী?'

'খাতাগুলো থেকে আর মিসেস মিত্রের কথায় জানতে পেরেছি মিস্টার মিত্র এখন জেলে। আর প্রায়ই আপনি সেখানে যান।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'অনুগ্রহ করে আমাকে একদিন তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন?'

কনকের তীক্ষ্ণ চোখ তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল, 'কেন?'

'এমন মানুষ আমি কখনও দেখি নি। একটা প্রণাম করে আসব।'

আমার গলায় এমন কিছু আন্তরিকতা, আবেগ এবং শ্রদ্ধা ছিল যেগুলো একাকার হয়ে কনককে স্পর্শ করল। স্নিগ্ধ গলায় সে বলল, 'নিয়ে যাবার আগে মেসোমশায়কে একবার জানানো দরকার। উনি নিতে বললে—'

তার কথা শেষ হবার আগে জেদী সুরে বললাম, 'না না, যদি-টদি নয়, আমাকে নিয়ে যেতেই হবে।'

'আচ্ছা-আচ্ছা—' কনক হাসল।

দিন তিনেক পর কনক বলল, 'জানেন একটা সুখবর আছে।'

'কী?' আমি উদ্‌গ্রীব হলাম।

'কিছু রাজনৈতিক বন্দী শিগগিরই মুক্তি পাচ্ছেন। সেই কিছুর দলে মেসোমশাই পড়ে গেছেন। মাসখানেকের মধ্যেই উনি 'রিলিজড' হবেন। এর মধ্যে গিয়ে আর দরকার নেই। 'রিলিজ'-এর দিন আমরা দল বেঁধে অনেকে যাচ্ছি। আপনিও যাবেন।'

আমার সারা শরীর শিহরণ খেলে গেল যেন।

একদিন কল্পনা করতাম, বি-এ পাশ করে মোটা অঙ্কের একটা চাকরি সংগ্রহ করব। আমার জীবন আর স্বপ্নের সেটাই ছিল সর্বশেষ সীমারেখা। কিন্তু কলকাতায় এসে নীনী-মিসেস মিত্র-সীতেশদাদের দেখে, অনবরত তাদের সংস্রবে থেকে শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

আমি কি জানতাম আমার জীবনের সীমারেখা বা সীতেশদা-নীনীদের বাইরেও বিস্তীর্ণ একটা পৃথিবী আছে? দুই শতাব্দীর উত্তরাধিকার নিয়ে একটি মানুষ সেই পৃথিবী থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই এসে পড়বেন। নতুন স্রোতে ভাসবার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে রইলাম।

দুই

হেমন্তবাবুর সেই দিনলিপির খাতাগুলি আমার অস্তিত্বের সকল দিকে দোলা দিতে শুরু করেছে। ছাব্বিশ বছর ধরে নানা সংস্কার আর অভ্যাস দিয়ে যে চিন্ময় জগৎটি সযত্নে গড়ে তুলেছিলাম হঠাৎ সেটা যেন একেবারেই মূল্যহীন হয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে চিরদিনই আমি আত্মসমাহিত। নিজের চারপাশে উঁচু উঁচু দেওয়াল তুলে একটা দুর্গের মধ্যে এতকাল নির্বাসিত থেকেছি। তার ভেতরকার যে বন্ধ হাওয়া এতকাল ফুসফুসে টেনেছি, কে জানত তার বাইরে বেগবান সঞ্জীবনী আরো হাওয়া আছে। যে মন্থর নিস্তরঙ্গ জীবন-স্রোতের ওপরে এতকাল ভেসে থেকেছি, কে জানত তার বাইরেও দুরন্ত দুর্বার একটা ঢল রয়েছে যা সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মোট কথা, চারদিকের প্রাচীর চুরমার হয়ে আমার সেই পুরনো আত্মকেন্দ্রিক পৃথিবীটার ভেতর ঝড় নেমে এসেছে।

মাসকয়েক আগেও আমি ছিলাম হুগলী জেলার সেই গ্রামটিতে। বাবার মৃত্যুর পর কলকাতায় এসে মিসেস মিত্রের কাছে চাকরি নিয়েছি। এখানে অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর কলকাতার ভেতরে এবং বাইরে কত কিছুই তো দেখলাম। নীনী, মিসেস মিত্র, বুলকি, সীতেশদা—যেদিকেই তাকিয়েছি শুধু অন্তহীন অগাধ অন্ধকার। সেই অন্ধকার হাজার হাত বাড়িয়ে আমাকে অতলে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছে। খানিকটা যে নামি নি, তা নয়। এই কলকাতা আমার মুখে কয়েক মুঠো পাঁক ছুঁড়ে দিয়েছে। চারদিকে নরকের যে সর্বগ্রাসী সাধনা চলছে তার থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা বুঝি কারুর নেই।

যেটুকুই ডুবে থাকি না, এই ক'মাসের জীবনটাকে মনে-প্রাণে ঘৃণাই করেছি। মিসেস মিত্ররা যতই আমাকে টানতে চেষ্টা করেছেন ততই অসহ্য যন্ত্রণায় আমার শিরা স্নায়ু একটু একটু করে কুঁকড়ে গেছে। আজন্মের যে সংস্কার, বিশ্বাস আর অভ্যাস সঙ্গে নিয়ে একদিন কলকাতায় এসেছিলাম বাঁচবার জন্য বার বার সেগুলোর কাছেই ফিরে গেছি। এই ক'মাসে এমন কিছুই চোখে পড়ে নি যা শ্রদ্ধা করতে পারি, যার মধ্যে ডুব দিয়ে উঠে বলতে পারি, 'আহা, মন জুড়িয়ে গেল।' দিগন্তব্যাপী গ্লানির মাঝখানে এক বিন্দু অমৃতের তলানি কোথাও খুঁজে পাই নি। কিন্তু মিস্টার মিত্রের দিনলিপির কয়েকটি খাতা যেন অস্পষ্ট উচ্চারণে বলে দিল, 'আছে, আছে। একেবারে হতাশ হবার কিছু নেই।'

মিসেস মিত্র এখনও নার্সিংহোমে। টিউমার অপারেশন অবশ্য হয়ে গেছে। আরো দিন সাতেক সেখানে থেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। অতএব সমস্ত দিন আমার অনন্ত অবসর। নতুন বাড়িতে এখনও যাতায়াত শুরু করিনি। নীনী সম্পর্কে সেই লজ্জা, সঙ্কোচ এবং নিদারুণ ভয়টা আমাকে ঘিরেই আছে। কিছুতেই এসবের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে

পারছি না।

খাওয়া-দাওয়া সেই একইভাবে চলছে। সকালে-বিকেলে বাইরের সস্তা একটা চায়ের দোকানে খেয়ে আসি। দুপুরে এবং রাত্রে যাই পাইস হোটেলে।

মিস্টার মিত্রের ডায়েরির খাতাগুলো আমার ঘুমন্ত একটা দিককে হঠাৎ খুব বেশিমাত্রায় সজাগ করে তুলেছে। এতকাল পৃথিবীর সকল দিকে পিঠ ফিরিয়ে প্রবাল বলয় দিয়ে ঘেরা একটা লেগুনে যেন নিজেকে নির্বাসন দিয়ে রেখেছিলাম। দেশ কাল সমাজ স্বাধীনতা—এ সব প্রশ্ন কোনদিনই আমাকে নাড়া দিতে পারে নি। পরীক্ষায় পাশ করার জন্য যে ক'টি পাঠ্য বই, তার বাইরে কোনদিন আর কিছু পড়েছি বলে মনে হয় না। সংকীর্ণ আত্ম-কেন্দ্রিকতার বাইরে যে প্রসারিত বিপুল দিগন্ত ছড়িয়ে আছে সে সম্বন্ধে এতকাল না ছিল আমার কৌতূহল, না কোন বিস্ময়। দীর্ঘ ছাব্বিশটা বছর পার হয়ে আসার পর মিস্টার মিত্রের দিনলিপিগুলো আমার অভ্যস্ত জীবনটাকে একেবারে এলোমেলো করে দিল। বাঙলাদেশের দুই শতাব্দীর যে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস আভাসে-ইঙ্গিতে তিনি তাঁর ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন সেগুলো বিশদভাবে জানার জন্য আমার সমস্ত চেতনা উন্মুখ হয়ে উঠল। ডায়েরির সূত্র ধরে উনিশ এবং বিশ শতকের সকল দিকের ইতিহাস যোগাড় করে ফেললাম। খবরের কাগজ সম্বন্ধে কোনদিনই আমার আকর্ষণ ছিল না। বরং প্রচুর বিতৃষ্ণাই পোষণ করে এসেছি।

খবরের কাগজকে চিরদিনই উচ্চকণ্ঠ একটা কোলাহল বলে আমার মনে হ'ত। পৃথিবীর তাবত সমস্যা যেন গলা ফাটিয়ে সমস্বরে সেখানে চিৎকার করতে থাকে। এই প্রচণ্ড কোলাহল দিয়ে নিজের শান্ত স্তিমিত স্নায়ুকে অহেতুক পীড়িত করে তুলতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ পেতাম না। কিন্তু ইদানিং আমার ধারণা বদলে যাচ্ছে। রোজ একখানা খবরের কাগজ রাখতে শুরু করেছি। মনে হয়, এই খবরের কাগজের কল্যাণে পৃথিবীর প্রতিমুহূর্তের হৃদস্পন্দন অনুভব করতে পারছি। খবরের কাগজ আর ইতিহাস—অতীত এবং বর্তমানের সঙ্গে সংযোগ রেখে দ্রুত এগিয়ে চলেছি। আর যত এগুচ্ছি ততই মনে হচ্ছে, ছাব্বিশ বছর ধরে নিজেকে ছাড়া আর যে কিছু বুঝতে চাই নি জানতে চাই নি, সে এক ক্ষমাহীন অপরাধ।

এইভাবেই চলছিল। মিসেস মিত্র যতদিন না নার্সিংহোম থেকে ফিরে আসেন দিবারাত্রি পড়াশুনোয় মগ্ন হয়ে থাকতে পারব। কৈশোর অর্থাৎ চেতনার সেই শুরু থেকে যদি যোগাযোগ রাখতাম এই বিশাল দেশের বিপুল ইতিহাস এতদিনে জানা হয়ে যেত। তা যখন হয়নি তখন তাড়াতাড়ি জানতে হলে কষ্ট একটু করতে হবে বৈ কি!

এরই মধ্যে একদিন খুকির চিঠি পেলাম। মায়ের মৃত্যুর পর বাগ-বাজারের সেই বাসাটা ছেড়ে রাজাবাজারের কাছে উঠে এসেছিল তারা। তাদের নতুন বাড়িতে এখনও আমার যাওয়া হয়ে ওঠে নি। খুকি অবশ্য বার দুই

আমার এখানে এসে টাকা নিয়ে গেছে।

বুলাকি লিখেছে চিঠি পাওয়ামাত্র অবশ্যই যেন তাদের বাড়ি চলে যাই। বিশেষ প্রয়োজন।

চিঠিটা পেয়েছিলাম সন্ধ্যেবেলা। সেদিন আর গেলাম না। পরের দিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম।

রাজাবাজারের কাছাকাছি একটা সরু গলিতে বুলাকিদের নতুন বাসা। গলিটা সার্কুলার রোড থেকে বেরিয়ে এঁকে বেঁকে সাপের মত কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে পশ্চিমে হ্যারিসন রোডে গিয়ে থমকে গেছে।

গলিটা সহজেই পাওয়া গেল। অন্যমনস্কের মত ভিতরে ঢুকে পড়লাম। দু-ধারে সারিবন্ধ ভাঙাচোরা পুরনো বাড়ি। আস্তর-খসা, দেওয়াল-ধসা। মনে হয়, এটা যেন কলকাতা শহরের একটা অংশ নয়। মাটির অতল থেকে আবিষ্কৃত প্রাচীন পরিত্যক্ত কোন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। পাড়াটা পাঁচমিশেলি। হিন্দু, মুসলমান এবং কিছু কিছু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কৃশ্চানও চোখে পড়ছে।

দু-ধারে ভাঙা বাড়ি। মাঝখান দিয়ে সরু বুক-চাপা গলি। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, এই তো সপ্তাখানেক আগে বুলাকি টাকা নিয়ে গেল। তখন তো কিছু বলে নি। হঠাৎ সাত দিনের মধ্যে এমন কি গুরুতর ব্যাপার ঘটে গেল যাতে এত জরুরি ডাক এসেছে!

চলতে চলতে ভাবনাটা হঠাৎ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'আ বে মণ্টে, সাড়ে চার আনা পয়সা হাতিয়ে লিয়ে আসিস মাইরি। ম্যাটিনিতে লাইন মারব। প্যারামাউণ্টে রগরগে একখানা বই এসেছে।'

মণ্টে অর্থাৎ মণ্টু! চকিত হয়ে মুখ তুললাম। ডানদিকে ঘেঁষে একেবারে সামনেই একটা টিনের চালায় চায়ের দোকান। ক'টা ছোকরা বেঞ্চে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। তাদের মধ্যে মণ্টু রয়েছে। আর কি আশ্চর্য, মণ্টুর হাতে একটা সিগারেট। এই তো মাত্র দিনকয়েক হল এ-পাড়ায় উঠে এসেছে। এরই মধ্যে সঠিক ঠিকানাটা খুঁজে পেয়েছে মণ্টু, অধঃপাতের সঙ্গীদের ঠিক খুঁজে বার করেছে।

মণ্টু যে ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এ-খবরটা বুলাকির মুখে আগেই শুনেছিলাম। কিন্তু এতখানি, ভাবতে পারিনি। একটা ষোল-সতের বছরের ছেলে চায়ের দোকানে বদমাস সঙ্গীদের সঙ্গে আড্ডা জমাবে, সিগারেট ফুঁকবে, এ প্রায় অকল্পনীয়। মনে মনে অত্যন্ত পীড়িত বোধ করতে লাগলাম।

ম্যাটিনি শোয়ের ব্যাপারে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মণ্টু। ঠিক সেই সময় আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল সে। তার পরেই হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে তীরের মত উঠে দাঁড়াল। পরক্ষণেই লাফিয়ে রাস্তায় নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চায়ের দোকানের জটলা থেকে একটা ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, 'এ মণ্টু, এ শ্লা—হল কি তোর! পালাচ্ছিস কেন?'

আমি আর দাঁড়ালাম না। পা টেনে টেনে এগিয়ে গেলাম।

আরো খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বুলকিদের নতুন ঠিকানাটা অবশেষে পাওয়া গেল। বাড়িটা একতলা এবং এই এলাকার জীর্ণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুরনো এবং ভাঙাচোরা।

ডাকাডাকি করতে বুলকিই বেরিয়ে এল। আমাকে দেখে যেন খুব ভরসা পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি এসেছেন, বাঁচলাম। আসুন—'

তার সঙ্গে ভেতরে যেতে যেতে বললাম, 'কি ব্যাপার এত জরুরি তলব কেন?'

'ভয়ানক বিপদে পড়েছি। ঘরে চলুন, সব বলছি।' কাঁপা ভারী গলায় বুলকি বলল।

তার স্বরে প্রায় চমকেই উঠলাম। একেক বার বাড়ি বদলাচ্ছে আর নতুন করে একেকটা বিপদ তার পিছু নিচ্ছে। বাগবাজারের বাসায় মরল তার মা। রাজাবাজারের বাসায় আবার কী ঘটল! অস্বস্তি এবং আশঙ্কায় ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠলাম।

বাগবাজারের সেই বাড়িটার মত এখানে বারো ভাড়াটের ভিড় নেই। আন্দাজে বুঝলাম, মোট তিন ঘর ভাড়াটে। যদিও বাইরেটা ধ্বংসস্তূপ, ভেতর দিকটা বেশ খোলামেলা। হাত-পা ছড়াবার মত প্রকাণ্ড একখানা উঠোন। তাছাড়া বাড়িটার পেছনে একখানা বাগানের আভাসও পাওয়া গেল।

বাড়িটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার আগেই বুলকি তাদের ঘরে নিয়ে বসাল। দক্ষিণমুখী বড় একখানা ঘর সে ভাড়া নিয়েছে। সামনের বারান্দার খানিকটা ঘিরে রান্নার ব্যবস্থা।

আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়েই ছিলাম। বসতে বসতে বললাম, 'কী হয়েছে, বল।'

'একেবারে ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে এসেছেন দেখছি।' মৃদু হেসে বুলকি বলল, 'সকালবেলা উঠেই ছুটে এসেছেন। একটু বসুন, চা খান। তারপর বলছি।'

'বেশ।'

আমাকে বসিয়ে রেখে বুলকি বেরিয়ে গেল। একটু পর চা করে এনে আমার হাতে দিয়ে একপাশে বসল। উৎকণ্ঠ সুরে বলল, 'ওদের নিয়ে ভয়ানক মুশকিলে পড়েছি।'

'কাদের কথা বলছ?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

'ওই সন্ধ্যা আর মণ্টু।'

'কেন, কী করেছে ওরা?'

'প্রথমে মণ্টুর কথাই শুনুন। একেবারে গোল্লায় গেছে বাঁদরটা। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে চা গিলে আড্ডা দিতে বেরোয়। খাবার সময় ফেরে। বাড়ির সঙ্গে খালি খাওয়ার সম্পর্ক। খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত করে। একদম কথা শোনে না। নতুন পাড়ায় এসেছি, এর ভেতরেই বদমাস বন্ধু জুটিয়ে ফেলেছে।'

'হ্যাঁ, সে তো নিজের চোখেই দেখলাম।'

'কী, কী দেখলেন?' বুলকি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

বললাম, 'গলির ঐ চায়ের দোকানটায় সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল আর সিগারেট ফুঁকছিল। আমাকে দেখেই দৌড়ে পালিয়ে গেল।'

'শুধু সিগারেট খাওয়া আর আড্ডা মারা! ঐটুকুন সব ছেলে, যা নিয়ে আলোচনা করে, ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। যেতে-আসতে তো একটু-আধটু কানে আসে। লজ্জায় মাথা তুলতে পারি না। তা ছাড়া—'

'কী?'

'এ-পাড়ায় এসে নতুন গুণ হয়েছে।'

'কি-রকম?'

'সিনেমার নেশা ধরেছে। চেয়ে-চিন্তে তো পয়সা পায় না। তাই চুরি-চামারি ধরেছে। কোথাও পয়সা ফেলে রাখার উপায় নেই। ঠিক হাতিয়ে বার করে নিয়ে যায়। এই তো সেদিন—' বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করল বুলকি।

'সেদিন কী?'

যন্ত্রণা-কাতর মুখে বুলকি বলল, 'লজ্জার কথা কি আর বলব! ভাবলেও মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। হতভাগা এমন অধঃপাতে গেছে যে চিন্তা করতে পারবেন না। এতদিন দু-চার আনার ওপর দিয়েই যেত। সেদিন বাক্স ভেঙে একটা আংটি বার করে নিয়ে গেছে। সবই তো গেছে, মায়ের স্মৃতি ঐটুকু সোনাই যা ছিল। হতভাগা সেই সোনাটুকু নিয়ে সেই যে পালাল তারপর দু-দিন আর পাত্তা নেই।'

'কোথায় ছিল দু-দিন?'

'কি করে বলব। মারধোর করেও জানতে পারি নি।'

প্রথমটা খেয়াল করিনি। কথায় কথায় হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলাম। এখানে এসে এখন পর্যন্ত সন্ধ্যাকে দেখিনি। বললাম, 'সন্ধ্যা কোথায়? তাকে তো দেখছি না।'

'চান করতে বাথরুমে ঢুকেছে।' বুলকি বলল, 'সাড়ে ন'টায় কলের জল চলে যাবে। তিন ভাড়াটের জন্যে জল নেবার সময় ভাগ করা আছে। সকালের দিকটা পড়েছে আমাদের ভাগে। ওর মধ্যে চান সেরে রান্নাবান্নার জল তুলে নিতে হয়।'

আমি চুপ করে রইলাম।

একটু পর বুলকি আবার শুরু করল, 'মন্টু তো আছেই। এদিকে সন্ধ্যাটাও যে কি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে! মা যতদিন ছিল ততদিন তবু খানিকটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকত। এখন সে সব বালাই নেই। আমি বেরুলেই ঘরে তালা লাগিয়ে পাশের ভাড়াটের কাছে চাবি দিয়ে সে-ও বেরুল।'

'যায় কোথায়?'

'কেন, আপনাকে তো আগেই বলেছি।'

'কী?'

'সেই যে ছোকরাটা, তার সঙ্গেই টো টো করে ঘোরে।'

'ছোকরা তো শ্যামবাজারের, তোমাদের সেই পুরনো পাড়ার। এখানেও

'সে হানা দিচ্ছে ?'

বুলাকি উত্তর দিল না। বিচিত্র করুণ একটু হাসল।

আমি বললাম, 'তা হলে দু ভাইবোনকে নিয়ে খুব মুশকিলে পড়েছ, দেখছি।'

বুলাকি বলল, 'হ্যাঁ, সেই জন্যেই আপনাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছি। দুটোর কেউ আমাকে গ্রাহ্য করে না। মণ্টুটা তবু ছেলে, যতই বাঁদরামি করে বেড়াক, লোকে খানিকটা গালাগাল দেবে। এর বেশি কি আর! কিন্তু সন্ধ্যাটা মেয়ে, যদি কিছু কাণ্ড বাধিয়ে বসে আমি কি করব, বলুন। একটা পরামর্শ দিন।' বলতে বলতে মাথা নিচু করল সে। গলার স্বরটা বিষণ্ণ, ভারী এবং অস্পষ্ট হয়ে এল, 'আমার জীবনটা তো নষ্টই হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম, সন্ধ্যার একটা বিয়ে দেব, ও সুখী হবে। কিন্তু এভাবে চললে—'

তার বিষণ্ণতা আমাকে স্পর্শ করল যেন। অভিভাবক-হীন এই ভাসমান সংসারটা অপার বেদনায় আমাকে ছেয়ে ফেলল। যতদিন মা বেঁচে ছিল ততদিন কিছুটা অন্তত নিয়ম-বন্ধনের মধ্যে থেকেছে সন্ধ্যা আর মণ্টু। এখন একেবারেই বেপরোয়া। তাই বুঝি কানা হোক খোঁড়া হোক পাগল হোক অসুস্থ হোক একটা বাপ অথবা মা মাথার ওপর থাকা প্রয়োজন। তাতে সংসারে কিছুটা অন্তত শৃঙ্খলা থাকে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে চান সেরে বাথরুম থেকে সন্ধ্যা ঘরে ফিরে এল।

সন্ধ্যা আমার দিকে চোখ রেখে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। সে সুযোগটুকু আর পেল না। তার আগেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল বুলাকি, 'এই যে বাঁদরী এসেছে!'

ক্ষিপ্র একটা মোচড় খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সন্ধ্যা। দু-চোখে তীব্র রাগ ফুটে বেরুল তার। দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্র গলায় সন্ধ্যা বলল, 'যা-তা বলবি না দিদি—'

'না, বলবে না!' বুলাকি চেঁচিয়ে উঠল।

'কেন, কেন বলবি ?' সন্ধ্যা এবার রুখে দাঁড়াল।

ঘরের এককোণে বসে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মাসকয়েক হল এই পরিবারটার সঙ্গে আমার পরিচয়। বাগবাজারের বাসায় অবশ্য একবারই মাত্র গেছি, তা-ও ওদের মায়ের মৃত্যুর দিন। আর এখানে আজই প্রথম এলাম। কিন্তু শ্যামবাজারে যখনই ওদের বাসায় গেছি, ঘরে যতক্ষণ থেকেছি সন্ধ্যাকে প্রায় সারাক্ষণই মুখ বুজে সংসারের কাজ করতে দেখেছি। মিষ্টি চেহারার শান্ত মেয়েটি। কোনদিনই মুখ তুলে গলা চড়িয়ে তাকে কথা বলতে শুনিনি। কিন্তু আজ যে-ভাবে বুলাকির বিরুদ্ধে সে দাঁড়িয়েছে তাতে রীতিমত স্তম্ভিত এবং শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। এই মুহূর্তে ঘরের যা আবহাওয়া তাতে একটা খণ্ডযুদ্ধের ভূমিকাই যেন তৈরি হচ্ছে।

বুলাকি টেনে টেনে বিদ্রূপ-ভরা গলায় বলল, 'কেন বলছি, জিজ্ঞেস করছিস ?'

'হ্যাঁ, করছি।' সন্ধ্যা যেন তাড়া করার ভঙ্গিতে বড় করেই বোনের দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল।

'তা হলে শোন, বাঁদরী বলেছি তোর গুণে।'

'আমার গুণে!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ তোর গুণেই। কি করে বেড়াচ্ছিস খেয়াল নেই? নিজের মুখে তো চুনকালি মাখছিসই, আমার মুখেও দিতে চাইছিস। কোনদিন কী ঘটিয়ে যে তুই বাড়ি ফিরবি!'

নিষ্ঠুর ক্রূর চোখে কিছুক্ষণ বুলাকির দিকে তাকিয়ে রইল সন্ধ্যা। তারপর আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল, 'কিছু যদি ঘটেই তবে উদ্ধার হতে তোর পায়ে এসে পড়ব না। ভয় নেই, তুই নিশ্চিন্তে থাকতে পারিস। তবে—'

'কী?'

'নিজের বুকে একবার টোকা দিয়ে ভাব, নিজে তুই কী করে বেড়াচ্ছিস!'

'আমি, আমি—' গলার স্বরটা প্রথমে কেমন যেন শিথিল এবং রুদ্ধ শোনাল বুলাকির। তারপরেই আমার দিকে ফিরে চিৎকার করে উঠল সে, 'শুনলেন, জানোয়ার মেয়ের কথাটা একবার শুনলেন?'

সন্ধ্যাকে যেন আঘাতের নেশায় পেয়ে গেছে। পাত্রাপাত্রের বিচার নেই তার। মরিয়ার মত অন্ধের মত সে বলতে লাগল, 'ভাল সাক্ষীই যোগাড় করেছিস! চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।'

গলার স্বরে অনেকখানি বিষ ঢেলে কথাগুলো এমনভাবে উচ্চারণ করল সন্ধ্যা যাতে আমার হৃদ্‌পিণ্ডে চমক খেলে গেল। কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা ইঙ্গিত আছে যেটা বুঝে ওঠা খুব কষ্টকর নয়। মুখ নামিয়ে বোবার মত আমি বসে রইলাম।

আর বুলাকি তীক্ষ্ম গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কী, কী বললি?'

'কী বলেছি, তা তো বুঝেছিস।' সন্ধ্যা বলল।

'না, বুঝিনি। বুঝিয়ে বল।'

'তবে শোন। আগে ছিল সীতেশ মল্লিক। আর এখন—' আমার দিকে চকিত একটা দৃষ্টিক্ষেপ করে চুপ করল সন্ধ্যা। কিছুক্ষণ পর আবার বলল, 'আমি তো বাইরেই যাই। তুই তো দুকান-কাটা, একেবারে ঘরে এনে—' বাক্যটা অসমাপ্ত রেখে বারান্দার দিকে পা বাড়িয়ে দিল সন্ধ্যা।

কিন্তু বাইরে আর যাওয়া হ'ল না। তার আগেই লাফ দিয়ে চুলের মুঠি ধরল বুলাকি।

সন্ধ্যা বলল, 'খবরদার, আমার গায়ে হাত দিবি না। চুল ছেড়ে দে বলছি।'

বুলাকি উত্তর দিল না। হ্যাঁচকা টানে সন্ধ্যাকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে মুখেচোখে যেখানে পারছে কীল-চড়-লাথি চালিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা কি পাগল হয়ে গেল?

দাঁতে দাঁত আটকে মার খেয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যা। এতটুকু শব্দ করছে না।

মারতে মারতে একসময় দু-হাতে তার গলা টিপে ধরল বুলাকি। অনেকক্ষণ পর গোঙানির মত একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল।

বিমূঢ়ের মত বসে বসে দেখছিলাম। ইন্দ্রিয়গুলো যেন একেবারেই অসাড় আর বিকল হয়ে গেছে। সন্ধ্যার গোঙানির সেই শব্দটা হঠাৎ যেন আমার সমস্ত সত্তায় প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে দুই বোনকে ছাড়িয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

পেছন থেকে বুলাকি ডাকতে লাগল, 'শুভেন্দুবাবু—শুভেন্দুবাবু—'

আমি সাড়া দিলাম না। বাড়িটা থেকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সার্কুলার রোডের দিকে ছুটতে লাগলাম। পরোপকারের বাসনাটা মন থেকে একটু একটু করে উবে যেতে শুরু করেছে। যদি কিছু করতেই হয়, দূর থেকেই টাকা পয়সা দিয়ে যতখানি সম্ভব, করব। কাছে গিয়ে আর নয়। যথেষ্ট হয়েছে।

না না, বুলাকিদের বাড়ি আমি কোনদিনই যাব না।

তিন

বুলাকিদের সেই গলি থেকে দুঃস্বপ্নের ঘোরে বেরিয়ে এসেছিলাম। তারপর কিভাবে যে ট্রামে উঠে এস্‌প্ল্যানেডে এসেছি আর এস্‌প্ল্যানেডে ট্রাম বদলে ভবানীপুরে হাজরা রোডর কাছাকাছি এসে পড়েছি, তা যেন আর মনে করতে পারি না। ট্রামের জানালার বাইরে ট্রাক-বাস-লরির অন্তহীন স্রোত, ফুটপাথে মানুষের ঠাসাঠাসি ভিড়। তা ছাড়া সারিবদ্ধ সুসজ্জিত দোকান এবং বিরাট বিরাট বাড়ি। আর আছে রোদ; হেমন্তশেষের পর্যাপ্ত অফুরন্ত আলো। সকালবেলা রাজাবাজার গিয়েছিলাম। কখন যে একটু একটু করে সূর্যটা সরাসরি মাথার ওপর উঠে এসেছে খেয়াল ছিল না।

বাস-লরি-মানুষ-দোকান-বাজার বা অঘ্রানের সুখদায়ক চমৎকার রোদ, কিছুই আমার চেতনায় রেখাপাত করতে পারছে না। কতকগুলো পলাতক ছায়ার মত সেগুলো চোখের উপর দিয়ে ক্রমাগত সরে যাচ্ছে।

শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আমি শুধু সন্ধ্যার কথাই ভাবছি। যত ভাবছি ততই স্তম্ভিত হয়ে উঠছি। আর অসীম যন্ত্রণায় বুলাকি এবং আমার মধ্যেকার সম্পর্কটা বার বার বিশ্লেষণ করে যাচ্ছি।

দুঃখী অসহায় মেয়েটার দিকে ছুটে গিয়েছিলাম। এর মধ্যে সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাকে মাঝে মাঝে টাকা দিয়ে যাচ্ছি, তার দুঃখের দিনে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আপাত চোখে এ সবই মহত্ত্ব।

নিজের মহত্ত্বে এতকাল পরিতৃপ্তই ছিলাম। কিন্তু প্রচণ্ড আঘাতে তৃপ্তিটাকে একেবারে চুরমার করে দিয়েছে সন্ধ্যা। সেই সঙ্গে অনেক নিচ থেকে অবচেতন মনটাকে একটানে আমার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েও দিয়েছে।

বুলাকির দিকে এই যে ছুটে গেছি, সে কি নিঃস্বার্থ উপকারের প্রেরণায়?

পৃথিবীতে কত অসহায় মানুষ রয়েছে। তেতাল্লিশের সেই প্রেতেরা এখনও তো চোখের সামনেই ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কই, কোনদিন তো তাদের হাতে দুটো পয়সা তুলে দিতে উৎসাহ বোধ করিনি!

তবে কি আমার এই করুণা, সহানুভূতি—সবই অছিলা মাত্র! একটি তরুণী মেয়েকে দেখে অন্ধের মত ছুটে গিয়েছিলাম—তার মধ্যে পরোপকারের বিন্দুমাত্র স্পৃহা ছিল না? ছিল শুধু নিদারুণ জৈব আকর্ষণ?

একটা নিষ্ঠুর সত্যকে কি আজ অনাবৃত করে দিল সন্ধ্যা?

কতক্ষণ যে নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে ছিলাম, খেয়াল নেই। হঠাৎ ট্রামটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে থেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে দূরাগত সমুদ্র গর্জনের মত অসংখ্য কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল।

'বন্দে মাতরম্—'

'বন্দে মাতরম্—'

'আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের—'

'মুক্তি চাই।'

মুহূর্তে আমার মগ্নতা ছিন্ন হয়ে গেল। চমকে জানালার বাইরে তাকালাম। ট্রাম-বাস-ট্রাক-লরির স্রোত একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। সারি সারি নিশ্চল দাঁড়িয়ে গেছে সব।

দূরে হাজরা রোডের ওপারে, রসা রোডের দিক থেকে বিরাট একটা মিছিল এগিয়ে আসছে। বেশির ভাগই স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে। হাতে ত্রিবর্ণ পতাকা আর উঁচু উঁচু লাঠির মাথায় পোস্টারে লেখা রয়েছে:

'আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তি চাই।'

'জয় হিন্দ—'

'বন্দে মাতরম্—'

'ব্রিটিশ, ভারত ছাড়—'

তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত মিছিলটা এগিয়ে আসছে। আমার ধমনীতে রক্তস্রোত উত্তাল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের জন্য এই মিছিল, অঘ্রানের সুখপ্রদ রোদ, ট্রাম বাসের রুদ্ধ স্রোত—সব যেন ভুলে গেলাম। আমার চেতনা অশরীরী কি একটাকে যেন আশ্রয় করল, তারপর দোল খেতে খেতে কয়েক বছর পেছনে একটা আগ্নেয় পটভূমিতে ফিরে গেল।

হেমন্তবাবুর দিনলিপির খাতাগুলিতে বহুবার একটি নামের সশ্রদ্ধ উল্লেখ রয়েছে। কংগ্রেস এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসেও নামটি সোনার অক্ষরে মুদ্রিত। সুভাষচন্দ্র বসু। গান্ধীজীর 'কুইট ইণ্ডিয়া'র অনেক আগে যাঁর কণ্ঠে 'ভারত ছাড়' মন্ত্র প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল।

মনে পড়ছে উনিশ শ একচল্লিশে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র কলকাতায় তাঁর স্বগৃহে অন্তরীণ। একদিন আর তাঁকে পাওয়া গেল না। সমস্ত দেশ স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনল, ব্রিটিশের সতর্ক বিনিদ্র পাহারা সত্ত্বেও তাঁর রহস্যময় অন্তর্ধান হয়েছে। কিভাবে কোথায় কোন দুর্গম পথে

তিনি পাড়ি দিলেন কেউ জানতে পারল না। সুভাষচন্দ্র বিস্ময়কর এক লিজেণ্ডের নায়ক হয়ে দেশের মানুষের মনে উত্তরহীন এক প্রশ্নের মত থেকে গেলেন।

তার পর আর এক দিন এল। যুদ্ধের তখন শেষ পর্ব, শেষ দৃশ্য। উত্তর পূর্ব সীমান্ত ডিঙিয়ে ব্রিটিশ সিংহের চোখে ধুলো ছিটিয়ে টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন যে সব খবর আসতে লাগল তাতে শৃঙখলিত দেশের হৃদ্‌পিণ্ড বিপুল আবেগে তরঙ্গিত হয়ে উঠল।

রূপকথার চাইতেও সে এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস। কলকাতা থেকে অন্তর্হিত হয়ে প্রথমে আফগানিস্তান, সেখান থেকে বার্লিন, অবশেষে টোকিও এলেন সুভাষচন্দ্র। পদানত দেশের অপমান তাঁকে যেন অস্থির উন্মাদ করে তুলেছে।

মহানায়ক রাসবিহারী বসু তখন আজাদ হিন্দ সংঘ স্থাপিত করছেন। সুভাষচন্দ্র তাতে প্রাণ সঞ্চার করে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। আজাদ হিন্দ সংঘ হল আজাদ হিন্দ ফৌজ। ইতিহাসের সে এক পরম শুভক্ষণ। একই পতাকাতলে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত এসে হাত মেলাল। সুভাষচন্দ্র সেদিন থেকে নেতাজী।

তার পর শুরু হল শৃঙখল মুক্তির অভিযান। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ঊর্ধ্বশ্বাসে কঠিন শপথে সে এক দুরূহ ব্রতপালন। দেখতে দেখতে সিঙ্গাপুরে জাতীয় পতাকা উড়ল। তারপর বর্মা পেরিয়ে ইম্ফল পেছনে ফেলে ঝড়ের গতিতে কোহিমা পর্যন্ত এল আজাদ হিন্দ ফৌজ।

ঐ কোহিমা পর্যন্ত। এদিকে জাপান মিত্রশক্তির কাছে পূর্ব সমুদ্রে বিধ্বস্ত হ'ল। রসদ নেই, খাদ্য নেই, সুভাষচন্দ্রের বড় সাধের 'দিল্লী চলো' স্বপ্ন হয়েই রয়ে গেল।

হায় পরাধীন দেশ! বীর সন্তানের রক্তাক্ত ক্লান্ত দেহের শ্রান্তি মুছিয়ে কপালে জয়ের তিলক পরিয়ে দেওয়ার সৌভাগ্য তোমার হল না।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মৃত্যুপণ অভিযান পরাভূত, বিধ্বস্ত হয়ে যায়। জীবন-মৃত্যুকে যাঁরা 'পায়ের ভৃত্য' করেছিলেন সেই ভয়লেশহীন বীর সৈনিকেরা বন্দী হয়ে একে একে দিল্লীর লালকেল্লায় কারারুদ্ধ হয়েছেন। ধীলন, সায়গল, শাহনওয়াজ—জাতির ইতিহাসে নামগুলো সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মত।

মনে আছে, দিন কয়েক আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযুক্ত সেনানীদের বিচারের জন্য সামরিক ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে এবং বন্দীরা আপিল করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। খুব সম্ভব সেটা ছিল নভেম্বরের গোড়ার দিকের খবর।

আর আজ নভেম্বর মাসের শেষ প্রান্তের একটা দিন। ট্রাইবুনাল গঠনের পর সপ্তাহ তিনেকের জন্য বিচার স্থগিত ছিল। আজ লালকেল্লায় তার প্রহসন শুরু হবে। একরকম অনায়াসে এই বিচারের রায় যেন আগে থাকতেই

বলে দেওয়া যায়।

সমস্ত দেশের প্রাণপুরুষ এই বীর সেনানায়কদের জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আসমুদ্র-হিমাচল এই বিশাল ভারতবর্ষের এমন কেউ নেই মনে মনে যে লালকেল্লার সেই মানুষ ক'টির পাশে গিয়ে দাঁড়ায় নি। সামরিক ট্রাইবুনালের সামনে বীর সন্তানদের মুক্তির জন্য সওয়াল করতে ছুটে গেছেন ভুলাভাই দেশাই। দীর্ঘ দু-যুগ পর ব্যারিস্টারবেশে জওহরলাল আজ ভুলাভাই-এর সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াবেন।

সমস্ত ভারতবর্ষ আজ অস্থির—উত্তেজিত। পায়ের তলায় মাটি যেন ঢেউ-এর মত দুলছে। বিচারের আগের মুহূর্তে দেশের আত্মা বজ্রকণ্ঠে দাবি জানাচ্ছে, স্বাধীনতার সৈনিকদের সসম্মানে মুক্তি চাই।……

জলোচ্ছ্বাসের ঢেউ-এর মত মিছিলটা এগিয়ে আসছে। আর সেই সমুদ্র-গর্জনটা অবিরত শোনা যাচ্ছে।

'আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের—'

'মুক্তি চাই।'

'জয় হিন্দ—'

'বন্দে মাতরম্—'

ট্রামের জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। খানিকটা আগে রাজাবাজারের দম চাপা অন্ধ গলিতে বুলাকিদের সেই ভাড়াটে বাড়িতে ছিলাম। সেখানে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল আমার। গ্লানি আর অন্ধকারে ভরা সেই জঘন্য চাপা পরিবেশটা আমাকে প্রতি মুহূর্তে পীড়িত এবং বিদ্ধ করে ফেলছিল।

আর এখানে? এখানে অন্য জগৎ। রাজাবাজারের সেই গলিতে কলকাতা যতখানি অন্ধকার জমা করে রেখেছে এখানে ঠিক ততখানিই আলো ছড়িয়ে দিয়েছে যেন।

জানালার পাশ দিয়ে মিছিলটা ঢলের মত এগিয়ে যাচ্ছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, নীনী-বুলাকি-সীতেশদা-মিসেস মিত্রদের রুদ্ধশ্বাস পৃথিবীর বাইরে এখানে যেন অসীম মুক্তি। এই মিছিলটা সমুদ্রের স্বাদ নিয়ে এসেছে। আশ্চর্য, এই কলকাতার কতই না অনাবিষ্কৃত দিক। আর সেই দিকগুলোতে কত বিচিত্র খেলা!

তাকিয়েই ছিলাম। মিছিলের সেই স্রোতটা আরো অনেকখানি এগিয়ে গেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল তিনরঙা প্রকাণ্ড একটা পতাকা কাঁধে নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে চলেছে কনক।

প্রথমটা কেমন যেন অস্থিরতা অনুভব করলাম। বুকের ভেতর অদ্ভুত এক টান পড়ল; সমস্ত অস্তিত্বটাই সেই টানে দুলে উঠল বুঝি। তারপর নিজের অজ্ঞাতসারে দুর্জ্ঞেয় এবং দুরন্ত এক আকর্ষণে ট্রাম থেকে নেমে কনকের কাছে চলে এলাম।

স্লোগান দিতে দিতে আমার দিকে ফিরে তাকাল কনক। এক মুহূর্ত থমকে রইল সে। সবিস্ময়ে বলল, 'আপনি এখানে!'

বললাম, 'ট্রামে বাড়ি ফিরছিলাম। মিছিলে আপনাকে দেখে নেমে পড়লাম।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ। তা এই প্রোসেশন নিয়ে কোথায় চলেছেন?'

'আজ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্রদের মীটিং আছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের আজ বিচার আরম্ভ তা জানেন তো?'

'জানি।'

'মীটিংটা তাঁদের মুক্তির দাবিতে। মীটিং-এর পর আমরা এই রকম প্রোসেশন করে হানড্রেড ফোরটি ফোর ভাঙতে ডালহৌসি স্কোয়ারে যাব। যাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে?'

'আমি!'

'হ্যাঁ, আপনি।' বলেই সকৌতুকে আমার দিকে তাকাল কনক। বলল, 'কেন, ভয় করছে নাকি!'

কনকের গলায় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ছিল যা আমার পৌরুষকে আঘাত করল। দৃঢ় স্বরে বললাম, 'ভয়ের কোন প্রশ্নই নেই। তবে ওটা ছাত্রদের মীটিং আর জানেনই তো আমি ছাত্র নই। তাই ভাবছিলাম—'

'ছাত্ররা এগিয়ে এসে মীটিংটা 'কল্' করেছে। নইলে ব্যাপারটা তো প্রতিটি দেশবাসীর। কারুরই সেখানে যেতে বাধা নেই। বরং সবারই যাওয়া উচিত।'

'তা হ'লে তো আপনার সঙ্গেই যেতে পারি।'

'নিশ্চয়, চলে আসুন।' উৎসাহিত হয়ে উঠল কনক। পরক্ষণেই তার মুখে কিসের একটা ছায়া পড়ল যেন। ভ্রূ কুঁচকে কপালে ভাঁজ ফেলে সে বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনাকে এর মধ্যে নিয়ে আসা বোধ হয় ঠিক হবে না শুভেন্দুবাবু।'

একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

'আপনি যাঁর কাছে চাকরি করেন অর্থাৎ মিসেস মিত্র এ-সব একেবারেই পছন্দ করেন না।' কনক বলল।

কিছু না ভেবেই প্রায় মরিয়ার মত বলে ফেললাম, 'তা হোক।'

'বেশ, তা হ'লে চলুন। দেখবেন শেষে আবার আমাকে দোষ দেবেন না।'

'দোষ দেব কেন? আপনি তো আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন না। আমি যাচ্ছি আমার নিজের ইচ্ছেয়।'

মিছিলটা আমাদের পেছনে রেখে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। কনক এবং আমি ছুটতে ছুটতে গিয়ে ধরে ফেললাম। আমার খেয়াল রইল না যে এখন পর্যন্ত আমার স্নান হয়নি। আর বুলাকিদের বাড়ি এক কাপ বিস্বাদ চা ছাড়া পাকস্থলীতে কিছুই পড়েনি। অভুক্ত আর অস্নাত, তবু শারীরিক কোন কষ্টই যেন নেই। বিচিত্র এক উন্মাদনা প্রবল স্রোতের মত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল।

মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যখন এসে পৌঁছলাম সময়টা দুপুর এবং বিকেলের মাঝামাঝি একটা জায়গায় থমকে রয়েছে।

পার্কটার এককোণে ছোটখাটো একটা বক্তৃতার মঞ্চ। মঞ্চ আর কি! ত্রিবর্ণ পতাকা দিয়ে মাঝারি একখানা টেবিলের একপাশে খানপাঁচেক চেয়ার আর লাউড স্পীকারের ব্যবস্থা। পার্কের সবুজ মখমলের মত নরম ঘাসের ওপর মিছিলটা বসে পড়ল।

মাঝে মাঝে মাধবীলতার ছোট ছোট কুঞ্জ আর সারিবন্ধ ভাবে দাঁড়ানো পাম গাছ।

পামগাছের ছায়ায় আমাকে নিয়ে বসে পড়ল কনক। বললাম, 'মীটিং কখন শুরু হবে?'

'বিকেলে।' কনক বলল, 'নর্থ আর ইস্ট ক্যালকাটা থেকে আরো দুটো প্রোসেশন আসবার কথা আছে। সে দু'টো এলেই সভার কাজ আরম্ভ হবে। যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ—'

'ততক্ষণ কী?'

'আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না তো?'

'এতগুলো ছেলেমেয়ে অপেক্ষা করবে। তাদের যদি অসুবিধে না হয় আমারও হবে না। আর যদি হয়ই—' কথা শেষ না করেই আমি থেমে গেলাম।

'যদি হয়ই তবে?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকাল কনক।

হেসে ফেললাম, 'কী-ই বা করা যাবে। খানিকটা আগে আপনিই তো বলেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের এই ব্যাপারটা সমস্ত দেশের। সারা দেশের সঙ্গে আমিও না হয় কিছুটা অসুবিধে ভোগই করলাম।'

'খুব বলেছেন যা হোক। আমার অস্ত্রেই আমাকে কাবু করে ফেলেছেন।' উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল কনক। আর হাসতে হাসতেই সচেতন হ'ল, 'আরে কি আশ্চর্য, একটা কথা তো এতক্ষণ আমার খেয়ালই হয়নি।'

'কী?'

'রাস্তা থেকেই চলে এলেন। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে চান খাওয়া কিছু হয়নি।'

'ছাব্বিশ বছর ধরে রোজই তো ও-সব করে আসছি। একটা দিন বাদ গেলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

'থাক, অতখানি কৃচ্ছ্রসাধন না করলেও চলবে।' কনক আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আসুন দেখি আমার সঙ্গে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সে।

'কোথায়?'

'প্রশ্ন করতে হবে না। এটা আপনার মিসেস মিত্রের জগৎ নয়, আমার রাজ্য। যা বলছি বিনা বাক্যব্যয়ে এখানে করতে হবে। ও কি, এখনও ওঠেন নি!'

অগত্যা উঠে পড়লাম। তারপর কনকের পিছু পিছু পার্কের বাইরে চলে এলাম। এক দোকান থেকে পাঁউরুটি আর বাতাসা কেনা হ'ল। ফুটপাথের এক ফেরিওলার কাছ থেকে নেওয়া হ'ল চাঁপা কলা। সে-সব নিয়ে আবার পার্কে ফিরে গেলাম। কনক বলল, 'নিন, খেয়ে ফেলুন।'

খাওয়া-দাওয়ার পর পার্কের এককোণে টিউব ওয়েল থেকে জল খেয়ে এলাম।

ওয়েলিংটন স্ট্রিটের কোন এক অদৃশ্য গীর্জার ঘড়ি থেকে যখন বিকেল চারটের ঘণ্টা ভেসে এল ঠিক সেইসময় উত্তর আর পূর্ব কলকাতার দুটো ছাত্র মিছিল স্কোয়ারের সামনে একই সঙ্গে এসে মিশে গেল। আর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত গর্জন উঠল, 'বন্দে মাতরম্—'

'জয় হিন্দ্—'

'আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈনিকদের—'

'মুক্তি চাই।'

মিছিলগুলো এসে পড়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সভা শুরু হয়ে গেল। যাঁরা বক্তৃতা দিলেন তাঁরা প্রায় সবাই ছাত্রনেতা। 'আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্তি চাই'—সমস্ত দেশের প্রাণপুরুষের এই বাণীই উদ্দীপনাময় ভাষায় একের পর এক বক্তা ঘোষণা করে গেলেন।

সভার কাজ শেষ হ'তে পুরো একটি ঘণ্টাও লাগল না। তারপর উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব—তিন দিকের তিন মিছিল একাকার হয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে একটি বিশাল ধারায় বেরিয়ে এল। এবার এটার লক্ষ্য ডালহৌসি স্কোয়ার; উদ্দেশ্য এক শ চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ।

কনকের প্রায় গা ঘেঁষেই আমি চলেছি। চলতে চলতে হঠাৎ কনক ডেকে উঠল, 'শুভেন্দুবাবু—'

তার গলার সুরে এমন কিছু ছিল যাতে চকিত হয়ে উঠলাম। মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'কী?'

'আপনি বরং ফিরে যান।'

'কেন?'

'দেখুন, আমার মন বলছে বিপদ-টিপদ কিছু একটা ঘটতে পারে। খুব সহজে হানড্রেড ফোরটি ফোর ভাঙা যাবে না। পুলিশ নিশ্চয়ই প্রিপেয়ার্ড হয়ে আছে। লাঠি-গুলি চলার সম্ভাবনা খুব বেশি। ঝোঁকের মাথায় আপনাকে নিয়ে আসা বোধ হয় উচিত হয় নি।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম না। স্থির নির্নিমেষে কিছুক্ষণ কনকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর একসময় বলে উঠলাম, 'আপনি আমাকে কী ভাবেন কনকদেবী!'

'মানে!' একটু যেন থতমত খেয়ে গেল কনক।

'আপনি নিশ্চয়ই ভাবেন আমি খুব ভীরু জীব; তা ছাড়া আপনার মাসিমার পঁচাত্তর টাকা মাইনের স্লেভ। দাসত্ব ছাড়া আর কোন ব্যাপারে

আমার কোন অধিকার নেই—এই তো আপনার ধারণা!' কথাগুলো বলেই অবাক হয়ে গেলাম যেন। আমার মুখ দিয়ে এ কী বেরিয়ে এসেছে! আত্মকেন্দ্রিকতার শক্ত খোলের মধ্যে চিরকাল শামুকের মত যে গুটিয়ে থেকেছে, এই কলকাতা শহরে যে এসেছে শুধুমাত্র একটা জীবিকার সন্ধানে, নিতান্ত প্রাণধারণ ছাড়া যার জীবনে মহত্তর কোন উদ্দেশ্য নেই—তার পক্ষে এজাতীয় কথা যেমন বিস্ময়কর তেমনই অভাবনীয়। না কি সমুদ্রস্রোতের মত এই মিছিল, স্লোগান, আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং একটু আগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সেই উদ্দীপনাময় উত্তেজক বক্তৃতা—সব একাকার হয়ে ক্রীতদাসের চেতনায় নিদারুণ বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছে!

খুব শান্ত গলায় কনক বলল, 'বেশ, তবে চলুন।'

মিছিলের ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে একসময় ম্যাডান স্ট্রিটে এসে গেলাম।

ম্যাডান স্ট্রিটের ভেতর ঢোকা গেল না। রাস্তাটার মুখের কাছে এসে মিছিলটা থমকে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখলাম, সামনের দিকে যতদূর দেখা যায় আর্মর্ড পুলিশ, সার্জেণ্ট, পুলিশ অফিসার আর ওয়ারলেস ভ্যান ব্যূহ সাজিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিছিলটা এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে ছিল। তার পরেই গর্জন উঠল, 'বন্দে মাতরম্—'

'জয় হিন্দ্—'

'ব্রিটিশ—'

'ভারত ছাড়।'

'আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের—'

'মুক্তি চাই।'

তড়িত চমকের মত কি যেন একটা উন্মাদনা প্রতিটি মানুষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল। আর সেই উন্মাদনাটাই প্রবল ধাক্কায় স্তব্ধ মিছিলটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। আমার মনে হ'ল, নিজের থেকে আমি যেন যাচ্ছি না। অশরীরী অলৌকিক কিছু একটা আমাকে পেছন থেকে দুর্দম বেগে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

মিছিলের মুখটা সবেমাত্র ম্যাডান স্ট্রীটে ঢুকেছে সেই সময় পুলিশ অফিসারের ভাবলেশবর্জিত মুখ থেকে নিষ্ঠুর চিৎকার বেরিয়ে এল, 'হল্ট—'

মানুষের সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। কলকাতার আকাশকে বিদীর্ণ করে গর্জন শোনা গেল, 'বন্দে মাতরম্—।' সামনের দিকটা যেন বাধাবন্ধহীন—এমনভাবে মিছিলটা তার স্বচ্ছন্দ প্রবাহে এগিয়ে চলল।

পুলিশ অফিসার গলা ফাটিয়ে দ্বিতীয় বার চেঁচাল, 'হল্ট—'

হাজার কণ্ঠে মিছিলটা প্রত্যুত্তর দিল, 'জয় হিন্দ্—'

'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—'

'ধ্বংস হোক—'

ম্যাডান স্ট্রীটের অনেকখানি ভেতরে মিছিলটা ঢুকে পড়েছে। দু-হাত তুলে পুলিশ অফিসার এবার ক্ষিপ্তের মত গজরে উঠল, 'আর এগুলে লাঠি

চালাতে আমি কিন্তু বাধ্য হব।'

জনতা ভ্রূক্ষেপও করল না, আপন গতিতে এগিয়েই চলল। আর অশ্রান্ত জলকল্লোলের মত ক্রমাগত শব্দ উঠতে লাগল, 'জয় হিন্দ, জয় হিন্দ্—'

কয়েক ফুট মাত্র আর এগিয়েছি, হঠাৎ বুম্ বুম করে টীয়ার গ্যাসের শেল ফাটল কয়েক রাউণ্ড। মুহূর্তে বিষাক্ত ধোঁয়া দৃষ্টিটাকে অন্ধ করে দিল। ভয়ানক জ্বালা করতে লাগল চোখ।

মিছিলটা প্রায় ছত্রভঙ্গই হয়ে গেল যেন। ছেলেমেয়েরা হাইড্রাণ্টের দিকে ছুটল। উদ্দেশ্য জলের সন্ধান। চোখ ধুয়ে নিতে পারলে এই যন্ত্রণা খানিকটা অন্তত কমবে।

সবাই যখন এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে ঠিক সেইসময় ব্লাঙ্ক ফায়ারের আওয়াজ পাওয়া গেল। তার পরেই শিকারী হায়েনার মত নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ। শুরু হয়ে গেল লাঠি চার্জ।

ছেলেমেয়ের বাছবিচার নেই। নৃশংস বর্বর হাতে ডাইনে বাঁয়ে এলোপাথাড়ি লাঠি চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

টীয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় মিছিলটা আগেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। লাঠি চার্জের সঙ্গে সঙ্গে ছোটাছুটি আর চিৎকার শুরু হয়ে গেল। কেউ আর সামনের দিকে এগুচ্ছে না। অনেকে দুপাশের বাড়িগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তবে দুর্জয় সাহস নিয়ে বেশির ভাগই রাস্তায় রয়েছে।

হঠাৎ স্তম্ভিত বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম প্রকাণ্ড একটা ত্রিবর্ণ পতাকা কাঁধে নিয়ে কনক পুলিশ ব্যূহ ভেদ করতে এগিয়ে চলেছে। তার পেছনে পঞ্চাশ ষাটটি ছেলেমেয়ে। মুহূর্তের জন্য আমার হৃদ্‌পিণ্ডের উত্থান-পতন স্তব্ধ হয়ে গেল যেন।

অবিচলিত দৃঢ় পায়ে কনক এগিয়ে যাচ্ছে। বাঁ হাতে তার পতাকা। ডান হাতটা আকাশের দিকে মুঠি পাকিয়ে সে চীৎকার করে উঠল, 'বন্দে মাতরম্—'

পেছনের ছেলেমেয়েগুলোর কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি উঠল, 'বন্দে মাতরম্—'

কনকের মৃত্যুপণে এই এগিয়ে যাওয়াটা মন্ত্রের কাজ করল যেন। যারা পালিয়ে গিয়েছিল সেই সব বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ছেলেমেয়েরা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে এসে তার পেছনে জমা হতে লাগল। আর আমিও প্রায় ঘোরের মধ্যেই কনকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

লাঠি সমানে চলছিল। উন্মত্ত পুলিশগুলো নির্বিচারে যন্ত্রের মত পিটিয়ে যাচ্ছে। মাথা ফাটছে, হাত-পা ভাঙচে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে।

প্রথম বারের আচমকা আক্রমণে ছেলেমেয়েরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার কেউ সরল না। রক্ত যত ঝরছে কনকের পেছনে মিছিলটা নিশ্ছেদ দেওয়ালের মত ততই জমাট বেধে যাচ্ছে।

পুলিশ ব্যূহের কাছাকাছি আসতেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। নভেম্বর বিকেলের নিস্তেজ আলোয় দেখলাম চকিতের জন্য একটা মোটা লাঠি আকাশের

দিকে উঠেই কনকের মাথায় গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কপালের কাছটা আঙুল ছয়েকের মত ফাঁক হয়ে গেল। তারপরেই ফোয়ারার মত উষ্ণ লাল রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল। ফাটা জায়গাটায় একখানা হাত চাপা দিয়ে আধফোটা শব্দ করে লুটিয়ে পড়ল কনক।

কিছুক্ষণ অন্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ভিড়ের সেই দেওয়ালটা ঠেলে কনকের কাছে চলে গেলাম। তার মুখের ওপর ঝুঁকে ডাকলাম, 'কনকদেবী—'

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। বুকটা খুব আস্তে আস্তে ওঠানামা করছে। চোখের দৃষ্টি স্থির এবং তাতে পলক পড়ছে না। গাঢ় থকথকে রক্তে শাড়ি-ব্লাউজ, গাল-বুক-চুল মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, চেতনা নেই। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। কনকের অচেতন দেহটা পাঁজাকোলে করে ধর্মতলা স্ট্রীটে নিয়ে এলাম। অসহায়ের মত এদিক সেদিক তাকাতেই চোখে পড়ল বাঁ দিকের ফুটপাত ঘেঁষে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কনককে নিয়ে তাতে উঠে বসলাম, 'হাসপাতালে চল, তাড়াতাড়ি।'

ট্যাক্সিটা নির্দেশ পাওয়ামাত্র ছুট লাগাল। আর পেছনে ম্যাডান স্ট্রীটের ভেতরে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র-কল্লোল শোনা যেতে লাগল, 'বন্দে মাতরম্—'

কনকের ছোট পাখির মত দেহটা আমার কোলের মধ্যে নিথর হয়ে রয়েছে। তার কপাল থেকে অশ্রান্ত ধারায় রক্তের ঢল বেরিয়ে এসে আমার বুক হাত, জামা-কাপড়—সব ভাসিয়ে দিচ্ছে।

কতদূর চলে এসেছিলাম খেয়াল নেই। খুব সম্ভব ধর্মতলা স্ট্রীটটা অর্ধ-বৃত্তাকারে বাঁক ঘুরে যেখানে চৌরঙ্গীতে পড়েছে ঠিক সেইখানে। হঠাৎ আকাশ বিদীর্ণ করে বুম্ বুম্ শব্দ উঠল। সেই সঙ্গে আর্ত চিৎকার। চমকে ফিরে তাকালাম। প্রচণ্ড আতঙ্কে দেখলাম ম্যাডান স্ট্রীটের মাথায় ধূসর রঙের ছোট ছোট ধোঁয়ার কুণ্ডলী আস্তে আস্তে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

একটু আগে ওখানে টীয়ার গ্যাস আর লাঠি চলছিল। তবে কি এখন গুলি শুরু হয়েছে?

হাসপাতালে নিয়ে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই কনকের জ্ঞান ফিরল। জ্ঞান ফিরল বটে কিন্তু তাকে ছাড়া হ'ল না। মাথায় শেলাই করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বেড়ে শুইয়ে রাখা হল। অনেকখানি রক্ত বেরিয়ে গেছে। হার্ট এবং শরীর, দুইই খুব দুর্বল। এ অবস্থায় তাকে 'রিলিজ' করা সঙ্গত হবে না।

অতএব আমাকে একাই বাড়ি ফিরতে হল। ফেরার আগে কনককে বললাম, 'কাল আমি আবার আসব। কালই বা কেন, যে ক'দিন হাসপাতাল থেকে আপনাকে না ছাড়ছে, রোজই আসব।'

একতলা ভাঙা বাড়িটায় আমার সেই ঘরে যখন পৌঁছলাম তখন অনেক রাত। উঠোন থেকে বারান্দায় উঠতেই দেখি সুরপতিবাবু। দাঁড়িয়ে বা বসে নেই তিনি, হাত দুটো শরীরের পেছন দিকে পরস্পর মুষ্টিবদ্ধ করে উদ্ভ্রান্তের মত পায়চারি করছেন।

আগে আর কখনও সন্ধ্যের পর তাঁকে বাড়িতে দেখিনি। বিকেল হলেই দাড়িগোঁফ কামিয়ে সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়েন। আমার জানা আছে চৌরঙ্গীর একটা বার-এ বসে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত তাঁর চল্লিশ বছরের অভ্যাসটির সাধনা চলে। কখন কত রাত্রে ফেরেন জানি না। কেননা পরিতৃপ্ত নিটোল ঘুমের আরকে সেই সময় আমি ডুবে থাকি। কাজেই এই অসময়ে সুরপতিবাবুকে আজ বাড়িতে দেখে রীতিমত অবাকই হলাম।

আমাকে দেখে থমকে গিয়েছিলেন সুরপতি। এদিকে তাঁর বাড়িতে থাকার সেই বিস্ময়টা কেটে গিয়ে কনকের মুখ ভেসে উঠেছিল আমার সামনে।

আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত মুখে কী যেন বলে উঠতে চেয়েছিলেন সুরপতি। তার আগেই কাছাকাছি এগিয়ে এসে বললাম, 'সাঙ্ঘাতিক একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।'

'কী?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন সুরপতি।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম না। একটু ইতস্তত করে চোখ নামিয়ে বললাম, 'আজকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির ব্যাপারে একটা প্রোসেশন বেরিয়েছিল। ম্যাডান স্ট্রীটে ঢুকতেই পুলিশ টীয়ার গ্যাস আর লাঠি চালায়। তাতে—'

'কী?'

'কনকদেবী মারাত্মক ইন্‌জিওরড হয়েছেন। মাথা অনেকখানি ফেটে গেছে। তাঁকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি।'

মনে হল, নিশ্বাসটা যেন বুকের ভেতর আটকে গেল সুরপতির। অনেকক্ষণ পর অস্থির গলায় বললেন, 'এখন কেমন আছে?'

'ভালই। লাঠির ঘায়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, রক্তও পড়েছে খুব। জ্ঞান অবশ্য ফিরেছে, রক্তও বন্ধ হয়েছে। তবে শরীরটা খুব দুর্বল।'

'কত নম্বর বেডে আছে?'

'সাত নম্বর, এমার্জেন্সি ওআর্ড।'

'এখন গেলে কি দেখা করতে দেবে?'

'আজ্ঞে না। কাল ভিজিটিং আওয়ারের আগে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ভয়ের কোন কারণ নেই।' আমি আশ্বাস দিতে চেষ্টা করলাম।

কি যেন ভেবে সুরপতি বিড় বিড় করে উঠলেন, 'এমন যে হবে, আমি জানতাম। আজ সকাল বেলা খবরের কাগজে যখন দেখলাম আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ব্যাপারে স্টুডেণ্টরা মীটিং কল করেছে, আর হানড্রেড ফোর্টি ফোর ভাঙার প্রোসেশন বেরুবে তখনই বুঝেছিলাম।'

'কী?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

'কী আবার, ঐ মেয়েটা এইরকমই একটা কাণ্ড বাধাবে।' গভীর নিশ্বাস ফেলে সুরপতি বলতে লাগলেন, 'তা ছাড়া এ তো নতুন কথা নয়। সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, কোথায় মীটিং হ'ল কি প্রোসেশন বেরুল কি

পিকেটিং আরম্ভ হ'ল—কনক ছুটল সবার আগে। হাজতে যেতে হবে, তা-ও সবার আগে। পুলিশের ভ্যানে প্রথমে কে উঠল? না কনক। কোথাও লাঠি চলছে, কনক দিল সবার আগে মাথা বাড়িয়ে।'

সুরপতি একটি কথাও বাড়িয়ে বলেন নি তার অনেকখানি প্রমাণ আজ বিকেলেই পেয়েছি। টীয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় সবার দৃষ্টি তখন অন্ধ, মিছিলটা বিক্ষিপ্ত, ম্যাডান স্ট্রীটের অপরিসর রাস্তায় ছেলেমেয়েরা লক্ষ্যহীনের মত ছুটছে। সেই সময় ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে নিয়ে ভয়লেশহীন ভঙ্গিতে পুলিশের উদ্যত লাঠির দিকে কনক এগিয়ে গিয়েছিল। নিষ্ঠুর আঘাতে মাথাটা যখন চৌচির হয়ে গিয়েছিল তখনও মৃত্যুপণে দৃঢ় মুঠিতে পতাকাটা আঁকড়ে ধরে রেখেছিল সে। নিশ্চেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পরও সেটা ছাড়ে নি।

সুরপতি থামেন নি। সমানে বলে যাচ্ছেন, 'এমন করে মার খেয়ে খেয়ে বেঘোরেই একদিন মেয়েটা মরবে। তুমি দেখে নিও শুভেন্দু, আমার কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিও।' গলার স্বরটা তাঁর আশ্চর্য করুণ এবং অসহায় শোনাল।

আমি উত্তর দিলাম না।

এতক্ষণ পর হঠাৎ আমার সম্বন্ধে যেন সচেতন হয়ে উঠলেন সুরপতি। তীক্ষ্ন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'তাই তো হে, তুমি তুমি—'

তাঁর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠলাম। বললাম, 'আমি কী?'

'তুমিও ঐ দলে নাম লেখালে নাকি?'

'কোন দলের কথা বলছেন?'

'ঐ কনকদের।'

'আজ্ঞে না।'

'তা হ'লে পুলিশের লাঠিতে ও যে জখম হয়েছে, জানলে কী করে? আবার হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এসেছ, বললে।' প্রায় জেরা শুরু করে দিলেন সুরপতি।

'আজ্ঞে—' আমি বলতে লাগলাম, 'কনকদেবী প্রোসেশনের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা। উনি আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মীটিং-এ। সেখান থেকে ম্যাডান স্ট্রীটে।'

সুরপতি কি বুঝলেন তিনিই জানেন। আবছা গলায় শুধু বললেন, 'বেশ তো চাকরি করছিলে সুষুর কাছে। বড়লোককে ঘিরে বকম বকম করতে, আরামে দিন কেটে যেত। বুদ্ধিমান হলে সুষুর কাছ থেকে আখেরের ব্যবস্থা করে নিতে পারতে। আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি শুভেন্দু, ঐ হতভাগা মেয়ের মত বিপদের পথে ছুটতে যেও না। কি দরকার ও-সব ঝঞ্ঝাটে?'

উত্তর না দিয়ে তালা খুলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম শেষ পর্যন্ত। সুরপতিবাবু বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

সারা দিন স্নান হয়নি। তা ছাড়া আমার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে,

স্নায়ুগুলো ঝিম ঝিম করছে, চোখ দু'টো জ্বলছে, কপালের দু-পাশে দুটো অবাধ্য শির ক্রমাগত দপ দপ করছে। মাথাটা এত ভারী, মনে হয়, কয়েক মণ ওজন তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে কেউ।

ছেলেবেলা থেকে আমার শ্লেষ্মার ধাত। এত রাত্রে স্নান করাটা ঠিক হবে না। নির্ঘাৎ বুকে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। কিন্তু স্নান না করলে আজ রাত্রে ঘুমই আসবে না। কাজেই মাথায় একটু তেল দিয়ে গামছা নিয়ে উঠোনের বাথরুমে চলে গেলাম।

বাথরুমে যাবার সময় দেখলাম সুরপতি একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। স্নান সেরে ফিরবার সময়ও একই অবস্থায় দেখলাম তাঁকে। যাবার সময় কিছু বলেন নি সুরপতি। ফেরার পথে অনুচ্চ চাপা গলায় কি যেন বলে উঠলেন।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। বললাম, 'আমাকে কিছু বললেন?'

'না, তোমাকে আর কি বলব। বলছি আমার নিজের কথা।' সুরপতির গলা থেকে অসীম বিরক্তি ঝরতে লাগল, 'যাও, ভিজে কাপড়ে তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না।'

নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকবার মুখে সুরপতির গজগজানি কানে ভেসে এল, 'এই রাত্রিবেলা কোথায় যে একটু হুইস্কি পাই! সারারাত আজ আর ঘুমই হবে না। এতকালের অভ্যেস—কি যে করি! ছেলেমেয়েরা ভারত উদ্ধার করছে, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি চাইছে, পুলিশ লাঠি হাঁকড়াচ্ছে, তাতে তোদের কি! তোরা কেন 'বার' বন্ধ করলি! সন্ধ্যেবেলা মুখে বুড়ো আঙুল পুরে ধর্মতলা থেকে ফিরে আসতে হ'ল! যত সব—'

আমি স্তম্ভিত। সুরপতির শেষের কথাগুলো যে 'বার' মালিকদের উদ্দেশে সেটা অবোধ্য নয়। সম্ভবত সন্ধ্যের সময় ধর্মতলায় গিয়ে দেখেছেন প্রোসেশন, লাঠি আর গুলির ফলাফলস্বরূপ ভয়ে ভয়ে 'বার'গুলো বন্ধ হয়ে গেছে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে যে অভ্যস্ত নেশার কক্ষপথে অবিরাম ছুটে বেড়াচ্ছেন হঠাৎ তাতে তাল কেটে গেছে। সে জন্যে মনে মনে নিদারুণ চটে গেছেন।

আশ্চর্য! আজকের সেই ঘটনায় কলকাতার আত্মা বিচলিত, অস্থির। ম্যাডান স্ট্রীটের সেই মৃত্যুঞ্জয় ছেলেমেয়েগুলো এই শহরটাকে অনন্ত গৌরবের সিংহাসনে নিয়ে বসিয়েছে। সেই ছেলেমেয়েদের সামনের দিকে রয়েছে কনক। সুরপতির নিজেরই মেয়ে। কলকাতার একদিকে যখন আলোর সাধনা চলছে, আরেক প্রান্তে চল্লিশ বছরের একটা জঘন্য অভ্যাসের জন্য সুরপতি তখন উন্মাদ। হঠাৎ মনে হল, মেয়ে যে আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছে সে খবরটা পেয়ে একটু আগে যতখানি হওয়া উচিত ছিল ততখানি উদ্বিগ্ন যেন তিনি হননি। মেয়ের আঘাতের সেই খবরটা তাঁর মনের বাইরের স্তরে স্পর্শ করেছিল। ভেতর দিকে ছিল নেশা করতে না পারার জন্য পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ এবং আক্ষেপ। হায় সুরপতি!

ভদ্রলোকের জন্য করুণাই বোধ করলাম।

চার

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, মনে নেই। কম্বলের ভেতরকার আরামদায়ক উষ্ণতা আমার সারাদিনের ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটাকে সুপ্তির আরকে ডুবিয়ে রেখেছিল যেন।

কাল রাত্রে দরজায় খিল দেবার কথা খেয়াল ছিল না। স্নানের পর ঘরে এসে কোনরকমে একখানা শুকনো কাপড় কোমরে জড়িয়ে বিছানায় নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম।

ঘুম যখন ভাঙল, দেখি খোলা দরজা দিয়ে রোদের সোনালী একটি ফালি লম্বাভাবে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। আর এসেছে খবরের কাগজ। মেঝের ওপর সেটা পড়ে রয়েছে।

শুয়ে শুয়েই সামান্য একটু ঝুঁকে খবরের কাগজটা তুলে নিলাম। প্রথম পৃষ্ঠায় নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে আগুনের স্রোতের মত কি যেন একটা নেমে গেল। বড় বড় হরফে সমস্ত পাতা জুড়ে লেখা রয়েছে ঃ

'বুধবার কলিকাতার রাজপথে শোভাযাত্রাকারী নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ। গুলির আঘাতে তিন ব্যক্তি নিহত ও আটান্ন জন আহত।

'জনতার উপর পুলিশের বে-পরোয়া লাঠি চালনা। সশস্ত্র পুলিশ সার্জেণ্ট কর্তৃক শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার গতিবোধ ঃ অশ্বারোহী পুলিশের সাহায্যে জনতা ছত্রভঙ্গের চেষ্টা।

'গুলিবর্ষণ সত্ত্বেও গভীর রাত্রি পর্যন্ত ছাত্রদের রাজপথের উপর অবস্থান।'

আরেকটা খবর দেখলাম ঃ

'লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়কদের বিচার।'

'শ্রীযুক্ত দেশাই কর্তৃক সরকারী সাক্ষীকে চার ঘণ্টাকাল জেরা।'

'আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপ তাঁবেদার নহে ঃ ভারতীয়দের চেষ্টা ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা মুক্তিলাভই ফৌজের লক্ষ্য।' জেরার উত্তরে সরকারী সাক্ষীর স্বীকৃতি।

আর কোন খবর আমার চোখ টানতে পারছিল না। বার বার দৃষ্টিটা কলকাতার রাস্তায় শোভাযাত্রীকারীদের ওপর বর্বর আক্রমণের খবরটার ওপর গিয়ে আটকে যাচ্ছিল।

কাল কনককে নিয়ে যখন হাসপাতালে যাই ট্যাক্সি থেকে বন্দুকের আওয়াজ শুনেছিলাম। কিছুটা অবশ্য সন্দেহ ছিল, সত্যি গুলি চলছে কিনা! খবরের কাগজ দেখে একেবারে নিঃসংশয় হয়ে গেলাম। আমি যখন আসি সেই সময় লাঠি আর টিয়ার গ্যাস চলছিল। কয়েকজন আহত রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়েও পড়েছিল। তার পরে গুলি চালিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এতগুলো

লোককে হত এবং আহত করা হয়েছে।

উত্তেজনায় উঠে বসলাম। আর সেই মুহূর্তে দরজার কাছে গুপীর মুখ ভেসে উঠল, 'দাদাবাবু—'

চকিত হয়ে তাকালাম। দু-সপ্তাহের ওপর নতুন বাড়ির সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই, আমি নিজেও যাই নি ওদিকে। ওখান থেকেও কেউ আমার খোঁজ নিতে আসে নি। নতুন বাড়ির সঙ্গে আমার যে কোনদিন কোন সম্পর্ক ছিল সেটা ধীরে ধীরে বোধহয় ভুলেই গিয়েছিলাম। গুপীর মুখটা নতুন করে আমার সেই পঁচাত্তর টাকা মাইনের চাকরিটার কথা মনে করিয়ে দিল। খবরের কাগজটা একপাশে নামিয়ে রেখে বললাম, 'এস গুপীদা—'

গুপী ভেতরে এলে বললাম, 'তারপর গুপীদা এই সকালবেলায় হঠাৎ কি মনে করে—'

'সব্বোনাশ হয়ে গেছে দাদাবাবু।' গুপীর গলা থেকে একরাশ আতঙ্ক লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল।

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কী হয়েছে?'

'কাল সারাদিন কুথায় ছিলেন? সাত আটবার এসে আপনাকে খুঁজে গেচি।'

'কেন, কিছু দরকার ছিল?'

'হাঁ, মা-জননী পাঠিয়ে দিলে যে।'

'মা-জননী, মানে মিসেস মিত্র?'

'হাঁ।'

এবার আমি চমকে উঠলাম। একটা সভয় শিহরণ আমার সমস্ত অস্তিত্বকে ঝাঁকুনি দিয়ে গেল যেন। কাঁপা গলায় বললাম, 'মিসেস মিত্র নার্সিংহোম থেকে ফিরে এসেছেন?'

'আজ্ঞে—' গুপী ঘাড় কাত করল, 'বলা লেই কওয়া লেই, কাল সকাল-বেলা হটাৎ এইসে হাজির। আর এইসেই আপনাকে ডাকতে পাঠিয়ে দিলে আমায়। এ বাড়িতে এসে দেখি আপনি নেই। সকালে এলাম, দুপুরে এলাম, বিকেলে এলাম, সন্ঝে, রাত্তির—কত বার যে এলাম। কিন্তুন আপনি লেই তো লেই।'

গুপী ঠিকই বলেছে। একেবারে বিনা নোটিশে নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন মিসেস মিত্র। অবশ্য আগেই জেনেছিলাম অবজারভেশনের পর টিউমার অপারেশন হয়ে গেছে। আমার ধারণা ছিল নার্সিংহোম থেকে ফেরার আগে মিসেস মিত্র নিশ্চয়ই বাড়িতে খবর পাঠাবেন। কিন্তু তা করেননি তিনি।

হুট করে মিসেস মিত্র যে ফিরে আসবেন সে খবরটা আগেভাগে জানা থাকলে সতর্ক থাকতে পারতাম। কাল আর বাড়ি থেকে বেরুতামই না। চাপা ভীরু গলায় বললাম, 'আমাকে না পেয়ে মিসেস মিত্র খুব রাগ করেছেন নিশ্চয়?'

'তা আর করেনি ! ও গুণে তো ঘাট নেই।' গুপী গজ গজ করে উঠল, 'আপনাকে পায় নি, সে ঝক্কি গেছে আমাদের চাকর-বাকরদের ওপর দিয়ে।'

'সে যাক, এখন কী করতে হবে বল।'

'শিগগির ও-বাড়ি গিয়ে দেখা করুন।'

প্রাতঃকালের যে-সব কৃত্য থাকে সেগুলো আর সারা হল না। ঝড়ের গতিতে জামাটা গায়ে চাপিয়ে বাসিমুখে রুদ্ধশ্বাসে নতুন বাড়ির দিকে ছুটলাম। আমার পিছু-পিছু গুপীও ছুটল।

নতুন বাড়ির দোতলায় আসতেই মিসেস মিত্রের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। নিজের ঘরে খাটের নরম বিছানায় আধ-শোয়া ভঙ্গিতে বসে ছিলেন তিনি। চোখদু'টি দরজার দিকে ফেরানো।

চোখে চোখ পড়তেই থমকে গেলাম। স্নায়বিক ভয়ে হাত-পাগুলো আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগল যেন।

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মিসেস মিত্র। তারপর বললেন, 'ভেতরে এস।'

গলার স্বরটা অস্বাভাবিক শান্ত। ধমক-ধামক আর তর্জন-গর্জনের জন্য প্রস্তুত হয়ে এখানে এসে ছিলাম। কিন্তু আমার প্রত্যাশার ধার দিয়েও গেলেন না মিসেস মিত্র। কিছুটা বিমূঢ়ের মত ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

মিসেস মিত্র বললেন, 'সারাদিন কোথায় থাক ? বার বার লোক পাঠিয়ে খোঁজ পাওয়া যায় না।'

লক্ষ্য করলাম তাঁর স্বরে মনিব সুলভ কঠোরতা নেই। কেমন যেন ক্ষোভ আর অনুযোগে তা মেশানো। একটু অবাকই হয়ে গেলাম। ক'টা দিন নার্সিংহোমে থেকে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে ফিরে এলেন নাকি মিসেস মিত্র ! অবশ্য গুপী একটু আগে যা বলছিল তাতে তা মনে হবার কথা নয়। রাগটা পুরোপুরি অটুটই আছে। তাকে না পেয়ে কাল চাকর-বাকরদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে নাকি তুলেছিলেন ! কিন্তু এখন পর্যন্ত তার সঙ্গে যা ব্যবহার করেছেন তাতে গুপীর কথা প্রমাণিত হয় না।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তীক্ষ্ন চোখে মিসেস মিত্রকে দেখতে লাগলাম। গায়ের রঙ এমনিতেই টকটকে ফর্সা। সেই রঙে এখন রক্তোচ্ছ্বাস ফুটে বেরিয়েছে। সমস্ত শরীরে সজীব মসৃণতা। চুলগুলো শিথিলভাবে বাঁধা। যে দিকেই তাকানো যাক কোথাও অপূর্ণতা নেই। সবই ভরপুর, উচ্ছ্বসিত।

বয়েসের দিক থেকে প্রৌঢ়ত্ব ছুঁই-ছুঁই। তবু যেন সাতচল্লিশের প্রান্তে পৌঁছে সারা দেহ ভরে দ্বিতীয়বার যৌবনের ঢল নেমেছে মিসেস মিত্রের। মাত্র ক'টা দিন নার্সিংহোমে কাটিয়েছেন। কিন্তু এরই মধ্যে মনে হল, বয়েস থেকে কয়েক যুগের ভার কমিয়ে এসেছেন। টিউমারের মত এত বড় একটা অপারেশন করিয়ে এলেন, তাঁকে দেখে সে কথা একেবারেই মনে হয় না।

মিসেস মিত্র আবার বললেন, 'বাড়ি এসে শুনলাম, তুমি নাকি এ ক'দিন

এখানে খেতে আস নি ?'

উত্তরটা দিতে গিয়েও চুপ করে গেলাম। গলার মধ্যে স্বরটা আটকে গেল যেন। এ-বাড়িতে খেতে না আসার কারণ যে নীনী, সেটা মনে পড়ে গেল। তার কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট বোধ করলাম। মিসেস মিত্র ফিরে এসেছেন। এখন থেকে তিন চার বার এ-বাড়িতে যাওয়া-আসা করতে হবে। নিশ্চয়ই নীনীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তখন আমি কী করব ? ভাবনাটা খুব অস্বস্তিকর মনে হ'ল। ভেতরে ভেতরে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লাম।

মিসেস মিত্র তাড়া লাগালেন, 'কি, মুখ বুজে রইলে যে ? খেতে আস নি কেন ?'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'এমনি। আপনি ছিলেন না, তাই—'

'এ তো ভারি আশ্চর্যের কথা, আমি থাকব না বলে তুমি খেতে আসবে না !' মিসেস মিত্রের মুখচোখে বিরক্তি ফুটে বেরুল।

আমি উত্তর দিলাম না। চোখ নামিয়ে বসে রইলাম।

মিসেস মিত্র বলতে লাগলেন, 'খাওয়া-পোশাক আর মাসিক পঁচাত্তর টাকা মাইনে—এ-সব শর্ত ঠিক করেই তো চাকরি নিয়েছিলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

'তা হ'লে আমি যখন বাড়ি ছিলাম না, তোমার খেতে আসা নিশ্চয়ই উচিত ছিল।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এবার থেকে আমি থাকি-না-থাকি তোমার খাওয়া তুমি খেয়ে যাবে।'

'আচ্ছা।'

এ-প্রসঙ্গে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন মিসেস মিত্র। হঠাৎ কি মনে পড়ছে বলে উঠলেন, 'ভাল কথা, এ ক'দিন কোথায় খেয়েছ ?'

'আজ্ঞে, হোটেলে।' আমি মুখ তুললাম।

'খাওয়ার জন্যে এ ক'দিন তোমার যা খরচ হয়েছে তার একটা বিল করে দিও। আইনত আমার কাছে ও টাকা তোমার প্রাপ্য।'

এতক্ষণের কথাবার্তার মধ্যে আন্তরিকতার অদৃশ্য একটা রেশ ছিল। হঠাৎ সেটার সুর কেটে গেল। মিসেস মিত্র যেন তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নতুন করে মনে করিয়ে দিলেন। প্রভুভৃত্যের হিসেবের বাইরে তাঁর আর আমার মধ্যে কিছুই নেই। গলার স্বরটা কিঞ্চিৎ কোমল হওয়া ছাড়া এক'দিনে তাঁর বিশেষ কিছুই পরিবর্তন ঘটে নি।

মিসেস মিত্র আবার বলে উঠলেন, 'আচ্ছা শুভেন্দু—'

'আজ্ঞে—'

'কড়ায়-ক্রান্তিতে তোমার প্রাপ্য যেমন তোমাকে দেব তেমনি নিশ্চয়ই আশা করব, আমার প্রাপ্যটাও বুঝে পাব। তাই না ?' মিসেস মিত্র জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালেন।

তিনি ঠিক কী বলতে চান বুঝতে পারলাম না। তবে কথাগুলোর মধ্যে

যে একটা অস্বস্তিকর ইঙ্গিত রয়েছে সেটা সহজেই আন্দাজ করা গেল। আজ দেখা হবার পর মিসেস মিত্র যে-ভাবে শুরু করেছিলেন তাতে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ফাঁড়াটা বুঝি ভালোয় ভালোয় কাটল। কিন্তু ভদ্রমহিলা কথাবার্তার বাঁক যেদিকে ঘুরিয়েছেন তাতে তটস্থ হয়ে উঠলাম।

মিসেস মিত্র বললেন, 'পনের কুড়িদিন আমি বাড়ি নেই। আশা করেছিলাম একবার অন্তত নার্সিংহোমে গিয়ে আমার খোঁজ নেবে। অবশ্য খোঁজ নেওয়াটা তোমার ডিউটির মধ্যে পড়ে না। নিতান্তই আন্তরিকতার ব্যাপার সেটা। তা না গিয়েছ, তার জন্য আমার বিশেষ ক্ষোভ নেই। কিন্তু আমার পারমিশান ছাড়া বাড়ি থেকে বেরুনো তো উচিত ছিল না।'

উত্তর দেবার কিছুই ছিল না। কেননা মিসেস মিত্র যা বলেছেন তার ভেতর অন্যায় কিছুই নেই। নতচোখে অপরাধী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিসেস মিত্র আবার বলে উঠলেন, 'সে থাক গে। নার্সিংহোমে যাও নি—তাতে আমার বলার কিছুই নেই। কেননা চাকরির শর্তের মধ্যে ওটা পড়ে না। কিন্তু—'

এবার মুখ তুলে তাকালাম।

'কিন্তু—' মিসেস মিত্রের তুলিতে-টানা সরু ভ্রু-দুটো কুঁচকে গেল। কপালের দু-ধারে গভীর খাঁজ পড়ল। তিনি বলতে লাগলেন, 'এ ক'টা দিন তুমি কোথায় কি-ভাবে কাটিয়েছ, নিশ্চয়ই তা জানবার অধিকার আমার আছে।' একটু থেমে কি ভেবে বললেন, 'এতগুলো দিনের চলাফেরার জবাবদিহি তোমাকে করতে হবে না। শুধু জানতে চাই, কাল তুমি কোথায় ছিলে? বার বার ও-বাড়িতে লোক পাঠিয়েও কেন তোমাকে পাওয়া যায় নি?' গলার স্বর তাঁর কঠোর শোনাল।

কাল সারাটা দিন কিভাবে কাটিয়েছি, ভয়ে ভয়ে বললাম।

প্রথমে কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন মিসেস মিত্র। তারপর তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শেষ পর্যন্ত ঐ কনকের সঙ্গে গিয়ে জুটলে! আমার কাছে চাকরি করে ও-সব চলবে না। কিছুতেই না।'

আমি চুপ।

হঠাৎ মিসেস মিত্রের কি যেন মনে পড়ে গেল। আমার দিকে চকিত একটা দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন, 'কি বললে, কনক হসপিটালে, তাই না?' একটু আগের তীব্রতা তাঁর গলায় নেই। বরং ব্যগ্রতাই ফুটে বেরিয়েছে।

মুহূর্তে স্বরের এই পরিবর্তন আমাকে অবাক করে দিল। বুঝলাম কনকের আহত হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার খবরটা তাঁর কাছে সুসংবাদ। অবাক বিস্ময়ে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

অনেকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলেন মিসেস মিত্র। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, তুমি এখন যাও। আজ থেকে এখানে খেতে আসবে। আর আমার কাছে না বলে কোথাও বেরুবে না।'

মাথা নেড়ে বেরিয়ে এলাম। ক'টা দিন খাঁচার পাখিটা অবাধ আকাশের

আস্বাদ পেয়েছিল। আবার তার পায়ে শিকল পড়েছে।

যথারীতি দুপুর বিকেল এবং রাত্রিবেলা নতুন বাড়িতে খেতে এলাম। সমস্ত দিন ভাঙা বাড়ির বিবর ছেড়ে কোথাও বেরুই নি। বিকেলের দিকে কনককে দেখার জন্য ছটফট করেছিলাম। সেই মুহূর্তে মিসেস মিত্রের মুখটা মনে পড়ে গিয়েছিল। ফলে হাসপাতালে যাবার উৎসাহ ঝিমিয়ে গেছে। অবশ্য সুরপতিবাবু তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখেই খবর পেয়েছি, কনক আজ ভাল আছে।

রাতে খাওয়ার সময় মিসেস মিত্র বললেন, 'কাল সকালে তুমি আমার সঙ্গে হুগলী যাবে। ঠিক সাতটায় আমরা বেরুব। তার মধ্যেই তুমি তৈরি হয়ে আসবে। এক মিনিটও যেন দেরি না হয়।'

'আচ্ছা।'

কাঁটা দিয়ে মাছের কাঁটা বাছছিলেন মিসেস মিত্র। বললে, 'ভাল কথা, তোমার ধুতি পাঞ্জাবি আছে?'

'আছে।'

'তা হ'লে তা-ই পরে এসো।'

'আচ্ছা।'

অনুচ্চ গলায় স্বগতোক্তির মত মিসেস মিত্র বললেন, 'যেখানে যাচ্ছি সেখানে স্যুট পরে যাওয়া উচিত হবে না। স্যুট দেখলে হয়ত রেগেই যাবে। ঐ ধুতি পাঞ্জাবিই ভাল।'

কাল সকালে আমরা কোথায় যাচ্ছি, জানি না। স্যুট পরে গেলে কে রেগে উঠবে, তা-ও আমার অজানা। অবাক বিস্ময়ে মিসেস মিত্রের দিকে তাকালাম। আর সেই বিস্ময়ের মধ্যেই এক সময় খাওয়ার পালা চুকিয়ে ভাঙা বাড়িতে ফিরে এলাম।

পাঁচ

সকালবেলা নতুন বাড়িতে এসে আবার অবাক হতে হ'ল। সাতটার মধ্যে আমার এখানে আসার কথা ছিল। তার অনেক আগেই এসে পড়েছি। ঘড়ির কাঁটায় এখন সাড়ে ছ'টা।

দোতলার লাউঞ্জে এসে দেখলাম, মিসেস মিত্র আর জয়ন্ত সোফায় বসে আছেন। জয়ন্তর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। এটা অভাবিত। ক'মাস এ-বাড়িতে চাকরি করছি। এমন নিখুঁত দিশি পোশাকে আর কখনও তাকে দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। বিলিতি স্যুট ছাড়া তার আর কোন চেহারাই আমার স্মৃতিতে নেই। আর মিসেস মিত্র?

মাস দেড়-দুই আগে একদিন ট্রামে করে আমাকে কার্জন পার্কে নিয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। সেখান থেকে ধর্মতলা স্ট্রীটের অতি সাধারণ একটা দোকানে। একখানা টাঙ্গাইল শাড়ি আর হাতে কাজ-করা সাদা ব্লাউজ

কিনেছিলেন সেই দোকানটা থেকে। রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে সেগুলো পরে যেন বিকারের ঘোরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আশ্চর্য, আজও সেই শাড়ি সেই ব্লাউজটাই বাঙালি ঘরের বয়স্কা মহিলাদের মত করে পরেছেন। পায়ে দিয়েছেন একজোড়া সাধারণ চটি। সিঁথিতে সিঁদুরের ডগডগে চওড়া রেখা, কপালে প্রকাণ্ড টিপ। আটপৌরে একটা খোঁপায় দীর্ঘ চুলগুলো আটকানো সেই রাত্রিটার মত আজও কি ভদ্রমহিলার ওপর কোন বিকার ভর করেছে! না কি নার্সিংহোম থেকে ফিরে নিজের অতীতকে একেবারে বদলে ফেলতে শুরু করেছেন তিনি?

আমাকে দেখে মিসেস মিত্র বললেন, 'এই যে শুভেন্দু, তুমি এসে গেছ! এখানে এসে বস। আজ আর ডাইনিং হলে যাব না। এখানেই ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়ব।'

আমি এগিয়ে এসে একটা সোফায় বসলাম। মিসেস মিত্র গলা তুলে ডাকতে লাগলেন, 'বয়—বয়—'

একসঙ্গে দু-জন বয় ছুটে এসেছিল। একজনকে তিনি বললেন, 'এখানে খাবার দাও।' দ্বিতীয় জনের উদ্দেশে বললেন, 'ছোট মেমসাবকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে তুলে পাঠিয়ে দাও।'

ছোট মেমসাব! অর্থাৎ নীনী। সেদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে আসার পর আর তাকে দেখেনি। দেখা হবার ভয়ে এ-বাড়িতে এ-ক'টা দিন খেতে পর্যন্ত আসেনি। নীনী আমাকে দেখলে কি করবে কি বলবে, সেই আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে রইলাম।

এদিকে বয় দুটো ঊর্ধ্বশ্বাসে দু-দিকে ছুটে গেছে। একটু পরেই খাবার এসে গেল। আর স্খলিত পায়ে টলতে টলতে এল নীনী। চোখদুটো আরক্ত, ঢুলু ঢুলু। এক নজরেই অনুমান করা যায়, সারা রাত্রির নেশার পর একটা সর্বগ্রাসী অবসাদ তাকে ঘিরে আছে।

নীনী আসায় আর চোখ তুলতে পারছি না। ভয় আর অস্বস্তির মিশ্র এক অনুভূতি আমাকে প্রতি মুহূর্তে বিদ্ধ করছে। বুঝতে পারছি, ঘামে জামা ভিজে উঠেছে। নীনীর চোখের আড়ালে কোথায় যে আত্মগোপন করব, ঠিক করতে পারলাম না। একবার ইচ্ছা হ'ল, ছুটে পালাই।

আশ্চর্য, আমার এত যে অস্থিরতা তা যেন গ্রাহ্যই করল না নীনী। এমন কি ফিরে পর্যন্ত তাকাল না। সোজা মিসেস মিত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মিসেস মিত্র যেন চমকে উঠলেন। স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নীনীর দিকে তাকিয়ে থেকে চাপা তীব্রস্বরে বললেন, 'এ কি!'

নীনী উত্তর দিল না। তার রক্তাভ ঠোঁটের ফাঁকে শিথিল একটু হাসি ফুটল মাত্র।

মিসেস মিত্র এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, 'কাল কী বলেছিলাম তোকে?'

অপরাধী গলায় নীনী বলল, 'তোমার কথা আমার মনে ছিল। রাত্তির ন'টা পর্যন্ত পারফেক্ট গুড গার্ল হয়ে ছিলাম কিন্তু তারপর আর পারলাম না।

গলা আর বুকের ভেতরটা শুকিয়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কী করি কী করি—বারেই ছুটলাম। রীয়ালি আই অ্যাম সরি।'

'এত বড় মাতাল হয়ে দাঁড়িয়েছ যে একটা দিন ড্রিঙ্ক না করলে তোমার চলে না! এখন আমি কী করি!' অসহায় ক্ষোভে আর রাগে স্বরটা বুজে এল মিসেস মিত্রের।

'কী করি বল, এতদিনের অভ্যাস!'

অন্য সময় লক্ষ্য করেছি, নীনী আর মিসেস মিত্র যখন মুখোমুখি দাঁড়ান তখন হয় পাথুরে নীরবতা নেমে আসে নতুবা একেবারে বিপরীত ছবি। দু'জনের হাতে বাছা বাছা যত অস্ত্র আছে সব পরস্পরের দিকে ছুঁড়তে থাকেন তাঁরা। সে-এক কুৎসিত কদর্য যুদ্ধ।

আজ কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে ভিন্ন রকম। মিসেস মিত্র একতরফা বলে যাচ্ছেন আর নীনী প্রায় মুখ বুজে নির্বিবাদে সে-সব সয়ে যাচ্ছে।

মিসেস মিত্র বলে উঠলেন, 'অভ্যাসের দোহাই দিলে তো চলবে না। এতদিন তবু না হয় একরকম কেটেছে কিন্তু আজ থেকে?' শঙ্কাভরা চকিত দৃষ্টিতে নীনীর দিকে তাকালেন তিনি।

মিসেস মিত্রের শঙ্কাটা নীনীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেল যেন। একটা ছায়া পড়ল তার মুখে। ভীত সুরে ফিস ফিস করে উঠল সে, 'তাইতো, আজ থেকে কী যে করব!'

আজ থেকে কী এমন ঘটতে পারে যাতে এই পরিবারটা তটস্থ হয়ে উঠেছে! বুঝতে না পেরে একবার নীনী, একবার মিসেস মিত্র, একবার জয়ন্তর দিকে তাকাতে লাগলাম।

মিসেস মিত্র বললেন, 'অনেকদিন থেকে তোকে সাবধান করে আসছি নীনী, তুই গ্রাহ্য করিস নি। আজ থেকে সামলে না চললে একটা কেলেঙ্কারি হবে।'

'শুধু আমি সামলে চললেই তো হবে না, তোমারও সাবধান হওয়া দরকার। ড্রিঙ্কের অভ্যাসটা তোমারও তো বেশ পাকাই।' স্খলিত ঠোঁটে নীনী হাসল।

এক মুহূর্ত কি ভাবলেন মিসেস মিত্র। তারপর চিন্তিত সুরে বললেন, 'পরের কথা পরে হবে। এখন এ অবস্থায় তোকে কী করে নিয়ে যাই বল্ দেখি।'

'আমাকে বাদ দিয়ে তোমরাই যাও।'

'তোর কথা যখন জিজ্ঞেস করবে তখন?'

'বলে দিও, আমার শরীরটা ভাল নয়। তাই যেতে পারিনি।'

'সেই ভাল। আমরা আসার আগে লেবুর আরক খেয়ে নেশাটা কাটিয়ে ফেলবি। আর স্নান সেরে নিবি। স্নানের পর সিল্কের শাড়ি কী হাত-কাটা ছোট ব্লাউজ পরবি না। কাল যে তাঁতের শাড়ি আর লম্বা হাতাওলা জামা কিনে এনেছি তাই পরবি। আর—আর—'

'কী?'

'হুট করে আবার কোথাও বেরিয়ে যাসনি। ওদিকে বলে আসব শরীর খারাপ বলে তুই আসিস নি। বাড়ি ফিরে তোকে দেখতে না পেলে আর রক্ষে রাখবে না।'

'না না, বেরুব না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার।'

ক'মাস ধরেই দেখছি মিসেস মিত্র এবং নীনীর মধ্যে প্রীতি, স্নেহ বা শ্রদ্ধার লেশমাত্র নেই। তারা মুখোমুখি হ'লেই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য, আজ দু-জনের ভেতর কোথায় যেন একটা সন্ধি হয়ে গেছে। যে নীনী সবসময়ই অবাধ্য, উদ্ধত আর হঠকারী, আজ নির্বিচারে নিতান্ত সুবোধ বালিকাটির মত মিসেস মিত্রের সব কথা শুনছে সে।

একসময় ব্রেকফাস্ট সেরে জয়ন্ত, মিসেস মিত্র এবং আমি বেরিয়ে পড়লাম।

আমাদের বাহন হিসেবে একখানা সুদর্শন আমেরিকান মডেলের গাড়ি বার করা হ'ল। ড্রাইভার নেওয়া হয় নি। মিসেস মিত্রের নির্দেশে আমাকেই ড্রাইভিং সীটে বসতে হ'ল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনদিকে যাব?'

মিসেস মিত্র বললেন, 'হুগলী। চৌরঙ্গী ধরে ডালহৌসি হয়ে হাওড়া। সেখান থেকে জি. টি. রোড ধরে সোজা বেরিয়ে যাবে।' ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই হুগলী পৌঁছে গেলাম। মিসেস মিত্র পেছনের সীটে বসে ছিলেন। মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'এবার?'

ডানদিকের একটা রাস্তা দেখিয়ে মিসেস মিত্র বললেন, 'ওটা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে বাঁয়ে ঘুরবে।'

প্রথমে ডাইনে, তারপর বাঁয়ে ঘুরতেই রাস্তার শেষপ্রান্তে দুর্গের মত লালরঙের বিশাল বাড়িটা চোখে পড়ল। তার গায়ে কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে, 'হুগলী জেল'।

লোহার প্রকাণ্ড গেটটা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরে অসংখ্য মানুষ ভিড় করে আছে। তাদের প্রায় সবারই হাতে ফুলের মালা, নতুবা ত্রিবর্ণ পতাকা।

দেখতে দেখতে বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল। তবে কি— তবে কি—

ভাবনার বৃত্তটা সম্পূর্ণ হ'ল না। তার আগেই মিসেস মিত্র বলে উঠলেন, 'জেল-গেটের কাছে গাড়ি নিয়ে যাও।'

ভিড় ঠেলে জেলের ফটক পর্যন্ত এগুনো গেল না। অনেক আগেই গাড়ি থামাতে হ'ল। গাড়ি থামল কিন্তু মিসেস মিত্র বা জয়ন্ত, কেউ নামল না। অগত্যা আমিও স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বসেই রইলাম।

ভিড়টা ক্রমাগত বাড়ছে। শাহী দুর্গের মত জেল বাড়িটার সামনের দিকে যতদূর তাকানো যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। আমরা এসে যা ভিড় দেখেছিলাম তা তো আছেই, আরো আসছে।

ভিড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু আগের সেই অসম্পূর্ণ ভাবনাটা আবার আমাকে পেয়ে বসল। জয়ন্ত আমার বাঁ পাশে বসে ছিল।

ফিসফিস গলায় মিসেস মিত্র যাতে শুনতে না পান, এমনভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মিস্টার মিত্র—মানে আপনার বাবা আজ কি রিলিজড্ হচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ।' জয়ন্ত মাথা নাড়ল।

এতক্ষণে নীনী-জয়ন্ত এবং মিসেস মিত্রের আজকের রহস্যময় আচরণগুলি কিছুটা বোধগম্য হ'ল যেন। পোশাক-নেশা এবং চলাফেরা সম্বন্ধে কেন যে তাদের এত সতর্কতা তা বুঝতে লেশমাত্র অসুবিধে হ'ল না।

মিসেস মিত্রের কাছে চাকরি নেবার পর থেকে যে মানুষটি সম্বন্ধে অসংখ্য কিংবদন্তী শুনে আসছি, যাঁর দিনলিপির পঞ্চাশটি খাতায় দুই শতাব্দীর জীবন-জিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে আছে, চোখে না দেখেও যাঁর উপস্থিতি প্রতি মুহূর্তেই শ্রদ্ধার সঙ্গে ইদানীং অনুভব করি, একটু পরে জেলখানা থেকে তিনি বেরিয়ে আসবেন। উনিশ শ' উনচল্লিশে অর্থাৎ যুদ্ধের আগে হেমন্ত মিত্র কারাগারে গিয়েছিলেন, যুদ্ধের পর উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের শেষ প্রান্তে আজ তাঁর মুক্তি। উনচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ছ'টা বছর। অর্থাৎ একটা যুগের অর্ধাংশ। আধ যুগের মত সময় ইটের পিঞ্জরে কাটিয়ে আজ তিনি পৃথিবীর অবাধ উন্মুক্তির মাঝখানে এসে দাঁড়াবেন। ভাবতেই আমার সমস্ত রক্তকণার ভিতর দিয়ে বিচিত্র শিহরণ খেলে গেল।

আর শিহরিত হতে হতে অকস্মাৎ সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল। সেই মেয়েটি—নাম যার কনক। আমার আত্মকেন্দ্রিক পৃথিবীর চারদিকে উঁচু উঁচু যে দেওয়ালগুলো মাথা তুলে ছিল প্রবল ধাক্কায় কনকই একদিন তাদের ভিতে ফাটল ধরিয়েছে। এতকাল আমার জীবনটা ছিল বদ্ধ জলার মত। তার বাইরে যে দুরন্ত জোয়ার রয়েছে, সে সংবাদ আমার কাছে সে-ই পৌঁছে দিয়েছে। হেমন্ত মিত্র নামে বিচিত্র মানুষটিকে তারই কল্যাণে জানতে পেরেছি। দিনলিপির খাতাগুলো পড়ার পর থেকেই তাঁকে দেখার জন্য আমার সমস্ত অস্তিত্ব উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। একটা অসহ্য আবেগ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল যেন। কনককে বলেছিলাম, হেমন্তবাবুকে জেলখানায় গিয়ে একটা প্রণাম করে আসতে চাই। সে আশ্বাস দিয়েছিল, হেমন্তবাবুর মুক্তির দিনে আমাকে নিয়ে আসবে।

আজ হেমন্ত মিত্রের মুক্তির দিন। খানিকটা আগেও সে খবর জানতাম না। যাই হোক, ঠিক ছিল কনকের সঙ্গে আজ এখানে আসব। কিন্তু মেয়েটা হাসপাতালে। তার বদলে অজ্ঞাতসারে মিসেস মিত্রের সহচর হয়ে চলে এসেছি।

কতক্ষণ যে গাড়ির মধ্যে বসেছিলাম, খেয়াল নেই। কম করে দু'টি ঘণ্টা তো বটেই। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল একসময়। জেলখানার লোহার ফটক গম্ভীর ধাতব শব্দে খুলে গেল। ভিতর থেকে একটু পরেই পাঁচজন বন্দী বেরিয়ে এলেন।

এতক্ষণ বাইরের ভিড়টা স্তব্ধ হয়ে ছিল। মুহূর্তে সেটা উত্তাল হয়ে উঠল। আর অসংখ্য কণ্ঠ একসঙ্গে কল্লোলিত হয়ে উঠল, 'বন্দে মাতরম্—'

'বন্দে মাতরম্—'
'ব্রিটিশ—'
'ভারত ছাড়।'

তারপরেই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত ভিড়টা ছুটল গেটের দিকে। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা রাজবন্দীদের গলায় সবার আগে মালা পরায়। ফলে ধাক্কাধাক্কি শুরু হ'ল। আর নিমেষে বন্দীদের গলার চারপাশে ফুলের পাহাড় জমে উঠল।

এদিকে জেলের গেট খুলবার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস মিত্র আর জয়ন্ত গাড়ি থেকে নেমে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কী এক দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণে আমিও নেমে পড়লাম। দিশেহারার মত চারদিকে তাকিয়েও মিসেস মিত্রদের কোথাও আবিষ্কার করতে পারলাম না। শুধু মানুষের স্রোতে তরঙ্গিত হতে হতে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। এগুতে এগুতে কখন যেন একেবারে বন্দীদের সামনে এসে পড়েছিলাম।

পাঁচজন বন্দীই প্রায় সমবয়সী। বয়স সবারই পঞ্চাশোধের্ব। এঁদের মধ্যে কে হেমন্ত মিত্র, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মিসেস মিত্ররা তখনও এসে পৌঁছন নি। কাজেই বিভ্রান্তের মত পাঁচজনের মুখের ওপর দৃষ্টিটাকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

যাই হোক, ভিড় ঠেলে খানিকটা পরেই মিসেস মিত্ররা এসে পড়লেন। পাঁচজন বন্দীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে দীর্ঘ মিসেস মিত্র তাঁকে প্রণাম করলেন প্রথমে। তারপর জয়ন্ত। ইনিই তা হ'লে হেমন্ত মিত্র! আমার হৃদপিণ্ড অস্থির আবেগে দুলতে লাগল।

হেমন্ত মিত্রের পরনে খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবি। মুখে বহুকালের সঞ্চিত দাড়ি গোঁফ। কপালে শিলালিপির মত অগণিত জটিল রেখা। ধূসর রঙের দৃষ্টি গভীর গুহার মধ্যে নিহিত। একদা গৌরবর্ণই ছিলেন কিন্তু সেই রঙ জ্বলে তামাটে হয়ে দাঁড়িয়েছে। চুল এবং দাড়ি গোঁফ তেলহীন, পিঙ্গল। হাতের শিরাগুলি দড়ির মত প্রকট। সুঠাম পেশীর লেশমাত্র তাঁর কোথাও নেই। সবই নীরস; দেহ স্বাস্থ্যবর্জিত। গায়ের চামড়া খসখসে, কর্কশ। ভাঙা গালের উপর দিকে হনুদুটো খাঁড়ার মত মাথা তুলে আছে। শরীরময় এত যে ধ্বংস তবুও চওড়া হাড়, শক্ত দীর্ঘ কাঠামো আর ঋজু শিরদাঁড়াটার দিকে তাকলে অনুমান করা যায় হেমন্ত মিত্র একদিন সুপুরুষই ছিলেন। দীর্ঘ কারাবাস তাঁর দেহের সমস্ত শাঁস শুষে শুষে নিঃশেষ করে ফেলেছে।

একদৃষ্টে, প্রায় অভিভূতের মত তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছি। চোখ আর ফিরছে না।

কোমল সুরে মিসেস মিত্র বললেন, 'চল।'

মানুষের সমুদ্রে অস্থিরভাবে কাকে যেন খুঁজছিলেন হেমন্ত। মিসেস মিত্রের কথায় দূরে থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অসীম বিতৃষ্ণায় চোখদু'টো কুঁচকে গেল তাঁর। তীক্ষ্ম বিরক্ত সুরে তিনি

বললেন, 'তুমি ! তুমি কেন এখানে ? কে আসতে বলেছে ?'

করুণ চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন মিসেস মিত্র। ঝাপসা ভারী গলায় বললেন, 'আমার সম্বন্ধে তুমি একটা ভুল ধারণা করে রেখেছ। তুমি যখন জেলে, কতবার এসেছি। তুমি দেখা কর নি। বার বার আমি ফিরে গেছি। আজ তোমাকে না নিয়ে আমি ফিরব না !'

'ভুল ধারণা করে আছি।' প্রখর বিদ্রূপে চোখদুটো কুঁচকে গেল হেমন্ত মিত্রের।

'সে-সব কথা বাড়ি গিয়ে হবে'খন। এখন চল।'

কী যেন ভেবে হেমন্ত বললেন, 'কনক কোথায় ? সে আসেনি কেন ?'

বিশাল জনতার মধ্যে একটু আগে কাকে যেন খুঁজছিলেন হেমন্ত। এই মুহূর্তে আমি নিঃসংশয় হলাম, যাকে তিনি খুঁজছিলেন সে কনক।

যাই হোক মিসেস মিত্র বললেন, 'কনক আসবে কি করে! সে তো হাসপাতালে।'

'হাসপাতালে ! কেন ?'

আমার কাছে কনকের হাসপাতাল যাবার কারণটা শুনেছিলেন মিসেস মিত্র। তা-ই বললেন।

'এখন কেমন আছে সে ?' হেমন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন।

'ভালই। চল।' হেমন্তর অস্থিরতার মধ্যেই একরকম জোর করে তাঁকে গাড়িতে নিয়ে তুললেন মিসেস মিত্র। জয়ন্ত আর আমিও গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। তারপর মিসেস মিত্রের চোখের ইশারায় স্টার্ট দিয়ে দিলাম।

মিসেস মিত্র আর হেমন্ত বসেছেন পিছনের সীটে। জয়ন্ত আর আমি সামনে। ছোট একটা আয়না আমার চোখের কাছে ঝুলছে। তাতে পিছনের হুবহু প্রতিচ্ছায়া পড়েছে। গাড়ি চালাতে চালাতেও আমার চোখদু'টি আয়নার কাচে নিবন্ধ হয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছি, দু-জনে পাশাপাশি বসে নেই। মাঝখানে অনেকখানি দূরত্ব বজায় রেখে দুই বিপরীত জানালার কাছে বসে আছেন।

হুগলী ছাড়িয়ে একসময় আমরা জি. টি. রোডে এসে পড়লাম। এর মধ্যে না মিসেস মিত্র, না হেমন্ত—কেউ একটা কথাও বলেন নি। গাড়ির হৃদ্‌পিণ্ডের ধকধকানি ছাড়া সব নিশ্চুপ।

রাস্তার দু-দিকে আদিগন্ত ধানের ক্ষেত। এখনও ধান ওঠে নি। যতদূর চোখ যায় কৃষাণের পরিশ্রমের পরশপাথর লেগে ক্ষেতগুলো সোনা হয়ে আছে। দুপুর হতে আর দেরি নেই। আসন্ন শীতের রোদ মাঠগুলোর ওপর অলস-ভাবে ছড়িয়ে আছে। আর উড়ছে পাখি। ঝাঁকে ঝাঁকে টুনটুনি আর চড়াই।

আয়না থেকে চোখ দুটো নিজের অজান্তে বাইরে চলে গিয়েছিল, হঠাৎ হেমন্ত মিত্রের শ্লেষভরা তিক্ত কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'তুমি আমায় ভেবেছ কি ?'

চকিতে দৃষ্টিটা আবার আয়নায় ফিরিয়ে আনলাম।

মিসেস মিত্র ওদিকে চমকে উঠেছেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কী ভেবেছি !'

'টাকা রোজগারের জন্যে যাদের কাছে উর্বশী সাজতে আমি বুঝি সেই দলের ?'

লক্ষ্য করলাম মিসেস মিত্রের মুখখানা মুহূর্তের জন্য রক্তশূন্য হয়ে গেল। রুদ্ধশ্বাস শিথিল গলায় তিনি বললেন, 'উর্বশী সাজতাম, কী বলছ তুমি !'

'শুধু কি উর্বশী, কখনও মেনকা, কখনও রম্ভা। সে সবই তোমার আসল রূপ। শান্তিপুরী শাড়ি পরে আজ ঘরের বউটি সেজে যে এসেছ—এ তো তোমার ছদ্মবেশ !'

মিসেস মিত্র দু-হাতে মুখ ঢাকলেন। ক্ষুব্ধ আর্ত সুরে বললেন, 'এ কথা তুমি বলতে পারলে !'

হেমন্ত যেন স্ত্রীর কথা শুনতেই পেলেন না। জয়ন্ত যে তাঁর ছেলে এবং আমার মতো অপরিচিত একটি যুবক গাড়িতে উপস্থিত রয়েছে তা যেন বিস্মৃত হলেন। আপন মনেই তিনি বলতে লাগলেন, 'তোমার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। নটী সেজে এক দলকে মজাতে। আজ কুলবধূ সেজে আমাকে ভোলাতে এসেছ ! ভেবেছ তোমার ছলাকলা আর অভিনয়ে আমি ভুলব !'

মিসেস মিত্র স্তব্ধ মূর্তি হয়ে বসে আছেন। তাঁর মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। শুধু মৃদু ফোঁপানির একটা শব্দ কানে এসে লাগল। মিসেস মিত্র কাঁদছেন। আমার সমস্ত স্নায়ু ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

হেমন্ত আবার বলে উঠলেন, 'তোমাদের গাড়িতে এই যে চলেছি তাতে গায়ে কাঁটা ফুটছে। ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছি। উঠবারই ইচ্ছা ছিল না। নেহাত না উঠলে জেলখানার অত মানুষের সামনে একটা নাটক ফেঁদে বসতে —সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠেছি। এখন দয়া করে গাড়ি থামিয়ে আমাকে নামিয়ে দাও।'

আয়নার কাচে দেখলাম, মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলেন মিসেস মিত্র। চোখের কালো মণিদুটো তাঁর ভাসছে। সজল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে করুণ গলায় বললেন, 'ছ বছর পর আজ তুমি জেল থেকে বেরুলে। এই দিনটার মুখ চেয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছি। সারাটা জীবন বাইরে আর ক'টা দিন থেকেছ ! জেলে জেলেই তো আয়ু ফুরিয়ে ফেললে। কি স্বাস্থ্য ছিল, কি হয়ে দাঁড়িয়েছে ! ভেবেছিলাম, এবার জেল থেকে বেরুলে তোমাকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য বাইরে চলে যাব। শরীর সারিয়ে তারপর যা খুশি করো।' শেষ দিকে গলাটা অনুনয়ের মত শোনাল মিসেস মিত্রের, 'তোমার পায়ে ধরছি, আমার আশাটা ভেঙে দিও না।'

হেমন্ত মিত্র নিশ্চুপ। আয়নার কাচে তাঁর কপালের রেখাগুলি আরো গভীর দেখাল শুধু।

মিসেস মিত্র এক মুহূর্ত থেমে আবার বলতে লাগলেন, 'আমি জানি কে আমার সর্বনাশটা করেছে। দিনের পর দিন আমার নামে সত্যি-মিথ্যে লাগিয়ে তোমার মন বিষিয়ে দিয়েছে কে। আমি—'

কথাটা শেষ হ'ল না। তার আগেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হেমন্ত, 'কনক সম্বন্ধে একটা বাজে কথাও বলবে না। মিথ্যে বলার মেয়ে সে নয়। তোমাদের যা করতে দেখেছে, তা-ই আমার কাছে এসে বলেছে।'

'বেশ, মুখে আমি কিছু বলব না। তুমি বাড়ি চল। নিজের চোখে দেখে সত্যি-মিথ্যে বিচার করো।'

আমি প্রায় চমকে উঠলাম। স্টিয়ারিং-এর ওপর হাতটা পলকের জন্য কেঁপে গেল। এ কি করলেন মিসেস মিত্র! জীবনের সমস্ত ফাঁকি আর মিথ্যেকে মুঠোয় পুরে কার সঙ্গে বাজি ধরলেন তিনি? ছ বছর ধরে প্রতিদিন সযত্নে যে জীবন তিনি গড়ে তুলেছেন, প্রতি মুহূর্তের ওঠাবসায় চলাফেরায়, এবং অভ্যাসে যা জড়িয়ে আছে তা নিশ্চিহ্ন করবেন কিভাবে? এতখানি দুঃসাহস তাঁর কোথা থেকে এল?

হেমন্ত মিত্র কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন যেন। স্ত্রীর চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, 'বেশ, তাই চল। নিজের চোখেই আমি সব দেখতে চাই।'

গাড়িটা একসময় হাওড়া পেরিয়ে ডালহৌসি এসে পড়ল। পাশ থেকে জয়ন্ত বলে উঠল, 'গাড়িটা থামান। আমি নামব।' মা-বাবার দিকে ফিরে বলল, 'আমি অফিস যাচ্ছি, দুপুরে আর বাড়িতে খেতে যাব না। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বিকেলের মধ্যে ফিরব।'

হেমন্ত কিছু বললেন না। মিসেস মিত্র বললেন, 'একটা দিন অফিস না গেলে চলত না? মানুষটা এতদিন পর বাড়ি ফিরছে—'

'গভর্নমেণ্টের কাজে জরুরি একটা টেণ্ডার পাঠাতে হবে। আজকেই লাস্ট ডেট।' ছ বছর কারাবাসের পর যে বাবা আজ মুক্তি পেয়েছেন তাঁকে ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়ার একটা কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করল জয়ন্ত।

মিসেস মিত্র ক্ষেপে উঠলেন, 'পাঠাতে হবে না টেণ্ডার। উঠে এসো গাড়িতে। একটা মানুষ ছ বছর একা-একা জেলখানার জেলে কাটিয়ে এল। কোথায় তার কাছে থেকে সঙ্গ দেবে, যাতে তার আরাম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে, তা নয়, শুধু টেণ্ডার আর টেণ্ডার! টাকা আর টাকা!'

আমার কেমন যেন সংশয় হ'ল, মিসেস মিত্রের ভর্ৎসনা যতখানি আন্তরিক তার হাজার গুণ লোকদেখানো।

জয়ন্ত গাড়িতে উঠে এল। আমি আবার স্টার্ট দিলাম।

ডালহৌসি পার হয়ে আমরা যখন চৌরঙ্গীতে সেই সময় কি যেন মনে পড়ল হেমন্তর। উন্মুখ সুরে তিনি বললেন, 'তোমরা সবাই এসেছ। কই, নীনীকে তো দেখছি না? সে কোথায়?'

'নীনীর শরীরটা ভাল না। সে বাড়িতে আছে। অবশ্য আসতে চেয়েছিল, আমি আনি নি।' মিসেস মিত্র বললেন।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। স্টিয়ারিং-এর ওপর হাতটা কেঁপে গেল। আয়নায় অবিকল প্রতিচ্ছায়া রয়েছে। তবু ঘাড় ফিরিয়ে মিসেস মিত্রকে

একবার দেখে নিলাম। কত স্বচ্ছন্দে আর অনায়াসে ভদ্রমহিলা মিথ্যাগুলি বলে গেলেন! কণ্ঠস্বর এতটুকু কাঁপল না। জিভটা বিন্দুমাত্র আড়ষ্ট হল না। আশ্চর্য!

ছ বছর আগের ইতিহাস আমার অজানা। তবে আজ ভদ্রমহিলা যে মিথ্যে দিয়ে শুরু করলেন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সেটা ক্রমাগত স্ফীত হয়ে হয়ে এরপর কী বিপুল হয়ে উঠবে, ভাবতেই হৃদ্‌পিণ্ড স্তব্ধ হয়ে আসতে লাগল।

একসময় নতুন বাড়ির সুবিশাল লনটার পাশে এসে গাড়ি থামল।

মিসেস মিত্র প্রথমে নামলেন। স্বামীর উদ্দেশে বললেন, 'এসো।'

গাড়ি থেকে নেমে বিমূঢ় বিস্ময়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলেন হেমন্ত। অনেকক্ষণ পর ফিস ফিস গলায় বললেন, 'ছ বছর আমি সংসারের বাইরে। এর মধ্যে তোমরা এই বাড়ি করেছ! অদ্ভুত!'

'হ্যাঁ, এসো।'

'কিন্তু—' গভীর সংশয় দেখা দিল হেমন্ত মিত্রের চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে।

'কী?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন মিসেস মিত্র।

'সারা জীবন কষ্টই তো করেছি। এত বড় বাড়ি, মনে হচ্ছে অনেক আরাম ওখানে। এত আরামের মধ্যে এই শেষ বয়েসে গিয়ে কি স্বস্তি পাব! তার চাইতে আমাদের সেই পুরনো বাড়িতেই চলে যাই বরং।'

'তুমি এসো দেখি। স্বস্তি পাও কি না পাও, সে দায়িত্ব আমার।' এক রকম জোর করেই স্বামীকে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন মিসেস মিত্র। খানিকটা গিয়ে কি ভেবে আমার কাছে ফিরে এলেন। বললেন, 'কিছু যদি মনে না কর, তোমায় একটা কথা বলব শুভেন্দু।'

'বলুন—' আমি উদগ্রীব হলাম।

'আজ দুপুরে তুমি লাঞ্চে এসো না। তোমার খাবার পাঠিয়ে দেব।'

বুঝলাম, এতদিন পর হেমন্তবাবু ফিরছেন। আজ সর্বক্ষণ মিসেস মিত্ররা তাঁকে ঘিরে থাকবেন। এটাই স্বাভাবিক। পারিবারিক সেই পুনর্মিলনে আমার মত অনাত্মীয়ের উপস্থিতি নিশ্চয়ই তাঁদের কাম্য নয়। বললাম, 'আচ্ছা।'

একটু ইতস্তত করে মিসেস মিত্র আবার বললেন, 'আরেকটা কথা শুভেন্দু—'

'কী?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না মিসেস মিত্র। কি ভেবে বললেন, 'সে কথা এখন থাক। বলতে সময় লাগবে। ওদিকে উনি দাঁড়িয়ে আছেন। পরে সময় করে বলব।'

মিসেস মিত্র ফিরে গিয়ে হেমন্তকে নিয়ে নতুন বাড়ির দিকে চলে গেলেন। আর নির্নিমেষ স্থির দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। দেখতে

দেখতে মনে হল, জীবনের দুই বিপরীত মেরুর দুটি মানুষ একই বিবরে গিয়ে ঢুকল।

অভাবিত ব্যাপার, খানিকটা পর খাবার নিয়ে বয়ই শুধু ভাঙা বাড়িতে এল না, মিসেস মিত্রও এলেন। প্রায় বিমূঢ়ই হয়ে গেলাম। বললাম, 'আপনি!'

'হ্যাঁ, সেই কথাটা বলতে এলাম।' বলেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন মিসেস মিত্র, 'কথাটা তোমাকে আগেই বলা উচিত ছিল। আমার একেবারে খেয়াল ছিল না।'

বুঝলাম, প্রসঙ্গটা অত্যন্ত গুরুতর। নইলে ছ বছর পর স্বামীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই এমনভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে এ-বাড়িতে ছুটে আসতেন না মিসেস মিত্র। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

মিসেস মিত্র একটু থেমে অনুচ্চ সুরে বললেন, 'আমাদের সম্বন্ধে তুমি অনেক খবরই জান। বিশ্বাস ক অনেক কথাই বলেছি। ইউ আর অ্যান ইনটেলিজ্যান্ট্ বয়। আমি কী বলছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

ঠিক যে বুঝতে পেরেছি তা নয়। বললাম, 'আজ্ঞে আপনি কিসের সম্বন্ধে—'

'মানে আমাদের সংসারের ব্যাপার আর কি। নীনীর, আমার আর জয়ন্তর প্রাইভেট লাইফের সব দিকের খবরই তুমি জেনেছ। এই ড্রিঙ্ক, হোটেল, পার্টি—এ সবের কথা বলছি।'

এতক্ষণে বোধগম্য হ'ল। অর্থাৎ আজকে হেমন্ত মিত্রের মুক্তির দিনে বাঙলাদেশের গৃহস্থ কুলবধূর যে মেক-আপ তিনি নিয়েছেন তার পেছনে ছ বছরের নোংরা একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড রয়েছে। মিসেস মিত্র সেদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু জানি।'

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে এবার মিসেস মিত্র বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছ আমার স্বামী খুবই কনজারভেটিভ প্রকৃতির মানুষ। শুধু কনজারভেটিভই না, মারাত্মক ধরনের নীতিবাদী। মরালিস্ট। মেয়েদের বেশি স্বাধীনতা তিনি পছন্দ করেন না। তাই—' বলতে বলতে ভদ্রমহিলা থামলেন।

'বলুন—' রুদ্ধশ্বাসে বললাম।

'বলছিলাম, আমার স্বামী পার্টি-ড্রিঙ্ক—এসব সম্বন্ধে যদি কোনদিন কোন কথা জিজ্ঞেস করেন, তুমি বলবে, তুমি কিছু জান না। আশা করি, আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে, কেমন?'

এতক্ষণে মিসেস মিত্রের এ-বাড়িতে ছুটে আসার রহস্যটা স্পষ্ট হ'ল। ভদ্রমহিলা আশ্চর্য চতুর আর সতর্ক। সর্বদিকের সব ঘাঁটিই তিনি আগেভাগে আগলে রাখছেন। এমন কোন ফাঁক তিনি রাখবেন না যার মধ্য দিয়ে ছ বছরের জীবনটা কদর্য দুর্গন্ধের মত বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়।

মিসেস মিত্র আমার অন্নদাত্রী। কাজেই নিয়মের কথা বাদ দিলেও নৈতিক দিক থেকেও তাঁর সম্বন্ধে বিশ্বস্ত থাকা আমার কর্তব্য। আত্মবিস্মৃতের মত মাথা নাড়লাম। বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আরেকটা কথা।'

'কী?'

'আজ রাতেও তুমি ও-বাড়িতে যেও না। তোমার খাবার এখানেই পাঠিয়ে দেব। বুঝতেই পারছ, এতকাল পর মিস্টার মিত্র ফিরলেন। আমরা ফ্যামিলির ক'জন একসঙ্গে আজকের দিনটা কাটাতে চাই।'

এ কথাগুলো না বললেও চলত। আগেই তা আন্দাজ করেছিলাম।

মিসেস মিত্র উঠে পড়লেন। আর সেই সময় কথাটা মনে পড়ে গেল আমার। পরশুদিন হাসপাতালে কনককে রেখে আসার পর আর যাওয়া হয় নি।

এদিকে মিসেস মিত্র ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের উঠোনে নেমে গেছেন। আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। পায়ের শব্দে থমকে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'কিছু বলবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী?'

'আজকের বিকেলটা আমাকে যদি ছুটি দেন, মানে আমার একটু দরকার আছে।'

মেজাজ যে কারণেই হোক, ভালো আছে মিসেস মিত্রের। বললেন, 'বেশ তো। আজ আর তোমাকে আমার দরকার নেই।'

মিসেস মিত্র চলে গেলেন।

বিকেলবেলা হাসপাতালে এসে অবাক হতে হ'ল। লোহার খাটের রেলিঙে হেলান দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে রয়েছে কনক। অনেকখানি রক্তপাত হয়েছে। ফলে মুখখানা কেমন যেন নির্জীব, প্রাণশূন্য। চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ। অন্তহীন এক ক্লান্তি তাকে ঘিরে রয়েছে। এত যে অবসাদ তবু আগের তুলনায় কিছুটা সুস্থই মনে হ'ল তাকে। বেডের ওপর কনকের পাশে বসে আছেন হেমন্ত মিত্র। খুব সম্ভব, একলাই এসেছেন তিনি। কেননা, মিসেস মিত্র বা নীনী অথবা জয়ন্ত—কাউকেই দেখতে পেলাম না।

আমাকে দেখে হেমন্তও যেন কিছুটা বিস্মিত হলেন। বললেন, 'ও-বেলা তোমাকে দেখেছিলাম না? তুমিই তো গাড়ি ড্রাইভ করেছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বলেই সকালে মিসেস মিত্রদের ভিড়ে যা পারিনি, তা-ই করলাম। মাথা নুইয়ে প্রণাম করলাম তাঁকে।

'আরে আরে, আবার এ-সব কেন?' ভয়ানক বিব্রত বোধ করলেন হেমন্ত।

বললাম, 'অনেকদিন থেকেই আমার ইচ্ছা আপনাকে প্রণাম করি। কনকদেবী তা জানেন। ও-বেলা সুযোগ পাই নি, তাই—'

কিসের একটা ছায়া যেন পড়ল হেমন্তর মুখে। বললেন, 'তুমিই তা হ'লে —কি যেন নাম—'

আমি উত্তর দেবার আগেই কনক বলে উঠল, 'শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ শুভেন্দু। তোমার কথা কনকের কাছে অনেক শুনেছি।' হেমন্ত বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এখানে এসে বস।'

কাছে গিয়ে খাটের একপ্রান্তে বসলাম।

হেমন্ত বললেন, 'সেদিন তুমি সঙ্গে না থাকলে কনক মরেই যেত। যা করেছ ওর জন্যে—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'না না, কি এমন করেছি যে-কেউ এটুকু করত।'

হেমন্ত আর কিছু বললেন না। হাত বাড়িয়ে সস্নেহে আমাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে একটু হাসলেন। তাঁর স্পর্শটুকু ভারি ভাল লাগল।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে কনকের উদ্দেশে বললাম, 'কাল আসতে পারিনি। হঠাৎ মিসেস মিত্র নার্সিংহোম থেকে ফিরে এলেন। আমিও আটকে গেলাম। অথচ আমার জন্যে—'

আমার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে কনক ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আরে কি আশ্চর্য, আপনি অত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? কি ধরনের চাকরি করেন তা তো জানি। ইচ্ছে থাকলেও কোথাও যাবার স্বাধীনতা আপনার নেই।'

নিজের খাঁচায় বন্দী জীবনের কথা নতুন করে মনে করিয়ে দিতে একটা দীর্ঘশ্বাসই উঠে এল বুঝি। বললাম, 'সে কথা থাক। এখন কেমন আছেন বলুন।'

'অনেক ভাল।'

'এখান থেকে কবে ছাড়া পাচ্ছেন?'

'খুব শিগগির নয়।' কনক হাসল, 'পুলিশ যেরকম করুণা করেছে তাতে অন্তত সপ্তাদুয়েক হাসপাতালের ভাত খেতে হবে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমার দুটো উপকার করবেন শুভেন্দুবাবু?'

'নিশ্চয়ই।' সাগ্রহে তাকালাম।

'তিনদিন ধরে হাসপাতালে আটকে আছি। বাইরের কোন খবরই পাচ্ছি না। বড় ছটফটানি লাগছে। দয়া করে একটা খবরের কাগজের হকার যদি ঠিক করে দেন—'

'হকারের দরকার হবে না। আমিই বিকেলের দিকে খবরের কাগজ দিয়ে যাব।'

'আপনার অসুবিধে হবে। যে চাকরি করেন তাতে—' বলতে বলতে কনক থামল।

'কিছু অসুবিধে হবে না। যেমন করে হোক আমি আসব।'

'বেশ। আরেকটা কথা—আমি কোন স্কুলে চাকরি করি তা তো জানেন!'

'না।'

'হিরন্ময়ী বালিকা বিদ্যালয়। মেডিক্যাল লীভের জন্য একটা দরখাস্ত

লিখে রাখব। কাল এসে নিয়ে যাবেন। কালই ওটা আমার স্কুলে পৌঁছে দিতে হবে।'

'আচ্ছা।' আমি মাথা নাড়লাম।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। এতক্ষণ হেমন্ত নিঃশব্দে আমাদের কথা শুনছিলেন। এবার নীরবতা ভাঙলেন। কনকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা হলে ঐ ব্যাপারটার কি হবে? তোর মাসিমা নতুন বাড়িতে থাকার জন্য এমন পীড়াপীড়ি শুরু করল যে ঝোঁকের মাথায় রাজিই হয়ে গেলাম। তোর সঙ্গে আগে যে পরামর্শ করব—'

বুঝলাম, আমি হাসপাতালে আসার আগে নতুন বাড়িতে থাকার প্রসঙ্গে কনকের সঙ্গে হেমন্তর কিছু কথাবার্তা হয়ে গেছে। সেই ব্যাপারটাই এখন নতুন করে উঠল।

কনক বলল, 'বেশ তো, থাকতে যখন বলছে থাকুন না কিছুদিন। থেকে সব কিছু নিজের চোখে দেখুন—'

'তুই বলছিস তা হ'লে—'

'নিশ্চয়ই।'

এর পর আর বিশেষ কথা হ'ল না। হাসপাতালে আত্মীয়-স্বজনদের ভিজিটিং আওয়ার্স চারটে থেকে ছ'টার মধ্যে সীমাবদ্ধ। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কনকের কাছে কাটিয়ে বেরিয়ে এলাম। হেমন্তও আমার সঙ্গী হলেন।

রাস্তায় এসে হেমন্ত বললেন, 'তুমি কোথায় যাবে এখন?'

'বাড়িই ফিরব।'

একটু চিন্তা করে হেমন্ত বললেন, 'তুমি তো আমাদের সেই একতলা পুরনো বাড়িটাতেই থাক, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজ জেল থেকে বেরিয়ে ও-বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। তোমার সঙ্গেই যাই চল। এখান থেকে বাড়ি তো একটুখানি পথ। ট্রামে-বাসে উঠে আর কি হবে, গল্প করতে করতে হেঁটেই যাই বরং। হাঁটতে তোমার আপত্তি আছে?'

'না না, আপত্তি থাকবে কেন? আমি তো হেঁটেই যেতাম।' ব্যস্তভাবে বলে উঠলাম। মিসেস মিত্রের কাছে চাকরি নেবার পর বহুবার এই মানুষটির কথা শুনেছি। শুনতে শুনতে কখনও অবাক, কখনও অভিভূত হয়েছি। কিংবদন্তীর বিচিত্র এক নায়কের মত আমার অস্তিত্বের মধ্যে তিনি স্থায়ী ছাপ ফেলেছেন। আজ সকালেই তাঁকে প্রথম দেখেছি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই দুর্লভ সুদূর মানুষটিকে যে এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পেয়ে যাব, এ ছিল আমার পক্ষে অপ্রত্যাশিত, আশাতীত। প্রায় রোমাঞ্চিত বোধ করলাম।

ফুটপাথ ধরে পাশাপাশি চলেছি। পাশাপাশি যেন নয়, হেমন্ত মিত্র তাঁর দীর্ঘ শরীরের ছায়ায় আমাকে ঢেকে নিয়ে চলেছেন যেন। শুধু শরীরেরই কি, তাঁর ব্যক্তিত্বের অদৃশ্য একটা ছায়াও বুঝি আমার ওপর প্রসারিত হয়েছে। হেমন্ত মিত্রের পাশে কত ক্ষুদ্র আর অকিঞ্চিৎকরই না মনে হচ্ছে নিজেকে!

এদিকে উত্তরায়ণের সূর্য অনেক আগেই দিগন্তের ওপারে টুপ করে খসে গেছে। হঠাৎ লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মুখের মত পশ্চিম আকাশ এখনও কিছুটা আরক্ত। ফুটপাথ ধরে সারিবন্ধ যে গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে তাদের বেশির ভাগেরই পাতা নেই। ডালগুলো নিঃস্ব, নিরানন্দ। এরই মধ্যে পাতা ঝরা বিষণ্ণ দিনেরা কি এসে গেছে!

এখন ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, অনন্ত বিষাদ। আকাশের দিকে কখনও, কখনও রাস্তার দিকে তাকিয়ে দূরমনস্কের মত হাঁটছিলেন হেমন্ত। মনে হয়, ছ বছর পর নতুন করে কলকাতাকে অপার স্নেহ দিয়ে স্পর্শ করছেন। হাঁটতে হাঁটতে একসময় তিনি ডেকে উঠলেন, 'বুঝলে শুভেন্দু—'

আমি প্রায় কান খাড়া করেই ছিলাম। ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলাম।

দূরে চোখ রেখে হেমন্ত বললেন, 'জেলখানা থেকে যখনই বেরুই কলকাতাকে অদ্ভুত ভাল লাগে আর আশ্চর্য নতুন। মনে হয়, আধো-জানা একটা রহস্যের জগতে এসেছি।'

আমি নিশ্চুপ। হেমন্তের দূরনিবদ্ধ দৃষ্টি, তন্ময় কণ্ঠ—সব মিলিয়ে মনে হ'ল ভদ্রলোক কবি।

হেমন্ত বলতে লাগলেন, 'ছ বছর এবার জেলে কেটে গেল। ছ'টা বছর অর্থাৎ একটা যুগের অর্ধেক। আমি একা নই, স্বাধীনতা আন্দোলনের ছোঁয়া যাদের গায়ে এতটুকু লেগেছে পুলিশ তাদের সবাইকে ছেঁকে নিয়ে আটকালে। যা দু-চারজন বাইরে ছিল বেয়াল্লিশে তাদেরও জেলখানার দেওয়ালের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল।' আবেগভরা কাঁপা সুরে এরপর তিনি যা বলে গেলেন সংক্ষেপে এইরকম। কারাগারের সঙ্কীর্ণ সেলের মধ্যে বিশাল-ব্যাপ্ত দেশ তাঁর চেতনার সকল দিককে আচ্ছন্ন করে রাখত। ভারতবর্ষের কথা যতই ভাবতেন অসহ্য এক যন্ত্রণা তাঁকে নিয়ত বিদ্ধ করত। এই দুর্ভাগা দেশে যেখানে এতটুকু স্ফুলিঙ্গ দেখা গেছে পুলিশ সেখানেই ছোঁ দিয়ে পড়েছে। যেখানেই এতটুকু প্রতিবাদ মাথা তুলতে চেয়েছে নিষ্ঠুর আঘাতে তাকে পিষে দিয়েছে। দু'শ বছরের পদানত দেশের আত্মা ক্ষোভে আর বেদনায় হেমন্তদের মধ্য দিয়ে বার বার বিদীর্ণ হতে চেয়েছে। তাতে বিদেশী মহাপ্রভুর সিংহাসন দুলে উঠেছে। আঁতকে উঠে তারা বোঝাতে চেয়েছে, তোমরা এখনও নাবালক। এ-দেশের ভালমন্দের আমরা অছিমাত্র, তোমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। প্রথম প্রথম মোহিনী মূর্তি ধরে দু-হাতে প্রলোভন আর ঘুষ ছড়িয়ে বশ করতে চেয়েছে। তাতেও যখন বিফল তখন রক্তচক্ষে রুদ্র মূর্তিতে ফেটে পড়েছে। হৃদ্‌পিণ্ডের তলায় কোথাও যদি বিক্ষোভের ক্ষীণ ধারা তির তির করে উঠেছে, ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছে। পীড়নে-পেষণে যখন কিছুই হয় নি তখন দেশের প্রাণপুরুষকে প্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ করেছে।

হেমন্ত ভেবেছিলেন, যাদের মধ্য দিয়ে দেশ তার অপমানিত আত্মার যন্ত্রণা

ব্যস্ত করবে তারা তো কারাগারে। কাজেই দেশের জীবনস্রোত একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভেবেছিলেন জেলখানা থেকে বেরিয়ে দেশ নামে একটা মৃত নিস্পন্দ বোধহীন শবদেহের ওপর গিয়ে দাঁড়াবেন। কিন্তু তা তো নয়, দেশ, বিশেষ করে এই কলকাতা চিরদিনের মত আজও প্রাণচঞ্চল। হেমন্ত ভেবেছিলেন, তাঁদের জেলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সব রুদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন, কলকাতা তাদের উত্তরাধিকারীদের সৃষ্টি করে বসে আছে। রসিদ আলী ডে, আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানায়কদের জন্য আন্দোলন, ছাত্র রামেশ্বরের আত্মদান—না, হতাশ হবার কিছু নেই। তাঁদের ধারাকে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য নতুন সংশপ্তকেরা প্রস্তুত।

হেমন্ত বলতে লাগলেন, 'এই কলকাতার দিকে তাকালে বড় আশা হয়। দু-শ বছর ধরে যে আলোর ধারা বয়ে চলেছে, মনে হয়, কলকাতা তাকে ব্যর্থ হতে দেবে না।'

যথারীতি আমি নিশ্চুপ। হেমন্তর শেষ কথাগুলো আমাকে অন্যমনস্ক করে ফেলল। একটা যুগের আধাআধি জেলে কাটিয়ে আজই সবেমাত্র তিনি মুক্তি পেয়েছেন। বেরিয়েই দেখেছেন কলকাতা উদ্বেল হয়ে রয়েছে এবং নতুন উত্তরাধিকারীরা তাঁদের মশাল হাতে তুলে নিয়েছে। দেখে অভিভূত হয়ে গেছেন হেমন্ত।

কলকাতার আলোর দিকটাই চোখে পড়েছে তাঁর। কিন্তু আড়ালে যে অন্ধকার ক'মাস ধরে আমার মুখে ক্রমাগত পাঁক ছুঁড়ছে তা তাঁর অজানা। সে সম্বন্ধে কনকের মুখে তিনি অনেক কিছুই শুনেছেন। ভেবেছেনও প্রচুর। এবং সে ভাবনার ছায়া পড়েছে তাঁর দিনলিপির খাতাগুলিতে।

কনক যতই নিখুঁত ছবি আঁকুক, সেটা তো তৃতীয় পক্ষের বিবরণ। তার সঙ্গে হেমন্তের প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই। যে কলকাতাকে তিনি জানেন তার নিচের অতল অন্ধকারে দ্বিতীয় আরেক কলকাতা তাঁর অনুপস্থিতির ছ বছরে জন্ম নিয়েছে। তাকে এখনও দেখেননি হেমন্ত। আমার আশঙ্কা, কয়েকটা দিন কি কয়েকটা সপ্তাহ যদি নীনীদের মধ্যে কাটান, সংসারের ভেতর নিজেই দ্বিতীয় কলকাতাকে আবিষ্কার করে ফেলবেন। তখন? আজকের মুগ্ধ অভিভূত হেমন্তের এই আশাবাদের কতখানি অবশিষ্ট থাকবে? কলকাতাকে হয়ত সেদিন ধিক্কারই দিতে বসবেন তিনি।

চলতে চলতে একসময় আমার কাঁধে হাত রাখলেন হেমন্ত। বললেন, 'দেশের কথা, কলকাতার কথা থাক। তোমার সঙ্গে ভাল করে আলাপই হল না। বল তোমার কথা।'

নিজের সম্বন্ধে কি বলব ভেবে পেলাম না। আমার জীবনের ভেতরে-বাইরে এমন কোন গৌরবের দিক নেই যা এই মানুষটির কাছে খুলে বলতে পারি। মফঃস্বলের আত্মকেন্দ্রিক ভীরু ছেলে, জীবন ধারণের জন্য কলকাতায় এসে দাসখত দিয়েছি। সমারোহ করে বলার মত কি আছে আমার! সঙ্কুচিত সুরে বললাম, 'আমার কথা!'

'হ্যাঁ। অবশ্য তোমার সম্বন্ধে কনকের কাছে কিছু কিছু শুনেছি। তোমার তো বাবা-মা নেই?'

'আজ্ঞে না।'

প্রশ্ন করে করে আমার যাবতীয় ইতিহাস জেনে নিলেন হেমন্ত। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তো সুষমার কাছে কাজ কর। কী করতে হয় তোমাকে?'

উত্তর দিতে গিয়েও থমকে গেলাম। একটা অদৃশ্য হাত আমার গলা টিপে ধরলে যেন। এত তাড়াতাড়ি সেই অবাঞ্ছিত অনিবার্য প্রশ্নটা যে এসে পড়বে, ভাবিনি। মিসেস মিত্র সত্যিই দূরদর্শী। আগেভাগেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আধফোটা গলায় বললাম, 'আজ্ঞে, বিশেষ কিছুই না।'

'তবু?'

উত্তর দিতে গেলে মিসেস মিত্রদের সমস্ত কথাই বলতে হয়। আমার পক্ষে তা অসম্ভব। মিসেস মিত্রের নিষেধ তো আছেই আমার কৃতজ্ঞতাবোধও সে পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে। দিশেহারার মত ভাসা ভাসা একটা উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে অনেকটা পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্টের মত কাজ।'

অর্থাৎ আমাকে তুমি পরিষ্কার করে বলতে চাও না। হেমন্ত মিত্র হাসলেন, 'থাক তবে, বলার যখন ইচ্ছে নেই, না-ই বললে।'

হেমন্ত সম্ভবত কনকের কাছে সবই শুনেছেন। সমস্ত জেনেও আমাকে প্রশ্ন করলেন কেন? আর সেই প্রশ্নের মধ্যে পীড়াপীড়ির একটা আভাসও ছিল। কনকের চাইতেও মিসেস মিত্রদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমাকে থাকতে হয়। অতএব হেমন্ত ধরে নিয়েছেন তাঁদের গূঢ় গোপন এমন অনেক দিকেই আমার আনাগোনা যা কনকের জানাশোনার বাইরে। সেই অজানা দিকের খবরই কি জানতে চেয়েছেন হেমন্ত?

নতচোখে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ হেমন্ত বললেন, 'কনকের কাছে শুনেছি, আবার তোমার মুখেও শুনলাম শুধু প্রাণে বাঁচবার জন্যে সুষমার কাছে এসে চাকরি নিয়েছ। কিন্তু শুভেন্দু, একে তো বাঁচা বলে না। সত্যিকার বাঁচার তাৎপর্য তার চাইতেও আরো গভীর। সেটি তোমাকে বুঝতে হবে।'

কি উদ্দেশ্যে কথাগুলো বললেন হেমন্ত, আমার পক্ষে তা দুর্বোধ্য, বরং যে-প্রসঙ্গটা চলছিল তার মধ্যে এটা একেবারেই প্রক্ষিপ্ত। তবু কেন যেন আমার সমস্ত স্নায়ু দোল খেয়ে উঠল।

এরপর আর কোন কথা হল না। হাঁটতে হাঁটতে একসময় আমরা পুরনো বাড়ির খিড়কির সামনে এসে গেলাম।

ছয়

হেমন্ত মিত্র যেদিন জেল থেকে বেরিয়ে এলেন সেই দিনটাই শুধু নতুন বাড়িতে আমার যাওয়া হয় নি। দু-বছরের অনুপস্থিত মানুষটিকে ঘিরে ছেলে-মেয়ে এবং স্ত্রী সারাটা দিন উৎসবে মগ্ন হয়ে থাকবেন—এই ছিল মিসেস মিত্রদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। যাই হোক, পরের দিন থেকে যথারীতি আবার নতুন বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করেছি।

হেমন্ত সম্পর্কে আমার প্রাণে বরাবরই দুরন্ত কৌতূহল ছিল। মিসেস মিত্র, গুপী, সুরপতি কিংবা কনকের মুখে টুকরো টুকরো যে সব কথা শুনেছি, তাতে তাঁর সম্পূর্ণ রূপটা ধরতে পারছিলাম না। একটা রহস্যময় আকর্ষণই অনুভব করছিলাম শুধু। কিন্তু দিনলিপির খাতাগুলোর মধ্যে হেমন্তকে সত্যিই যেদিন আবিষ্কার করলাম সেদিন কৌতূহলটা মুহূর্তে অনেকখানি বদলে গিয়ে ভয়ের আকার নিল। ভয়, কেন না আজীবন ত্যাগী আর সত্যসন্ধ মানুষটি যেদিন জেল থেকে বেরিয়ে আত্মসর্বস্ব সুখলোলুপ পরিবেশে এসে দাঁড়াবেন সেদিন সংসার সীমান্তে কোন বিস্ফোরণ ঘটবে? তাঁর জীবন আর ব্রত থেকে বিচ্যুত স্বজনদের কিভাবে গ্রহণ করবেন হেমন্ত।

অসীম কৌতূহল আর আশঙ্কা নিয়ে এতকাল প্রতীক্ষা করেছি আমি। হেমন্ত ফিরেও এলেন এবং একটা সপ্তাহও কেটে গেল।

আগে নতুন বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল চারবেলা খাবার। খেয়ে এক মুহূর্তও আর বসতাম না। ঊর্ধ্বশ্বাসে পুরনো বাড়িতে ফিরে আসতাম। কিন্তু হেমন্ত আসার পর সহজে নড়তে চাই না। আমার সেই যে কৌতূহল আর ভয়—সে দুটোই অদৃশ্য দুই হাতে আমাকে আটকে রাখে। তা ছাড়া একটা সুবিধেও হয়েছে। হেমন্ত একবার দেখতে পেলে ছাড়তে চান না। আর মনে মনে সেটাই আমার ইচ্ছা।

হেমন্তর সঙ্গলাভের প্রলোভন তো আছেই। তা ছাড়াও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তীক্ষ্ম চোখে দেখতে চাই মিসেস মিত্ররা হেমন্তের সুরে সুর মেলাতে পারেন কিনা। সে জন্য স্নায়ুগুলো উদ্‌গ্রীব করে রেখেছি। উন্মুখ মনোযোগে আমি শুধু দেখি, দেখি আর দেখি। আর চকিত বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, সমস্ত পরিবারটার গায়ে যেন হঠাৎ তপোবনের হাওয়া লেগে গেছে। ডিকাণ্টার আর মদের বোতলগুলো উধাও। স্বচ্ছ সিল্কের শাড়ি আর শরীরের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত সেই ব্লাউজগুলো কোথায় যেন অদৃশ্য হয়েছে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর পাস্তুরাইজড ক্রীম, অল-টোন শ্যাম্পু, হেলথ টনিক লোশন, আই-ব্রো পেন্সিল, নখরঞ্জনী—কিছুই নেই। ওআর্ডরোবে নেই স্লীপিং গাউন আর ঝকমকে পেটিকোট। খাওয়ার টেবিলে দু-একদিন বীয়ার আর শেরীর বোতল দেখেছিলাম। সেগুলো কোথায় যেন নির্বাসিত হয়েছে। ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে রতিশাস্ত্রের লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে নারীপুরুষের কিছু কিছু

উত্তেজক ছবি ছিল। সে সবের জায়গায় ত্যাগব্রতী মহাপুরুষরা দল বেঁধে এসে গেছেন।

যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। যত অবাক তত স্তম্ভিত। মিসেস মিত্র হেমন্তকে হুগলী জেল থেকে আনার দিন যে সাজসজ্জা করেছিলেন তাই স্থায়ী হয়ে গেছে। ফরাসডাঙা শান্তিপুরের শাড়ি, রেশমী ব্লাউজ, কপালে সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর, চুলগুলো কখনও খোলা, কখনও সাধারণ একটি খোঁপায় আবদ্ধ, হাতে সোনার চুড়ি। সব মিলিয়ে বাঙলাদেশের চিরন্তনী মাতৃমূর্তি। জয়ন্তকে যেন চেনাই যায় না আজকাল। কোথায় তার স্যুট, কোথায় টাই আর কোথায়ই বা ডিনার ড্রেস! শীতে-গ্রীষ্মে-শরতে-বসন্তে তার হরেক বেশ। শুধু কি ঋতুবদলের সঙ্গেই সাজবদল, উৎসবে-ব্যসনে-শোকে-রাষ্ট্রবিপ্লবে তার একেক পোশাক। হেমন্ত আসার পর শরীর থেকে সে-সব নামিয়ে দিয়ে মুক্ত হয়েছে জয়ন্ত। ইদানীং তার পরনে যা দেখা যায় তা প্রায় বাহুল্যহীন। তাঁতের ধুতি আর পাতলা খদ্দরের পাঞ্জাবি। পায়ে পাম্প-শু কি স্যান্ডেল—এই তার সবসময়ের সাজ। আগের তুলনায় ব্রহ্মচর্যই শুরু করে দিয়েছে সে।

আর নীনী যেন আশ্রম-বালিকা। প্রথম প্রথম ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকিয়েছি। কেননা হোটেলের সেই অপ্রীতিকর স্মৃতি প্রতি মুহূর্তে আমাকে সঙ্কুচিত করে রাখত। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার যেদিকটায় নিদারুণ ভয় সেদিকে ফিরেও তাকাত না নীনী। আমার দিকেই তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সূর্যমুখীর মত তার দৃষ্টি ছিল হেমন্তর মুখে নিবদ্ধ। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়েই স্বচ্ছ সিফন, উত্তেজক ব্লাউজ, নখ ঠোঁটের উগ্র রঙ, শ্যাম্পু-করা চুলের সযত্ন রুক্ষতা—একে একে ছ-বছরের সব অভ্যাস সে ছেড়ে দিয়েছে। মনে মনে যেন বলছে, আমার ছ-বছরের সব গ্লানি বিসর্জন দিলাম। সেগুলোর বদলে তার শরীরে এসেছে রঙীন তাঁতের শাড়ি। আগেকার ব্লাউজগুলো শরীরের সব রহস্যকে উন্মুক্ত করে রাখত। আজকাল এমন জামা সে পরে যার হাতা কনুই পর্যন্ত নামানো। কনুই থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত, মুখখানা আর পায়ের পাতাদুটি—এছাড়া শরীরের সব কিছুই এখন তার আবৃত। রুক্ষ তেলহীন চুল এতকাল হর্স-টেলের আকারে উদ্ধত হয়ে থাকত। তেল দিয়ে দিয়ে নরম করে দু'টি দীর্ঘ বেণীতে সেগুলো তাল মানানো হয়েছে।

শুধু কি পোশাকে, খাদ্যরুচিও বদলে গেছে এ-বাড়ির। মাংসের কোর্মা, পোলাও, ফ্রাই, সসেজ, সুপ, স্যালাড, পুডিং, রোস্ট—খাবারের অধিকাংশই ছিল বিদেশী। ইংরেজি মেনুর সঙ্গে মোগলাই আর ফরাসী আমেজ মিশিয়ে ভোজটাকে রীতিমত বর্ণসংকর করে ফেলা হয়েছিল। হেমন্ত আসার পর ভাত-ঘি-ডাল-ভাজা-তেতো-অম্বল-মাছের ঝোল-দই, বৈচিত্র্য হারিয়ে খাদ্য-তালিকাটা চিরকালের সেই বাঙালী হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্য করেছি, বেকার বাবুর্চিগুলো ইদানীং বসে বসে ঝিমোয়। আমার অনুমান, শিগগিরই ওদের

জবাব হয়ে যাবে।

ক'দিন আগেও এ-বাড়ির জীবন ছিল চড়া তারে বাঁধা। খাবার ঘরে ইংরেজি অর্কেস্ট্রার রেকর্ড, শোবার ঘরে আমেরিকান জাজ আর লাউঞ্জে অন্য কোন বিদেশী সুর। সে-সব এখন বিস্মৃত অতীত। গ্রামোফোনগুলো কোথায় মুখ লুকিয়েছে, জানি না। ক্বচিৎ কখনো রেডিও থেকে কালীকীর্তন কি মীরার ভজন অথবা রামপ্রসাদী কি রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের কোন ভাবের গান শোনা যায়।

আগে মিসেস মিত্র, নীনী কি জয়ন্তর মুখ প্রায়ই ফোলা ফোলা আর রক্তাভ দেখেছি। চোখ ঢুলু ঢুলু, দৃষ্টিতে কখনও আচ্ছন্নতা, কখনও বিদ্যুৎ-ঝলকের মত চকিত উদ্ভাস, কথা বলতেন তাঁরা জোরে জোরে, হাসতেন উচ্চকণ্ঠে, রসিকতা (আমার সঙ্গে নয়, তাঁদের সহচরদের সঙ্গে) করতেন অক্ষরে অক্ষরে বিলিতি ব্যাকরণ মেনে। এবং সেগুলোর সবই আদিরসের প্রান্ত-ঘেঁষা। অশ্লীলতার মোড়কে আটকানো সেই রসিকতায় আমার অনভ্যস্ত কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকত। এখানকার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল তীব্রতা আর উত্তেজনা দিয়ে ঘেরা। সে-সবের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। মিসেস মিত্রদের কণ্ঠস্বর এখন প্রায় শোনাই যায় না। এমনভাবে হাসেন যাতে ঠোঁটদুটো ঈষৎ কাঁপা হয় মাত্র, শব্দ একেবারেই হয় না। হাঁটেন পা টিপে, মেপে মেপে। একমাত্র জয়ন্ত ছাড়া এই সাতদিনে কাউকেই বাইরে বেরুতে দেখিনি। তামসিক নরক থেকে মিসেস মিত্ররা রাতারাতি সাত্ত্বিক জগতের বাসিন্দা হয়েগেছেন।

তীক্ষ্ণ চোখে আমি ধরতে চেয়েছি, মিসেস মিত্ররা তাল মেলাতে গিয়ে কোথাও ভুল করে বসেন কি না ? কোথাও ছন্দোপতন ঘটে কিনা ? কিন্তু না, হেমন্তর সঙ্গে ঠিক সঙ্গৎ করে গেছেন তাঁরা। ছন্দ মিলিয়ে পা ফেলতে এতটুকু এদিক-ওদিক হয় নি।

স্বপ্নচর মানুষের মত মিসেস মিত্রদের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বার বার আমার সংশয় হচ্ছে। কোনটা সত্যি ? পবিত্রতার মলাটে ঢাকা এই জীবনটা ? না হেমন্ত আসার আগে সেই উদ্দাম প্রমত্ত দিনযাপন ? আজকের এই জীবনটার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে পেছনের সেই দিনগুলির অস্তিত্ব বুঝি আদৌ কখনও ছিল না।

যত দেখছি ততই যেন বুকের ভিতর শ্বাস আটকে আসছে। এ সবই সাময়িক, চেষ্টাকৃত। নিজেদের ওপর যে সুন্দর প্রলেপটি মিসেস মিত্ররা লাগিয়েছেন তার আয়ু কতক্ষণ ? মনোহর গিল্টির তলা থেকে পারার ঘায়ের মত যখন ক'দিন আগের জীবনটা ফুটে বেরুবে, তখন ? মিসেস মিত্ররা মঞ্চটি সাজিয়েছেন চমৎকার। পাত্রপাত্রীদের অঙ্গচালনা অভিনয়—সবই নিখুঁত। তবু অভিনয় অভিনয়ই। কোন পালাই অনন্ত নয় ; একসময় তার শেষ আছে। সেই শেষের সেদিন ঝকমকে মঞ্চ থেকে হেমন্ত যদি নেপথ্যের অন্ধকারে চোখ ফেরান, তখন ? আমার বুকের ভয়, উদ্বেগ, সংশয় আর উত্তেজনা পুঞ্জীভূত হতে লাগল।

সাত

পলক পড়ার আগেই যেন সপ্তাহটা ফুরিয়ে গেল। এই দিন সাতটা কর্মহীন আলস্য দিয়ে ভরা। পুরনো আর নতুন—দুই বাড়ির মধ্যে রোজ চারবার ছোটাছুটি করেছি। কোন কাজ নেই। ইদানীং নীনী আশ্রম বালিকা, বাড়ি থেকে একরকম বেরোয় না। কাজেই তার পেছনে গোয়েন্দাগিরির প্রশ্নই ওঠে না। মিসেস মিত্রও বাড়ির ভেতরেই স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গী হয়ে বেরুবার সম্ভাবনাও ছিল না। তা ছাড়া অন্য কিছু করার নির্দেশও তিনি দেন নি।

মিসেস মিত্র যখন নার্সিংহোমে, সময় আর কাটতে চাইত না। দিনগুলো ছিল মন্থর, ভারবাহী। সামনের দিকে পা ফেলতে যেন কষ্ট হত। কিন্তু এবার সময় কেটেছে ঝড়ের গতিতে। নতুন বাড়িতে গেলেই হেমন্ত আমাকে ধরে ফেলতেন, তারপর শুরু হত কথা। পর্যাপ্ত, অফুরন্ত গল্প। যে প্রসঙ্গ দিয়েই আরম্ভ হোক অভ্রান্ত নিয়মে আলোচনাটা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এসে পৌঁছুতই। দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাস (বই থেকে যা সংগ্রহ করতে আমার নিদারুণ পরিশ্রম হয়েছে। কোন কোন অধ্যায় আলোছায়ার মত বোঝা না-বোঝার মধ্যে থেকে গেছে। কোন কোন অংশে আবার একেবারেই অবোধ্য) অনায়াসে জলের মত বুঝিয়ে দিয়েছেন হেমন্ত। ফলে অনেক ভ্রান্ত ধারণা শুধরে নিতে পেরেছি। অনেক না-বোঝা জটিলতা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

স্বাভাবিক নিয়মে হেমন্তই বক্তা। চোখ বুজে তন্ময় হয়ে তিনি বলে যেতেন। আর মুগ্ধ শ্রোতার মত আমি শুনে যেতাম। লক্ষ্য করেছি, হেমন্ত যখন দেশের ইতিহাস বলতেন মিসেস মিত্ররা প্রথম প্রথম চুপচাপ বসে থাকতেন। তারপর শুরু হ'ত উসখুস। অবশেষে কোন অজুহাতে পালিয়ে যেতেন।

আমার ধারণা ছিল, মিসেস মিত্রদের উঠে যাওয়াটা টের পান না হেমন্ত। ধারণাটা কতখানি ভুল, একদিন বুঝতে পারলাম। মনে আছে, সেদিন রাউলাট অ্যাক্ট ব্যাখ্যা করছিলেন তিনি। নিমীলিত দৃষ্টি, বুকের উপর হাত দু'টি আড়াআড়ি স্থাপিত, নিবিড় তন্ময়তা—কোনদিকে লক্ষ্য থাকার কথা নয়।

আমার পাশে ছিল জয়ন্ত। এক সময় পা টিপে টিপে সে উঠে গিয়েছিল। রাউলাট অ্যাক্টের বিবরণ থামিয়ে হঠাৎ হেমন্ত বলে উঠেছিলেন, 'ওদের যদি শুনতে ইচ্ছে না হয়, এসে বসে কেন? আমি কি পা ধরে সাধতে যাই?'

হেমন্তর সান্নিধ্যে বসে দেশের ইতিহাসই শুধু শুনি না। বিকেলবেলা তাঁর সঙ্গে হাসপাতালে কনককে দেখতে যাই, ফিরিও একই সঙ্গে।

এইভাবেই দিন কাটছিল। এক সপ্তাহ পর সেদিন সকালে সবেমাত্র ঘুম ভেঙেছে। ঘুম ভেঙেছে কিন্তু তার রেশটুকু এখনও কাটে নি। জানালার

বাইরে দৃষ্টিটাকে একবার ছড়িয়ে দিলাম। বাগানটা ধূসর চাদর মুড়ি দিয়ে অসাড় হয়ে পড়ে আছে। শুধু এই বাগানটাই না, যতদূর চোখ যায় কলকাতা শহরটারই এই ঋতুতে বৈধব্যর সাজ। পুকুরের এপারে বাঁধানো ঘাটের ঠিক পাশটিতে একটা শিশু গাছ। অনেক দিন আগেই তার কাছে পাতা ঝরার খবর এসে গিয়েছিল। ন্যাড়া ডালগুলো এখন কঙ্কাল। আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে কাঙালের মত তারা বুঝি প্রার্থনা করছে হে প্রকৃতি, প্রাণ দাও স্বাস্থ্য দাও।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম রোদ উঠতে এখনও অনেক দেরি। কাজেই যে ঘুমটা শেষ হয়ে গিয়েছিল পুনশ্চ দিয়ে আবার তার জের টানব কিনা যখন ভাবছি ঠিক সেই সময়ে কুয়াশা এবং ঝোপঝাড় ঠেলে বুলাকি উঠোনে এসে পড়ল। কাজেই সারারাতের ঘুমের পর ঝিমুনির যে পর্বটা নতুন করে শুরু করতে যাচ্ছিলাম সেটা স্থগিত রাখতে হল। অবাক বিস্ময়ে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দরজা খুললাম।

আগেও বারকয়েক এ-বাড়িতে এসে টাকা নিয়ে গেছে বুলাকি। তার আসার মধ্যে সে-জন্য অবাক হবার কিছু নেই। বিস্ময়টা অন্য কারণে। এত ভোরে শীতের হিম সরিয়ে তাকে আর কখনও আসতে দেখিনি। হঠাৎ কি এমন হ'ল যাতে—

আমার ভাবনা শেষ হবার আগে ঘরে এসে ঢুকল বুলাকি। তার মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম। দিন কয়েক আগে রাজাবাজারের সেই গলিতে যাকে দেখে এসেছিলাম এ যেন তার প্রেত। চিরদিনের ভাসা ভাসা চোখদুটি এখন এক ইঞ্চি বসে গেছে। দৃষ্টি কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত আর লালচে। চোখের কোলে কালির গাঢ় রেখা। ঠোঁট নীরক্ত, নীল। দীর্ঘ অযত্নে চুলগুলো রুক্ষ আর জটপাকানো। আদিবাসী যুবতীদের মত উদ্দাম স্বাস্থ্য ছিল বুলাকির। ভেঙেচুরে সেটা এখন ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়েছে। হাত-পা যেন শরীরের সঙ্গে নিবিড় ভাবে আটকে নেই, কেমন যেন আলগা হয়ে ঝুলছে। জামাকাপড় বহুকাল বদলানো হয় নি, মনে হয়। ঘাম আর ময়লার একটা মিশ্র দুর্গন্ধ সেগুলো থেকে উঠে আসছে।

স্খলিত গলায় বললাম, 'কি, কি ব্যাপার? এত সকালে—এমনভাবে—'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না বুলাকি। দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

ফোঁপানির সুরটা কিছুক্ষণ আড়ষ্ট করে রাখল আমাকে। এক সময় বুলাকিকে আমার বিছানায় নিয়ে বসালাম। আস্তে আস্তে বললাম, 'কেঁদো না—কেঁদো না—'

আমার স্বরে সহানুভূতির উত্তাপ ছিল। ফোঁপানিটা উত্তাল হয়ে উঠল বুলাকির।

অনেকক্ষণ কান্নার পর বুলাকি কিছুটা শান্ত হ'ল। মুখ থেকে হাত সরিয়ে শূন্য ঝাপসা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল সে। তারপর আবছা গলায় বলল, 'সন্ধ্যা—সন্ধ্যা—' কথাটা আর শেষ করতে পারল না সে।

ঠোঁটদুটো থর থর করল মাত্র।

কয়েক দিন আগে রাজাবাজার থেকে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলাম, বুলকির সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তার উপর যতটা পারি যবনিকা টেনে দেব। দিয়েছিলামও। সন্ধ্যা যে ইঙ্গিত দিয়েছে তাতে মনটা বিরূপ হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম, সহানুভূতি অবশ্যই থাকবে। কিন্তু কাছে যাব না। দূর থেকে আমার সাধ্যের মধ্যে যতখানি সম্ভব উপকারের চেষ্টা করব।

দিনকয়েক আগের সেই প্রতিজ্ঞা এই মুহূর্তে ভুলে গেলাম। বুলকির মুখের দিকে খানিকটা ঝুঁকে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'সন্ধ্যা—সন্ধ্যা কী করেছে?'

'পালিয়ে গেছে।' ভাঙা ভাঙা গোঙানির মত শোনাল বুলকির গলা।

'পালিয়ে গেছে!' রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কবে?'

'আপনি আমাদের বাড়ি শেষ যেদিন গিয়েছিলেন তার তিনদিন পর।'

'বল কি! সে তো অনেক দিনের কথা। আমাকে খবর দাও নি কেন?'

'সাহস হয়নি।'

'তার মানে?'

'আপনি সেদিন রাগ করে চলে এলেন। ভেবেছিলাম, সন্ধ্যার খবর নিয়ে এলে অসন্তুষ্ট হবেন। তাই—' বলতে বলতে মুখ নত করল বুলকি।

বললাম, 'সে কথা থাক। সন্ধ্যার ব্যাপারটা আগাগোড়া সব খুলে বল।'

কাঁপা শিথিল গলায় থেমে থেমে বুলকি এরপর যা বলল, সংক্ষেপ এইরকম। আমি যেদিন শেষবার ওদের রাজাবাজারের বাড়িতে যাই তার তিন দিন পরের ঘটনা। খুব সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল বুলকি। এক ভদ্রলোক চাকরির আশ্বাস দিয়েছিলেন। কেরানীর চাকরি, সেই উদ্দেশ্যেই যেতে হয়েছিল। কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে। মাসখানেকের মধ্যেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসে যাবে।

সকাল থেকে না-খাওয়া না-স্নান। ভদ্রলোকের পিছু পিছু চরকির মত ঘুরতে হয়েছে। বিকেলে যখন সে বাড়ি ফিরল তখন মনটা খুশি কিন্তু শরীর ভীষণ ক্লান্ত। কতকাল ধরে চাকরি নামে একটা সোনার হরিণের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে বুলকি। এতদিনে সেই বাঞ্ছিত প্রার্থিত বস্তুটি হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। এখন মর্যাদার জীবনে উঠে আসতে পারবে। সারাদিনের ক্লান্তির কথা যেন মনেই ছিল না বুলকির। শরীরটা পালকের মত হাল্কা মনে হচ্ছিল।

ঘরে ঢুকেই বুলকির চোখে পড়েছিল, একমাত্র পোশাকি শাড়িটা ফেরতা দিয়ে সুন্দর করে পরেছে সন্ধ্যা। হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাজা ঘষা। চুলটি পরিপাটি করে বাঁধা। চোখে কাজলের সরু রেখায় নিপুণ টান। একমাত্র হাত-আয়নাখানা মুখের সামনে ধরে দুই ভুরুর মাঝখানে কুঙ্কুমের টিপ আঁকছে সে। টিপ আঁকা হলেই প্রসাধন-পর্বের ইতি। ইদানীং এমনভাবে তাকে আর সাজতে দেখা যায় নি।

সন্ধ্যার দিকে চোখ রেখেই তক্তপোশের উপর শরীর এলিয়ে দিয়েছিল

বুলকি। বোনের উদ্দেশে হালকা গলায় বুলকি বলেছিল, 'কিরে, এত সেজেছিস যে! ব্যাপার কী?'

মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই দুই বোনের সম্পর্কে চিড় ধরেছিল। দৈনন্দিন অভাব আর খিটিমিটি তো ছিলই। তার উপর শ্যামবাজারের সেই লম্পট ছোকরাটা রাহুর মত সন্ধ্যাকে গ্রাস করছিল। সেটা বুলকির কাম্য নয়। নিজের জীবনে সীতেশ মল্লিকের মত লোক দেখেছে। নিজে মরে ভাইবোনদের বাঁচাতে চেয়েছিল সে। সন্ধ্যা বাঁচতে চায় নি। দিদিকে অগ্রাহ্য করে সে ছুটেছিল সেই ছোকরার দিকে। ফলে দু-জনের মধ্যে দূরত্ব ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিল। সম্পর্কটা এমনিতেই ছিল বিস্ফোরকে ঠাসা। তার ওপর তিন দিন আগে আমাকে উপলক্ষ করে দুই বোনে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে। নিজের চোখেই দেখে এসেছি চুল ধরে সন্ধ্যাকে মাটিতে আছড়ে ফেলেছিল বুলকি। তারপর অন্ধের মত, মরিয়ার মত মুখেচোখে চড়-কিল চালিয়ে যাচ্ছিল। সেই দৃশ্য আমার অসহনীয় মনে হয়েছিল, দৌড়ে পালিয়ে এসেছিলাম। সেদিনের সেই যুদ্ধের পর দুই বোনের কথাবার্তা একেবারে বন্ধ। একই ঘরের মধ্যে থেকেও তাদের সম্পর্কটা ছিল যুদ্ধরত দুই পশুর সম্পর্ক। চোখা-চোখি হলে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ঘরের দুই প্রান্তে বসে তারা ক্রুদ্ধ গর্জন করেছে। ঘর না হয়ে যদি জঙ্গল হ'ত, প্রতি মুহূর্তে তারা পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের রক্তাক্ত বিধ্বস্ত করে ফেলত।

কিন্তু চাকরি পাবার আনন্দে বিদ্বেষটা শেষ পর্যন্ত আর পুষে রাখে নি বুলকি। সেধে সন্ধ্যার সঙ্গে কথা বলেছিল। সন্ধ্যা কিন্তু উত্তর দেয়নি। ভ্রূ-দুটো কুঁচকে গিয়েছিল শুধু।

বুলকি আবার বলেছিল, 'খুব রাগ, না? বেড়ালের মত এখনও ফুলে রয়েছিস?'

সন্ধ্যা আগের মতই নিশ্চুপ।

তক্তপোশ থেকে এবার নেমে এসেছিল বুলকি। বোনের গলা জড়িয়ে বলেছিল, 'তুইও তো আমাকে কম মারিস নি। নখ দিয়ে গলা আর পিঠের চামড়া তুলে ফেলেছিলি। কিল মেরে নাক ফাটিয়ে দিয়েছিলি। কই, আমি তো রাগ করে থাকতে পারলাম না। তুইও পারবি না।'

'সর—সর বলছি। মেরে ধরে অত আহ্লাদ দেখাতে হবে না। ধাক্কা মেরে বুলকিকে সরিয়ে দিয়েছিল সন্ধ্যা। তার চোখ এবং কণ্ঠস্বরে পরম বিতৃষ্ণা ফুটে বেরিয়েছিল।

তবু রাগ করেনি বুলকি। হাসতে হাসতে বলেছিল, 'দেখাবই তো, একশ বার আহ্লাদ দেখাব।'

'থাক্ থাক্—খুব হয়েছে।' বিষাক্ত সুরে বলেছিল সন্ধ্যা।

তবু বোনকে আবার দু-হাতে বেষ্টন করেছিল বুলকি।

আবারও তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল সন্ধ্যা। হিংস্র গলায় বলেছিল, 'তুই আমাকে ছুঁবি না। খবরদার।' হাত-আয়নাটা তুলে নিয়ে যুগল ভুরুর

মাঝখানে টিপ আঁকতে বসেছিল সে।

বুলাকি কিন্তু কিছুই গায়ে মাখেনি। হেসে হেসে বলেছিল, 'তুই মারিস আর ধরিস, আজ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কিছুতেই রাগ করব না।'

সন্ধ্যা উত্তর দেয় নি। গভীর মনোযোগে টিপটাই এঁকে যাচ্ছিল শুধু।

বুলাকি সেদিন যেন পণ করেছে বোনের সঙ্গে যে কোন উপায়ে সন্ধি করবে। দ্বিতীয়বার ধাক্কা খেয়েও দ্বিধাশূন্য মনে আবার সে তাই উঠে এসেছিল। সন্ধ্যার পাশে ঘন হয়ে বসে বলেছিল, 'আজ আমি দেখব, কতক্ষণ তুই রাগ করে থাকতে পারিস।'

সন্ধ্যা এবারও নিশ্চুপ। টিপটা তখনও আঁকা হয় নি। তার ধ্যান-জ্ঞান —সব আয়নায় নিবন্ধ।

হঠাৎ হাল্কা গলায় বুলাকি বলে উঠেছিল, 'হ্যাঁ রে, আমাকে তো তুই গ্রাহ্যই করছিস না। তা এত সাজছিস গুজছিস যে, কি ব্যাপারে বললি না তো? কোথাও বেরুবি না কি?'

টিপ আঁকতে আঁকতে হাত কেঁপে গিয়েছিল সন্ধ্যার। মুখ ফিরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'তোকে মুক্তি দিতে। আর নিজেও মুক্তি পেতে।'

কথাটা সহজ ভাবেই নিয়েছিল বুলাকি। ভেবেছিল, সন্ধ্যা বেড়াতে বেরুবে। বেড়ানো ছাড়া আর কোন চিন্তা তার মাথায় আসে নি। অন্যদিন বেড়াবার নামে ক্ষেপে ওঠে বুলাকি। কেননা সন্ধ্যা তো একা নয় শ্যামবাজারের সেই ছোকরাটির প্রশ্নও আছে। রাহুর মত সে সন্ধ্যার পিছু নেবে—সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। কাজেই পারতপক্ষে বোনকে বাড়ির বার হতে দিতে চায় না বুলাকি। কিন্তু সেদিনটার কথা আলাদা।

শ্যামবাজারের সেই ছোকরার কথা ভেবে মনের কোণে শঙ্কা যে একেবারে ছায়া ফেলে নি, তা নয়। তবু বড় উদার হয়ে গিয়েছিল বুলাকি। বলেছিল, 'সারাদিন খাটিস পিটিস, সংসার আগলে থাকিস। মাথাটা গরম হয়ে আছে তোর। যা একটু ঘুরেই আয়। রাত করিস নি। সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসবি।'

কথাটা মিথ্যে নয়। চাকরির সন্ধানে সারাদিনই অফিসে অফিসে কি লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে হয় বুলাকিকে। কাজেই সংসারের সমস্ত দায়—রান্না থেকে শুরু করে বাসন মাজা, ঘরদুয়ার পরিষ্কার, কাপড় কাচা—যাবতীয় কিছুই একা হাতে করতে হয় সন্ধ্যাকে। অবশ্য বুলাকি ফিরে এসে হাতে হাতে বোনকে সাহায্য করে।

টিপটা ইতিমধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় ঠিক করতে করতে সন্ধ্যা বলেছিল, 'কখন ফিরব না ফিরব, সেটা আমি বুঝব। তোর মাথা না ঘামালেও চলবে।'

হঠাৎ সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে উঠেছিল বুঝি। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যই।

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়েছিল বুলাকি। শান্ত নিরুত্তেজ গলায় বলেছিল, 'বোকা মেয়ে, মা নেই। তোদের জন্য আমি ছাড়া ভাবার আর কেউ কি আছে রে?'

সন্ধ্যা কিছু বলে নি। তার বিরূপ ঠোঁট দু'টো কুঁচকে গিয়েছিল শুধু। দেখেও দেখে নি বুলাকি। ব্যাগ থেকে একটা টাকা বার করে বোনের দিকে বাড়িয়ে বলেছিল, 'এই নে—'

'টাকা—টাকা কেন?' সন্ধ্যার বিতৃষ্ণার সঙ্গে কিছুটা বিস্ময় মিশেছিল এবার।

'যা কপাল, কখনও তো কিছুই দিতে পারি নি। এই টাকাটা দিয়ে তোর যা খুশি কিনে খাস।'

প্রখর বিদ্বেষের চোখে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ বড় বোনের দিকে তাকিয়েছিল সন্ধ্যা। তারপর তীব্র চাপা স্বরে বলেছিল, 'তোর সংসারে বাঁদী হয়ে আছি বলে বখশিস দিচ্ছিস বুঝি? চাই না টাকা।'

আহত ম্লান মুখে বুলাকি বলেছিল, 'আমার সংসার, তুই বাঁদী, এ সব কী বলছিস সন্ধ্যা!'

বুলাকি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে কোন মূল্যে বোনের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলবে। কিন্তু সন্ধ্যা যেন পণ করেছে, দিদিকে আঘাত হেনেই যাবে। সে বলছে, 'ঠিকই বলছি।'

'এটা ঠিক বলা হল! এ সংসার শুধু আমার, তোর নয়?'

'না, নয়।' নিষ্ঠুর গলায় টিটকিরি দিয়ে উঠেছিল সন্ধ্যা, 'খুব তো ভাল-মানুষি করছিস এখন, সেদিন কী বলেছিলি একবার মনে করে দ্যাখ—'

এবার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বুলাকি। তার মনে পড়েছিল, আমাকে উপলক্ষ ক'রে দুই বোনের যেদিন মারামারি হয় সেদিন থেকেই সব কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল সন্ধ্যা। রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার—কিছুই করত না সে। চুপচাপ এখানে ওখানে বসে থাকত, নতুবা ঘুমোত। অগত্যা বুলাকিকেই সব করতে হ'ত। ঘরের কাজের পর ছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে চাকরির পেছনে ছোটা। একদিন চাকরির ব্যাপারে দুপুরের দিকে তাকে বেরুতে হয়েছিল। ফিরতে রাত হবে। যাবার সময় সন্ধ্যাকে বলে গিয়েছিল যেন রাতের রান্নাটা সেরে রাখে। ফিরে এসে দেখেছিল রান্না তো হয়ই নি তক্তপোশে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে সন্ধ্যা। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল বুলাকির। তার উপর, সারাদিনের নিদারুণ শ্রান্তি। দুইয়ে একাকার হয়ে সাঙ্ঘাতিক প্রতিক্রিয়া ঘটে গিয়েছিল। সন্ধ্যাকে জাগিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, রান্না হয়েছে কিনা। সন্ধ্যা বলেছিল সে রাঁধতে বাড়তে বা সংসারের কোন কাজই করতে পারবে না। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল বুলাকি। বলেছিল, 'এ সংসারে থাকতে হলে সব করতে হবে।' দুর্বিনীত ভঙ্গিতে সন্ধ্যা বলেছিল, 'আমি কি কারো কেনা বাঁদী?' বুলাকিও ক্ষেপে গিয়েছিল, 'সংসারের কাজ করাকে যদি বাঁদীগিরি মনে করিস, তা হ'লে তা-ই।'

আশ্চর্য, সেদিন ক্রুদ্ধ উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সে যা বলেছে সন্ধ্যা তা ভোলে নি। স্তম্ভিত বিস্ময়ে বুলাকি বলেছিল, 'সেই সামান্য কথাটা তুই মনে করে রেখেছিস!'

'কথাটা সামান্য! বেশ। কোনদিন হয়ত জুতো পেটা করে বলবি, ও কিছু নয়।'

বুলাকি কিছু বলতে চেষ্টা করেছিল। গলায় স্বর ফোটে নি। থরথর ঠোঁট দুটো করেছে শুধু।

যাই হোক, টিপ আঁকা হয়ে গেলে সন্ধ্যা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে। সে যখন সদরের কাছে, বুলাকি আবার বলেছিল, 'তাড়াতাড়ি করে আসিস কিন্তু—'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সন্ধ্যা। মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, আর যেন তোর সংসারে আমায় না ফিরতে হয়।' বলেই রাস্তায় গিয়ে নেমেছিল।

সন্ধ্যার সেদিনের কথাবার্তা এবং আচরণ যে খুবই অর্থবহ, সেটা লক্ষই করেনি বুলাকি। তার মনে হয়েছিল, যা-যা সন্ধ্যা বলেছে, সবই অভিমানে আর রাগে। তৎক্ষণাৎ বুলাকি বোনকে ক্ষমা করে ফেলেছিল এবং সন্ধ্যের আগে আগে নিজে বাজারে গিয়ে মাংস আর সন্দেশ কিনে এনেছিল। তারপর পরিপাটি করে রেঁধে গা ধুয়ে ফর্সা একখানা শাড়ি পরে বিছানায় গিয়ে বসেছিল। আর বসে থাকতে থাকতে সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে গিয়েছিল। মাসখানেকের মধ্যেই চাকরিটা হয়ে যাচ্ছে। এটা হলেই মণ্টুকে আবার স্কুলে ভর্তি করে দেবে। না, কলকাতায় ওকে রাখা চলবে না। যা সব সঙ্গী জুটেছে! কলকাতার দূষিত আবহাওয়া থেকে অনেক দূরে বোর্ডিং-এ রেখে পড়ানোই ভাল। মণ্টু থাকবে বাইরে। আর মাসে মাসে টাকা জমিয়ে বছর দেড় দুই পর সন্ধ্যার বিয়ে দিতে হবে। অবশ্য সংসার আর মণ্টুর খরচ চালিয়ে দেড়-দু'বছরে যা জমবে তাতে সন্ধ্যার বিয়ে হবে না। কিছু হয়ত ধার করতে হবে। তা হোক। ভাবতে ভাবতে সুখের নেশাটা বুলাকিকে ওপর নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। নিজের জীবনে যা সে পায়নি, অথচ কাঙালের মত যার জন্য তার বুকে দুরন্ত তৃষ্ণা রয়েছে, ভাইবোনের মধ্যে সেটা ফুটিয়ে তুলবে। এটাই তার একমাত্র সাধ।

সেই সুখটা একটা তন্দ্রার মধ্যে তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল যেন। সেই ঘোরের ভেতর কতক্ষণ কেটে গেছে, বুলাকির খেয়াল ছিল না।

এরই মধ্যে একসময় ফিরে এসেছে মণ্টু। ঘোরের ভেতরেই তাকে খেতে দিয়েছে বুলাকি। ভাত-মাংস-মিষ্টিতে পাকস্থলী বোঝাই করে মণ্টু শুয়ে পড়েছে। শোয়ামাত্র ঘুম।

মণ্টু ঘুমিয়ে পড়ার পরও কতটা সময় কেটে গেছে, বুলাকির মনে নেই। হঠাৎ একসময় চোখে পড়েছে, ঘড়ির কাঁটায় দশটা। রাজাবাজারের সেই গলিটা ইতিমধ্যেই নিঝুম; ক্বচিৎ দু-একটি পায়ের শব্দ অথবা রিক্সার ঘণ্টি।

বুলাকিদের ভাড়াটে বাড়িটা বড় বেশি ঘুমকাতুরে। দশটার মধ্যেই লেপের তলায় সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সন্ধ্যের আগে যার ফেরার কথা, দশটা পর্যন্ত তার দেখা নেই। বোনের জন্য প্রথমে বিরক্ত, পরে অস্থির হয়ে উঠেছিল বুলাকি। এদিকে ঘড়ির কাঁটা এগারটা বারটা পার হয়ে যেতে লাগল। বিভ্রান্ত বিচলিত বুলাকি মণ্টুকে জাগিয়ে গলি পেরিয়ে ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত খুঁজে এসেছিল। বাড়ি ফিরেও বাকি রাতটুকু বসে বসেই কাটিয়ে দিয়েছে। রাস্তায় কোন শব্দ হলেই ছুটে বেরিয়েছে। কিন্তু কোথায় সন্ধ্যা? কোথায় যেতে পারে সে? চেতনার সকল দিকে প্রবল চিৎকারের মত একটা প্রশ্নই বার বার বিদীর্ণ হয়েছে। দুরু-দুরু উন্মুখ প্রত্যাশায় ভোর হবার আগেই পরের দিন সে শ্যামবাজারের পুরনো পাড়ায় ছুটে গেছে। সরাসরি সেই ছোকরার বাড়ি গিয়ে উঠেছে, যার নাম ললিত।

ললিতদের বাড়ি গিয়ে দেখে সে-ও নেই। আগের দিন থেকেই উধাও। জানবার বুঝবার আর কিছুই ছিল না। দুইয়ে দুইয়ে চারের মত ব্যাপারটা স্বতঃসিদ্ধ। সেখান থেকে বেরিয়ে বুলাকি সোজা চলে গিয়েছিল থানায়। ডাইরি করিয়েছিল। আশ্চর্য! দিন চারেক পর ললিত বাড়ি ফিরে এসেছিল। ওর বাবাই কোথা থেকে যেন ফিরিয়ে এনেছিল। একাই এসেছিল ললিত। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল বুলাকি। কিন্তু সন্ধ্যার কথা বেমালুম অস্বীকার করেছে ললিত। অনুনয়-বিনয় শাসানি কিংবা ভয় দেখিয়ে লাভ হয় নি। বরং যুদ্ধের বাজারে ললিতের হঠাৎ বড়লোক বাপ তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। সাফ বলেছে আইন-আদালত-থানা-পুলিশ—সবার দরজা খোলা রয়েছে। সেখানে গিয়ে যা খুশি বুলাকি করতে পারে। কিন্তু তার বাড়ির দিকে যেন পা না বাড়ায়। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বুলাকি শুধু বলেছে, আইন-আদালতের দ্বারস্থ হবার সামর্থ্য বা ইচ্ছা কোনটাই তার নেই। বোনকে সে শুধু ফেরত চায়। উত্তরে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ললিতের বাবা। হতাশা বিষাদ শূন্যতা আর যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে এসেছে বুলাকি।······

কথা শেষ করে বুলাকি বলল, 'নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আমি এখন কী করব? কী করব? বলে দিন। ওরা অস্বীকার করলে কী হবে, আমি জানি ললিতই সন্ধ্যাকে নিয়ে গেছে। আমি আর কিচ্ছু চাই না শুভেন্দুবাবু। ললিতের শাস্তি না, জেল না, কিচ্ছু না। শুধু বোনটাকে ফিরিয়ে চাই। মা নেই, বাবা নেই, আমি যে ওদের মায়ের মত—'

অভিভূতের মত কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর বললাম, 'তুমি একটু বস। আমি ও-বাড়ি থেকে একটু আসছি।'

মিসেস মিত্রের কাছ থেকে দিন দুই ছুটি নিয়ে কলকাতার সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সকল দিকে উদয়াস্ত সন্ধ্যাকে খুঁজে বেড়ালাম। পুলিশও খুঁজল। কিন্তু না, নিরুদ্দেশ মেয়েটিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এই বিশাল শহর তার কোন জঠরে সন্ধ্যাকে লুকিয়ে রেখেছে, কে বলবে। ঘরের ছেলেটি

সুবোধ বালকের মত ঘরে ফিরে এসেছে। ঘরের মেয়েটি আর ফিরল না।

শুধু বেঁচে থাকার জন্য এই কলকাতা একদিন বুলাকিকে মেরেছিল। সন্ধ্যার জীবনেও সে অপমৃত্যুর যবনিকা টানল।

হায় কলকাতা!

আট

সন্ধ্যার জন্য দুটো দিন কলকাতার উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে-পশ্চিমে—অবিরত ছুটে বেড়িয়েছি। এই বিশাল শহরের চতুঃসীমায় পাক খেতে খেতে ক্লান্তি এবং দুশ্চিন্তায় এত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম যে তৃতীয় দিন সকালে ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হয়ে গেল।

উঠে দেখলাম ঘরের মধ্যে রোদ এসে পড়েছে। আর দেখলাম, এককোণে গুপী বসে আছে। রোদ দেখে অবাক হই নি, গুপীকে দেখে হলাম। বললাম, 'গুপীদা যে, কতক্ষণ এসেছ?'

'অনেকক্ষণ।' গুপী বলল।

'আমায় ডাক নি কেন?'

'এ্যামন অকাতরে ঘুমুচ্ছিলেন, ডাকতে মায়া হ'ল। ভাবলাম, একটু বসি। আপনি উঠলে পর কথা কইব।'

গুপীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন যেন আশঙ্কা হ'ল। দৃষ্টি স্থির রেখে বললাম, 'আমার কাছে তোমার কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ দাদাবাবু।' গুপী ঘাড় কাত করল, 'ভারি বিপদে পড়েচি।'

'বিপদ!'

'হ্যাঁ। আমার একদিকে রাম, আরেক দিকে রাবণ। ইদিকে ঝুঁকলে রামে মারবে, উদিকে ঝুঁকলে রাবণে মারবে। পেরান বাঁচাতে চাকরিটাই ছাড়তে হবে দেখচি।'

গুপীর সমস্যাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'কি ব্যাপার!'

'আর কি?' গলার স্বরে জগতের সবটুকু বিস্বাদ ঢেলে দিয়ে গুপী বলল, 'আপনি তো এ ক'মাসে সব খবরই জেনে ফেলেচেন। এ বাড়িটায় পাপ সেঁদিয়েচে। ঘরের মেইয়েছেলেরা মদ খাচ্ছে, নেশা করচে, বাইরের মানুষের সনগে ঢলাঢলি করচে। বাবু য্যাদ্দিন ঘরে ছিল না ত্যাদ্দিন চোখে দেখেচি আর বুকের ভেতরটা পুড়েচে। নিজে নিজেই জ্বলেছি, সে একরকম ভালই ছিল। কিন্তু বাবু ফেরত আসতে আরেক জ্বালা হ'ল।'

'কী?'

'আড়ালে ডেকে নিয়ে রোজ রোজ এক কথা শুদোচ্চে বাবু। ছ-বছর তো বাড়ি ছিল না। এর ভেতরে কুত্থেকে এত টাকা হ'ল? মা-জননীরা কী করত? কুথায় ঘুরত? এ বাড়িতে কারা-কারা আসত? কেন আসত? এমনি হাজার কথা। এ্যাখন আমি কী করি বলুন দিকিন! সত্য কথা কইলে তো সোমসারে

কুরুক্ষেত্তর লেইগে যাবে।'

হেমন্ত আসবার পর থেকে নতুন বাড়িটা সরযূ তীরের তপোবন হয়ে উঠেছে। মিসেস মিত্রদের চলায়-ফেরায় আচরণে-ব্যবহারে ক'দিন আগের সেই জীবনটার ছিটেফোঁটাও নেই। ঋষিকুমার আর ঋষিকুমারীদের মত তাঁদের সকল দিকে পবিত্রতার আবহাওয়া। সত্যিই যখন তাঁদের পরিবর্তন হয়েছে তখন অতীত জীবনের সেই ঘুমন্ত দৈত্যটাকে খুঁচিয়ে সংসারে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধাবার কি প্রয়োজন। এই সঙ্গে আরেকটা কথা আমার মনে পড়ল। কৌশলে একদিন হেমন্ত আমার কাছে মিসেস মিত্রদের কথা জানতে চেয়েছিলেন। গুপীর কাছে তাঁর কোন চাতুর্যের দরকার নেই। কাজেই প্রশ্নগুলো হয়েছে সরাসরি। খুব সম্ভব, নানা ভাবে স্ত্রীকে যাচাই না করে তিনি শান্ত হতে পারছেন না। জীবনের পরিধি তাঁর দিগন্তব্যাপী সুবিশাল। কিন্তু একটা জায়গায় এখনও তিনি গণ্ডীবন্ধ। এই হয়ত নিয়ম। বললাম, 'হেমন্তবাবুকে সে-সব কিছু বলে দরকার নেই। শুধু বলবে আমি কিছু জানি না।'

আমার কথাটা শেষ হয় নি, ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে মিসেস মিত্রের গলা শোনা গেল, 'শুভেন্দু—'

এই মুহূর্তে মিসেস মিত্রকে আশা করিনি। চকিত হয়ে সাড়া দিলাম, 'আজ্ঞে—'

'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। বিশেষ গোপনীয়।' বলতে বলতে মিসেস মিত্র ঘরে ঢুকলেন।

তাঁকে দেখে গুপী থতিয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢোকামাত্র একরকম লাফ দিয়েই পালিয়ে গেল।

মিসেস মিত্র আমার আপ্যায়নের অপেক্ষা করলেন না। নিজেই একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। আর বশংবদ প্রাণীর মত আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মিসেস মিত্র একসময় শুরু করলেন, 'আমি যে একেবারে মরে গেলাম শুভেন্দু—'

আমার মনিবানীর এমন কাতর কণ্ঠস্বর আগে আর কখনও শুনিনি। বিমূঢ়ের মত বললাম, 'আজ্ঞে—'

'মিস্টার মিত্র দশদিন এসেছেন। এর মধ্যে গলা আর বুক শুকিয়ে একেবারে মরুভূমি হয়ে গেল। তুমি আমাকে বাঁচাও শুভেন্দু—' উঠে এসে আমার একটা হাত ধরলেন মিসেস মিত্র।

ব্যাপারটা নাটকীয় মনে হ'ল। নাটকীয় এবং দুর্বোধ্য। জড়িত স্বরে আগের মতই বলতে পারলাম, 'আজ্ঞে—'

মিসেস মিত্র কিছুটা ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে উঠলেন, 'শ্রীবাস্তবের দোকানটার কথা মনে আছে তো? সেই যে পার্ক স্ট্রীটে—'

শ্রীবাস্তবের দোকান অর্থাৎ ওয়াইন শপ। কিন্তু সে তো মিসেস মিত্রের জীবনের একটা অন্ধকার অধ্যায়। ভেবেছিলাম হেমন্ত আসার পর জঞ্জালের

মত সেটা বাতিল করে দিয়েছেন। দশ দিন পর তার উল্লেখে আমার হৃদ্‌পিণ্ড ধক করে উঠল। আড়ষ্ট গলায় বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে। কতবার তো গেছি—'

গলার স্বর এবার আরও খাদে নেমে গেল। মিসেস মিত্র বললেন, 'আজ একবার চুপি চুপি তোমাকে সেখানে যেতে হবে। এক বোতল হুইস্কি এনে রাখবে আর আনবে সোডা। এই নাও টাকা।' হাত-ব্যাগ থেকে টাকা বার করে আমাকে দিতে দিতে আবার বললেন, 'খুব সাবধান শুভেন্দু, এ-কথা আর কেউ যেন না জানতে পায়। আমি জানি তুমি কাউকে বলবে না। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে।'

একটু আগেও তাঁদের সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হয়েছিল তা ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্যই যেন এই সকালবেলা মিসেস মিত্রের এমন আকস্মিক অপ্রাবিত আবির্ভাব। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম, হেমন্ত আসাতে ভদ্র-মহিলা আশ্রম-জীবনের মহড়া দিতে শুরু করেছেন। হয়তো পুরনো খাদ বেরিয়ে গিয়ে পাকা সোনা হয়ে উঠতে পারবেন। কিন্তু কে জানত হেমন্ত জেল থেকে বেরুবার পর দশম প্রভাতে কল্পনার স্বর্গ থেকে এক আছাড়ে কঠিন মর্ত্যে এসে পড়ব। মাত্র ন'টি দিন ছ-বছরের অভ্যস্ত প্রখর পিপাসাটার গলা টিপে রেখেছিলেন মিসেস মিত্র। কিন্তু তার তীব্র দাহ ভেতরের স্নায়ু-রক্ত-মাংস পুড়িয়ে পুড়িয়ে অঙ্গার করে দিচ্ছিল। মিসেস মিত্রের নিজের ভাষায় গলা থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত জায়গাটা মরুভূমি হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য! জন্মসূত্রে তাঁর রক্তে রক্তে ভোগের বীজাণু ছড়ানো। এই ভোগবাদকে সুযোগ আসামাত্র নিজের জীবনে বাড়িয়ে তুলেছেন মিসেস মিত্র। কিন্তু গত ছ'টা বছর বাদ দিলেও তো বহুকাল হেমন্তর সংস্পর্শে তিনি কাটিয়েছেন। স্বামীর জীবন থেকে তিনি কি কিছুই অর্জন করতে পারেন নি? না কি হেমন্তর বাঁচার পদ্ধতি তাঁকে আকর্ষণ করে নি। হেমন্তর মত স্বামী পেয়েও তাঁর যোগ্য স্ত্রী হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মিসেস মিত্রের এই অক্ষমতার মার্জনা নেই।

মিসেস মিত্র আবার বললেন, 'হুইস্কি আর সোডা এনে আবার ও-বাড়িতে তুলো না। তোমার ঘরেই রাখবে। বুঝলে?'

ভাঙা গলায় বললাম, 'আচ্ছা।'

মিসেস মিত্র উঠে পড়লেন। বাইরের বারান্দা পর্যন্ত গিয়ে কী ভেবে ফিরে এলেন। বললেন, 'বিকেলবেলা মিস্টার মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে তুমি তো হাসপাতালে যাও। ঘরে চাবি দিয়ে যাও নিশ্চয়ই—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'যাবার সময় চাবিটা আমার কাছে দিয়ে যেও। ফিরে এসে আমার কাছ থেকে আবার নিয়ে নিও।'

মিসেস মিত্রের উদ্দেশ্যটা অবোধ্য নয়। আমার ঘরে হুইস্কি সোডার বোতল থাকবে। অতএব—

ভাঙা বাড়ির বিবর থেকে বেরিয়ে বিকেলে নতুন বাড়িতে চা খেতে যাই। সেখান থেকে হেমন্তর সঙ্গে হাসপাতালের দিকে বেরিয়ে পড়ি। ক'দিন ধরে এ-ভাবেই চলছে।

আজ বিকেলে নতুন বাড়ি যাবার আগেই মিসেস মিত্র আবার এসে পড়লেন। বুকের সেই মরুভূমিটা যে তৃষ্ণায় চৌচির সেটা সহজেই অনুমান করা গেল।

ঘরে ঢুকেই তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'এনেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম। তক্তাপোশের তলা থেকে বোতল-গুলো বার করে মিসেস মিত্রের সামনে রাখতে রাখতে বললাম, 'এই যে—'

হাত বাড়িয়ে হুইস্কির বোতলটা তুলে নিলেন মিসেস মিত্র। লুব্ধ আঙুলগুলো বোতলটার গায়ে এমনভাবে বুলোতে লাগলেন যাতে মনে হয় হারানিধি ফিরে পেয়েছেন। সস্নেহে কৃতজ্ঞ সুরে বললেন, 'আমায় বাঁচালে শুভেন্দু। ইউ আর এ লাভলি নাইস চ্যাপ। তোমাকে কত যেন মাইনে দিই?'

নেশার যোগান দিতে মিসেস মিত্র স্বাভাবিক কারণেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সেই উচ্ছ্বাসের ব্যাপারে হঠাৎ আমার মাইনের প্রসঙ্গটা কেন উঠল, ভেবে পেলাম না। বললাম, 'পঁচাত্তর টাকা।'

'আসছে মাস থেকে ও ব্যাপারে আমি কনসিডার করব। আচ্ছা তোমার ঘরে কাচের গেলাস আছে?'

'আছে।'

'ধুয়ে নিয়ে এস।'

নির্দেশমত কাচের গেলাসটা ধুয়ে আনলাম। হুইস্কি এবং সোডার বোতল খোলার চাবি সঙ্গে এনেছিলেন মিসেস মিত্র। সেটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'খুলে ফেল। তারপর গেলাসে অর্ধেক সোডা মিশিয়ে দাও।'

সম্মোহিত প্রাণীর মত যা যা বললেন ভদ্রমহিলা, তা-ই করে গেলাম। গেলাসটি হাতে পেয়ে দীর্ঘ একটা চুমুক দিলেন তিনি। মুমূর্ষু মানুষ যে আবেগে যে ব্যগ্রতায় সঞ্জীবনীর পাত্রে ঠোঁট ঠেকায় মিসেস মিত্রের চোখেমুখে সেই সেই অনুভূতিগুলো একে একে ফুটতে লাগল।

গেলাসটা শেষ করতে অনেকক্ষণ লাগল। ইতিমধ্যে চোখ লালচে হয়ে উঠেছে। গেলাসটা নামিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে গেলেন মিসেস মিত্র। বাগানের পেয়ারা গাছ থেকে দু'টো পাতা ছিঁড়ে চিবোতে চিবোতে আবার ঘরে ফিরে এলেন। আমার দিকে চেয়ে একটু অপ্রতিভ হলেন যেন। ঈষৎ হেসে বললেন, 'হুইস্কির গন্ধটা ভারি বেয়াড়া। সহজে যেতে চায় না। পেয়ারা পাতা চিবিয়ে গন্ধটা মেরে একটা পান খেয়ে নেব। তা হলেই নিশ্চিন্ত।'

আমি নিশ্চুপ। অনুভূতিশূন্য বোবার মত একটা দাম্পত্য প্রতারণার সাক্ষী হয়ে রইলাম শুধু। নিজের কাছেই নিজেকে ভয়ানক ঘৃণা মনে হতে লাগল।

হাত উল্টে ঘড়ি দেখে মিসেস মিত্র বললেন, 'চারটে প্রায় বাজে। তুমি ও-বাড়ি চলে যাও। তোমরা হাসপাতালে বেরুলে তবে আমি ফিরব।'

মিসেস মিত্রের হাতে চাবি দিয়ে আমি চলে গেলাম।

পরের দিন সকালে আবার আমাকে স্তম্ভিত হতে হ'ল। মুখ ধুয়ে নতুন বাড়িতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি ঠিক সেই সময় জঙ্গল ঠেলে নীনী এসে হাজির। হোটেলের সেই বিভ্রান্তিকর ঘটনার পর থেকে নীনী সম্বন্ধে আমার প্রাণে নিদারুণ আতঙ্ক জমে আছে। হেমন্ত আসার পর যদিও তার সঙ্গে রোজই দেখা হচ্ছে, নীনী কিন্তু ভ্রূক্ষেপই করে না আমাকে। অবশ্য তার কাছ থেকে সভয় দূরত্ব বজায় রেখেই চলি। কিন্তু এমন অযাচিত ভাবে বিনা ভূমিকায় নীনী যে আমার ভাঙা ঘরে এসে উঠবে, এ ছিল আমার পক্ষে কল্পনাতীত। নিষ্পলক বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

নীনীর ঠোঁটে এক ঝলক হাসি দেখা দিল। আমার চোখে চোখ রেখে স্নিগ্ধ স্বরে সে বলল, 'আপনাকে সকালবেলা জ্বালাতে এলাম শুভেন্দুবাবু।' স্বচ্ছন্দ অনায়াস পায়ে উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় উঠে এল সে। হোটেলের সেই ঘটনাটির ছায়া তার হাসিতে, চলায় ফেরায় বা অন্য কোন আচরণের মধ্যেই নেই। হয়ত তা মনে রাখে নি নীনী।

নির্বাক নিস্পন্দের মত আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সাধারণ ভদ্রতার একটা কথা যে বলব, পারলাম না। জিভ আড়ষ্ট হয়ে রইল।

নীনী আরও কাছে এগিয়ে এল। হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি আমার ওপর রাগ করে আছেন, না?'

এতক্ষণে আমার গলার স্বর ফুটল, 'রাগ করব কেন?'

'হোটেলের সেই ব্যাপারটার জন্যে। বিশ্বাস করুন, সেদিন আমার নিজের ওপর কোন কণ্ট্রোল ছিল না।'

হোটেলের সেই ঘটনাটা তা হ'লে ভোলে নি নীনী! আমি চুপ করে রইলাম।

নীনী আবার বলল, 'সেই ব্যাপারটার জন্যে আমাকে মাপ করে দিন। ক'দিন ধরেই ভাবছিলাম আপনার কাছে এসে ক্ষমাটা চেয়ে নেব কিন্তু আমার লজ্জা লাগছিল। আজ থেকে কিন্তু আবার সন্ধি। ক্ষোভ, রাগ—আমার ওপর কিন্তু আর কিছু পুষে রাখতে পারবেন না।'

আমি এবারও চুপ।

অন্তরঙ্গ সুরে নীনী বলল, 'কি, আমাকে বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন না কি? ভেতরে যেতে বলবেন না?' তার স্বরে কপট অভিমানের উত্থানপতন অনুভব করলাম।

এতক্ষণে আমার আড়ষ্টতা কাটল। তক্তাপোশে বসে ছিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত ব্যগ্র গলায় বললাম, 'আসুন—ভেতরে আসুন—'

ভেতরে এসে চেয়ারে বসতে বসতে তরল স্বরে নীনী বলল, 'নিজে থেকে

সেধে বললাম বলে, নইলে ঘরে আসতে কী আর বলতেন ! দরজার কাছ থেকেই বিদায় নিতে হত।'

'না না, মানে—' আমি একেবারে মরমে মরে রইলাম।

আজ প্রথম থেকেই নীনীর ঘনিষ্ঠ হওয়াটা লক্ষ করেছি। আরো একটা ব্যাপার চোখে পড়েছে, আমার সঙ্গে কথা বলছে বটে সে কিন্তু চোখ দু'টি লুব্ধ মার্জারীর মত ঘরময় অস্থিরভাবে ছটফট করে বেড়াচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ কৌতুক আর ঠাট্টার ফানুস উড়িয়ে নীনী হঠাৎ তার গলাটা খাদে নামিয়ে ফেলল, 'আচ্ছা শুভেন্দুবাবু, এ আপনার কেমন বিচার বলুন তো ?'

'মানে !' আমি চকিত হয়ে উঠলাম।

'স্বর্গের সুধাভাণ্ড নাকি নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছেন !'

'আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।'

আদরলোভী পায়রার কত গলা মোটা করে আর চোখের বিজুরি হেনে নীনী বলল, 'নু না, আহা কিছুই যেন বোঝেন না ! মাইরি শুভেন্দুবাবু, আর ছলনা করবেন না।'

অস্বীকার করি না, নীনীর মত রূপসীর এই খুনসুটিটুকু, হোক কপট, ভালই লাগল। তবে আগের মত তার ইঙ্গিতটা এবারও দুর্বোধ্য। বললাম, 'বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আমার চোখে নীলাভ দৃষ্টি রেখে নীনী হাসল। মৃদু স্বরে বলল, 'তা হ'লে হেঁয়ালি বাদ দিয়েই বলে ফেলি, না কি বলুন। কাল মিসেস মিত্র আপনাকে দিয়ে একটা হুইস্কির বোতল আনিয়েছে না ?'

যেচে এসে আমার সঙ্গে সন্ধি করার হেতুটা এতক্ষণে বোধগম্য হ'ল। এর পেছনে আর যাই হোক, হোটেলের সেই বিসদৃশ ঘটনাটির জন্য অনুতাপের কোন কারণ নেই। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না, যে ব্যাপারটা শুধু মিসেস মিত্র এবং আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তৃতীয় কানে যা পৌঁছনো অসম্ভব, কেমন করে নীনী তা জেনে ফেলল ? না কি হুইস্কির ব্যাপারে নীনীর অতিরিক্ত কোন ইন্দ্রিয় আছে যেটা প্রবল আকর্ষণে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে তাকে এই ভাঙা বাড়িতে এনে তুলেছে ?

আমার স্বীকারোক্তিতে নীনীর চোখ দপ্ দপ্ করে উঠল। লুব্ধ কাঁপা স্বরে সে বলল, 'কালকেই সবটা সাবাড় করে গেছে, না কিছু তলানি টলানি এখনও আছে ?'

'আছে।'

'বার করুন মাইরি। ওটা না পেয়ে দশ এগারটা দিন ধরে একেবারে মরে আছি।'

আমি আঁতকে উঠলাম, 'কিন্তু—'

'কী ?'

'মিসেস মিত্র খুব অসন্তুষ্ট হবেন।'

'মোটেই না। যদি কিছু বলে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেবেন। বলবেন আমি জোর করে কেড়েকুড়ে খেয়েছি। বোতলটা বার করে প্রাণ বাঁচান ভাই।'

আমি দ্বিধায় দুলতে লাগলাম। নীনী আবার বলল, 'হুইস্কি যদি না পাই আজ আমি মরেই যাব। যদি আমি মরি কী হবে জানেন ?'

'কী ?' আগ্রহহীন শুষ্ক স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

'নরহত্যার পাপটা গিয়ে আপনার ঘাড়ে চাপবে।'

পাপের ভয়ে নয়, নীনীর জবরদস্তিতে নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত হুইস্কির বোতলটা বার করতে হ'ল। সেটা প্রায় নিঃশেষ করে মিসেস মিত্রের মত কিছুক্ষণ পেয়ারা পাতা চিবোল নীনী। তারপর মুখ ধুয়ে আমার কাছে এসে বলল, 'দেখুন তো গন্ধ আছে না কি ?' বলেই হাঁ করল।

হুইস্কির ঝাঁঝালো গন্ধটা নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বললাম, 'অল্প অল্প আছে।'

'ওতে ধরা সম্ভব না। ও-বাড়ি গিয়ে একটা পান খেয়ে নিলেই বাকিটুকু মিলিয়ে যাবে। ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ। আপনি আমার নতুন করে প্রাণ দিলেন।' নীনী চলে গেল।

দুপুরবেলা নতুন বাড়িতে খেতে গিয়ে মিসেস মিত্রকে একান্তে পেয়ে সব বললাম। শুনে মিসেস মিত্র হাসলেন।

অবাক বিস্ময়ে বললাম, 'আপনি রাগ করেন নি তো ?'

'আরে না না', মিসেস মিত্র আমাকে আশ্বস্ত করলেন, 'তুমি তো জান না, নেশার সময় নেশার জিনিসটি না পেলে কী অবস্থা হয়! নীনী যখনই চাইবে তখনই দেবে। আর কয়েক বোতল হুইস্কি এনে রেখো।'

আমার তৃতীয় নয়ন খুলে গেল যেন। এতকাল ধারণা ছিল, মিসেস মিত্র এবং নীনীর মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতা। অনন্ত বিদ্বেষ নিয়ে একই সংসারে তারা আবদ্ধ হয়ে আছে। তাদের সম্পর্ক এমন একটা শীর্ষবিন্দুতে পেঁাছেছে, যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। কিন্তু কে জানত, আপাত কটু দৃশ্যের তলায় এমন একটা সূক্ষ্ম জায়গা আছে যেখানে তাদের কোন বিরোধ নেই!

এরপর থেকে সকালে নীনী আর বিকেলে মিসেস মিত্র ভাঙা বাড়িতে গিয়ে হানা দিতে লাগলেন। গেলাস গেলাস হুইস্কি খেয়ে পেয়ারা পাতা চিবিয়ে এবং পান-চুনের রসে মুখের গন্ধ নষ্ট করে হেমন্তর সঙ্গে লুকোচুরিটা চালিয়ে যেতে লাগলেন চমৎকার। যত দেখতে লাগলাম আত্মগ্লানিতে সমস্ত অস্তিত্ব কালো হয়ে যেতে লাগল। আত্মগ্লানি, কেননা মিসেস মিত্রদের লুকোচুরিতে আমারও একটা অগৌরবের ভূমিকা আছে। আমিই তো এই নেশার জোগানদার। নাঃ, হেমন্ত কিংবা কনকের সান্নিধ্যে এসেও পৌরুষ জাগাতে পারলাম না। চিৎকার করে যে বলব, এই নরকের মধ্যেখানে তোমরা আমাকে টেনে নিও না, তাও পারলাম না। শুধু হাজার বার নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম।

এই একতলা ভাঙা বাড়িতে একদিন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেনরা এসেছেন। দুই শতাব্দী ধরে এখানে আলোর তপস্যা চলেছে। সেই তপস্যার ধারা পুরুষানুক্রমে হেমন্ত পর্যন্ত বয়ে এসেছে। আশ্চর্য! আজ সেখানে হুইস্কির বান ডেকেছে। তাতে আলোর সাধনায় সিদ্ধকাম এই পরিবারের বিগত পুরুষদের আত্মা কোন অদৃশ্যলোকে হয়ত শিউরে উঠেছে।

যে বাড়িটা দুই শতাব্দী ধরে অবিরত সূর্য-প্রদক্ষিণ করেছে আজ তার হৃদপিণ্ডের উপরেই নরকের অন্ধকার উৎসব।

নয়

লুকোচুরিটা বেশ নিপুণভাবেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন নাটকীয় একটা ঘটনা ঘটে গেল। নাটকীয় এবং উত্তেজক। তাতে ছ-বছরের সেই নেপথ্য-জীবনটার ওপর মিসেস মিত্ররা সযত্নে সুকৌশলে যে যবনিকা নামিয়ে দিয়েছিলেন, এক দমকা হাওয়ায় সেটা উড়ে গেল। ফলে হেমন্ত মিত্রের চোখে যা যা পড়ল তাতে তাঁর সমস্ত সত্তার মূল দুলে উঠল।

ঘটনাটি এইরকম ঃ

একদিন সকালে দোতলার লাউঞ্জে চায়ের আসর বসেছে। মিসেস মিত্র জয়ন্ত, হেমন্ত এবং আমি চারজনে গল্প করছি। একটা বয় কলের পুতুলের মত মিসেস মিত্রের নির্দেশে হাত পা নেড়ে নেড়ে চায়ের পট, কাপ ডিশ, খাবারের প্লেট সবার সামনে সাজিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। নীনী সেই, সে গেছে ভাঙা বাড়িতে, আমার সেই ঘরে। এ বাড়িতে আসার আগে দেখে এসেছি, সকালবেলাতেই হুইস্কির বোতল নিয়ে বসেছে সে।

ঠিক এইসময় ব্যাপারটি ঘটল। বায়ুমণ্ডলে ঝড় তুলে একটা মোটর বাইক গেট পেরিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল। যে ড্রাইভ করছিল সে একটি দীর্ঘদেহ পাঞ্জাবী যুবক। পরনে আমেরিকান টমিসুলভ জ্যাকেট আর সরু প্যাণ্ট। চোখে গগল্‌স, পায়ে ছুঁচলো বুট। সামনের লনের চারদিকে ঘিরে বৃত্তাকার নুড়ির পথটা। সেখানে বাহনটাকে স্তব্ধ করে ওপর দিকে তাকাল সে। তার-পর সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যালো—হ্যালো, ইউ আর দেয়ার!'

আড়চোখে লক্ষ্য করলাম, মিসেস মিত্র সাঙ্ঘাতিক চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। জয়ন্তর চোখে মুখে কেমন যেন অস্থিরতা। আর হেমন্ত মিত্রের ভ্রূ দুটো ধীরে ধীরে কুঁচকে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবি ছেলেটি প্রায় লাফাতে লাফাতে দোতলার লাউঞ্জে এসে পড়েছে। মিসেস মিত্রের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'অনেকদিন পর দেখা হল। হাউ ডু ইউ ডু?'

'ভাল।' নিস্পৃহ শীতল স্বরে মিসেস মিত্র বললেন, 'হঠাৎ তুমি কী মনে করে সুরয?'

ছেলেটির নাম তা হ'লে সুরয। দু-হাত মাথার উপর তুলে বিচিত্র এক

ভঙ্গি করল সে। বলল, 'সব বলছি, তার আগে প্লীজ পারমীট মী টু টেক সীট।'

মিসেস মিত্র অভ্যর্থনায় উদার হলেন না। আবেগহীন সুরে বললেন, 'আজ আমরা খুব ব্যস্ত আছি সুরেষ। তাই—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগে সুরেষ বলে উঠল, 'ক'দিন আগেও আমাকে দেখলে আপনি খুশি হতেন মিসেস মিত্র। বাট টু-ডে ইউ আর এ চেঞ্জড্ লেডি। সে যাক, আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না। লাইফ অ্যান্ড ডেথের একটা প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।'

মিসেস মিত্র বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখালেন না। চোখ নামিয়ে চামচ দিয়ে চায়ে চিনি মেশাতে লাগলেন।

সুরেষের, খুব সম্ভব, আত্মসম্মানের চামড়াটা খুবই পুরু। উপেক্ষা সত্ত্বেও সে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, 'মিসেস মিত্র, আপনাদের সবাইকে দেখছি, নীনী কোথায় ?'

মিসেস মিত্রের হাতের চামচ থমকে গেল। স্বামীর দিকে চকিত একটা দৃষ্টিক্ষেপ করে ভীত সুরে বললেন, 'তাকে কী দরকার ?'

গলার ভেতর ক্লাউনদের মত অদ্ভুত শব্দ করল সুরেষ, 'অ-অ-অ, কী দুঃখ যে দিলেন মিসেস মিত্র! তিন সপ্তাহ ধরে ক্লাবে যাচ্ছি। কিন্তু নীনী ডার্লিং-এর পাত্তা নেই। সে ছাড়া ক্লাব-লাইফ একেবারে হেল। ড্রিঙ্ক বলুন, ডান্স বলুন—এভরিথিং ইজ মিজারেবল্, রট—'

সমস্ত আবহাওয়া অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। মিসেস মিত্র এবং জয়ন্তর আশঙ্কা তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। ছ-বছরের যে জীবনটা তাঁর হাজার কৌশলে ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, কে জানত বন্দুকের গুলির মত সেটা এমন করে ফিরে আসবে ?

আমার চোখদুটি প্রায় সর্বক্ষণই হেমন্তর মুখে নিবদ্ধ ছিল। লক্ষ্য করেছি তাঁর দৃষ্টি নিষ্পলক, চোয়াল শক্তবদ্ধ। শরীরের সমস্ত রক্ত আর উত্তেজনা দু-চোখে গিয়ে জমা হয়েছে। স্ফীত ঠোঁটদুটো অল্প অল্প নড়ছে। আর হাতের দীর্ঘ আঙুলগুলো বার বার মুঠি পাকিয়ে যাচ্ছে। মনে হ'ল, হেমন্ত মিত্রের প্রতিটি রক্তকণা বারুদ হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্তে সেগুলো প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়বে। আতঙ্কে ভয়ে আমার বুকের ভেতর শ্বাস আটকে গেল।

মিসেস মিত্র ভীত সুরে বললেন, 'তুমি আজ যাও সুরেষ, ফর গডস্ সেক—'

'যাব তো নিশ্চয়ই, তার আগে নীনীর সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন শুধু।' সুরেষ বলল।

আর ঠিক সেই সময় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন হেমন্ত। সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'গেট আউট, গেট আউট—রাস্কেল, স্কাউন্ড্রেল—'

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল সুরেয। তিন পা পিছিয়ে সভয় কাঁপা স্বরে মিসেস মিত্রের কাছে নালিশ জানিয়েছিল, 'এ-সবের মানে কী, অ্যাঁ—'

'মানে জিজ্ঞেস করছ? হারামজাদা তোমার গাল ছিঁড়ে দেব। বেরোও—' হেমন্ত আবার গর্জে উঠলেন।

আকস্মিক ভয়ের ধাক্কাটা ইতিমধ্যে অনেকখানি সামলে নিয়েছিল সুরেয। মিসেস মিত্রকে নালিশ জানিয়ে সে বলল, 'কেন যাব, নীনী আমাকে কথা দিয়েছে বিয়ে করবে। সে আমার ভাবী স্ত্রী। তার সঙ্গে দেখা না করে যাব না।'

ধৈর্যচ্যুতি অনেক আগেই ঘটেছিল হেমন্তর। মুখটা রক্তবর্ণ, হাত-পা অস্বাভাবিক কাঁপছে। রাগটা তাঁর শীর্ষবিন্দুতে পোঁছল। টেনে টেনে বললেন, 'বিয়ে করবে! এত বড় সাহস তোমার!' বলেই পায়ের মোটা তালতলার চটিটা ছুঁড়ে মারলেন হেমন্ত। সেটা সুরেযের মুখে গিয়ে লাগল।

এক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপরেই সুরেয চেঁচিয়ে উঠল, 'অলরাইট এ অপমান আমার মনে থাকবে। তবে মনে রেখো বুড়ো, নীনীকে আমি বিয়ে করবই। এমনিতে না হয়, ছিনিয়ে নিয়ে যাব।' বলে আর অপেক্ষা করল না সে। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে মোটর বাইকে গিয়ে উঠল। তারপর প্রচণ্ড শব্দ আর আলোড়ন তুলে গেটের বাইরে অদৃশ্য হ'ল।

বিমূঢ়ের মত সুরেযের কথা ভাবছিলাম। নীনীর আগুনের খেলায় আরেক পতঙ্গ। আগে আর একে দেখি নি। অবশ্য কয়েক জনকে আমি জানি—রজত, তলোয়ারকর, মুখার্জি। তালিকায় আরো কত নাম যে আছে তা আমার অজানা। অন্য সবাইকে এমনি নাচিয়েছে নীনী কিন্তু সুরেযকে একেবারে তুর্কী নাচ। তাকে নাকি বিয়ে করবে! আমি যদি নীনীকে এতটুকু বুঝে থাকি তা হ'লে মনে মনে নিশ্চয়ই বলতে পারি, হায় সুরেয, হায় প্লাঞ্জাব-নন্দন!

এদিকে সুরেযের বাইকটা অদৃশ্য হ'লে হেমন্ত স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মিসেস মিত্র নতচোখে নিশ্চল মূর্তির মত বসে ছিলেন। তীক্ষ্ম অস্বাভাবিক চোখে হেমন্ত কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে চিৎকার করে উঠলেন, 'এ সব কী?'

মিসেস মিত্র নিশ্চুপ।

হেমন্ত আবার চেঁচালেন, 'চুপ করে থাকলে চলবে না। বল—বল! এ-সবের মানে কী? জানোয়ারটা বাড়ির ভেতরে ঢুকে এমন কথা বলতে সাহস পায় কেমন করে?'

এবার চোখ তুললেন মিসেস মিত্র। মুখখানা নীরক্ত, ফ্যাকাশে। ভাঙা কাঁপা গলায় বললেন, 'আমি কী করে বলব, বল। নীনী কাকে কোথায় কী কথা দিয়েছে, আমার পক্ষে তা জানা কি সম্ভব?'

'নীনী কোথায়?'

মিসেস মিত্র চমকে উঠলেন। সেই চমকটা আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে

গেল। হেমন্ত আবার বললেন, 'নীনীকে ডাকাও—' স্বরটা আদেশের মত শোনাল।

নীনী এখন কোথায়, মিসেস মিত্র এবং আমি—দু-জনেই জানি। সে যে অবস্থায় আছে, তাতে তাকে ডাকিয়ে আনা বিপজ্জনক। কাজেই অসম্ভব। মিসেস মিত্র বিড় বিড় করে কী একটা উত্তর দিলেন, বোঝা গেল না।

হেমন্ত এবার জয়ন্ত এবং আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'নীনী কোথায় জান?'

আমার মত জয়ন্তর হৃদ্‌পিণ্ডও বুঝি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কী জবাব দিতাম জানি না। আমরা কিছু বলার আগেই যে বয়টা খাবার দিচ্ছিল (এতক্ষণ চিত্রার্পিতের মত একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে) তার ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল, 'জী, ছোটা মেমসাবকে একটু আগে ভাঙা কোঠিতে যেতে দেখেছি।'

আড়ষ্টতা কেটে গেল মিসেস মিত্রর। লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন তিনি। আরক্ত চোখ, তোলপাড় হয়ে-যাওয়া বুক। উত্তেজিত ভীষণ গলায় বললেন, 'কে তোমাকে আমাদের কথার মধ্যে কথা বলতে বলেছে?'

নীনীকে নিয়ে কী নিদারুণ প্রতারণার খেলা চলছে, বয়টার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। নীনীর সন্ধান দিয়ে সে হয়ত ভেবেছিল বাহবা কুড়োবে। মূর্খ বয় এবারও, অবশ্য ভয়ে ভয়ে বলল, 'জী বড়া সাব ছোট মেমসাবের কথা পুছলেন, তাই বললাম। নিজের আঁখে আমি ছোটা মেমসাবকে ভাঙা কোঠিতে—'

মিসেস মিত্র কথা আর শেষ করতে দিলেন না। তার মাঝখানেই সাঙ্ঘাতিক ধমক দিয়ে উঠলেন, 'চোপ রও রাসকেল, গেট আউট—গেট আউট ফ্রম হীয়ার' তাঁর মারমূর্তি দেখে বয়টা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল।

বয়টাকে তাড়িয়ে মিসেস মিত্র আবার তাঁর সোফায় গিয়ে বসলেন। এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিসেস মিত্র আর বয়ের সংলাপ শুনছিলেন হেমন্ত। এবার স্ত্রীর দিকে নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'বয়টাকে তো হটালে। তা বেশ করেছ। এবার চল ও-বাড়িতে।'

নিমেষে উত্তেজনা কেটে গেল। মুখখানা আবার রক্তশূন্য হয়ে গেল মিসেস মিত্রর। স্তিমিত স্বরে বললেন, 'ও-বাড়িতে যাবে কী করতে? নীনী নেই ওখানে।'

'আছে কি নেই, ও বাড়ি গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসতে চাই।'

ভয়ানক শঙ্কিত এবং ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মিসেস মিত্র, 'শুধু শুধু ওখানে গিয়ে কী হবে? তার চাইতে তুমি একটু শান্ত হয়ে বস। আমি নীনীকে খুঁজে আনছি।'

'না।' কঠোর সুরে হেমন্ত বললেন।

একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন মিসেস মিত্র। চোখের তারাদুটো স্থির, শুষ্ক ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থর থর। একসময় ফিসফিসিয়ে উঠলেন তিনি, 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না?'

'না।' হেমন্ত প্রায় চিৎকারই করে উঠলেন।

সবার সামনে হেমন্ত যে এভাবে বলতে পারেন, প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারলেন না মিসেস মিত্র। অবিশ্বাস্য অভিমান আর দুঃসহ অপমানবোধে ঠোঁট প্রথমে স্ফুরিত হ'ল, চোখের কোণদুটো কুঁচকে যেতে লাগল। তারপর নির্জীবের মত বসে রইলেন তিনি। না এতটুকু স্পন্দন, না শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বুকের উত্থান-পতন—জীবনের কোন লক্ষণই তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট নেই যেন।

হেমন্ত আবার বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে।'

'আমি কী করতে যাব! বলছি নীনী নেই ওখানে।' মিসেস মিত্র হেমন্তকে আটকাবার শেষ চেষ্টা করলেন।

'যা বলছি তা-ই কর।' হেমন্ত ধমকে উঠলেন। আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরাও চল।' তাঁর স্বরে এমন অনমনীয়তা রয়েছে যাতে তৎক্ষণাৎ আমরা উঠে পড়লাম। মিসেস মিত্রও উঠে দাঁড়ালেন, তারপর অবসন্ন পায়ে এগিয়ে এলেন। মনে হ'ল একটা অসহায় পশুকে বধ্যভূমিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

একটু পরেই আমরা পুরনো বাড়িতে এসে পড়লাম। আমার বুকের সেই শ্বাসরুদ্ধ অবস্থাটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী নই। তবু এই মুহূর্তে নিজের অজান্তে মনে মনে বলতে লাগলাম, 'হে ঈশ্বর, নীনীকে যেন এ-বাড়িতে পাওয়া না যায়। সে যেন চলে গিয়ে থাকে।'

কিন্তু যা অনিবার্য, কে তাকে রোধ করবে? আমার ঘরেই নীনীকে আবিষ্কার করে ফেললেন হেমন্ত। টেবলের ওপর দু'টো সোডার বোতল পাশাপাশি সাজানো। একটু দূরে একটা হুইস্কির বোতল। আর নীনী আমার বিছানায় বসে পায়ে পা তুলে নাচাচ্ছে। হাতে তার একটা গেলাস। আগ্নেয় তরলে সেটা পূর্ণ। নীনীর রক্তবর্ণ চোখের মাঝখানে নীলাভ মণি দু'টো ভাসছে। দেখেই বোঝা যায়, ইতিমধ্যে কয়েক গেলাস হুইস্কি তার পাকস্থলীতে পৌঁছে গেছে। অন্তর্নিহিত সেই আগুনের উত্তাপে মুখ টকটকে লাল, ঠোঁট স্ফীত। প্রচণ্ড জ্বর হ'লে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি।

কিছুক্ষণ নিশ্চল জড়মূর্তির মত চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে রইলেন হেমন্ত। আমরা ঠিক তাঁর পেছনে। মনে হ'ল, আমরা যেন পৃথিবীর শেষ প্রলয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

ঘরের ভেতরের দৃশ্যটা বিশ্বাস করে উঠতে খুব সম্ভব খানিকটা সময় লাগল হেমন্তর। তার পরই হৃদ্‌পিণ্ড বিদীর্ণ করে চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে, এ বাড়িতে এ-সব কী? কী এ-সব?' বলেই পিছনে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'বদমাস মেয়েমানুষ, এইজন্যেই এখানে আমাকে আসতে দিতে চাইছিলে না?'

মিসেস মিত্র মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

লক্ষ করলাম, শীর্ণ আঙুলগুলো কাঁপছে হেমন্তর। গলার শিরগুলো

দড়ির মত পাকিয়ে পাকিয়ে ফুলে উঠেছে। দৃষ্টিটা স্বাভাবিক নয়, কেমন উদ্‌ভ্রান্ত। চোয়াল আশ্চর্য কঠিন। দাঁতে-দাঁত চাপা অসহ্য এক উত্তেজনা সমস্ত শরীর ফাটিয়ে চুরমার করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আর প্রাণপণে প্রবল শক্তিতে তা সংযত করে রেখেছেন হেমন্ত। ফলে সমস্ত শরীর থরথর করছে। স্ত্রীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার মেয়ের দিকে তাকালেন হেমন্ত। তারপর উন্মাদের মত টলতে টলতে কাছে গিয়ে নাকে-মুখে এলোপাথাড়ি কিল আর চড় চালিয়ে যেতে লাগলেন। আমরা এগিয়ে গিয়ে যে ছাড়িয়ে দেব সে সাহস বা শক্তি শরীরের কোথাও যেন অবশিষ্ট নেই। পা-দুটো অদৃশ্য শিকলে কেউ বেঁধে রেখেছে।

যতক্ষণ না নীনীর নাকমুখ ফেটে রক্ত ছুটল, যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে সে লুটিয়ে পড়ল ততক্ষণ অন্ধের মত মেরেই গেলেন হেমন্ত। তারপর মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে রাগে-যন্ত্রণায় আর দুরন্ত অভিমানে একটা শিশুর মত কেঁদে উঠলেন। ভাঙা ভাঙা জড়িত স্বরে বলতে লাগলেন, 'কনক আমাকে আগেই সব খবর দিয়েছিল কিন্তু এতটা সে তো বলে নি! বোধ হয় সে জানত না। এই চরিত্রহীনদের কাছে আমার যাবার ইচ্ছাই ছিল না। মেয়েমানুষটা কাঁদুনি গেয়ে জেলখানা থেকে নিয়ে গেল পাপের আড়তে। প্রথমটা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, আমি আসাতে বুঝি পরিবর্তন হয়েছে। মেয়েমানুষটার চালচলন ঋষিপত্নীর মত, মেয়েটা ঋষিকন্যা, ছেলেটা ঋষিকুমার। সংশয় হয়েছিল, কনক কি তবে আমাকে মিথ্যে বলেছে! কিন্তু কে জানত এ সব অভিনয়! আমার চোখে ধুলো দেবার, আমাকে ভেড়া বানিয়ে রাখার আয়োজন। পাঞ্জাবি ছোকরা না এলে আর এ-বাড়িতে আসার জেদ না ধরলে তো কিছুই জানতে পারতাম না।'

ইতিমধ্যে আমি খানিকটা দুঃসাহস সঞ্চয় করে ফেলেছিলাম। ঘরময় সোডার বোতল, হুইস্কির বোতল আর কাচের গেলাস ভেঙেচুরে ছত্রখান হয়ে রয়েছে। কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। নীনী জ্ঞান হারিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। জয়ন্তকে ডেকে ধরাধরি করে আমার বিছানায় তাকে শুইয়ে দিলাম। তারপর জল এনে চোখে মুখে ঝাপটা দিতে লাগলাম। মিসেস মিত্র বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর নীনীর জ্ঞান ফিরল। আরক্ত চোখ মেলে উঠে বসল সে। নেশা এখনও কাটে নি। তবে মত্ততা নেই। একটুক্ষণ বসে রইল সে। তারপর প্রায় হুড়মুড় করে আমাদের নিষেধ না মেনে হেমন্তের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জড়িত শিথিল সুরে বলল, 'তুমি আমাকে মারলে বাবা?'

হেমন্ত মুখ থেকে হাত সরালেন না। উত্তরও দিলেন না।

নীনী বলতে লাগল, 'আমি তোমার খারাপ মেয়ে, শাস্তি তো দেবেই। কিন্তু কেন আমি খারাপ হ'লাম মারার আগে তা তো একবার জিজ্ঞেস করলে না বাবা!'

হেমন্ত এবারও নিশ্চুপ।

নীনী থামে নি, 'বল বাবা, ছ-বছর আগে যখন তুমি জেলে গেলে, আমাকে এমন দেখে গিয়েছিলে? মদ ছোঁওয়া তো দূরের কথা, চোখে পর্যন্ত তখনও দেখিনি। তবে এর মধ্যে কেন আমি এত খারাপ হলাম, কেন তোমাকে এত দুঃখ দিলাম?' একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করল সে। দরজার বাইরে মিসেস মিত্রের দিকে আঙুল বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সব—সব এর জন্যে।'

মুখ থেকে হাত সরালেন না হেমন্ত। ভাঙা স্খলিত সুরে বলতে লাগলেন, 'কোন কথা তোমাদের শুনতে চাই না। দয়া করে তোমরা এখান থেকে চলে যাও।'

নীনী বলল, 'তোমাকে শুনতেই হবে বাবা।' সংক্ষেপে যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে তাদের পরিবারে যা যা ঘটেছে, সব ইতিহাস বলে গেল নীনী। সে ইতিহাস অর্থ এবং ভোগের পিছনে উল্কার মত দুরন্ত বেগে ছোটার ইতিহাস। আর এই সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে বসে আছেন মিসেস মিত্র। সেখানে বসেই তিনি এ-যুগের অন্ধকার স্রোতে ভেসে গেছেন। এবং নীনী আর জয়ন্তকেও ভাসিয়ে দিয়েছেন।

শুনতে শুনতে হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়ালেন হেমন্ত। শরীরের সমস্ত শক্তি গলার স্বরে ঢেলে দিয়ে ক্ষিপ্তের মত চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টপ ইট, স্টপ ইট। গেট আউট—বেরিয়ে যাও, যাও।' গলার শিরগুলো উত্তেজনায় পাকিয়ে উঠেছে। চোখ দু'টি রক্তবর্ণ।

হেমন্তর উত্তেজিত ভয়ানক চেহারার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল নীনী। তারপর মাথা নিচু করে টলতে টলতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

মিসেস মিত্র দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হেমন্তকে দেখে কি বুঝলেন, তিনিই জানেন। নিঃশব্দে নীনীকে অনুসরণ করলেন। একটু পরেই ঝোপঝাড় ঠেলে নতুন বাড়িতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন দু-জনে।

এদিকে হেমন্ত আবার দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েছেন। ক্লান্ত, ক্ষত-বিক্ষত, জর্জরিত মানুষটির দিকে তাকিয়ে অপার বিষাদে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার। কতক্ষণ অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম, খেয়াল নেই। যখন সেই ভাবটা কাটল, ঘয়ের দিকে মনোযোগ দিলাম। মেঝেময় এখনও ভাঙা হুইস্কির বোতল, গেলাস আর সোডার বোতল ছড়িয়ে রয়েছে। ঝাঁটা দিয়ে কাচের টুকরোগুলো পরিষ্কার করতে লাগলাম।

ভাঙা খাদে-বসা গলায় হঠাৎ হেমন্ত ডেকে উঠলেন, 'শুভেন্দু—'

'আজ্ঞে—' চকিত হয়ে মুখ ফেরালাম।

'তোমার সম্বন্ধে অন্য রকম ধারণা ছিল আমার। কিন্তু এ-সব কী? মানে কী এর?'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আজ্ঞে—'

'এটা তো তোমার ঘর, সেদিন হাসপাতাল থেকে এখানে এনেই তো আমায় বসিয়েছিলে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমার ঘরে এ-সব বেলেল্লাগিরি কেমন করে চলতে পারে ? কেন এসব অ্যালাউ করছ তুমি ? কেন, কেন ?' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হেমন্ত।

আমার শ্বাস ফের রুদ্ধ হয়ে এল যেন। কেমন করে বলব, ক'দিন ধরে এ ঘরে যে নরকের আসর বসছে তাতে আমার বিন্দুমাত্র সায় নেই। সব কিছুই হচ্ছে মিসেস মিত্রের ইচ্ছায় এবং খেয়ালে। কোনরকমে বলতে পারলাম, 'আজ্ঞে—আমার—আমার—'

আমার মুখে এমন এক অসহায়তা ছিল যা নির্ভুল বুঝতে পারলেন হেমন্ত। নির্নিমেষ স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে সস্নেহে বললেন, 'নাউ আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইওর ডিফিকালটিজ শুভেন্দু। তোমার বিপদের কথাটা আগে খেয়াল করিনি। ওদের কাছে তুমি চাকরি কর—ওরা যদি তোমার ঘরে মদের আড্ডা জমাতে চায়, কী করতে পার তুমি ? অনিচ্ছা থাকলেও তাই মুখ ফুটে বলতে পারনি, এই না ?'

আমার মনোভাবটা যে হেমন্ত বুঝতে পেরেছেন, এতেই আরাম বোধ করলাম। তাঁর চোখে যে আমি একেবারে নেমে যাই নি, এটাই আপাতত সান্ত্বনা। দমবন্ধ বুকটা আবার স্বাভাবিক ভাবে ওঠানামা করতে লাগল। আর কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে হেমন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দশ

হেমন্ত মিত্র সেই যে পূর্বপুরুষের ভাঙা বাড়িতে এলেন, আর নীনীদের কাছে ফিরলেন না। সেদিন স্ত্রী এবং মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ আমার ঘরে বসে ছিলেন তিনি। তারপর আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে সেই ঘরখানায় গিয়ে দরজা বন্ধ করেছিলেন, একদিন খেলাচ্ছলে যেখানে আমি তাঁর বিস্ময়কর দিনলিপির খাতাগুলি আবিষ্কার করেছিলাম।

সেই যে হেমন্ত দুয়ারে খিল দিলেন, দু দিন আর খুললেন না। খুললেন তো না-ই, খেলেন না, ঘুমোলেন না। উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির পায়ে পায়চারি করতে লাগলেন শুধু। স্ত্রী-ছেলেমেয়ের অধঃপতনের কিছু কিছু ইতিহাস জেলে বসেই শুনেছিলেন। কিন্তু তারা যে এতখানি রসাতলে গিয়ে ঠেকেছে, এ ছিল তাঁর সুদূর কল্পনারও বাইরে। দীর্ঘ কারাবাসের পর সংসারের এমন মর্মান্তিক চেহারার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হবে, তা কে ভেবেছিল! তা ছাড়া জেল থেকে বেরিয়ে এসে ক'টা দিন তো তপোবনের পরিবেশেই কাটিয়ে ছিলেন। তখন সংশয় হয়েছিল, স্ত্রী-ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে কনকের মুখে যা শুনেছেন তার সবটাই হয়ত সত্যি নয়। কিংবা সত্যি হলেও তিনি ফিরে আসাতে তাদের পরিবর্তন হয়েছে। এতেই সন্তুষ্ট ছিলেন হেমন্ত। কিন্তু অকস্মাৎ এমন অভাবনীয় রূঢ় আঘাত যে এসে পড়তে পারে, এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।

এই দু-দিনের মধ্যে নীনী আর মিসেস মিত্র অনেক বার এ-বাড়িতে হানা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, হেমন্তকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। দু-জনে বার বার ক্ষমা চেয়েছেন। এবার থেকে হেমন্ত যে ভাবে বলবেন সেই ভাবেই চলবেন। সব গ্লানি সব অন্ধকার মুছে দিয়ে সুস্থ আলোকিত জীবনে উঠে আসবেন, তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হেমন্ত কিন্তু ফিরেও তাকান নি, কথাও বলেন নি, শুধু আমাকে ডেকে দু-জনকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে বলেছেন। আর অপমানিত মেয়ে এবং মা বন্ধ দরজায় মাথা কুটে কুটে ব্যর্থ হয়ে নতুন বাড়িতে ফিরে গেছেন।

নীনী আর মিসেস মিত্রই কি শুধু, বার বার হেমন্তর ঘরের সামনে আমিও গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ভয়ে ভয়ে বলেছি, 'এভাবে না খেয়ে থাকলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে।'

'আমায় বিরক্ত করো না শুভেন্দু।' ভারী সুরহীন গলায় বলেছেন হেমন্ত।

যতবার তাঁর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, একই উত্তর পেয়েছি। প্রথমটা কী করব, বুঝে উঠতে পারিনি। ভেতরে ভেতরে খুবই বিচলিত আর ভীত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এমন ভয়ে ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখলে ভদ্রলোক অনাহারেই আত্মহত্যা করে বসবেন হয়ত। অবশেষে অনেকখানি দুঃসাহস সঞ্চয় করে ফেললাম। সেই সঙ্গে অপার বেদনাও বোধ করলাম। তাঁর নিজের সংসার তাঁকে মর্যাদা দিল না। ছেলেমেয়ে তার ব্রত থেকে বিচ্ছিন্ন, স্ত্রী ব্যভিচারিণী। এর চাইতে যন্ত্রণাদায়ক পরিবেশ আর কি থাকতে পারে! হেমন্ত মিত্র একবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। মরিয়ার মত তৃতীয় দিন সকালে গিয়ে তাঁর দরজায় ধাক্কা দিলাম।

হেমন্ত রুষ্ট স্বরে বললেন, 'কী, কী ব্যাপার?'

'দরজা খুলুন।' গলাটা কেঁপে গেল আমার।

'কেন বার বার আসছ? আমাকে একা থাকতে দাও।'

'দেখুন, এক বাড়িতে আছি, আপনি না খেয়ে থাকবেন আর আমি খাব, এ আমার ভাল লাগছে না। আপনি না খেলে আজ থেকে আমিও তা হ'লে খাব না।'

আমার স্বরে এমন কিছু ছিল যা হেমন্তকে স্পর্শ করল। দু-দিন পর দরজা খুলে বললেন, 'আমার জন্যে তুমি না খেয়ে থাকবে কেন? বোকা ছেলে।'

দুটো দিন অস্নাত, অভুক্ত, বিনিদ্র। চোখ দু'টো এখন আরক্ত, চুল রুক্ষ অবিন্যস্ত; সমস্ত মুখে গাঢ় কালির ছোপ। দীর্ঘ কারাবাসে শরীর আগেই ভেঙে গিয়েছিল। সেই ভগ্ন কৃশ স্বাস্থ্য এই দু-দিনের নিদারুণ অনিয়মে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। শঙ্কিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তারপর ফিসফিস করে করুণ সুরে বললাম, 'তা জানি না। তবে আপনার জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

হেমন্ত আর কিছু বললেন না। শুধু একখানা হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধে রাখলেন। তাঁর স্পর্শের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা মুখের ভাষার চাইতে অনেক বেশি প্রকাশক্ষম।

অনেকক্ষণ পর আমি আবার বলে উঠলাম, 'আপনি স্নান সেরে নিন, আমি খাবার নিয়ে আসি।'

'কোথা থেকে খাবার আনবে?' হেমন্ত জিজ্ঞেস করলেন।

'ও-বাড়ি থেকে।'

'না না না।' আমার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে চিৎকার করে উঠলেন হেমন্ত, 'ও-বাড়ির কোন জিনিস আমি ছোঁব না। কক্ষনো না।' জোরে জোরে প্রবল-বেগে মাথা নাড়তে লাগলেন তিনি।

একটুক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ব্যস্তভাবে বললাম, 'আপনি যখন বলছেন, ও-বাড়ি থেকে আনব না, দোকান থেকেই কিনে আনি।'

'আন। কিন্তু—' হেমন্তর কপালে হঠাৎ গভীর রেখা ফুটল।

'কিছু বলছেন?'

'হ্যাঁ। তুমি তো ওদের চাকরি কর। ওরা যা মাইনে দেয় সেই পয়সাতেই তো খাবার আনতে যাচ্ছ?'

হেমন্ত ঠিক কী বোঝাতে চান, বুঝতে পারলাম না। নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

হেমন্ত বললেন, 'জেল থেকে বেরুবার পরও ক'টা দিন ওদের ভাত খেয়েছি। তখন ওদের স্বরূপ জানতাম না। জেনেশুনে ওদের পয়সার খাদ্য তো খেতে পারব না শুভেন্দু। সহ্য হবে না।'

'পয়সাতে কি কারো নাম লেখা থাকে! যতদিন ওদের ঘরে ছিল ততদিন ও-পয়সা ওদের। পরিশ্রম করে উপার্জন করেছি, ও-পয়সা এখন আমার। আমাকে যদি ঘৃণা করেন তা হলে না হয়—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই হেমন্ত বলে উঠলেন, 'ছি-ছি, তোমাকে ঘৃণা করব, কি বলছ শুভেন্দু! যাও, খাবার নিয়ে এস।'

আমি দোকানে ছুটলাম।

দুপুরবেলা ঠিক করলাম কনক যতদিন না হাসপাতাল থেকে ফিরছে হেমন্তর জন্য নিজের হাতেই রাঁধব। কনকদের রান্নাঘরে বাসন-কোসন, স্টোভ —যাবতীয় সরঞ্জামই রয়েছে। পরমুহূর্তেই খেয়াল হ'ল রান্নার কোন কৌশলই আমার আয়ত্তে নেই। অতএব টিফিন কেরিয়ার নিয়ে পাইস হোটেলে ছুটতে হ'ল।

রাত্রিবেলাও হেমন্তর জন্য হোটেলের দ্বারস্থ হ'লাম। তাঁকে খাইয়ে নতুন বাড়িতে ছুটলাম। কেননা চাকরিটা যতদিন আছে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা ওখানেই।

রাতের খাওয়া সেরে ফিরে এসে দেখি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন হেমন্ত। বললেন, 'এই যে শুভেন্দু, এসে গেছ। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

এখন অনেক রাত। শীতের গাঢ় কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন। বাগানের গাছগুলো এখন আর আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। আকাশে হয়ত চাঁদ আছে, কুয়াশার ঘন স্তর ভেদ করে দৃষ্টি ততদূর পৌঁছয় না।

বললাম, 'এই ঠাণ্ডার ভেতর দাঁড়িয়ে আছেন! দু-দিন ঘুমোন নি। খেতে যাবার আগে আপনাকে না শুয়ে পড়তে বললাম।' আমার গলায় মমতামাখা শাসনের একটি সুর ছিল। নিজের কানেই সেটা অদ্ভুত ঠেকল।

হেমন্ত হকচকিয়ে গেলেন। ব্যস্তভাবে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বললেন, 'শুয়েই তো পড়তাম। কিন্তু ব্যাপারটা কী জান শুভেন্দু, ছেলে বয়েস থেকে আমার ডাইরি লেখার অভ্যেস। এদিকে ভারি মুশকিল হয়ে গেছে।'

আমার কাছে জবাবদিহির কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবু হেমন্তর হকচকানি, ব্যস্ত ভাবভঙ্গি—সব দেখতে দেখতে মনে হল, তাঁর ভাঙাচোরা প্রৌঢ় শরীরে যার বাস সে একটি অবোধ শিশু। আমার শাসনের সুরে সেই শিশুটি একেবারে জড়সড়। যাই হোক, চকিতের জন্য হেমন্তর সেই দিনলিপির খাতাগুলোর কথা মনে পড়ল। সাগ্রহে বললাম, 'কিসের মুশকিল?'

'ডান হাতের বুড়ো আঙুলটায় খিল ধরেছে। কিছুতেই কলম ধরতে পারছি না। এদিকে যে কথাগুলো মনে ভিড় করে এসেছে সেগুলো লিখে না রাখলেই নয়। তাই ভাবছিলাম তুমি ফিরে এলে আমি বলে যাব আর তুমি লিখবে। এসো আমার সঙ্গে।'

রোমাঞ্চিতই বোধ করলাম। দিনলিপির যে খাতাগুলো একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে হয়েছে সেগুলোতে আমার হাতের ছাপ থাকবে। অস্ফুট সুরে বললাম, 'চলুন।'

হেমন্তর ঘরে গিয়ে বসতেই তিনি খাতা আর কলম এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'শুরু কর।'

হেমন্ত যা বললেন তা এইরকম ঃ

'ছয় বৎসর পর জেলখানা হইতে আসিয়া এ আমি কি দেখিলাম! বাহিরে আসিয়া ইহাই যদি দেখিবার ছিল তা হইলে মুক্তির জন্য কে প্রতীক্ষা করিত! জেলখানার ভিতরে একটা কাণ্ড বাধাইয়া বন্দিত্বের মেয়াদ আর কিছুদিন বাড়াইয়া লইতাম। কি নিদারুণ উদ্‌ভ্রান্তি, কি ভয়াবহ অন্ধকার! এই ছ বছরে কলিকাতা আমার পরিবারে এমন গাঢ় গভীর তমসা যে জমা করিয়া রাখিবে তা কে জানিত! কলিকাতার এমন অধঃপতন কে কল্পনা করিয়াছিল। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকিতে ইচ্ছা করে না। প্রখর দহনে সমস্ত অস্তিত্ব এবং আত্মা পুড়িয়া যাইতেছে যেন।'

লিখতে লিখতে কিছুটা অবাকই হলাম। জেল থেকে যেদিন হেমন্ত মুক্তি পান সেদিন বিকেলে কনকের হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম। কলকাতার স্তুতিতে সেদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন হেমন্ত।

আজ এই শহরের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা, প্রবল ধিক্কার।

হেমন্ত বলতে লাগলেন, 'জয়ন্ত এবং নীনীর কথা ছাড়িয়া দিলাম। সুষমাকে তাহারা যে রূপে দেখিয়াছে সেই রূপটাই নিজেদের জীবনে কার্বন কপি করিয়াছে মাত্র। যে পরিবারে দুই শতাব্দীর আলোকিত দিকের উত্তরাধিকার সেখানে আসিয়া সুষমা কি-ভাবে বিপরীত পথে চলিতে পারে! ঐতিহ্যের প্রভাব বলিয়া কিছুই কি নাই! স্ত্রীকে আজ যে রূপে দেখিতেছি শোপেনহাওয়ার বুঝি তাঁহার মাকে সেইরূপেই দেখিয়াছিলেন। আমি কি শোপেনহাওয়ারের মত দুঃখবাদী হইয়া যাইব?

'পৃথিবীর সকল দুঃখের কেন্দ্রে আছে স্পৃহা আর অনন্ত ভোগেচ্ছা। যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি সুষমার শরীর এবং মন ঐ দুইয়েরই পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দিকে তাকাইয়া কেবলই মনে হইতেছে, সর্বম্ দুঃখম্। দুঃখ ছাড়া আর আমার কোন দিকেই কিছু নাই।

'একদিন জীবনকে মহাকাব্য বলিয়া প্রশস্তি গাহিয়াছি। ছ ছবছর পর কারাগারের বিবর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মনে হইতেছে মহাকাব্য হওয়া দূরের কথা, সে একটা সাধারণ কবিতাও না। চারিপাশের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।'

লিখতে লিখতে ভয় পেয়ে গেলাম। হেমন্ত মিত্র নামে এই মানুষটি আশৈশব জীবনকে শ্রদ্ধা করেছেন। সেই শ্রদ্ধার মধ্যে এতটুকু ফাঁকি নেই। মনুষ্যত্বের সকল অধিকার নিয়ে বাঁচার মত বাঁচতে হলে যা যা করণীয়, সবই করেছেন তিনি। কিন্তু জীবন তাঁকে কী দিয়েছে? আয়ুর শেষ প্রহরে পোঁছে মুঠি ভরে পেয়েছেন শুধু শূন্যতা।'

আজন্ম হেমন্তর সামনে একটি মাত্র লক্ষ্য। পূর্বপুরুষরা যে আলোর ধারাটিকে এক শতাব্দী থেকে আরেক শতাব্দীতে পোঁছে দিয়েছেন, তাঁর ধ্যান ছিল তাকে আরো একটু এগিয়ে দেওয়া। নির্যাতন পীড়ন অত্যাচার—কতই তো শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। কিন্তু নিজের ধ্রুব থেকে কোনদিন বিচ্ছিন্ন হ'ন নি তিনি। জীবনের শুভ সম্বন্ধে চিরদিনই তিনি আশাবাদী। কিন্তু নিজের স্ত্রী-ছেলেমেয়ে কী দিল তাঁকে? কোন আশার ইঙ্গিত?

উনিশ শ'র বেয়াল্লিশ সালে ডায়েরিতে হেমন্ত লিখেছিলেন, জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সংসার সীমান্তে যুদ্ধ আরম্ভ করবেন। কারাগারে বসে স্ত্রী-ছেলেমেয়ে সম্পর্কে যা শুনেছিলেন সত্যিই যখন তা নিজের চোখে দেখলেন তখন আর স্থির থাকতে পারেন নি হেমন্ত। চিরদিনের সংগ্রামী মানুষটি কি তাঁর ধ্যান ভুলবেন? বিচলিত বিভ্রান্ত হেমন্ত কি পেসিমিস্ট হয়ে যাবেন?

এগার

হেমন্ত এ-বাড়িতে আসার পর তাঁর সব দায়িত্ব এসে পড়ল আমার ওপর। কয়েক দিনের সান্নিধ্যেই বুঝতে পেরেছি, নিজের স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম-বিশ্রাম সম্বন্ধে মানুষটি একেবারেই উদাসীন। কখন খেতে হবে, কখন ঘুমনো উচিত, কিছুই তাঁর খেয়াল থাকে না। একটা বিচিত্র অন্যমনস্কতা সবসময় তাঁকে বেষ্টন করে থাকে। এমন মানুষের পেছনে সর্বক্ষণ লেগে থেকে কেউ তাগিদ না দিলে তাঁর জীবনের স্বাভাবিক গতিটাই রুদ্ধ হয়ে যায়।

নিজের সম্বন্ধে হেমন্তর উদাসীনতা প্রকৃতিগত, সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু দীর্ঘ কারাবাসের পর বাড়ি ফিরে স্ত্রী-ছেলেমেয়ের অধঃপতনের প্রমাণ পেয়ে প্রথমটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন হেমন্ত। ধীরে ধীরে রাগ আর উত্তেজনা থিতিয়ে গিয়ে ইদানীং অদ্ভুত এক বিষাদ এবং নৈরাশ্য তাঁকে ঘিরতে শুরু করেছে। আচ্ছন্নের মত সবসময় কি যেন ভাবেন। ঘর থেকে এক পা-ও বাইরে বেরুতে চান না। চিরদিনের সংগ্রামী মানুষটি একেবারেই অথর্ব আর পঙ্গু হয়ে পড়েছেন।

অথচ অজস্র কাজ ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। শুধু অন্ধকারের অতলে বিলীন হয়ে যাওয়া নয়, আশান্বিত হবার মত কলকাতার আলোকিত দিকও তো আছে। এবং সে কথা হেমন্তর চাইতে ভাল করে কে আর অনুভব করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈনিকদের মুক্তির জন্য ছাত্র-আন্দোলন আর রসিদ আলী ডে-র জের এখনও কাটে নি। সর্বভারতীয় নেতারা, কৃপালনী-জওহরলাল-শঙ্কর রাও দেও-প্যাটেল-গফুর খান-রাজেন্দ্রপ্রসাদ—কেউ বাকি নেই, সবাই ছুটে এসেছেন কলকাতায়। দেশপ্রিয় পার্কের সুবিশাল জনসভায় উদ্দীপনাময় কৃতজ্ঞ ভাষায় আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জওহরলাল।

শুধু কি কৃপালনী-প্যাটেল-জওহরলালেরই, স্বয়ং গান্ধিজীও এসেছেন। কলকাতায় এসেই চলে গেছেন সোদপুর। সেখানকার খাদি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে প্রথম প্রার্থনা-সভার প্রবর্তনা করেছেন তিনি। প্রার্থনা-সভায় রোজ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। এ-জন্য কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে। পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থ থেকে শ্রেষ্ঠ বাণীগুলি সভায় পাঠ করা হয়। তারপর সমবেত কণ্ঠে রামধুন গান। অবশেষে গান্ধিজী প্রার্থনান্তিক ভাষণ দেন। ভাষণের মর্মার্থ হ'ল, মানুষের শুভবুদ্ধি এবং আত্মাকে উদ্দীপ্ত করা।

এবার গান্ধিজীর কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য রকম। যুদ্ধের

শুরু থেকেই বাঙলাদেশের জীবনের তটে আঘাতের পর আঘাত এসে পড়ছে। দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, মহামারী—তিনে মিলে চুক্তি করেছে দেশটাকে রসাতলের অতলে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত থামবে না। পীড়িত জর্জরিত মুমূর্ষু বাঙলাকে সান্ত্বনা দিতে এবার এসেছেন গান্ধিজী।

এরই মধ্যে একদিন কলকাতায় এসে গভর্নর কেসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন গান্ধিজী। তারপর ছুটলেন মেদিনীপুর। সেই মেদিনীপুর, দক্ষিণের দুরন্ত বন্যায় যা একদিন ভেসে গিয়েছিল। প্লাবিত দুর্গত অঞ্চলটি, ঘুরে ঘুরে পরমাত্মীয়ের মত কত মানুষের অশেষ দুঃখের খবর যে নিয়েছেন গান্ধিজী! শুধু কি বন্যার খবরই, বেয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে সমস্ত এলাকাটার ওপর দিয়ে পুলিশ নামে ইংরেজের পোষা মাংসাশী নেকড়েরা যে তাণ্ডব চালিয়েছিল সে লাঞ্ছনার মর্মন্তুদ কাহিনী ক্লিষ্ট করুণ মুখে শুনেছেন।

বাঙলাদেশ, বিশেষ করে কলকাতার ধমনী এখন অতিমাত্রায় স্পন্দিত। তার জীবনে দুরন্ত স্রোতের আহ্বান।

আশ্চর্য! সব দেখেশুনেও চিরদিনের কর্মী মানুষটি নাড়িতে টান অনুভব করছেন না। নিস্পৃহের মত দরজা বন্ধ করে রয়েছেন। কর্তব্যের কোন হাতছানিই হেমন্তকে চঞ্চল করতে পারছে না।

চারবেলা তাড়া দিয়ে হেমন্তকে খাওয়াই, স্নান করাই। আঙুলের সেই ফিক ব্যথাটা এখনও সারে নি তাঁর। অতএব রোজই ডায়েরির পাতায় আমাকে শ্রুতলিপি লিখতে হচ্ছে।

দিনরাত শুধু হেমন্তকে নিয়ে থাকলে চলে না। মিসেস মিত্রের কাছে আমার চাকরি আছে। চাকরিটার সঙ্গে আমার আশ্রয় আর প্রাণধারণের প্রশ্নটি জড়িত। অতএব নিয়মিত নতুন বাড়িতে হাজিরা দিতে হচ্ছে।

লক্ষ্য করেছি, হেমন্তবাবু সত্যিই যখন ভাঙা বাড়ি থেকে আর ফিরলেন না তখন প্রথম প্রথম কয়েকটা দিন নীনী, জয়ন্ত এবং মিসেস মিত্র খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ছ বছরের সেই লাগাম ছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত জীবনটার জন্যে হয়ত খানিকটা অনুশোচনাই এসেছিল তাঁদের মধ্যে।

মিসেস মিত্র একদিন বলেছিলেন, 'আমরা বোধ হয় ভুলই করেছি শুভেন্দু।'

আমি উত্তর দিই নি। ভেবেছিলাম, হেমন্তর কাছ থেকে যে আঘাত পেয়েছেন তাতেই বুঝি আত্মস্থ হতে চলেছেন মিসেস মিত্ররা।

মিসেস মিত্র আবার বলেছিলেন, 'হাজার হোক ওদের তো নীতিবাগীশের বংশ। ঘরের বউ ঘরের মেয়ে ড্রিঙ্ক করছে—এতটা সহ্য করতে পারবে কেন? হ্যাবিটটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে আমাদের। এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও পারতাম। জেলখানা থেকে ওর ফিরে আসার পর আরো সাবধানে আমাদের

চলা উচিত ছিল।' ভদ্রমহিলা যেন আমাকে নয়, আমাকে সামনে বসিয়ে নিজের কাছেই জবাবদিহি করে যাচ্ছিলেন।

যথারীতি আমি নিশ্চুপ থেকেছি।

হেমন্ত তাঁদের ত্যাগ করেছেন, এটা খুবই অসহনীয় এবং লজ্জাকর। মিসেস মিত্র আমাকে অনুরোধ করেছেন, 'ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তুমি এ-বাড়িতে নিয়ে এস শুভেন্দু। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকতে পারব না—এর চাইতে লজ্জার আর কী থাকতে পারে! আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এবার থেকে আমরা ঠিকমত চলব। যা ওর অপছন্দ তেমন কিছুই করব না।'

আবেগের তোড়ে বলে গেলেন বটে কিন্তু ছ বছরের যে অভ্যাসগুলো মিসেস মিত্রদের গ্রাস করে আছে সে-সব পরিবর্তন করা যে কত দুরূহ তা আমি জানি। তা ছাড়া মিসেস মিত্রদের সপক্ষে হেমন্তর কাছে সওয়াল করতে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। শঙ্কিত করুণ সুরে বলেছিলাম, 'আপনি তো কতবার ওঁকে আনতে গেলেন, উনি এলেন না। আপনার কথাই যেখানে রাখলেন না, আমি বললে কী রাখবেন?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিলেন মিসেস মিত্র, 'তুমি ঠিকই বলেছ শুভেন্দু, বরাবরই মানুষটা জেদী। একবার যা ঠিক করবে তা থেকে এক পা-ও ওকে নড়ানো যাবে না। বিয়ে হয়েছে আজ পঁচিশ তিরিশ বছর, তখন থেকেই তো ওকে চিনি।' খানিকটা চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন, 'ও আর এ-বাড়ি আসবে না জানি। তোমাকে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে শুভেন্দু।'

'বলুন—' আমি উদগ্রীব হয়েছিলাম।

'জেলখানা থেকে শরীরের কী হাল করে এসেছে দেখেছ তো। রাগ করে ও-বাড়িতে গিয়ে রইল। কী খাবে কী না খাবে, কিছু ঠিক নেই। কনকটা হাসপাতালে, ও থাকলেও না হয় কথা ছিল। সে যাক, তুমি ওর জন্যে রোজ এ-বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যাবে।'

বাধা দিয়ে বলে উঠেছিলাম, 'কিন্তু—'

'কী?'

'মিস্টার মিত্র এ-বাড়ির খাবার ছোঁবেন না।'

'তোমাকে বলেছে নাকি?' মিসেস মিত্র চকিত হয়ে উঠেছিলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমি চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম।

'খাবে না কেন?' এবার রূঢ়স্বরে জানতে চেয়েছিলেন মিসেস মিত্র।

উত্তরটা আমার জানা ছিল। কিন্তু জানা আর বলার মধ্যে একেক সময় দুস্তর ফারাক। নতমুখে নিশ্চুপ বসে থেকেছি।

প্রথম প্রথম কয়েকটা দিন আক্ষেপ করেছেন মিসেস মিত্র, অনুশোচনা করেছেন। লক্ষ করেছি নীনী বা তিনি বাড়ির বাইরে একটা পা-ও বাড়ান

নি। জয়ন্তকে অবশ্য তার কাজের খাতিরে বেরুতে হয়েছে। নিষ্ঠাবতী আদর্শ কুলবধূর মতই বাড়িতেই সময় কেটেছে মিসেস মিত্রের। হেমন্ত ফিরে আসার পর নীনী আশ্রমবালিকা হয়ে গিয়েছিল। তার জের সে টেনে চলেছে।

কিন্তু মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই মিসেস মিত্র অন্য সুর ধরলেন, তুমি সাক্ষী আছ শুভেন্দু, আমি ওকে ফিরিয়ে আনার কম চেষ্টা করিনি। ছ বছর জেল খেটে স্বাস্থ্য নষ্ট করে এল। তুমি তো জান, ওর জন্যে দু-খানা আলাদা ঘর সাজিয়ে রেখেছি। সারা জীবন তো কষ্ট করেই কাটাল। এবার ও বিশ্রাম করবে, ক'টা দিন আরামে থাকবে—তার সব ব্যবস্থাই করেছিলাম। কিন্তু ও এল না।'

মনে মনে বললাম, 'জীবনের সবকিছুর দামে যে সুখ কিনেছ সে সুখের ফাঁদে আর যাকে হোক হেমন্তকে ধরা অসম্ভব। বদমাস মেয়েমানুষ, এত জান আর এটুকু জান না! নিজের স্বামীকে এখনও চেন নি!' মনে মনেই বললাম, গলায় স্বর ফুটল না।

একটু চুপ করে থেকে মিসেস মিত্র আবার বললেন, 'এক কাজ করলে অবশ্য হয়। সব ছেড়েছুড়ে ও-বাড়িতে ওর ঘরের সামনে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকলে পারি। কিন্তু—'

কোন প্রশ্ন না করে উৎসুক মুখে তাকালাম।

মিসেস মিত্র হঠাৎ প্রবলবেগে মাথা নাড়তে লাগলেন, 'কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। ছ বছর আগে হ'লে পারতাম, এখন আর অতটা পেরে উঠব না। কেমন যেন প্লে বলে মনে হবে। অভ্যাস, বুঝলে শুভেন্দু, সবই অভ্যাস। ছ বছর ধরে যে-সব অভ্যাসের ফাঁদে আটকে গেছি সেগুলোই পিছু ফিরতে দেবে না। জীবন বড় বিচিত্র ব্যাপার।' স্বগতোক্তির মত তিনি বলে চললেন, 'যে স্রোতে ভেসেছি সে শুধু সামনেই ঠেলে নিয়ে যায়, পেছন ফেরার উপায় রাখে না।'

কথায় বার্তায় শুধু নয়, ধীরে ধীরে দিনযাপনের মধ্যেও আবার সেই প্রমত্ততার ছোঁয়া লাগল। ছ বছরের জীবনটা দিনকয়েক একটু দূরে আড় ঘোমটা টেনে বসে ছিল, আবার সে হাতছানি দিল। শান্ত শুদ্ধ আশ্রমিকার ছদ্মবেশ খুলে পুরনো মিসেস মিত্র আবার আসরে নামতে শুরু করলেন। বললেন, 'যতবার গেছি ততবারই ও আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। তুমি সাক্ষী আছ শুভেন্দু। কেন, কি এমন অন্যায়টা করেছি আমি! যুদ্ধের বাজারে সবাই টাকা করেছে। আর যদি ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্কের কথা তোল, তা হলে বলব অত গোঁড়ামি ভাল নয়।'

খুব সম্ভব নতুন করে মাতবার আগে নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়া শেষ করে নিলেন মিসেস মিত্র।

ধীরে ধীরে আবার হোটেল-ড্রিঙ্ক-পার্টি শুরু হয়ে গেল। আবার সেই অন্ধকার জীবনের অনুচরদের আনাগোনা আরম্ভ হ'ল বাড়িতে। হেমন্ত আসার পর ছ বছরের উদ্‌ভ্রান্ত জীবনটা কয়েক দিনের জন্য থমকে ছিল। আবার সে তার কক্ষপথে ফিরে এসেছে।

নীনী এবং জয়ন্তও মিসেস মিত্রের পদচিহ্ন ধরে এগুতে লাগল। বিশেষ করে নীনী। হেমন্ত আসার আগে যা ছিল, তার চাইতে এবার হাজার গুণ প্রমত্ত সে। স্বয়ং মত্ততার ঈশ্বর তার হাত ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

যখন খুশি হত, নীনী বেরিয়ে যেত। প্রায় রাত্রেই বাড়ি ফিরত না। প্রচণ্ড নেশা করে দিন দুই ইডেন গার্ডেনে পড়ে ছিল, পুলিশ তুলে এনে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে এবং যা মন্তব্য করে গেছে আর যাই হোক তা খুব রমণীয় নয়। নীনীকে তারা চেনে, বহুদিন থেকেই তার উদ্‌ভ্রান্ত গতিবিধির ওপর তাদের নজর রয়েছে। এমন সব পরিবেশে তার আনাগোনা এবং এমন সব মানুষের সঙ্গে চলাফেরা যা রীতিমত আপত্তিকর এবং বিপজ্জনক। নিতান্ত ভদ্র পরিবারের মেয়ে, তাই এতদিন পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে আছে। মাত্রা আরেক পর্দা ছাড়িয়ে গেলে কর্তব্যের খাতিরেই তাদের রূঢ় হতে হবে। অতএব নীনী যেন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক হয়। ইত্যাদি-ইত্যাদি—

দেখেশুনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। ভয়ে ভয়ে মিসেস মিত্রকে বলেছি, 'নীনী দেবী যা করে বেড়াচ্ছেন মিস্টার মিত্র এ সব শুনলে খুবই কষ্ট পাবেন।'

মিসেস মিত্র উত্তর দেন নি।

সাহস সঞ্চয় করে আমি আবার বলেছি, 'এভাবে যেখানে-সেখানে মদ খেয়ে উনি পড়ে থাকেন। এ তো ভাল নয়। আপনি যদি বলেন আগের মত, তা হলে—' এই পর্যন্ত বলে আমি থেমে গেছি।

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছেন মিসেস মিত্র।

'নীনী দেবীর পেছনে ঘুরতে শুরু করি। নেশা-টেশা করে কোথাও পড়ে থাকলে তুলে নিয়ে আসতে পারব। তাতে লোক জানাজানি হবে না।'

'কিছু দরকার নেই।'

এর পর আর কোন কথা চলে না। তবু মরিয়ার মত বলে ফেললাম, 'কিন্তু আপনিই তো একদিন নীনী দেবীর পেছনে আমাকে লাগিয়েছিলেন। মানে উনি কোথায় যান, কী-কী করেন—'

বাধা দিয়ে মিসেস মিত্র বলে উঠেছেন, 'তখন দরকার ছিল। ভেবেছিলাম, ওর চলাফেরার খবর নিয়ে ধমকে দেব। তাতে বাড়াবাড়িটা কমবে। সেদিন মনে হয়েছিল নীনীর অভ্যাসগুলোর রাশ টেনে না ধরলে পরে আর নিজেকে সামলাতে পারবে না সে। সেদিন ভয় ছিল, ওর বাবা জেল থেকে বেরিয়ে

মেয়ের এমন অবস্থা দেখলে আর যাকেই হোক, আমাকে অন্তত ক্ষমা করবে না। আজ আর সেই ভয়টা নেই। ওর বাবা সবই জেনে ফেলেছে। তা ছাড়া—'

'কী?' রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

নিজের অজান্তেই যেন মিসেস মিত্র বলতে লাগলেন, 'তা ছাড়া সেদিন ভয় ছিল, ওর অনেক বয় ফ্রেণ্ড, তাদের কারো সঙ্গে না পালিয়ে যায়। তাতে বিপদ ছিল। মানে বুঝতেই পারছ, আমাদের কণ্ট্রাক্টার বিজনেসের ব্যাপারে নীনী খুব হেল্পফুল। মানে পার্টি-টার্টি যখন থ্রো করতাম তখন ওকে দেখে অনেক লোকের মাথা ঘুরে যেত। কণ্ট্রাক্ট বাগানো সহজ হত। যুদ্ধের পর ব্যবসার অবস্থা খুবই—' বলতে বলতে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে চুপ করলেন। এতক্ষণ কার কাছে জীবনের কোন গূঢ় খবর দিচ্ছিলেন, তা যেন হুঁশ ছিল না মিসেস মিত্রের।

কিন্তু আমি যা জানবার জেনে নিয়েছি। মিসেস মিত্রের অঙ্গুলি হেলনে এতকাল নীনীর পেছনে কেন যে ছুটেছি সে রহস্য এতদিনে উন্মোচিত হ'ল।

একদিকে নতুন বাড়িতে মিসেস মিত্ররা, আরেক দিকে ভাঙা বাড়িতে হেমন্ত মিত্র। জীবনের দুই বিপরীত মেরু। মাঝখানের বিষুবরেখায় উদ্বিগ্ন দর্শকের মত আমি দাঁড়িয়ে আছি।

বার

মিসেস মিত্রের কাছে যেদিন চাকরি-জীবন শুরু হ'ল সেদিনই ভাঙা বাড়ির গর্তে এসে ঢুকেছিলাম। আর তার দিনকয়েক পরেই এক সুপ্রভাতে সুরপতি আমার ঘরে হানা দিয়েছিলেন।

আমাকে দেখে প্রথম প্রথম উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন সুরপতি। ভেবেছিলেন এক তাল কাদার মত মফস্বলের ভীরু ছেলেটিকে নিজের খুশিমত ছাঁচে ঢেলে নিতে পারবেন। রহস্যময় হেসে বলেছিলেন, 'তোমায় আমি নিয়ে যাব নাগরীর হাটে।' সেদিন কলকাতার অন্ধকার সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা তেমন ব্যাপক ছিল না, কাজেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

প্রায়ই সুরপতি আমার ঘরে আসতেন তখন। উনিশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু বাবুতন্ত্র আর বিশ শতাব্দীর নব্যরীতির ভোগবাদ সম্বন্ধে প্রচুর রসাল গল্প ফাঁদতেন। সে-সব গল্পের অধিকাংশই আদিরসের প্রান্ত ঘেঁষা। শুনতে শুনতে কান গরম হয়ে উঠত। গল্প বলে যখন যাবার সময় হ'ত ঠিক তখনই খুব বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে আমার কানে কানে বলতেন, 'এক-আধটা টাকা আছে ব্রাদার? থাকলে দাও না। পরশু দুপুরবেলা দিয়ে দেবো।' যখনই আসতেন

কিছু না নিয়ে যেতেন না। শব্দটা অবশ্য 'ধারই' কিন্তু তাঁর এবং আমার মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে গেছে, ধার কোনদিনই তিনি শোধ করবেন না। তবু লোকটিকে আমার খারাপ লাগত না। ভাঙা বাড়ির নির্বাসনে সুরপতিকে পেয়ে বেঁচে গিয়েছিলাম।

সুরপতির হয়ত ইচ্ছা ছিল কোনরকমে যদি আমাকে তাঁর পথের সঙ্গী করে নিতে পারেন, চল্লিশ বছর ধরে যে অভ্যাসটি চালিয়ে যাচ্ছেন তার উত্তরাধিকার আমাকে দিয়ে যাবেন। কিন্তু কিছুদিন আনাগোনার পরই বুঝেছিলেন তাঁর এবং আমার পথ একেবারেই ভিন্ন। যদিও মিসেস মিত্রের কাছে চাকরি করতে এসে আমার মুখে কিছু কাদার ছিটে লেগেছে তবু যে ধাতু দিয়ে তাঁর প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছে তার বিপরীত ধাতুতে আমার স্বভাব গড়া। অতএব ধীরে ধীরে আমার সম্বন্ধে সুরপতির আকর্ষণ আলগা হয়ে আসছিল। আমার ঘরে যাতায়াত কমিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। প্রমত্ত অতীতকে স্মরণ করতে করতে তাঁর লালা ঝরত। সে-সব গল্পও আমার কাছে আর করতেন না। অবশ্য সম্পর্কটা একেবারে ছিন্ন করেন নি। ধার নেওয়াটা মাঝে মধ্যে চলছিলই। কিন্তু কনক হাসপাতালে যাবার পর তাঁকে বিশেষ দেখিনি। রাত্রিবেলা মদ্যপানটি সেরে কখন যে সুরপতি বাড়ি ফিরতেন, আমার খেয়াল থাকত না। সারাদিনই বা তাঁর কোথায় কাটত, কি খেতেন, কিছুই জানতাম না। মোট কথা, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেনানীদের মুক্তির জন্য যেদিন আন্দোলন শুরু হয় সেদিন থেকে এত সব ঘটনা ক্রমাগত একের পর এক আমার চেতনায় হানা দিয়ে গেছে যাতে সুরপতির কথা মনে ছিল না। তাঁর কথা সহজে মনে পড়ত কি-না সে সম্বন্ধে সংশয় আছে। কেননা, হেমন্ত এ-বাড়িতে এসে আছেন। যতক্ষণ ভাঙা বাড়িতে কাটাই তাঁকে নিয়ে মগ্ন থাকতে হয়। দিনের বাকী অংশটা কাটে মিসেস মিত্রের কাছে।

এইভাবেই চলছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ এক সকালে সুরপতি আমার ঘরে এলেন। তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকদিন পর আবার সচেতন হয়ে উঠলাম। সাদর অভ্যর্থনা করলাম, 'আসুন—আসুন—'

ঘরে ঢুকেই সুরপতির চোখ দু'টো কুঁচকে গেল। মুখে দুশ্চিন্তার গাঢ় ছায়া। ক্লিষ্ট স্বরে বললেন, 'ভারি বিপদে পড়েছি ভায়া।'

'কী ব্যাপার ?'

'এ বাড়ি থেকে বোধহয় উদ্বাস্তু হতে হ'ল। কনকও নেই, এখন কোথায় গিয়ে যে উঠব !'

আমি চমকে উঠলাম, 'কেন বলুন তো ?'

'আরে ভাই, তোমাকে তো বলেছি চল্লিশ বছর ধরে আমি ড্রিঙ্ক করে আসছি !' সুরপতি বলতে লাগলেন, 'ড্রিঙ্ক করাটা আমার জীবনের একটা

অঙ্গ হয়ে গেছে। ওটা বাদ দিয়ে আমার জীবন অচল।'

'সে তো জানিই। কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'আরে ভায়া, পরশুদিন রাত্তিরে এগারটা নাগাদ তুমি এ-বাড়ি ছিলে না। খুব সম্ভব সুষুর কাছে গিয়েছিলে। আর সেই সময় চৌরঙ্গীর বার থেকে ড্রিঙ্ক সেরে আমি ফিরে এসেছিলাম। নেশার মুখে যদ্দুর মনে পড়ল একটা গান ধরেছিলাম। আর তাতেই হেমন্ত ক্ষেপে উঠল। নিজের ঘরে বসে বই পড়ছিল সে। বাইরে বেরিয়ে এসে বললে নেশা করে এখানে হল্লা চলবে না। এ-বাড়িতে থাকতে হ'লে ভদ্রলোকের মত থাকতে হবে। আরে বাপু, একদিন দু-দিন নয়, এ আমার চল্লিশ বছরের অভ্যেস। কত কষ্টে একে টিকিয়ে রেখেছি! দুনিয়ার সব ছাড়তে পারি কিন্তু এটি পারব না। হেমন্তকে সে-কথা বললাম। শুনে হেমন্ত কি বললে জান?'

'কী?'

'বললে ড্রিঙ্ক করা না ছাড়লে এ-বাড়িতে থাকা চলবে না। আমি বললাম, এই বয়েসে তা হলে কোথায় যাব? হেমন্ত বললে, 'যে জাহান্নামে খুশি!' একটু থেমে আবার বললে, 'কেন, আপনার শালীর কাছে যান না। ওখানে গেলে সুবিধেই হবে। এক ঝাঁকের কই তো সব।' ও-বাড়িতে যদি যাই সুষু নিশ্চয়ই 'না' বলবে না। কিন্তু বিপদ কি একদিকে? আমার ডাঙায় বাঘ জলে কুমির। যেদিকেই যাব সেদিকেই মরণ। কনক আমাকে জোর করে সুষুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। এখন যদি সেখানে যাই মেয়েটা কি আমাকে রক্ষে রাখবে! কী করি বল তো শুভেন্দু?'

বললাম, 'আপনি যে এতকাল ধরে ড্রিঙ্ক করে আসছেন, সে কথা কি আগে হেমন্তবাবু জানতেন না?'

'তা আর জানত না—' সুরপতি বললেন, 'যুদ্ধের আগে যখন সে আমাকে সুষুদের দেখাশোনার জন্যে নিয়ে আসে তখনই তাকে আমার অভ্যেসটার কথা বলেছিলাম। সব জেনেশুনেও দেখ দিকি কি ঝামেলা! নেশার মুখে কখন কি করেছি তার জন্যে তাড়িয়ে দিতে চায়! নেশার সময়কার কথা কেউ ধরে! তুমিই বিবেচনা কর শুভেন্দু।'

বুঝলাম মিসেস মিত্রদের ওপর হেমন্তর যত রাগ আর বিতৃষ্ণা ছিল সব গিয়ে পড়েছে সুরপতির ঘাড়ে। সুরপতি তাঁর দীর্ঘকালের অভ্যাস ছাড়তে পারবেন না। কাজেই এ-বাড়িতে হেমন্তর চোখের সামনে থাকাটা তাঁর পক্ষে ঠিক মঙ্গল হবে না। বললাম, 'মিসেস মিত্রের যদি আপত্তি না থাকে আপনি বরং তাঁর কাছেই গিয়ে থাকুন।'

'কিন্তু কনক?'

'আমি কনকদেবীকে বুঝিয়ে বলব'খন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলো।' সুরপতি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'তুমি কনকের জন্যে এত করেছ। পুলিশের লাঠি খেয়ে রাস্তাতেই মরে থাকত। তুমি ওকে বাঁচিয়েছ। নিশ্চয়ই কনক তোমার কথা শুনবে। তা ছাড়া বুঝতেই তো পার, আমরা চিরকালের বাবুমানুষ। কনক মাস্টারি করে যা পায় তাতে পেটে-ভাতেই কোনরকমে বাঁচা চলে। বাবুগিরি বজায় রাখা অসম্ভব। কী করে যে চালাচ্ছি! সুষুর ওখানে গেলে আরামেই কাটবে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

এর দিন দুই পর সুরপতি মিসেস মিত্রের কাছে চলে গেলেন। চিরদিনের পরগাছা বাবু মানুষটি তাঁর অভ্যাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এবার নিশ্চিন্ত হতে পারবেন।

সুরপতি এ-বাড়ি থেকে চলে যাবার পরদিনই বুলাকির চিঠি পেলাম। তার চাকরি হয়েছে। চাকরি পাওয়াটা নিঃসন্দেহে সুখবর। তার সঙ্গে একটা দুঃসংবাদও আছে। চুরি এবং মারামারির দায়ে পুলিশ মণ্টুকে ধরে নিয়ে গেছে। মণ্টু যে অধঃপতনের পথ ধরেছিল তার স্বাভাবিক পরিণতিই ঘটেছে। বুলাকি লিখেছে ভাইকে ছাড়িয়ে আনার কোন চেষ্টাই সে করবে না।

সন্ধ্যার পর মণ্টু। নিজেকে হত্যা করে দুটো ভাইবোনকে জীবনের রাজপথে পেঁৗছে দিতে চেয়েছিল বুলাকি। কিন্তু তারা তা শোনেনি। সহজলভ্য কুসঙ্গ আর কুপথকেই তারা আশ্রয় করেছিল। সেখান থেকে হাজার চেষ্টা করেও তাদের ফেরানো যায় নি।

যারা প্রতিজ্ঞা করেছে বুলাকির কাম্য পথের বিপরীত দিকে চলবে আর নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেদের হাতেই তুলে নেবে তাদের জন্য কী-ই বা করা যায়!

ক্ষতবিক্ষত জর্জরিত বুলাকি এবার তাই একেবারেই উদাসীন।

তের

ক'দিন ধরেই আমার স্নায়ুগুলো কিসের একটা আভাস যেন পাচ্ছিল। খুব স্পষ্টভাবে নয়, তবু মনে হচ্ছিল কিছু একটা আসন্ন। মিসেস মিত্রদের পরিবারটাকে বেষ্টন করে একটা অদৃশ্য ছায়া রাহুগ্রাসের মত ক্রমাগত ঘন হচ্ছিল বুঝি।

ছায়াটা যে কিসের, সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। তবে উদ্বিগ্ন ইন্দ্রিয়-গুলো অবিরাম ফিস ফিস করে বলছিল, উদ্‌ভ্রান্ত একটা উল্কার মত লক্ষ্যহীন অন্ধ গতিতে নীনী যেভাবে ছুটছে তার পরিণাম খুব রমণীয় নয়।

মনে হচ্ছিল তাকে ঘিরে কিছু একটা ঘটবে, নিশ্চয়ই ঘটবে।

সত্যিই যে ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি আর এমন মর্মান্তিকভাবে ঘটে যাবে, এ ছিল আমার পক্ষে অকল্পনীয়।

একদিন সকালে দোকান থেকে চা আর টোস্ট কিনে এনে হেমন্তকে খেতে দিয়েছি, ঠিক সেই সময় ছুটতে ছুটতে গুপী একেবারে দরজার কাছে থমকে এসে দাঁড়াল। চুল উস্কখুস্ক, চোখদুটি বসে গেছে। সমস্ত মুখে ভয়ের ছায়া টানা। বুড়ো মানুষ, অনেকখানি দৌড়ে এসেছে। সেই ধকলে বুকটা দ্রুত ওঠানামা করছে।

গুপীর হৃদ্‌পিণ্ডের উত্থান-পতন দেখতে দেখতে চকিত হয়ে উঠলাম। হেমন্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে, কি হয়েছে ? অমন দৌড়ে দৌড়ে এলি যে ?'

সন্ত্রস্ত স্বরে গুপী বলল, 'আজ্ঞে, পুলিশ এয়েচে।'

'পুলিশ !' ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেল হেমন্তর, 'এই তো সবে ছাড়া পেলাম। এরই মধ্যে আবার পুলিশ কেন ?'

'আজ্ঞে আপনার জন্যে লয়।' গুপীর স্বরটা খাদে ঢুকে গেল।

'তবে ?'

'আজ্ঞে নীনী দিদিমণি—' বলতে বলতে গুপীর গলাটা বুজে গেল। আর শ্বাসটা আটকে এল বুঝি।

'নীনী দিদিমণি কী ?' হেমন্ত বসে ছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন।

চারদিকে তাকিয়ে চাপা অবরুদ্ধ স্বরে গুপী বলে উঠল, 'আজ্ঞে তেনার জন্যে পুলিশ এয়েচে। আপনাকে ডাকচে।'

'নীনীর জন্যে পুলিশ !' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন হেমন্ত, 'কেন, কী করেছে সে ! এ-সবের মানে কী ?'

গুপী ভয় পেয়ে গেল। দু-পা পিছিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'দিদিমণি কিছু করে নি—'

'তা হলে পুলিশ কেন ?'

'আজ্ঞে—আজ্ঞে—' কিছুক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত মরিয়ার মত বলে ফেলল গুপী, 'দিদিমণিকে কাল রাত্তিরে কারা যেন ছুরি মেরেছে।'

'নীনীকে ছুরি মেরেছে ! তুই বলছিস কী !' গোঙানির মত একটানা আর্ত একটা শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল হেমন্তর গলার ভেতর থেকে, 'সে কী বেঁচে আছে ?'

'আজ্ঞে না।' ঘাড় ভেঙে ঝুলে পড়ল গুপীর।

নীনীর মৃত্যুর খবরটা এত অভাবিত যে একেবারে বোবা হয়ে গেলেন হেমন্ত। উদ্‌ভ্রান্ত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপরেই তাঁর হৃদ্‌পিণ্ড বিদীর্ণ করে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার উঠে এল, 'নীনী নেই ! কী

বলছিস গুপী! কী বলছিস তুই!'

গুপী নিশ্চুপ। ঘাড়টা সেই যে তার ভেঙে গিয়েছিল আর সোজা হল না।

ভাঙা বিকৃত স্বরে হেমন্ত আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে, কে ছুরি মেরেছে নীনীকে? কোথায়—কোথায় পুলিশ?' বলেই অন্ধের মত শূন্যে দু-হাত বাড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মাত্র দু পা এগিয়েছেন তারপরেই বুঝি তাঁর চারপাশে সমস্ত সৌরলোক দুলতে শুরু করেছে। টলতে টলতে চেতনা-শূন্যের মত তিনি পড়ে গেলেন।

নিষ্ক্রিয় নিরুপায় দর্শকের মত এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। নীনীর মৃত্যুর আকস্মিকতা আমাকেও অভিভূত আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। হেমন্তকে পড়ে যেতে দেখে স্নায়ুতে ধাক্কা লাগল যেন। ঝড়ের বেগে তাঁর কাছে গিয়ে গুপীকে বললাম, 'ধর গুপীদা।'

দু-জনে ধরাধরি করে হেমন্তকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। নিদারুণ শোকের আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে তাকালেন। আমার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অপ্রকৃতিস্থের মত বলতে লাগলেন, 'এ কি হল শুভেন্দু, ছ-বছর পর এই দেখবার জন্যেই কি আমি জেল থেকে বেরুলাম। এ কী হ'ল!' বলেই উঠে বসলেন, 'কোথায় পুলিশ, চল সেখানে। আমি সব জানতে চাই।'

ব্যস্তভাবে বললাম, 'এ অবস্থায় আপনার যেতে হবে না। আপনি শুয়ে থাকুন, আমি পুলিশকে ডেকে নিয়ে আসছি।' গুপীকে বললাম, 'তুমি এখন যেও না, এখানে থাক।' বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম।

নতুন বাড়িতে এসে দেখি দোতলার লাউঞ্জে একজন পুলিশ অফিসার বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন মিসেস মিত্র, জয়ন্ত আর সুরপতি।

সরাসরি পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'নীনীদেবীর সম্বন্ধে একটা খুব খারাপ শুনলাম, ব্যাপারটা কি বলুন তো। মানে—' এই পর্যন্ত বলেই থমকে গেলাম। মৃত্যুর কথাটা কিছুতেই মুখে আনতে পারলাম না।

অফিসার বললেন, 'আপনি কে?'

ঝোঁকের মাথায় কোন দিক বিবেচনা না করে নীনীর মৃত্যুপ্রসঙ্গ তুলে-ছিলাম। খেয়াল করিনি, এ-ব্যাপারে এ-ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা আমার পক্ষে সমীচীন নয়। খানিকটা থতিয়ে নিয়ে বললাম, 'আজ্ঞে আমি কেউ না। এ-বাড়িতে চাকরি করি মাত্র। তবে আপাতত নীনীদেবীর বাবার কাছ থেকে আসছি।'

'নীনীদেবীর বাবা!' পুলিশ অফিসার উদগ্রীব হলেন, 'তিনি এখানে আছেন নাকি?'

'আজ্ঞে না। এ-বাড়িতে নেই, পাশে ওঁদের একখানা বাড়ি আছে, সেখানেই আছেন। হঠাৎ কোন সূত্রে উনি খবর পেয়েছেন নীনীদেবী মারা গেছেন। খবরটা পেয়েই 'শকে' অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরতেই আসতে চেয়েছিলেন। শারীরিক এবং মানসিক এই অবস্থায় আমি আসতে দিই নি। অনুগ্রহ করে যদি ও-বাড়িতে একটু আসেন—'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়—' পুলিশ অফিসার আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তীক্ষ্ম বিরক্ত দৃষ্টিতে মিসেস মিত্রের দিকে তাকালেন, 'কি আশ্চর্য, আপনি যে বললেন নীনীদেবীর বাবা মানে আপনার স্বামী বাড়ি নেই!'

কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন মিসেস মিত্র। কাঁপা গলায় বললেন, 'দেখুন আমি ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলেছি। আমার স্বামী একজন রেভলিউশনারি, ছ বছর পর দিন কয়েক হ'ল উনি জেল থেকে রিলিজড্ হয়েছেন। শরীর খুব খারাপ। এ অবস্থায় একটা সাঙ্ঘাতিক খবর শুনলে সহ্য করতে পারবেন না। ভেবেছিলাম, আস্তে আস্তে ওঁকে সব বলব।'

অফিসার আর কিছু বললেন না।

মিসেস মিত্রের কৈফিয়তের সবটুকু মেনে নিতে আমার মন সায় দিল না। কেন যেন মনে হ'ল, হেমন্ত সম্পর্কে লুকোচুরির অজুহাতটা শুধু তাঁর স্বাস্থ্যের কারণে নয়। যাই হোক, পুলিশ অফিসারদের নিয়ে একসময় পুরনো বাড়িতে চলে এলাম। মিসেস মিত্র, সুরপতি এবং জয়ন্তও সঙ্গে এল।

হেমন্ত তাঁর ঘরে উন্মাদের মত পায়চারি করছিলেন। চোখদু'টো টকটকে লাল। আমাদের দেখে দরজার দিকে ছুটে এলেন। ব্যগ্র রুদ্ধ ভাঙা গলায় পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরা বলছিল নীনীকে কে ছুরি মেরেছে, সে মরে গেছে। সত্যি অফিসার?' স্বরটা ঠিক ফুটল না, আধফোটা একটা গোঙানির মত শোনাল। লক্ষ্য করলাম হেমন্তর হাতের আঙুলগুলো আর ঠোঁটদু'টো থরথর করছে। গলা এবং কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে।

'আপনি নিশ্চয়ই নীনীদেবীর বাবা।' অফিসার জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ। নীনীকে কেন ওরা মারল? কেন—কেন? কী করেছিল সে?' দু-হাত দিয়ে পুলিশ অফিসারের হাত আঁকড়ে ধরলেন হেমন্ত।

'আপনি এমন করে ভেঙে পড়বেন না মিস্টার মিত্র।' পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে হাত ধরে হেমন্তকে বিছানায় বসালেন। নিজেও বসলেন। মিসেস মিত্র, জয়ন্ত আর সুরপতি ঘরে এলেন না, বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

হেমন্ত আবার বলে উঠলেন, 'চুপ করে রইলেন কেন, বলুন—'

অফিসার কিছুক্ষণ ইতস্তত করে শুরু করলেন, 'দেখুন, আমাদের

চাকরিটাই এমন যাতে প্রায়ই অপ্রিয় কাজ করতে হয়, অপ্রিয় কথা বলতে হয়। কী করব, কর্তব্য! নইলে এমন একটা খারাপ খবর মুখে করে এই সকালবেলা—'

হেমন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন, 'ও-সব শুনতে চাই না, নীনীর কথা বলুন—'

'হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি।' অফিসার এর পর যা বললেন, সংক্ষেপে এই-রকম : কাল ভোরে দু-জন কনস্টেবল গঙ্গার ধারে প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে রক্তাক্ত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় একটি তরুণীকে পড়ে থাকতে দেখে। তৎক্ষণাৎ তাকে তুলে প্রথমে থানায়, পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে কোন লাভ হয় নি। অনেক আগে রাতের মাঝামাঝি কোন এক সময় সে মারা গেছে। মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়, এ হত্যা। ইনডিসক্রিমিনেট মার্ডার। ধারাল কোন অস্ত্র, সম্ভবত ছোরা দিয়ে নৃশংসভাবে আঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। অনুমান করা হয়েছে, মৃত্যুর সময় তরুণীটি মাতাল অবস্থায় ছিল। অনুমান সত্য কি-না, কালকের মধ্যেই বোঝা যাবে। কেন না মৃতদেহ পোস্টমর্টেম পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। শবব্যবচ্ছেদের আগেই তার বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজনরা শেষবারের মত যাতে তাকে দেখতে পান সেজন্য দেহটি পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়েছে।

তরুণীটি অজ্ঞাত-পরিচয় নয়। বরং নিদারুণ পরিচিত। পুলিশের দৃষ্টি অনেক দিন থেকেই তার ওপর ছিল। জুয়ার আড্ডা, বার, হোটেল এবং এই কলকাতা শহরের এমন সব নিষিদ্ধ এলাকায় তার গতিবিধি ছিল যা রীতিমত বিপজ্জনক এবং একটি সদ্বংশজাত কুমারী মেয়ের পক্ষে অমর্যাদাকর। নীনীর মা অর্থাৎ মিসেস মিত্রকে এ-সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু সুফল কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। হ'লে নীনীর জীবনে এমন মর্মান্তিক যবনিকা নেমে আসত কি-না সন্দেহ। এমন প্রমাণ আছে, প্রায়ই গভীর রাত্রে পুরুষ বন্ধুদের নিয়ে মত্ত অবস্থায় গঙ্গার ধারে যেত নীনী। শহরের ঐ প্রান্তটা এমনিতেই নির্জন। সেই নির্জনতায় কোনদিন হল্লা করে, নেশাটা বেশি হয়ে গেলে কোনদিন বা চুপচাপ পড়ে থেকে অনেকক্ষণ কাটিয়ে তারা ফিরে যেত।

প্রত্যক্ষদর্শী একটি পুলিশের বিবরণ থেকে জানা যায়, কাল সন্ধ্যের খানিকটা পর নীনী এবং একটি ছেলেকে প্রিন্সেপ ঘাটের দিকে যেতে দেখেছে সে। শহরের ঐ জনহীন এলাকায় নীনীর যাতায়াতটা প্রায় দৈনন্দিন। কাজেই তার মনে কোন সন্দেহই হয় নি।

নীনীকে যে হত্যা করা হয়েছে সে সম্বন্ধে পুলিশ নিঃসংশয়। তার প্রমাণও আছে। মৃতদেহের পাশে ইংরেজিতে টাইপ-করা নাম-স্বাক্ষরহীন

একখানা কাগজ পাওয়া যায়। তাতে লেখা আছে, 'অনেক নাচ নাচিয়েছ কিন্তু শেষ ধরাটা কখনও দাও নি। আশায় আশায় থেকে শেষ পর্যন্ত বুঝেছি, কোনদিনই তুমি চিরকালের জন্য ধরা দেবে না। দয়া করে তুমি নিজে যেটুকু দেবে সেটুকুই শুধু পাব। কিন্তু সেই ছিটেফোঁটাটুকুতে আমার প্রাণ ভরে নি। শুধু বুকের ভেতরটা অতৃপ্ত পশুর মত অস্থির হয়ে উঠেছিল। যখন বুঝলাম তুমি শুধু নাকে দড়ি পরিয়ে আমাকে খেলিয়ে যাবে, আমার হতাশা তখন শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছল। আমি তোমাকে পাব না। স্থির করলাম আর কাউকে পেতেও দেব না। বুকের সেই অশান্ত উত্তেজিত পশুটা আমার কানে কানে বলল, মৃত্যুই তোমার একমাত্র পুরস্কার। সেই পুরস্কারই দিলাম।'

বক্তব্য শেষ করে পুলিশ অফিসার চুপ করলেন। আর চকিতের জন্য সুরেযের মুখটা আমার মনে পড়ে গেল। দিন কয়েক আগে সে শাসিয়ে গিয়েছিল যেমন করে হোক নীনীকে সে ছিনিয়ে নেবে। ব্যর্থ হয়েই কি নীনীর জীবনে এমন একটা মর্মান্তিক ছেদ টানল সে!

এদিকে হেমন্তর বিশাল কাঁধটা ভেঙে ঝুলে পড়েছে। হাত-পা এবং অন্যান্য প্রত্যঙ্গগুলো কেমন যেন স্খলিত, শরীরের সঙ্গে যেন আটকানো নয়। দু-হাতে মুখ ঢেকে অবোধ শিশুর মত হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলেন হেমন্ত। চিরদিনের ভয়শূন্য সংগ্রামী মানুষটার প্রাণে এতখানি কোমলতা যে ছিল, তা কে জানত!

চারপাশ স্তব্ধ। প্রতিটি মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড একেবারে অচল হয়ে গেছে যেন। কারো শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। হেমন্তর উচ্ছ্বসিত কান্নার একটানা আওয়াজটা সেই আড়ষ্ট স্তব্ধতাকে ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর কান্নাটা থিতিয়ে এলে পুলিশ অফিসার ডাকলেন, 'মিস্টার মিত্র—'

ঝাপসা গলায় হেমন্ত সাড়া দিলেন, 'বলুন।'

'আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়? মানে নীনীদেবীর কি এমন কেউ শত্রু ছিল—'

হঠাৎ মুখ থেকে হাত সরিয়ে ক্ষিপ্তের মত উঠে দাঁড়ালেন হেমন্ত। সজল চোখ থেকে তাঁর আগুন ছুটল। উন্মত্তের মত মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হয়। কে ওকে খুন করেছে আমি জানি।'

হেমন্তর এই রূপান্তরে সবাই চকিত হয়ে উঠল। পুলিশ অফিসার সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

দরজার বাইরে মিসেস মিত্রের দিকে আঙুল বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন হেমন্ত, 'ঐ—ঐ মেয়েমানুষটা—'

পুলিশ অফিসার কি অনুমান করলেন, তিনিই জানেন। মাথাটা তাঁর নুয়ে পড়ল শুধু।

আর আমার মনে হ'ল হেমন্ত যে অর্থে স্ত্রীকে অভিযুক্ত করলেন তার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে। মিসেস মিত্রই যে নীনীকে একটা উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের মাঝখানে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন এবং তারই চরম পরিণতি যে এমন নিষ্ঠুর নিদারুণ রূপে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু সমস্তটুকু দায়িত্ব মিসেস মিত্রের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বোধ হয় ঠিক নয়। নীনীর স্বভাবের মধ্যেই তার মৃত্যুবাণ লুকনো ছিল।

কিংবা মিসেস মিত্র, নীনী আর অজানা হত্যাকারী—কেউ হয়ত এই ঘটনার জন্য দায়ী নয়। এই ভয়াবহ সময় আর যুদ্ধোত্তর কলকাতাই নীনীকে হত্যা করেছে।

চোদ্দ

নীনীর মৃত্যুর পর কয়েকটা দিন কেটে গেল। পৃথিবী নামে এই গ্রহটি এক মুহূর্তের জন্যও থমকে দাঁড়ায় নি, কোথাও বিন্দুমাত্র ছন্দোপতন ঘটে নি তার। একটা অস্বাভাবিক ভয়াবহ মৃত্যু তার জীবনযাত্রায় এতটুকু ছায়াও ফেলতে পারে নি। আপন মেরুদণ্ডের চারপাশে অবিরত পাক খেতে খেতে নিয়তকালের অভ্রান্ত নিয়মে কক্ষপথ ধরে সে ছুটে চলেছে।

সে যাই হোক, নীনীর হত্যার ব্যাপারটা এখনও রহস্যময়ই থেকে গেছে। হত্যার কারণটা অবশ্য আগেই জানা গেছে ঃ ব্যর্থ প্রণয়। কিন্তু হত্যাকারী কে, সেটুকু এখনও অজ্ঞাত। পুলিশের দিক থেকে ত্রুটি ঘটছে না। নীনী সম্পর্কে নানা প্রশ্ন নিয়ে বহুবার তারা এ বাড়িতে হানা দিয়েছে। নীনীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শ বিন্দুমাত্রও ছিল এমন প্রতিটি সন্দেহভাজন লোককে থানায় নিয়ে তুলেছে। সে কি এক আধজন? নীনীর অসংখ্য অনুরাগী। মুখার্জি থেকে শুরু করে তাকে ঘিরে কত বন্ধু আর কত ভক্তের ভিড় যে ছিল, এতদিনে তা জানা যাচ্ছে। আমি আর ক'জনকেই বা দেখেছি!

একটি তথ্য পুলিশ আবিষ্কার করেছে, নীনীর জন্য তার প্রতিটি স্তাবকের প্রাণে উন্মাদ কামনা ছিল। সেই কামনাটা কারো সঙ্গোপন, কারো বা অতিরিক্ত সোচ্চার। তাদের অনেকেই স্বীকার করেছে, নীনীকে পাবার জন্য তারা লোভী হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

নীনীকে একান্ত করে কেউ পায় নি। আকাশের তারার মতই সে সুদূর এবং দুর্লভ থেকে গেছে। না পাওয়ার হতাশা আর ব্যর্থতা যে তার চারপাশের সেই লোভী পতঙ্গগুলোকে অস্থির উন্মত্ত করে তুলবে, এর ভেতর

সংশয়ের অবকাশ নেই। তাই বলে কাউকে না পেলেই যে খুন করতে হবে এমন নজির খুব বেশি নেই। থাকলে পৃথিবী বোধহয় রূপসীশূন্য হয়ে যেত। আর নীনীকে হত্যার দায়ে তার সমস্ত অনুরাগীকেই ফাঁসিতে ঝোলাতে হয়। যদিও নীনীর মৃত্যুর ব্যাপারে হতাশাই একমাত্র কারণ তবু কারো বিরুদ্ধেই এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি যা দিয়ে তাকে অভিযুক্ত করা চলতে পারে। যে সুরয একদিন হেমন্তকে শাসিয়ে গিয়েছিল, নীনীর মৃত্যুর দিন সারারাত মত্ত অবস্থায় একটা হোটেলে পড়ে ছিল সে। এত নেশা করেছিল সুরয যে উঠে দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। তার সেই অবস্থায় খুন করাটা অকল্পনীয় ব্যাপার। অতএব হত্যাকারী এখনও অনাবিষ্কৃতই থেকে গেছে। অবশ্য পুলিশের কর্তব্যে কোনরকম অবহেলা নেই। সমস্ত শহর তারা তোলপাড় করে ফেলছে।

নীনীর মৃত্যুর পর হেমন্ত একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ঘরের কোণে সব সময় নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধই করে দিয়েছেন। ঘুমোনও না, দিবারাত্রি জানালার পাশে বসে কি ভাবেন তিনিই জানেন। বোঝা যায়, তাঁর চারপাশ ঘিরে অনন্ত বিষাদ ঘনিয়ে আছে। বেঁচে থাকার সমস্ত সার্থকতাই ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছেন বুঝি। আকৈশোর কত পীড়ন কত অত্যাচারই তো সহ্য করেছেন। কিন্তু একটি অভাবনীয় মৃত্যু তাঁকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে।

মানুষটির জন্য অপার দুঃখে আমার সমস্ত অস্তিত্ব ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে। সারা জীবন শুধু কষ্টই সয়েছেন। তার পরিবর্তে আয়ুর শেষ প্রান্তে পেঁছে কী পেলেন তিনি!

এদিকে আমার কাজ যথারীতি করেই যাচ্ছি। তাড়া দিয়ে দিয়ে হেমন্তকে স্নান করতে পাঠাই, খেতে বসাই। কোনদিন খান, কোনদিন বা খাবার নাড়াচাড়া করেই উঠে পড়েন। যখন ইচ্ছা হয় আমাকে দেখে স্তব্ধতা ভেঙে বলেন, 'এ কি হ'ল শুভেন্দু! ছ বছর আগে যখন জেলে যাই দেশ তো এমন ছিল না। এ কোথায় এসে পড়লাম!'

কোনদিন বা বলেন, 'আর বাঁচবার সাধ নেই শুভেন্দু। কেন বাঁচব? কী নিয়ে বাঁচব?'

আমি বলি, 'ওসব কথা থাক। কতদিন ধরে ঘরের বার হ'ন না। চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।'

'বেড়াতে যাব!' কিছুক্ষণ কি ভেবে হেমন্ত বলেন, 'না থাক, কোথায়ই বা যাব!'

সবসময় ভাবেন হেমন্ত। নীনীর মৃত্যু চোরাবাণের মত তাঁর সমস্ত অস্তিত্বের ভিতে ক্ষয় ধরিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্যও যদি তাঁকে ঘরের

বাইরে টেনে নিতে পারতাম মনটা বিক্ষিপ্ত বহির্মুখী হত।

হেমন্তকে নিয়ে আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। কি করব, কিছুই যখন ঠিক করে উঠতে পারছি না ঠিক সেই সময় হাসপাতাল থেকে কনক ফিরে এল। আর কনক ফিরতেই নতুন বাড়ি থেকে গুপীও এসে পড়ল।

কনক ফিরে আসতে আমি বেঁচে গেলাম যেন। বললাম, 'আপনি এসেছেন, এবার সব দায়িত্ব বুঝে নিন। একটু একটু করে প্রতিদিন একটা মানুষ আত্মহত্যা করে যাচ্ছেন, চোখের ওপর এ দেখা যায় না।'

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কনক। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাইছেন ? তা কি আর পাবেন শুভেন্দু-বাবু ? তার চাইতে এক কাজ করি আসুন, দু-জনেই ওঁর দায়িত্বটা ভাগাভাগি করে নিই। একটা মানুষ সমস্ত জীবন সামনে একটা লক্ষ্য রেখে সংগ্রাম করে গেলেন। সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার আগেই তাঁর সংসার আর এই নিদারুণ সময় তাঁকে পঙ্গু করে দিল। আসুন না আবার তাঁকে তাঁর ব্রতে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। যদি তা পারি একদিন দেশের মানুষের আশীর্বাদ নিশ্চয় আমাদের মাথায় এসে পড়বে।'

অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। নীরবে হেমন্তর যৌথ দায়িত্ব স্বীকার করে নিলাম।

শোকের আচ্ছন্নতা থেকে হেমন্তকে বাঁচাতে হলে তাঁকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসতে হবে। তাঁর মন নানা দিকে বিক্ষিপ্ত করে দিতে হবে। আমি তা-ই চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি। কনক কিন্তু পারল।

প্রথম প্রথম হেমন্ত অবশ্য বেরুতে চাইলেন না। কনক দিনরাত বোঝাতে লাগল, 'না বেরিয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকলে ভেবে ভেবেই আপনি মরে যাবেন।'

হেমন্ত উত্তর দেন না। বিহ্বলের মত তাকিয়ে থাকেন শুধু।

কনক আবার বলল, 'আপনাকে আমি কি বোঝাব মেসোমশাই, সে ক্ষমতা কি আমার আছে! চিরকাল তো আপনার কাছে বসেই কি ভাবে জীবনের সমস্যাগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় তা শুনেছি। আপনিই তো বলেছিলেন শোক-দুঃখ যা-ই আসুক, জীবনের ধ্রুব থেকে কখনও বিচলিত হতে নেই। ধৈর্য, সাহস—'

কিন্তু অস্থিরভাবে হেমন্ত বলে উঠেছেন, 'তুই তো আমাকে ভাবনার হাত থেকে বাঁচাতে চাস। কিন্তু তা কি সম্ভব! যখন ভাবি নীনীর মৃত্যুর জন্যে আমার খানিকটা দায়িত্ব রয়েছে তখন আর নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না। এই ছ'টা বছর যদি জেলে না থাকতাম, সংসারটা এমন করে বেপরোয়া স্রোতে ভেসে যেতে পারত না। নীনীটাকেও বোধহয় এভাবে মরতে হ'ত না। আর

সবই করেছি, নিজের সংসারটার ওপর আমার যেকর্তব্য তাতেই শুধু ফাঁকি থেকে গেছে। এভাবে—'

কথাগুলোর মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। কাজেই কিছুক্ষণ থতিয়ে থেকেছে কনক। তারপর একটু ভেবে বলেছে, 'আপনার কথাটা পুরোপুরি মানতে পারলাম না মেসোমশায়। কেউ পাহারা দিয়ে রাখল না বলেই আমাকে নষ্ট হয়ে যেতে হবে, এটা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে এ-কালের হাওয়ার মধ্যেই এমন ধ্বংসের বীজ উড়ছে যা জীবনের সব কিছু সততা আর পবিত্রতাকে নষ্ট করে দেয়। তাই বলে সব কিছু খুইয়ে বসতে হবে! না না মেসোমশায়, আপনি জেলের বাইরে থাকলেও নীনীকে বাঁচাতে পারতেন কি-না সন্দেহ আছে।'

একরকম জোর করেই এরপর হেমন্তকে ঘরের বার করে আনল কনক। প্রথম প্রথম তাকে নিয়ে কাছাকাছি হাজরা পার্কে যেত। সারাটা বিকেল এবং সন্ধ্যার পর খানিকটা সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরত। প্রথমে কাছে, তারপর আরেকটু দূরে লেকের দিকে। কোন কোন দিন গড়ের মাঠে।

দায়িত্বটা যদিও কনক এবং আমার যৌথ ব্যাপার তবু কনক একাই হেমন্তকে মায়ের মত ঘিরে রইল। যদিও কনকই দিবারাত্রি সর্বক্ষণের সহচরী তবু মিসেস মিত্রের কাছে আমার চাকরিটা বজায় রেখে যেটুকু সময় পাই, হেমন্তর কাছে গিয়ে বসি।

এরই মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটল। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে গান্ধীজি কলকাতায় এসেছিলেন। মাঝখানে আসাম সফর করে জানুয়ারির মাঝামাঝি আবার তিনি সোদপুরে ফিরে এলেন এবং যথারীতি প্রার্থনা-সভা করে যেতে লাগলেন।

হেমন্ত এবং আমাকে নিয়ে একদিন সোদপুর গেল কনক। লক্ষ মানুষের ভিড়ে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে আমরা প্রার্থনা-সভায় যোগ দিলাম। প্রার্থনার পর গান্ধীজি ভাষণ দিলেন। ভাষণের বিষয়টা চমকপ্রদভাবে হেমন্তর মানসিক অবস্থার সঙ্গে মিলে গেল। গীতা এবং উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে গান্ধীজি যা বললেন, তা এইরকম।

'ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, একটা জাতির অগ্নিপরীক্ষার জন্য রাষ্ট্র এবং সমাজে বার বার অরাজকতা নেমে আসে। ব্যক্তিজীবনও সেই অরাজকতার সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে নিস্তার পায় না। এই যুগসন্ধিক্ষণগুলোতে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া এবং পরম নিষ্ঠায় জীবনের অভ্রান্ত সত্যকে আঁকড়ে থাকা।'

বিশাল জনতা, প্রার্থনা সঙ্গীত, গান্ধীজির ভাষণ—লক্ষ্য করলাম সব একাকার হয়ে হেমন্তর ওপর দূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। নীনীর মৃত্যুতে

বিভ্রান্ত মানুষটি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।

গান্ধীজি যে ক'দিন বাঙলাদেশে ছিলেন প্রতিদিনই সোদপুরের সেই প্রার্থনা সভায় হেমন্তকে নিয়ে যেতে লাগল কনক। আমি অবশ্য চাকরির জন্য রোজ তাদের সঙ্গী হতে পারি না।

গান্ধীজি চলে যাবার পর আবার আগের মতই কলকাতার মধ্যে হেমন্তকে নিয়ে বেড়াতে শুরু করল কনক।

ধীরে ধীরে শোকের সেই আচ্ছন্নতা কেটে যাচ্ছে হেমন্তর। কনকের নিয়ত সান্নিধ্য, সেবা আর ঘরের বাইরের বিস্তৃত পটভূমি আবার তাঁকে স্বাভাবিকতার মধ্যে ফিরিয়ে আনছে।

একদিন হেমন্তর ঘরে বসেছিলাম। কনকও ছিল। হঠাৎ আশ্চর্য এক কথা বললেন হেমন্ত, 'খবরের কাগজ আছে? দেশের পরিস্থিতি কিছুই জানি না—'

নীনীর মৃত্যুর পর থেকে খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন হেমন্ত। সানন্দ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কাগজের খোঁজে ছুটলাম।

পরের দিন আরো অবাক করে দিলেন হেমন্ত। দুপুরবেলা কনককে বাদ দিয়ে একা একাই বেরিয়ে পড়লেন। যাবার আগে বললেন, 'আমার সঙ্গে যারা জেল থেকে বেরিয়েছিল তারা এখন কী করছে কিছুই জানি না। যাই, তাদের খবর নিয়ে আসি। খবরের কাগজে তো সব কথা থাকে না। দেখি দেশ কোন দিকে ছুটছে, সেটা বুঝতে পারি কি না।

এর পর থেকে প্রতিদিনই একা একা বেরুতে লাগলেন হেমন্ত। এতদিনে কনকের ধৈর্য সেবা এবং সহিষ্ণুতা সার্থক হল।

পনের

নীনীর মৃত্যু মিসেস মিত্রের ওপরও দীর্ঘ ছায়া টেনে দিয়েছে। লক্ষ্য করেছি, ইদানীং বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ করে দিয়েছেন। হেমন্তর মতই নিজের ঘরে নির্বাসন বেছে নিয়েছেন তিনি। শ্রীবাস্তবের দোকান থেকে মাঝে মাঝে হুইস্কি এনে দিই। ঘরে বসেই ড্রিঙ্ক করেন।

নীনীর মৃত্যু হেমন্তকে যেদিক থেকে বিচলিত করেছিল তার বিপরীত দিক থেকে মিসেস মিত্রকে বিভ্রান্ত করেছে। প্রায়ই তিনি বলেন, 'এটা কি রকম হ'ল শুভেন্দু? মেয়েরা ফ্রীলি মেলামেশা করলেই যদি লোকে ধরে নেয়

ইণ্টিম্যাসি হয়ে গেল তা হ'লে তো আগের কালের মত পর্দা প্রথা চালু করতে হয়। তার ওপর কেউ যদি ইণ্টিম্যাসিতেই সন্তুষ্ট না থেকে সব কিছু পাবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়, আর না পেলে মার্ডার করে বসে তবে তো ভয়ানক বিপদ। ভাবছি, কারো সঙ্গেই আর মিশব না।'

নীনীর মত মিসেস মিত্রেরও অগণিত স্তাবক এবং ভক্ত রয়েছে। লক্ষ্য করেছি, ইদানীং তিনি তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। হয়ত ভয়ে। নীনীর ভয়াবহ পরিণাম তাঁকে শঙ্কিত করে তুলেছে।

মিসেস মিত্রের মানসিক অবস্থা যখন এই পর্যায়ে সেইসময় একটা অঘটন ঘটল। একদিন সকালে নতুন বাড়িতে গিয়ে দেখি, জয়ন্তর বিয়ের ব্যাপার নিয়ে মা এবং ছেলেতে তুমুল গোলমাল বেধেছে।

শালীনতা, ভব্যতা—সমস্ত কিছু ভুলে মিসেস মিত্র চিৎকার করছেন, 'না না, এ বিয়ে কিছুতেই হবে না।'

জয়ন্ত বলল, 'কেন দীপালিরা গরীব বলে ?'

আমি চমকে উঠলাম। দীপালি অর্থাৎ সিঁথির সেই মেয়েটা !

মিসেস মিত্র বললেন, 'এ্যাগজাক্টলি সো। ওখানে বিয়ে করলে কী প্রসপেক্ট আছে ! তার চাইতে সচদেবের বোন আছে, মিহির বোসের মেয়ে আছে—তাদের কাউকে বিয়ে কর। তোমার বিজনেসের দিক থেকে সে বিয়ে প্রফিটেবল্—'

বিয়ের ব্যাপারে মিসেস মিত্রের মনোভাবের মধ্যে কোনরকম অস্পষ্টতা নেই। তিনি চান পুত্রবধূ হয়ে যে আসবে, সৌন্দর্য শিক্ষা আভিজাত্যের সঙ্গে তাঁদের কন্ট্রাক্টরি ব্যবসার ক্রমোন্নতির চাবিকাঠিটিও হাতে করে আনবে। জয়ন্তর মনের কথা কিন্তু উল্টো। সে বলল, 'দীপালিকে নিয়ে কাল বাবার কাছে গিয়েছিলাম। বাবা আমাদের আশীর্বাদ করেছেন। তুমি আর অমত করো না মা।'

কাল কখন ও-বাড়িতে গিয়েছিল জয়ন্ত, জানি না। খুব সম্ভব আমি যখন ছিলাম না তখন।

এদিকে মিসেস মিত্রের গ্রীবা শক্ত হয়ে উঠেছে। মেরুদণ্ড নিস্পন্দ। শ্বাস-ক্রিয়া থমকে গেছে। কিন্তু চোখের দপদপানি বাড়ছেই। হঠাৎ তীব্রস্বরে তিনি ভেংচে উঠলেন, 'ও-ও, আশীর্বাদ তা হ'লে পাওয়া গেছে ! তবে আর আমার কাছে কেন ? যাও, এবার থেকে ও-বাড়িতেই থাক গিয়ে।'

'ও-বাড়িতে থাকার যোগ্যতা কী আমার আছে ? ছ-বছর যে পাঁকের মধ্যে ডুবে আছি তা থেকে যদি কোনদিন মুক্তি পাই তবেই ওখানে গিয়ে থাকার কথা ওঠে। সে যাক, একবার দীপালির কথাটা ভেবে দেখ—'

'ভাবার কিছু নেই। এ বিয়ে হবে না, হবে না, হবে না।'

দীপালির সঙ্গে জয়ন্তর বিয়েতে আগেই অনিচ্ছা ছিল মিসেস মিত্রের। মনে হ'ল, হেমন্ত আশীর্বাদ করেছেন বলেই তাঁর অনিচ্ছাটা আজ এত বেশি তীব্র। হেমন্ত তাঁকে অপমান করেছেন, বার বার ফিরিয়ে দিয়েছেন, সেই ক্ষোভই কি জয়ন্তর বিয়ের ব্যাপারে ফেটে পড়েছেন !

এদিকে অবাধ্য হয়ে উঠেছে জয়ন্ত। দু-চোখে পৃথিবীর সমস্ত দুর্বিনয় নিয়ে মায়ের দিকে তাকাল সে। বলল, 'নিশ্চয়ই এ বিয়ে হবে।'

'যদি হয় এর পরিণাম ভাল হবে না।' মিসেস মিত্রের স্বর উত্তেজনায় কাঁপছে 'মনে রেখ, বাড়ি-বিজনেস সব আমার নামে।'

কিছুক্ষণ থতিয়ে থেকে জয়ন্ত বলল, 'ভয় দেখাচ্ছ ? আমাকে কিছুই দেবে না ?' একটু থেমে আবার বলল, 'বেশ দিও না। তোমার বাড়িতে যদি থাকতে না দাও, আর কোথাও চলে যাব।'

মিসেস মিত্র চুপ। পরক্ষণেই জয়ন্ত যা বলল কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বিস্ময়কর। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সে বলছে, 'এখানে দীপালিকে এনে তোলা ঠিকও হবে না। একটা কথা ভেবে দেখ মা, তোমার সঙ্গে ছুটে আমরা কোথায় গিয়ে ঠেকেছি। দিদিটা তো খুনই হয়ে গেল। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ. কী ছিলে আর কী হয়েছ ! আমার খুব ভয় করছে, দিদির মত কোন ভয়ঙ্কর পরিণতি না আমাদের জীবনে আসে—'

অবাক বিস্ময়ে স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে গেল। এ-সব কী বলছে জয়ন্ত ? যতদূর দেখেছি মিসেস মিত্রের বিশ্বস্ত অনুগামী সে। ভোগের দুরন্ত প্রবাহে নিজেকেও ছুঁড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমার চোখের দেখাটার মধ্যে কি কোথাও কোন ভুল ছিল ? আমি যেটুকু তাকে জানি তার বাইরেও সে অনেকটাই অজানা। তার চরিত্রের সেই অদেখা দুর্গম অংশে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের কি কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল ? পরমুহূর্তেই মনে হ'ল উচ্ছৃঙ্খল ভোগী জীবন সম্বন্ধে জয়ন্তর এই বিরাগ কি তার নিজস্ব স্বাভাবিক উপলব্ধি থেকে জাত, না নীনীর জীবনের মর্মান্তিক পরিণতিই তার কারণ ?

জয়ন্ত আবার বলে উঠল, 'এখনও ফেরার সময় আছে মা। ইচ্ছে করলে আমাদের সংসারটাকে তুমিই সুখের করতে পারতে। ভেবে দেখ, বাড়িটার অবস্থা কী হয়েছে ! স্বাভাবিকভাবে এখানে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এতকাল একটা ঘোরের মধ্যে অন্ধের মত তোমার পিছু-পিছু চলেছি। কিন্তু দিদি মরে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, এর মধ্যে সুখ নেই, শান্তি এ-ভাবে আসে না।'

জয়ন্তর কথাগুলোর মাঝখান থেকে একটি বাক্য তুলে নিয়ে মিসেস মিত্র উন্মত্তের মত বলে উঠলেন, 'এখানে নিঃশ্বাস নিতে তোমার কষ্ট হচ্ছে ! অল রাইট, যেখানে প্রাণভরে বাঁচতে পারবে সেখানেই চলে যাও।'

এর দিন সাতেক পর দীপালীকে বিয়ে করে নতুন বাড়ি ছেড়ে চলে

গেল জয়ন্ত।

স্বামী এবং ছেলে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেছে। মিসেস মিত্র একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। মদের মাত্রা বাড়িয়েও তাঁর ক্রুদ্ধ স্নায়ু সহজ হ'ল না। তখন তাঁর সমস্ত বিতৃষ্ণা আর রাগ গিয়ে পড়ল সুরপতির ওপর। তাঁর ভোগসর্বস্ব জীবনের প্রথম মন্ত্রগুরু সুরপতি। তাঁর সামনে গিয়ে মিসেস মিত্র বললেন, 'আমার স্বামী, ছেলে—সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এর জন্যে আপনি, আপনিই দায়ী!'

ভীত সুরপতি সন্ত্রস্ত সুরে বললেন, 'আমি!'

'হ্যাঁ, আপনিই। আমার শ্বশুরের আমলের কোম্পানির কাগজ ছিল, নিজে মাস্টারি করতাম, তাতেই সংসার চলে যাচ্ছিল। আপনিই লোভের ফাঁদ পেতে আমাকে এই জীবনে টেনে এনেছেন, আমার সর্বনাশ করেছেন। বেরিয়ে যান—এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যান।'

'সুষু, কী বলছ তুমি! তোমার মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল! আমার অবস্থাটা একবার বিবেচনা করে দেখ। এই বয়েসে—' শেষ চেষ্টা করলেন সুরপতি।

'আমি আপনার কোন কথা শুনতে চাই না। এ-বাড়ি থেকে আপনাকে যেতেই হবে।'

লাঞ্ছিত অপমানিত সুরপতি একটা কুকুরের মত শেষ পর্যন্ত আবার পুরনো বাড়িতে ফিরে এলেন। হেমন্ত এবং কনকের কাছে সদাচারের অলিখিত একটা অঙ্গীকার দিতে হ'ল তাঁকে। অবশ্য জানি রাতের অন্ধকার নামলেই চল্লিশ বছরের সেই তপস্যাটা নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়ে দেবে। তখন?

হায় সুরপতি!

ষোল

হেমন্ত মিত্র আবার তাঁর নিজের জগতে ফিরে গেছেন।

ক'দিন আগে স্ত্রী-ছেলেমেয়ের অধঃপতনে তাঁকে অস্থির উন্মত্ত হ'তে দেখেছি। নীনীর মৃত্যুতে তিনি হয়ে গিয়েছিলেন পঙ্গু, অথর্ব এবং নিঃশব্দ। সংশয় হয়েছিল নিজের ধ্রুব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেমন্ত বুঝি পেসিমিস্ট হয়ে যাবেন। যৌবনের শুরু থেকে অনিবার্য গতিতে যে স্থির লক্ষ্যের দিকে

ছুটছিলেন তাতে তাঁর সেই ধ্যানের জগতে আর ফেরা সম্ভব হবে না। কিন্তু হয়েছে। সমস্ত আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠেই প্রথমে তিনি সহকর্মীদের খোঁজ নিয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁদের তো বটেই, যাঁরা এখনও জেলখানার চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ এবং যাঁরা তাঁর আগেই বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁদেরও।

সহকর্মীদের খোঁজ নিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ হয় নি। দেশের বর্তমান অবস্থায় কী ধরনের স্রোত বইছে আর সেই স্রোতে কতখানি বেগ আর গভীরতা সবই নির্ণয় করে দেখছেন।

যুদ্ধের পর থেকে বিচিত্র অন্ধ বেগে সারা দেশ একটা অমোঘ পরিণতির দিকে ছুটে চলছে। সেই পরিণতির নাম স্বাধীনতা।

সমস্ত দেশের প্রাণ এখন টগবগ করে ফুটছে। নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈনিকদের মুক্তির জন্য কলকাতায় যে আন্দোলন হয়ে গেল তার ঢেউ পৌঁছেছে দেশের দূর দিগন্তে—মহারাষ্ট্রে, মাদ্রাজে, দিল্লীতে। তা ছাড়া বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহ ঘটে গেছে।

যুদ্ধের মাঝামাঝি পর্যায়ে বৃটেন এবং আমেরিকা, একটা সনদ রচনা করেছিল, নাম যার 'আটলাণ্টিক চার্টার'। তাতে সমস্ত দেশের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা রক্ষা করা হবে, এমন অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু আপাত মহৎ এই সনদের নেপথ্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্যই কাজ করেছে। যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার দিনে সামান্য একটু প্রতিশ্রুতির বদলে যত বেশি সংখ্যক দেশকে তাদের জনবল এবং সম্পদবল নিয়ে নিজেদের অনুকূলে রাখা যায়!

কিন্তু প্রতিশ্রুতির রঙিন খেলনাটা দেখিয়ে এবার শেষরক্ষা হ'ল না।

বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে ভারতবর্ষের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শের জন্য লণ্ডনে ডাকা হয়েছে। স্থির হয়েছে তেইশে মার্চ ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ এবং মিস্টার আলেকজাণ্ডারকে নিয়ে গঠিত একটি মিশন ভারতে আসবে। উদ্দেশ্য, সর্বদলীয় ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর।

এ তো গেল মোটা রেখায় সমস্ত দেশের মোটামুটি পরিস্থিতি। কিন্তু যে স্বাধীনতা আসন্ন তার পথ একেবারে নিরঙ্কুশ নয়। দেশের দ্বিতীয় প্রধান দল মুসলিম লীগ, যার উদ্ভব দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিতের ওপর, ঘৃণা এবং বিদ্বেষের রসে সে বেড়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবী স্বতন্ত্র সার্বভৌম পাকিস্তানের।

বহুকাল ধরে মুসলিম লীগ তার বিদ্বেষ আর বিচ্ছেদের মন্ত্র প্রচার করে আসছিল। কিন্তু মিশন আসার আগে সেই প্রচার ভয়াবহ একটা আকার নিতে লাগল। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ এবং রাজনৈতিক আকাশের ওপর একটা

কালো ছায়া ক্রমাগত ঘন হচ্ছে যেন।

যে অশুভ ইঙ্গিতটা দেশের পক্ষে সব চাইতে ভয়ানক তা এই রকম: দেশের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মুসলমান। এদের সবাই সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগের অনুগামী নয়। বরং জাতীয়তাবাদী। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একাংশের তখন দোদুল্যমান অবস্থা। একদিন সত্যিই যদি স্বাধীনতা এসে যায় এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয় তখন কোন পন্থা শ্রেয়? জাতি এবং ধর্মের নামে মুসলিম লীগ যে ডাক দিয়েছে তার আকর্ষণও তো কম নয়। প্রবল সেই আকর্ষণকে উপেক্ষা করার মত অমিত শক্তি সবার নেই।

সাম্প্রদায়িক শক্তিই শেষ পর্যন্ত যদি এই মানুষগুলিকে শিকার করে ফেলে তেমন দুর্ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বুঝি খুব বেশি আসবে না। অতএব দ্বিজাতি বিদ্বেষের মধ্যে যে সর্বনাশ রয়েছে তার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি সংহত করার সময় এসে পড়েছে।

গান্ধীজি-জওহরলাল-আজাদ থেকে শুরু করে কংগ্রেসের প্রতিটি অগ্রণী নেতা এবং কর্মী দ্বিজাতি তত্ত্বের বিভীষিকা সম্বন্ধে দেশের মানুষকে সচেতন করে যাচ্ছেন। হেমন্তও নীরব রইলেন না।

হেমন্ত আজকাল প্রায়ই কলকাতার বাইরে বাইরে থাকেন। বাঙলাদেশের সুদূর অভ্যন্তরে অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামগুলিতে আসন্ন স্বাধীনতা এবং দ্বিজাতি তত্ত্ব কী-রকম তরঙ্গ তুলেছে, তাঁর উদ্দেশ্য, সেগুলোর বেগ এবং তীব্রতা পরিমাপ করা। বার দুই তো পূর্ব বাঙলাতেই ঘুরে এলেন। একা অবশ্য যান না, দু-একজন সহকর্মী সঙ্গে থাকেন। বেশির ভাগ সময় কনকও সঙ্গী হয়।

বাইরে থেকে ফিরে এসেই রিপোর্ট তৈরি করতে বসে যান হেমন্ত। তখন আমার ডাক পড়ে। চিরদিনই হাতের লেখাটা আমার ভাল। তা ছাড়া ইংরাজি কিংবা বাঙলা লেখার হাতটা মন্দ না। জানি না, কেমন করে যেন আমার এই দিকটা হেমন্ত জেনে ফেলেছেন।

হেমন্ত যে সব তথ্য সংগ্রহ করে আনেন সেগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ করে লিখে ফেলি। এই সব রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঊর্ধ্বতন নেতাদের কাছে।

রিপোর্ট লিখতে লিখতে নেশা ধরে গেছে যেন। হেমন্ত যখন বাইরে চলে যান উন্মুখ প্রতীক্ষায় দিন গুনতে থাকি। কেন না তিনি ফিরলেই দেশের এক অঞ্চলের হৃদ্স্পন্দন অনুভব করতে পারব। এই ভাঙা বাড়িতে আমার চারপাশে হেমন্ত সমস্ত দেশকে টেনে আনতে শুরু করেছেন। আর দেশটা নানা দিগন্ত থেকে আমাকে হাতছানি দিতে শুরু করেছে। একেকবার মনে হয়, সেই আকর্ষণে হেমন্তর সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু বেরুবার মুখে পঁচাত্তর টাকার শিকলটার পিছুটান অনুভব করি।

হেমন্ত ফিরে এলেই তাঁর সহকর্মীরা এসে তাঁকে ঘিরে ধরেন। দেশের অবস্থা নিয়ে কখনও তুমুল উত্তেজিত তর্ক চলে। কখনও আলোচনায় বিষাদের রঙ, কখনও বা আশাবাদের ঝকমকানি।

একেক দিন সর্বজনমান্য দু-একজন নেতাও এসে পড়েন। আসন্ন স্বাধীনতাকে কী-ভাবে দেশের মানুষ গ্রহণ করবে, স্বাধীনতার পর দু'শ বছরের পরাধীন জাতির রক্তে কেমন করে নতুন সঞ্জীবনী প্রবাহিত করতে হবে তা নিয়ে উদ্দীপনাময় মতামত বিনিময় চলে।

আলোচনার আসর বসলে আমি সহজে নড়তে চাই না। মাধ্যাকর্ষণের মত দুরন্ত টানে তারা আমাকে আটকে রাখে। হেমন্তর এ ব্যাপারে খানিকটা সস্নেহ প্রশ্রয়ও আছে। দেশমান্য বিরাট মানুষগুলির একপাশে আমি যে গিয়ে বসি, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁদের কথা শুনি, সে সম্বন্ধে হেমন্তর লেশমাত্র বিরক্তি বা আপত্তি নেই।

সে যাই হোক, রিপোর্ট লিখতে লিখতে আর হেমন্তদের আলোচনা শুনতে শুনতে আমার চাকরিটার কথা একেবারেই খেয়াল থাকে না। যতক্ষণ না মিসেস মিত্র বয় পাঠিয়ে আমাকে ডাকিয়ে নিচ্ছেন ততক্ষণ ভাঙা বাড়িতেই থাকি।

চাকরি নিয়ে আসার পর মিসেস মিত্রকে দেখেছিলাম, ব্যবহারে মার্জিত, কথায়-বার্তায় সহৃদয়। কিন্তু ইদানীং সবসময়ই তিনি অসহিষ্ণু, কারণে-অকারণে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। স্বামী-ছেলে তাঁকে ত্যাগ করেছে, নীনীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে—সম্ভবত এ-সবই তাঁর পরিবর্তনের কারণ।

বয়ের সঙ্গে বধ্যভূমির পশুর মত নতুন বাড়িতে এলেই মিসেস মিত্র ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, 'তোমার কি এ-বাড়ির কথা খেয়াল থাকে না ?'

কোনদিন বলি, 'আজ্ঞে মিস্টার মিত্র একটা রিপোর্ট লিখে দিতে বললেন। তাই—।' কোনদিন বা কৈফিয়ৎ দিই, 'ও-বাড়িতে কয়েক জন নেতা এসেছিলেন। তাঁরা স্বাধীনতার ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন—'

'ইউ—ইউ সোয়াইন, রিপোর্ট লেখা আর নেতাদের গা শুঁকবার জন্যে কি তোমাকে মাইনে দেওয়া হয় ? চাকরির শর্তগুলো কি ভুলে গেছ ?'

মিসেস মিত্র যে-ভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তাতে মনে হয় আমি উপলক্ষ্য মাত্র। আমাকে মাঝখানে রেখে স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ আর আক্রোশ ফেটে পড়ছে। অবশেষে ম্রিয়মাণ পাংশু মুখে শর্তমত চলার অঙ্গীকার দিয়ে পুরনো বাড়িতে চলে আসি। ওখানে ফিরলেই অঙ্গীকারটার কথা মন থেকে নিঃশেষে মুছে যায়।

অতএব প্রতিদিনই ইদানীং আমাকে গালাগাল সইতে হচ্ছে। মিসেস মিত্র শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, 'না, ও-বাড়িতে তোমার আর থাকা

হবে না। ভাবছি, এখানে এনেই রাখব।'

শুনে চমকে উঠেছি। হেমন্ত জেল থেকে ফিরে আসার পর রোজ কত আলোর সঙ্গ পেয়ে আসছি। তাদের ছেড়ে নতুন বাড়িতে যেতে আমার সমস্ত মন অস্থির হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য! একদিন ভাঙা বাড়িটাকে নির্বাসন মনে হয়েছিল। ইদানীং সেটা ঘিরেই আমার চেতনা উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

এইভাবেই চলছিল। নতুন আর পুরনো বাড়ির মাঝখানে আমি ছোটাছুটি করছিলাম। দু-দিকের টানাপোড়েনে জীবনে অদৃশ্য এক রাগিণী বাজতে শুরু করেছিল।

অবশ্য পুরনো ভাঙা বাড়িটাই আমাকে মগ্ন করে রেখেছে। নতুন বাড়ির সঙ্গে আমার শুধুমাত্র কষ্টদায়ক প্রাণধারণের যোগ।

এদিকে লক্ষ্য করছিলাম, ক্রমাগত বাইরে যাওয়ার ফলে হেমন্ত আর কনককে অত্যধিক পরিশ্রম এবং অনিয়ম করতে হচ্ছে। কাজেই দু-জনের শরীর ভেঙে পড়ছিল।

বাড়িতে থেকে কিছুদিন বিশ্রামের জন্য হেমন্তকে অনুরোধ জানিয়েছি। হাজার বলেও কিছু হয় নি। মৃদু হেসে হেমন্ত শুধু জানিয়েছেন, আরাম করার সময় আপাতত তাঁর নেই।

কনককেও একই কথা বলেছি, 'এ আপনি কী করছেন? ক'দিন আগে হাসপাতাল থেকে এসেছেন, সে খেয়াল আছে?'

হেসে কনক বলেছে, 'আছে বৈ কি। হঠাৎ ও কথা যে?'

একখানা হাত-আয়না তার হাতে দিয়ে বলেছি, 'নিজের চেহারাখানা একবার দেখুন।'

আয়নার প্রতিবিম্বটাকে অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে কপট দুর্ভাবনার সুরে কনক বলেছে, 'নাঃ, শরীরটাকে একেবারে খেয়ে বসেছি।'

'মনে হচ্ছে? তবেই বুঝুন এ-ভাবে অমন অনিয়মের মধ্যে আপনার চলা উচিত নয়।'

'নয়ই তো। কিন্তু কী করব, বলুন। ভাঙা শরীর নিয়ে মেসোমশায় বাইরে বাইরে ঘোরেন। তাঁকে একলা ছেড়ে দেওয়া তো নিরাপদ নয়। কেমন অন্যমনস্ক মানুষ, সে ত নিজেই ভাল করে জানেন। আমি সঙ্গে থাকলে তবু জোর করে খাওয়াতে পারি।'

একটু ভেবে বলেছি, 'মেসোমশায় তো অন্যমনস্ক মানুষ আর কনকদেবী স্বয়ং? তাঁকে জোর করে খাওয়াবার কেউ আছে কী? মিস্টার মিত্রের চলাফেরা খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর রাখতে আপনি তাঁর সঙ্গে যান।

ভাবছি—'

'কী ?'

'চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে আপনার ওপর খবরদারি করবার জন্যে আমাকে সঙ্গে যেতে হবে। না হ'লে আপনাকে বাঁচানো যাবে না। আর আমি থাকতে আপনি মরে যাবেন, তা হবে না।' বলেই বিব্রত বোধ করেছি। সেই সঙ্গে অপরিসীম এক আড়ষ্টতা আমাকে বেষ্টন করে ফেলেছে। বুঝতে পেরেছি আমার গলার সুরে মুখের ভাবে বেসুর বাজতে শুরু করেছে। এ কী হল! এ কী বললাম আমি! আমার অগোচরে আলোছায়ার কোন খেলার মাঝখানে কোনদিন এই বেসুর ছিল কি না, জানি না।

ওদিকে কনকের চোখও স্থির হয়ে গেছে। নির্নিমেষে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে ডেকে উঠেছে, 'শুভেন্দুবাবু—'

কনকের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি না। কোন রকমে অস্ফুট উত্তর দিয়েছি, 'বলুন—'

কনক কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে বলেছে, 'ছেলেবেলায় মা মরেছে। তার কথা মনেও নেই। আর বাবাকে তো নিজেই দেখেছেন। আপনার মত এমন করে কেউ কোনদিন আমাকে বলে নি।'

ইচ্ছা হয়েছে কনককে একটু স্পর্শ করি, নাম ধরে ডেকে একটু আদর করি। কিন্তু পারি নি।

সতের

আমার উপর মিসেস মিত্রের রাগটা শেষ পর্যন্ত শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছল। তার ফল হ'ল এই, ভাঙা বাড়িতে আমার কয়েক মাস থাকার আয়ু শেষ হ'ল।

ব্যাপারটা এইরকম। হেমন্ত মাঝখানে একবার কুষ্টিয়া গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, ওখানকার রাজনৈতিক আবহাওয়াটা বুঝে আসা। প্রায় প্রতিবারই কনক নতুবা অন্য কোন সহকর্মী সঙ্গে যায়। এবার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়ে বসেছে কনকের। সহকর্মীরাও অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত। অতএব একাই যেতে হবে হেমন্তকে। একা অবশ্য যাওয়া হ'ল না, কনক জোর করে তাঁর সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিল। একবার ভেবেছিলাম, মিসেস মিত্রকে জানিয়ে যাব। পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, জানাতে গেলে যেতে দেবেন না। তাই না বলেই চলে গিয়েছিলাম।

দিন সাতেক পর হেমন্তকে নিয়ে ফিরে এসে স্তম্ভিত হ'তে হ'ল। আমার

ঘর একেবারে ফাঁকা। বিছানা-স্যুটকেশ জামাকাপড়—আমার যা কিছু ছিল মিসেস মিত্র চাকর পাঠিয়ে সব নতুন বাড়িতে নিয়ে গেছেন।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। নতুন বাড়িতে আসতেই আশ্চর্য শান্ত গলায় মিসেস মিত্র বললেন, 'ও-বাড়িতে ওদের সংস্রবে না থাকাই ভাল। কাজের বড্ড গাফিলতি হয়ে যাচ্ছে। আমারও খুব অসুবিধে হচ্ছে। তোমার মালপত্র সব আনিয়ে নিয়েছি। এবার থেকে এ-বাড়িতেই থাকবে।'

কী উত্তর দেব, ভেবে পেলাম না। দিশেহারার মত মিসেস মিত্রের দিকে তাকিয়ে রইলাম শুধু।

দোতলায় মিসেস মিত্রের পাশের ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। বিলাসের সমস্ত উপকরণে ঘরখানা চমৎকার সাজানো। মিসেস মিত্র নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাজিয়েছেন। জিজ্ঞেস করেছেন, 'কি, ঘর পছন্দ হয়েছে?'

পুরনো বাড়ি ছেড়ে আসতে প্রাণে বিষণ্ণ রাগিণী বাজছিল, মুখে কিছু বলি নি। মাথা নেড়ে শুধু জানিয়েছি, হয়েছে। সত্যই তো আরামের কোন দিকই অপূর্ণ রাখেন নি মিসেস মিত্র।

তিনি আবার বলেছেন, 'আমার কাছে কাছেই তোমার থাকা ভাল। একা থাকি; কখন কী দরকার হয়—'

এর পর এক বিচিত্র জীবন শুরু হ'ল আমার। আজকাল দিবারাত্রি সর্বক্ষণই আমি মিসেস মিত্রের সহচর। তাঁর জীবনের যে দিকগুলো এতকাল আমার অদেখা ছিল সেগুলো ধীরে ধীরে উন্মোচিত হ'তে লাগল। দেখতে দেখতে শিউরে উঠতে লাগলাম।

দীপালিকে বিয়ে করে জয়ন্ত চলে গিয়েছিল। কর্মচারীদের দু-মাসের করে মাইনে বেশি দিয়ে কণ্ট্রাক্টরি ব্যবসা তুলে দিলেন মিসেস মিত্র। বললেন, 'আর টাকার দরকার কী আমার। ব্যাঙ্কে যা আছে আমার জীবনে তা উড়িয়ে যেতে পারব কি না সন্দেহ।'

ড্রিঙ্ক পুরোদমেই চলছিল। শুধু মাত্রাটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। বলেন, 'ওরা আমাকে ত্যাগ করেছে শুভেন্দু। মনে করেছে আমি জব্দ হয়ে যাব। আরে বাপু, ব্যাঙ্কের পাশ বইগুলো আর হুইস্কির বোতল যতদিন আছে ততদিন আমি নিঃসঙ্গ নই। এরাই আমার সঙ্গী, আমার সান্ত্বনা। অবশ্য তুমিও আছ।'

দিনকয়েক মিসেস মিত্রের মদ খাওয়া আর প্রলাপ বকা শুনলাম। কতবার যে ভাবলাম, এমন প্রচণ্ডভাবে নেশা করতে বারণ করি। কিন্তু প্রতিবারই নীনীর হাতে সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতাটার কথা মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উৎসাহ নিভে যায়।

মদ খাবার সময় কাছে বসে থাকাটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু

দিনকয়েক পর এক নতুন যন্ত্রণা শুরু হ'ল। ডাকার সুবিধের জন্য কলিং বেলের ব্যবস্থা করেছেন মিসেস মিত্র। তাঁর ঘরে বোতাম টিপলে আমার ঘরে আওয়াজ পৌঁছয়। একদিন মাঝরাতে গাঢ় ঘুমে তলিয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটানা কলিং বেল বেজে উঠল। এ-বাড়ি আসার পর শোবার সময় স্লীপিং গাউন পরতে বলে দিয়েছেন মিসেস মিত্র। সেই অবস্থাতেই পাশের ঘরে দৌড়লাম।

মিসেস মিত্র হেসে বললেন, 'একেবারে ঘুম আসছিল না। ভাবলাম একা একা কী করি, শেষ পর্যন্ত তোমাকেই ডাকলাম। বোসো। ঘুম ভাঙালাম বলে কিছু মনে করলে না ত?'

একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। অপরিসীম বিরক্তি গোপন করে বললাম, 'না, মনে করার কী আছে?'

'অবশ্য শুধু শুধু তোমার ঘুম ভাঙাই নি। বাকি রাতটুকু কাটাবার জন্যে রসের বন্দোবস্ত আছে। ভালই লাগবে তোমার। এক কাজ কর, ডান-দিকের বুক-শেলফ্‌টার মাঝখান থেকে লাল মলাটের ঐ বইটা নিয়ে এস।'

নির্দেশ মত বই নিয়ে এলাম। মিসেস মিত্র বলতে লাগলেন, 'ফ্রেঞ্চ ক্লাসিক হে, একেবারে রসের বান ডেকে আছে। ইংরেজিতে অনুবাদ করা, অসুবিধে হ'বে না। নাও শুরু করে দাও।'

চাকরি দেবার সময় মিসেস মিত্র বলেছিলেন, আমি গ্র্যাজুয়েট হ'লে তাঁর পক্ষে সুবিধে হ'ত। এতদিন তিনি যে-সব কাজ দিয়েছেন তাতে শিক্ষাগত যোগ্যতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এবার বোধ হয় হ'ল। যাই হোক, বই খুলে একটি পাতা পড়তে না পড়তে কান গরম হয়ে উঠল, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল, রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল আর স্বর আসতে লাগল জড়িয়ে।

এর নাম ক্লাসিক! বীভৎস দেহবাদ আর যৌন অপরুচির কুৎসিত সব কাহিনী। এর নাম নাকি রস! রসই বটে! ফরাসী ভাষার গেঁজিয়ে-ওঠা উগ্র অম্লস্বাদ এই আরক হজম করা আমার পক্ষে সম্ভব না। বই বন্ধ করে নতমুখে বসে রইলাম।

মিসেস মিত্র বললেন, 'বই বন্ধ করলে যে! লজ্জা লাগছে? বোকা ছেলে, তুমি না পুরুষ মানুষ! আমাকে তোমার বন্ধু ভাবো। নাও, আবার শুরু কর।'

আমি নীরব। মিসেস মিত্র কী বুঝলেন তিনিই জানেন। তীব্রস্বরে বলে উঠলেন, 'আমার কথামত চলাই কিন্তু তোমার চাকরি। এ কথাটা বার বার তুমি ভুলে যাচ্ছ!'

অগত্যা গুঙিয়ে গুঙিয়ে বইটা থেকে কী যে পড়ে গেলাম, নিজেই বুঝলাম না।

এর পর থেকে প্রতি রাতে আমাকে ডাকিয়ে এনে বিদেশী ভাষার অশ্লীল ফেনায়িত তাড়ি তারিয়ে তারিয়ে পান করতে লাগলেন মিসেস মিত্র। শুধু কি তা-ই, একদিন বিকেলে দরজা-বন্ধ অন্ধকার ঘরে সিনেমা দেখালেন মিসেস মিত্র। মুভি ক্যামেরায় তোলা মৈথুনের কদর্য ভয়াবহ সব চিত্র দেখতে দেখতে চোখ বুজে ফেলেছিলাম। মনে হয়েছিল, পৃথিবী নামে এই গ্রহটা একেবারেই বায়ুশূন্য। সিনেমা শেষ হ'লে দু হাতে মুখ ঢেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম।

আরেক দিন দুপুরে হঠাৎ আমাকে বাথরুমে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মিসেস মিত্র। বাথরুমের দরজার বাইরে ইতস্তত করছিলাম দেখে তিনি বলেছিলেন, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন, কাম ইন—কাম ইন।'

ভেতরে ঢুকে দেখলাম বাথ-টাবের অজস্র সাবানের ফেনার মধ্যে মিসেস মিত্রের সমস্ত দেহ অদৃশ্য, মুখটা শুধু বাইরে বেরিয়ে আছে। একটা টুল দেখিয়ে প্রথমে তিনি আমাকে বসতে বললেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলার জন্যে ডেকেছি।'

কথা বলার এমন উপযুক্ত পরিবেশের কথা আগে জানা ছিল না। যাই হোক, উন্মুখ হয়ে রইলাম।

মিসেস মিত্র বলতে লাগলেন, 'ওদের ধারণা আমি অসুখী, আমার শান্তি নেই। তোমার কী ধারণা? আমার ত মনে হয়, সুখের সাগরে আমি ভাসছি।'

কথায় কথায় হঠাৎ একসময় খেয়াল হ'ল বাথ-টাবের সাবানের ফেনা মরতে শুরু করেছে। চমকে লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

একদিন নেশার ঘোরে মিসেস মিত্র বললেন, 'তুমি আমার কাছে থাক। আমার যা কিছু সব তোমাকে লিখে দিয়ে যাব। আপাতত দু-চারদিনের ভেতর হাজার পঁচিশ টাকা তোমার নামে ব্যাঙ্কে একটা একাউণ্ট করে জমা দেব ভাবছি। সবাই আমাকে ছেড়ে গেছে, শুধু তুমি ছাড়া। রীয়ালি আই অ্যাম গ্রেটফুল।'

এত প্রলোভনেও আমি খুশি নই। শুধু জীবনধারণের জন্য নিজের অনিচ্ছায় মিসেস মিত্রের অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছি। নইলে প্রাণটা এখান থেকে পালাবার জন্য বুকের ভেতর অবিরত ডানা ঝাপটাচ্ছে। আমি পালাব, পালাব, পালাব।

হেমন্ত এবং কনকের কাছে যে জীবনের আস্বাদ পেয়েছি, তার জন্য আমার সমস্ত চেতনা অস্থির হয়ে রয়েছে। অথচ চাকরির ফাঁদে এখানে আটকে আছি। নতুন বাড়ি আর পুরনো বাড়ি—জীবনের দুই বিরুদ্ধ প্রান্তের প্রবল চাপে আমার ফুসফুস বুঝি ফেটে যাবে।

এখানে এত বিলাস এত আরাম, তবু প্রতি মুহূর্তে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হয় ড্রাগনের দ্বীপে বন্দী হয়ে আছি। বাড়ি থেকে বেরুবার সুযোগ কদাচিৎ পাই। মিসেস মিত্র সব সময় আগলে থাকেন। কখনও যদি বাইরে বেরুতে হয়, সঙ্গে যান।

একদিন কিন্তু সুযোগ পেয়ে গেলাম। মিসেস মিত্রের শরীর খারাপ ছিল, বিশেষ একটা দরকারে একাই আমাকে ব্যাঙ্কে পাঠালেন। প্রথমে ব্যাঙ্কে গেলাম না। নতুন বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটলাম কনকের কাছে।

হেমন্ত বাড়ি ছিলেন না, কনক ছিল। আমাকে দেখে অনুযোগের সুরে বলে উঠল, 'ও-বাড়িতে গিয়ে আমাদের কথা একেবারে ভুলেই গেছেন দেখছি। একবারও এদিকে আসেন না। বেশ আরামে আছেন, বলুন।'

'আমি ভুলেছি না আপনি ভুলেছেন!' আমার গলার স্বর কাঁপতে লাগল, 'ও-বাড়িতে গিয়ে কী-ভাবে বেঁচে আছি সে খোঁজ একবারও নেন? সম্পর্ক একেবারে চুকিয়েই দিয়েছেন। মরে গেলেও বোধ হয় খেয়াল থাকবে না।'

'খোঁজ নিই না!' ক্ষুব্ধ হ'ল কনক। বলল, 'জানেন, গুপীকে অন্তত সাত আটবার ও-বাড়িতে পাঠিয়েছি। মেসোমশায়ের খুব দরকার ছিল আপনাকে। যতবার গেছে বয়রা ততবারই বলে দিয়েছে আপনি বাড়ি নেই।'

'সে কী, আমি তো কিছুই জানি না। তা ছাড়া এখান থেকে যাবার পর মাত্র তিন দিন আমি বাইরে বেরিয়েছি। তা-ও সামান্য সময়ের জন্যে। কিন্তু বয়রা তো আমাকে গুপীর কথা কিছু বলে নি।' চকিতের জন্য আমার মনে পড়ল, তবে কী এ-সব মিসেস মিত্রের কারসাজি! এ-বাড়ি থেকে কেউ আমার খোঁজে গেলে বয়দের 'নেই' বলতে শিখিয়ে দিয়েছেন?

কনক বলল, 'সে যাক, এখন কেমন আছেন তা-ই বলুন।' বলতে বলতে হঠাৎ চমকে উঠল, 'এ কী, এত আরামের মধ্যে রয়েছেন কিন্তু চেহারার এমন হাল হয়েছে কেন!'

মিসেস মিত্রের কাছে কী-ভাবে কী অর্থে গ্লানির মধ্যে দিন কাটাচ্ছি, সব বলে গেলাম। কিছুই গোপন করলাম না। অবশেষে প্রশ্ন করলাম, 'একে আপনি আরাম বলেন?'

কনক চুপ। আমি বলতে লাগলাম, 'এই বিকৃত পারভার্টেড্ মহিলার কাছে আর কিছু দিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।' বলতে বলতে হঠাৎ অন্ধের মত হাত বাড়িয়ে কনকের একটা হাত ধরলাম, 'মিসেস মিত্রের কাছ থেকে আমাকে বাঁচাতে পারেন? আমাকে বাঁচান। ঐ নরকের মধ্যে মরে যাচ্ছি। দু-বেলা দুটো খাওয়া আর একটা স্বাভাবিক জীবন—এর বেশি কিছু চাই না। আপনি যা বলবেন, তা-ই করব। যে-ভাবে চলতে বলবেন—'

কনক হাত ছাড়িয়ে নেয় নি। নরম গলায় বলল, 'যান, আপনার বাক্স-

বিছানা নিয়ে আসুন। এক সঙ্গে অনেকদিন ছিলাম। এমন অভ্যাস হয়ে গেছে আপনি ও-বাড়ি চলে যাওয়াতে এত খারাপ লাগে—' বলতে বলতে চুপ করল সে।

কনকের না-বলা কথার অন্ধকারে কিসের যেন একটা রেশ ছিল, যাতে প্রাণের কোন এক অজানা তারে ঝঙ্কার লাগল। কতক্ষণ যে নিষ্পলকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, খেয়াল নেই। একসময় চোখ নামিয়ে নতুন বাড়িতে ছুটলাম।

মিসেস মিত্র দোতলার লাউঞ্জে বসে ছিলেন। সোজা তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'আমাকে মুক্তি দিন।'

'মুক্তি!' বিমূঢ়ের মত উচ্চারণ করলেন মিসেস মিত্র।

'আমি আর চাকরি করব না। আজই, এখনই চলে যাব।'

'চাকরি করবে না, মানে!' মিসেস মিত্র এবার ফেটে পড়লেন, 'ইচ্ছে হ'লেই চলে যাওয়া যায় না কি! আমি তোমাকে ছাড়ব না, দেখি কেমন করে যাও।'

কনক আমাকে মুক্তির সনদ হাতে তুলে দিয়েছে। অতএব এই প্রথম মিসেস মিত্রের অবাধ্য হলাম। দুর্বিনীত ঘাড় বাঁকিয়ে আবার জানালাম, চাকরি আমি করব না। তিনি পারলে আমাকে যেন আটকে রাখেন।

মিসেস মিত্র চিৎকার করতে লাগলেন, 'ইউ সোয়াইন, তোমাকে আমি পুলিশে দেব। তুমি আমার টাকা মেরেছ, তুমি—'

তাঁর সেই অর্থহীন প্রলাপের মধ্যে ঘর থেকে আমার স্যুটকেশ-বিছানা বার করে আনলাম। যখন সত্যিই মিসেস মিত্র দেখলেন, আমি যাবই, ভয় দেখিয়ে আমাকে ঠেকানো যাবে না তখন বললেন, 'ভেবেছিলাম, পঁচিশ হাজার টাকা তোমার নামে ব্যাঙ্কে জমা দেব। আমার যা কিছু সব তোমাকে দিয়ে যাব।'

উত্তর না দিয়ে আমি ততক্ষণে সিঁড়ির কাছে। এবার অসহায় সুরে মিসেস মিত্র বলে উঠলেন, 'সত্যিই চললে! কোথায় যাচ্ছ?'

বললাম, 'বাঁচতে।'

আঠার

পুরনো বাড়িতে ফিরে এসে আমার দু'টো কাজ হ'ল। প্রথমত আগেকার মত হেমন্তর রিপোর্ট লিখে দেওয়া এবং মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে কলকাতার বাইরে যাওয়া। আমাকে ফিরে পেয়ে খুশিই হয়েছেন হেমন্ত।

দ্বিতীয় কাজটি হ'ল, ফাঁকে ফাঁকে চাকরির খোঁজ। হেমন্ত সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। একদিন বললেন, 'চাকরি করা কি তোমার একান্ত প্রয়োজন? শুনেছি, তোমার তো কেউ নেই।'

'আজ্ঞে—' কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললাম, 'আপনাদের ওপর এসে আছি—'

'সে-জন্য তোমার সঙ্কোচ করতে হবে না। দেখ শুভেন্দু, তোমার কাছে আমার কিছু প্রত্যাশা আছে। চাকরি সংসার ছেলেপুলে নিয়ে যারা দিবারাত্রি ঝালাপালা, নিতান্ত সেই দলে না-ই বা নাম লেখালে—'

বললাম, 'কিন্তু একেবারে বসে থেকে—'

আমার শেষ দ্বিধাটা ভাসিয়ে দিয়ে হেমন্ত বললেন, 'বসে থাকতে তোমাকে দিচ্ছে কে? অনেক কাজ আছে শুভেন্দু। যার জন্য সারা জীবন লাঞ্ছনা সইলাম সেই স্বাধীনতা এবার এসে যাবে মনে হচ্ছে। স্বাধীনতা পেলে কত যে দায়িত্ব আর কাজ হাতে এসে পড়বে, এখন তা চিন্তা করতে পারবে না। জাতি-গঠনের দায়িত্ব—'

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিপুল কর্তব্যের ছবি এঁকে হেমন্ত থামলেন। আর চাকরি খোঁজা ছেড়ে দিয়ে অনাগত দায়িত্বের প্রত্যাশায় দিন গুনতে শুরু করলাম।

দিন যাচ্ছিল। এর মধ্যে ক্রীপস-মিশন ভারতবর্ষ থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। কেননা, সিমলায় কংগ্রেস এবং লীগের সঙ্গে মিশনের যে আলোচনা চক্র বসেছিল তাতে লীগ সার্বভৌম পাকিস্তান আর কংগ্রেস ভারতের অখণ্ডতা দাবী করে। উভয়েই নিজের নিজের দাবীতে অটল। অতএব আলোচনা কোন সার্থক পরিণতিতে পৌঁছয় না।

শেষ পর্যন্ত মিশন দেশের সামনে এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা পেশ করে গেছে। তার অনেক প্রস্তাবের মধ্যে এগুলো প্রধান। প্রথমত, লীগের সার্বভৌম পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করা হবে না। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র এবং শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হবে। তৃতীয়ত, শাসনতন্ত্র গঠন না হওয়া পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তী

সরকার গঠিত হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেসের সমান সংখ্যক সদস্য দাবী করল লীগ। দেশের জনসমষ্টির এক-চতুর্থাংশ মুসলমান এবং তাদের সবাই লীগপন্থী নয় —এই যুক্তিতে লীগের সমান সংখ্যার দাবী কংগ্রেসের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হ'ল না। কাজেই জুন মাসের শেষ দিকে সাময়িকভাবে গভর্নমেন্টের উদ্যোগে একটি তদারকী সরকার গঠন করা হ'ল। লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে সমান সংখ্যক সদস্য গ্রহণ করা হলে গণপরিষদ গঠনে রাজি হবে এমন স্বীকৃতি দিয়েছিল কিন্তু কংগ্রেস যখন সংখ্যাসাম্যের দাবী অগ্রাহ্য করল তখন গণ-পরিষদ এবং তদারকী সরকার—দুই পরিকল্পনাই প্রত্যাখ্যান করল এবং ষোলই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করল।

ষোলই আগস্ট, ঊনিশ শ ছেচল্লিশ। ইতিহাসের ধিক্কৃত কলঙ্কিত দিনগুলির মধ্যে এটি বোধ হয় সব চেয়ে গাঢ় কালি মাখানো। এক বছর আগে ঠিক এই দিনটিতে চাকরির সন্ধানে কলকাতায় এসেছিলাম। তারপর থেকে নানারূপে এই শহরটা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার নৃশংস ভয়াবহ চেহারাটা এই প্রথম দেখলাম। তার দিকে তাকিয়ে সভয়ে বিস্ময়ে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে গেল। বিংশ শতকের মার্জিত সুসভ্য আলোকিত নগরী দেখতে দেখতে ইতিহাসের আগের যুগের হিংস্র অরণ্য হয়ে উঠল।

দেখে শুনে দিশেহারা হয়ে পড়লেন হেমন্ত, 'এ কি হ'ল শুভেন্দু, সমস্ত জীবন ধরে এত যে কষ্ট করলাম, সে কি এই জন্যে। না না না, উঃ, কি ভয়ঙ্কর!'

আমার সংশয় হচ্ছিল, নীনীর মৃত্যুর পর যেমন হয়েছিল হেমন্ত বুঝি তেমনভাবেই পঙ্গু হয়ে পড়বেন। কিন্তু না, একটা দিনই মাত্র তিনি আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। পরের দিন সমস্ত ঘোর কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। আমাকেও সঙ্গে নিলেন। এতদিন দূরে থেকেই রিপোর্ট লিখেছি, তাঁর আলোচনা শুনেছি। এই প্রথম তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। যে দেশ দূর থেকে এত কাল হাতছানি দিচ্ছিল, এবার তার হৃদপিণ্ডের ধুকধুকের শব্দ অনুভব করতে পারব।

প্রথমেই পীস কমিটি তৈরি হ'ল আর হ'ল রেসকিউ পার্টি। শুধু আমাকেই না, এই ভয়াবহতার মধ্যে সবাইকে ডাক দিয়েছেন হেমন্ত। সবাই না হ'লেও অনেকেই সাড়া দিয়েছে। যত নগণ্যই হোক, কিছু মানুষের মধ্যে বিবেক এবং শুভবুদ্ধি, এখনও অবশিষ্ট আছে।

খাওয়া-ঘুম-আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য—কোনদিকেই লক্ষ্য রইল না। জীবন-ধারণের সমস্ত নিয়ম একপাশে ঠেলে দিয়ে কলকাতার নানা প্রান্তে ছুটে বেড়াই। বিপন্নদের উদ্ধার করি আর আবেদন জানাই মানুষের শুভবোধের

কাছে ; এ আত্মক্ষয়, এ বর্বরতার অবসান হোক। কলকাতা জুড়ে শুধু রক্ত, আগুন আর মৃতদেহের স্তূপ। সেইসব নিয়ে কুকুরদের মধ্যে দিবারাত্রি হানাহানি, শকুন আর গৃধিনীদের চিৎকার। আর এরই মধ্যে দিয়ে অভুক্ত অস্নাত অনিদ্র আমরা ক'টি মানুষ জীবনপণে ক্রমাগত ছুটে চলেছি। দিন-ঘণ্টা-প্রহর, কোনদিকে লক্ষ্য নেই। সময়ের হিসেব নেই। আমরা শুধু ছুটছি, ছুটছি আর ছুটছি।

দাঙ্গার প্রথম তিনটে দিন একেবারে খেয়াল ছিল না। চতুর্থ দিন সকালে বুলকির কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে নিদারুণ শিহরণ বয়ে গেল। বুলকি কলকাতার যে দিকে থাকে এ ক'দিনে সে জায়গাটা পোড়া বাড়ি, অঙ্গার আর মানুষের মৃতদেহে নরক হয়ে উঠেছে। খবরটা আগেই পেয়েছিলাম। মনে পড়া মাত্র এক মুহূর্তও আর অপেক্ষা করি নি। রেসকিউ পার্টি নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেছি।

বুলকিকে উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। একটা ভাঙা পরিত্যক্ত পায়খানার ভেতর সে লুকিয়ে ছিল। সেখান থেকে তাকে বার করে উদ্ধার-আশ্রমগুলোতে পাঠাই নি। সোজা ভাঙা বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম।

তারপর ? কলকাতার মাটিতে যতখানি সার আর জল পাওয়া সম্ভব, দাঙ্গার জৈব শক্তি তার সবটুকুই শুষে নিয়েছিল। এর বেশি পুষ্টি এখানে সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক নিয়মেই তার ভীষণতা এবং ব্যাপকতা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। কলকাতার দাঙ্গা কমলে কি হবে, সে নতুন মাটি খুঁজছিল, এবং পেয়েও গিয়েছিল। কলকাতার পর বিহার নোয়াখালি বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, গুজরাট—দিকে দিকে আগুন জ্বলল। রক্ত আর হত্যার উৎসব শুরু হয়ে গেল।

এর মধ্যে নোয়াখালি আর বিহারের তাণ্ডবই সব চাইতে ভয়ানক। সকালে বসে খবরের কাগজ খুলতে আতঙ্ক হয়। একটা দাঙ্গা হত্যা আর আগুনের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এলাম। স্নায়ুগুলো যদিও শক্ত হয়ে উঠেছে তবু প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সব খবর আসছে সেগুলো অসহনীয়।

হেমন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ছিলেন। মন্ত্রি-মিশন আসার আগে তাঁর যে উদ্যম দেখেছিলাম তা যেন নিভে আসছে। ক্লান্ত সুরে প্রায়ই বলেন, 'কিছুই হবে না শুভেন্দু, সব ব্যর্থ হয়ে গেল। স্বাধীনতার জন্য এত মানুষের এত আত্মদান এত আয়োজন—কোনটাই কাজে লাগবে না।'

বুলকিকে সেই যে নিয়ে এসেছিলাম, তারপর থেকে সে এখানেই আছে। যত দিন যাচ্ছে হেমন্ত কনক এবং আমি—তাকে নিয়ে ভয়ানক বিপন্ন হয়ে পড়েছি। সেটা অকারণে নয়।

নিজের চোখের সামনে পর পর অনেকগুলো হত্যা দেখেছে বুলকি, দপদপে মশালের আগুনে আকাশটাকে শিউরে উঠতে দেখেছে। তার ওপর ভাঙা পায়খানায় তিনটে দিন আটকে ছিল। সব মিলিয়ে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া ঘটে গেছে তার মস্তিষ্কে।

সবসময় বিড় বিড় করে আপন মনে কি যেন বকে। কারো সঙ্গে কথা বলে না। যদিও বা বলে—সব অসংলগ্ন, অপ্রকৃতিস্থ। স্নান-খাওয়া-ঘুম, প্রাণধারণের সাধারণ জৈবিক নিয়মগুলির কথা তার মনে থাকে না। খাওয়ানো-নাওয়ানো —সবই করাতে হয় জোর করে। চোখ দু'টি উদ্‌ভ্রান্ত। সব চাইতে বিপদ রাত্রিতে। ঘুম এলেই পৃথিবীর সব দুঃস্বপ্ন আর আতঙ্ক তার দু-চোখে নামতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে বুলকি, 'মেরে ফেলল, মেরে ফেলল—বাঁচাও, বাঁচাও।' রাতের পর রাত বিনা ঘুমে কেটে যাচ্ছে তার।

চিকিৎসা করিয়েও লাভ হয় নি। ডাক্তার জানিয়েছেন, টেরিব্‌ল্ শকে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো জট পাকিয়ে গেছে। কতদিনে যে সেগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে, বলা কঠিন। খুব সাবধানে রাখতে হবে মেয়েটিকে। কোন কারণে যাতে উত্তেজিত না হয়।

এই কলকাতা বুলকির বাবা-মাকে মেরেছে, ভাই-বোনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তাকেও বাঁচতে দিল না, আবার একেবারে মারলও না। জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি একটা জায়গায় বুলকিকে সে ছুঁড়ে দিয়েছে!

উনিশ

ছেচল্লিশের সেই অভিশপ্ত দিনগুলির পর সমস্ত দেশের ওপর দিয়ে নিমেষে দৃশ্যপট বদলে গেছে। এর মধ্যে কিছুকালের জন্য কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করল। মুসলিম লীগ প্রথমে এই সরকার বয়কট করে, পরে অবশ্য যোগদান করেছিল। ওদিকে গান্ধীজি ছুটে গিয়েছিলেন দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালিতে। মনুষ্যত্বের সেই শ্মশানগুলোতে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছিল। সেই অবিশ্বাস আর পশুত্বের অন্ধকারে তিনি করুণা এবং সান্ত্বনা নিয়ে গিয়েছিলেন।

অবশেষে স্বাধীনতা এল। তবে তার পথ কুসুমে-ঢাকা পেলব নয়। স্বাধীনতার রথ এল খণ্ডিত দেশের রক্তাক্ত দেহের ওপর দিয়ে।

একজন দেশবিশ্রুত নেতা ঘোষণা করেছিলেন, 'এক বছর, দশ বছর বা

হাজার বছরে—কোনদিনই পাকিস্তান সৃষ্টি হবে না।' কিন্তু তা হ'ল।

মনে পড়ে, ঊনিশ শ পঁয়তাল্লিশের ষোলই আগস্ট এই শহরে আমি এসেছিলাম। এক বছর পর ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট কলকাতার 'গ্রেট কিলিং' হয়ে গেল। তারও একবছর পর সাতচল্লিশের পনেরই আগস্ট এল স্বাধীনতা।

যাই হোক, বুলাকি আমাদের সঙ্গেই আছে। কিছুটা সুস্থ হ'লেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা ফেরে নি।

ভাঙা বাড়িতে বসেও মিসেস মিত্রের খবর পাই। মদের মাত্রা নাকি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফরাসী সেই অশ্লীলতা আর সেই বীভৎস পর্নোগ্রাফির ছায়াচিত্রগুলি তাঁর একমাত্র সঙ্গী। নিজের মনেই নাকি হাসেন। একা একাই কথা বলেন, 'বেশ আছি, বেশ আছি, সুখের সমুদ্রে ভাসছি।'

নিঃসঙ্গ মহিলাটির জন্য দুঃখই হয়। স্নেহহীন বিশ্বাসহীন এক নৈরাজ্যের অতলে এই যুগ তাঁকে একটু একটু করে ঠেলে দিয়েছে।

একদিন হেমন্ত বলেছিলেন, স্বাধীনতার পর অনেক দায়িত্ব এসে পড়বে। জাতি-গঠনের দায়িত্বই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে খণ্ডিত বাংলা আর পাঞ্জাবের সীমান্তের ওপার থেকে শরণার্থীর স্রোত আসতে শুরু করেছে।

ব্যথিত করুণ সুরে হেমন্ত বলেছেন, 'ভাল করে বাঁচব বলেই তো একদিন স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। কিন্তু এ কী হ'ল! লক্ষ লক্ষ মানুষ যে ভিটেমাটি হারিয়ে ভিখিরি হয়ে গেল।'

শরণার্থীদের সেবায় ঝাঁপ দিতে চেয়েছিলেন হেমন্ত। সীমান্তে ছুটে যেতে চেয়েছিলেন। কনক বাধা দিয়েছে। বলেছে, 'আপনার শরীরের যা অবস্থা তাতে এত পরিশ্রম করতে দিতে পারি না। শরণার্থীদের সেবার দায়িত্ব নেবার লোক অনেক আছে। দরকার হ'লে আমিও নেব।'

'আর হাত পা গুটিয়ে আমি ঘরে বসে থাকব?'

'তা কেন, কত কাজই তো আছে।'

অতএব দেশগঠনের দায়িত্ব নিয়ে হেমন্ত গেছেন স্টেট অ্যাসেম্বলীতে। আর কনক ছুটে গেছে সুদূর দিল্লী। সেখানকার শরণার্থী শিবিরে সে সেবিকা। ঠিক সেবিকা নয়, একটি শিবিরের সমস্ত ভার তার ওপর। ভাঙা বাড়িতে আমি হেমন্ত এবং বুলাকিকে ঘিরে আছি। অবশ্য গুপীও আছে।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন দিল্লী থেকে কনকের চিঠি পেলাম:

'সুচরিতেষু, এখানে শুধু কাজ কাজ আর কাজ। সীমান্ত পেরিয়ে যারা এসেছে তাদের প্রতিটি মানুষ বধ্যভূমির পশুর মত। দু-চোখে তাদের

অসহায়তা আর অবিশ্বাস, দ্বিধা আর সংশয়। রাজনীতির কুটিল একটি ইঙ্গিতে সাতপুরুষের ভিটেমাটি থেকে তারা উচ্ছেদ হয়ে গেছে। তারপর নেমে পড়েছে পথে। কেউ ট্রেনে, কেউ মোষের গাড়িতে, কেউ বা শুধু পায়ে হেঁটেই দিল্লী পর্যন্ত এসে পোঁছেচে। সীমান্ত পেরিয়ে এসেও কতভাবে যে তারা প্রতারিত হয়েছে, সে করুণ ইতিহাস শুনলে তুমি অভিভূত হবে। সীমান্তের এ-পাশেও অনেক অন্ধকার, অনেক অরণ্য। সুযোগ বুঝে শকুনেরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মাংসাশী নেকড়েরা যুবতী মেয়েদের অক্ষত রাখে নি। আর প্রতারিত লুণ্ঠিত হ'তে হ'তে জগতের প্রতি সব বিশ্বাস তাদের শিথিল হয়ে গেছে। সব মানুষকেই তারা সন্দেহ করে। মনোবল, আত্মবিশ্বাস—কিছুই প্রায় তাদের অবশিষ্ট নেই। এই ভাঙাচোরা জীবন্মৃত মানুষগুলোকে আবার মনুষ্যত্বের স্বধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর সে-ই হচ্ছে আমাদের একমাত্র ব্রত।

'সে যা-ই হোক, এখানে অনেক স্বেচ্ছাসেবক। কিন্তু সত্যিকারের সেবাব্রতী আর ক'জন? যা দু-চারজন আছে তাদের নিয়ে এত বড় দায়িত্ব পালন অসম্ভব। তুমি যদি আসতে পার বড় ভাল হয়। আশা করি আসবে। তোমার প্রতীক্ষায় রইলাম।'

এত রক্ত, এত আগুন, এত হত্যা, সারা দেশ জুড়ে এত যে উথল-পাথল ঢেউ, তবু এরই মধ্যে কবে যেন সন্ধ্যাকলি ফুটেছিল। কবে যে কনক আর আমি পরস্পরকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছিলাম, নিজেরাই জানি না। বুঝি বা মনের অগোচর কোন্ স্বাভাবিক ধর্মেই বলতে শুরু করেছিলাম।

চিঠির কথা হেমন্তকে জানাতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কালই তুমি দিল্লী যাও।'

'কিন্তু আপনার আর বুলকির—'

'সে জন্যে চিন্তার কিছু নেই। গুপী আছে, একরকম করে ঠিক চলে যাবে।'

সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব গুপীকে বুঝিয়ে দিয়ে দিন তিনেক পর দিল্লী যাওয়া ঠিক করলাম। যাবার আগের দিন হঠাৎ সীতেশদা এসে হাজির। অনেকদিন পর তাকে দেখলাম। তার কথা এতকাল খেয়াল ছিল না। বললাম, 'হঠাৎ কি মনে করে?'

সীতেশদা বলল, 'বিশেষ একটা দরকার আছে তোর সঙ্গে। শুনলাম মিসেস মিত্রর চাকরি ছেড়ে দিয়েছিস?'

'সে তো অনেক দিন—'

'আমি আজই শুনলাম। প্রায় বছরখানেক পর ও-বাড়িতে তোর খোঁজে এসেছিলাম। মিসেস মিত্র বললেন, তুই এখানে আছিস।'

'কী ব্যাপার বল তো ?'

সীতেশদা বলল, 'তোকে খুব দরকার। আমি একটা অফিস খুলছি। ইম্‌পোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেস করব। লাইসেন্সও পেয়ে গেছি। তুই জয়েন কর, আপাতত আড়াই শ টাকা মাইনে পাবি।'

দূর দিগন্ত থেকে দিল্লী আমাকে হাতছানি দিচ্ছে। সীতেশদাকে সরাসরি 'না' বলে দিলাম। কিছু দিন আগে হলেও সাগ্রহে দু-হাত বাড়িয়ে চাকরিটা আঁকড়ে ধরতাম। কিন্তু তা সম্ভব হল না। আজ আমার অস্তিত্বের প্রায় সব দিকেই কনক আর হেমন্তের ছায়া!

আশ্চর্য! একদিন জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসেছিলাম, ভদ্র রকমের একটা চাকরি নিয়ে সুখের জোয়ারে ভাসব, আমার স্বপ্নের সে-ই ছিল সর্বশেষ সীমারেখা। কলকাতা আমাকে বঞ্চিত করে নি। প্রত্যাশার অনেক বেশি—দুই শতাব্দীর উজ্জ্বল আলোকিত দিকের উত্তরাধিকার সে আমার হাতে তুলে দিয়েছে।

———